জোছনা ও জননীর গল্প / হুমায়ূন আহমেদ

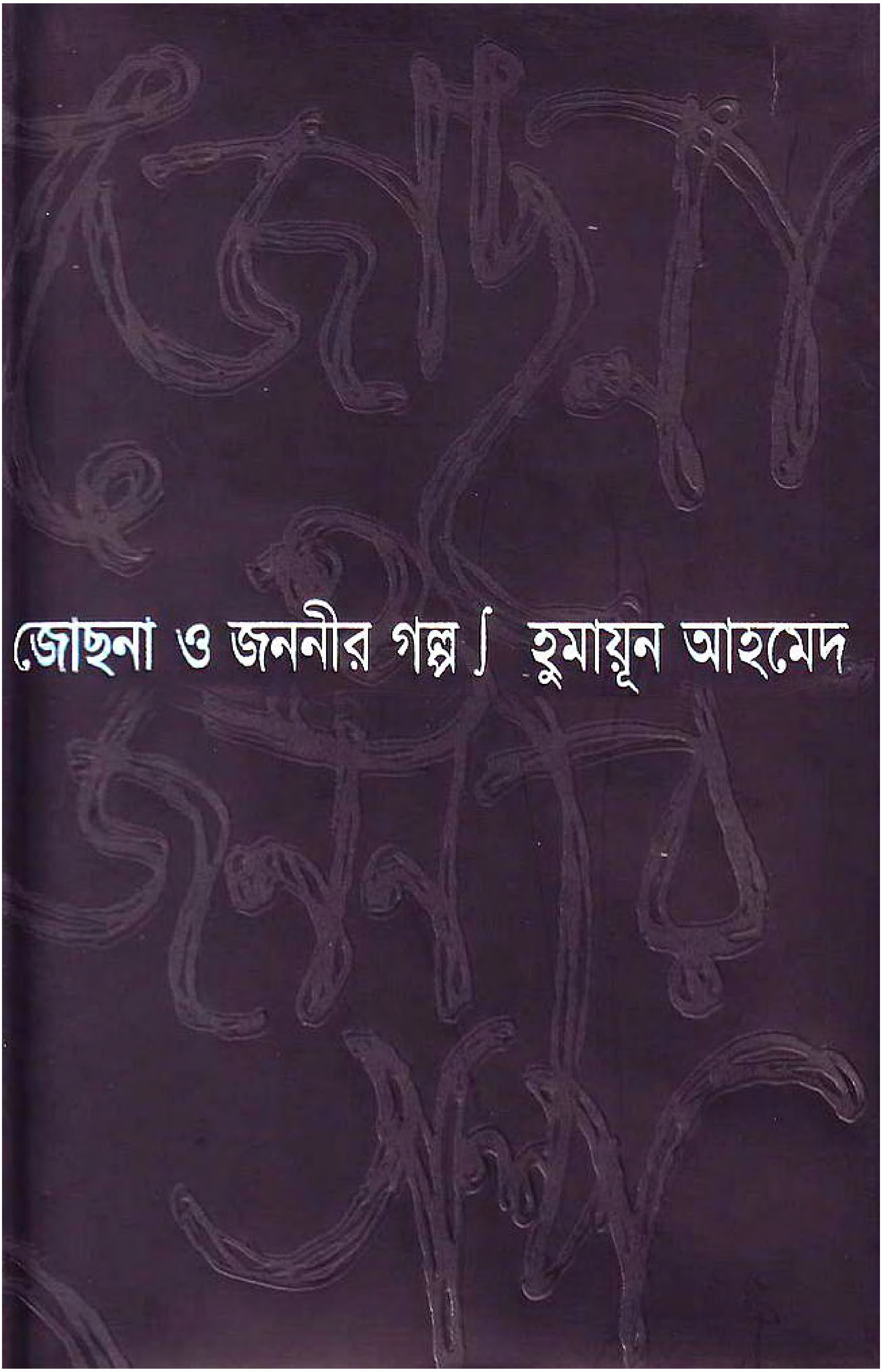
জোছনা ও জননীর গল্প / হুমায়ূন আহমেদ

মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে।
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা,
বন্দিশালার ঐ শিকলভাঙা
তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে ?
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে॥

যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে,
স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি
এসো স্বদেশ ব্রতের মহাদীক্ষা লভি,
সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি।

যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা,
মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা।
সেই রক্তকমলে গাঁথা মাল্যখানি,
বিজয় লক্ষ্মে দেব তাদেরই গলে॥

—মোহিনী চৌধুরী

পূর্বকথা

মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন আমার বয়স তেইশ। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কেমিস্ট্রিতে অনার্স থিয়োরি পরীক্ষা দিয়েছি, প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা। সুন্দর সময় কাটছে। আর মাত্র এক বৎসর— M.Sc পাশ করে ফেলব। ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে যোগ দেব। পিএইচডি করতে যাব দেশের বাইরে।

গল্প-উপন্যাসে আদর্শ ভালো ছাত্রের কিছু চিত্র আঁকা হয়। আমি ছিলাম সে রকম একজন। আদর্শ ভালো ছাত্রের বন্ধু-বান্ধব থাকবে না, আমার ছিল না। তাদের সময় কাটবে বই পড়ে — আমারও তাই কাটে। উনসত্তুরের গণআন্দোলনের অতি উত্তেজনাময় সময়ে আমি ছিলাম উত্তেজনামুক্ত তরুণ যুবক, যার একমাত্র বিনোদন পাবলিক লাইব্রেরিতে গল্পের বই পড়া। শরিফ মিয়ার ক্যান্টিনে চা খাওয়া, মাঝে-মধ্যে বাংলা একাডেমীতে উঁকি দেয়া। সেখানে প্রায়ই গানের আসর হতো।

যেখানেই থাকি সন্ধ্যার আগে আগে মহসিন হলে নিজের ঘরে ফিরে আসতাম। ভালো ছাত্র হিসেবে সেখানে আমি একটি সিঙ্গেল সিটের রুম পেয়েছিলাম। নানান ধরনের বই দিয়ে রুম ভর্তি করে ফেলেছিলাম। গানের প্রতি আমার প্রবল দুর্বলতা দেখে বাবা আমাকে একটা রেকর্ড প্লেয়ার কিনে দিয়েছিলেন। বাইরে যখন ভয়াবহ আন্দোলন চলছে, তখন আমি দরজা বন্ধ করে গান শুনছি— কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?

আমার সাজানো অতি পরিচিত ভুবন পুরোপুরি ভেঙে পড়ল ১৯৭১ সনে। যে পরিস্থিতিতে আমি পড়লাম, তার জন্যে কোনোরকম মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। ছায়াঘেরা শান্ত দিঘির একটা মাছকে হঠাৎ যেন নিয়ে যাওয়া হলো চৈত্রের দাবদাহে ঝলসে যাওয়া স্থলভূমিতে। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা! ভাইবোন নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালাচ্ছি। জীবন বাঁচানোর জন্যে মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে ভর্তি হতে গেছি শর্ষিনার পীর সাহেবের মাদ্রাসায়। পাকিস্তান মিলিটারি মাথায় গুলির বাক্স তুলে দিয়েছে। অকল্পনীয় ওজনের গুলির বাক্স মাথায় নিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে বারহাট্টা থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছি নেত্রকোনা পর্যন্ত। মিলিটারির বন্দিশিবিরে কাটল কিছু সময়। কী ভয়ঙ্কর অত্যাচার! এক সকালে মিলিটারিদের একজন এসে আমার হাতে বিশাল সাইজের একটা সাগরকলা ধরিয়ে দিয়ে বলল, তোমাকে কাল সকালে গুলি করে মারা হবে। এটা তোমার জন্যে ভালো। তুমি যদি নিরপরাধ হও, সরাসরি বেহেশতে চলে যাবে। আর যদি অপরাধী হও, তাহলে মৃত্যু তোমার প্রাপ্য শাস্তি।

এইসব ঘটনা আমি নানান সময়ে নানান পত্র-পত্রিকায় লিখেছি। মুক্তিযুদ্ধের আনন্দ, বেদনা, হতাশা, গ্লানি নিয়ে বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছি। কয়েকটা উপন্যাসও লিখেছি। একসময় মনে হলো, মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় ধরে রাখার জন্যে একটা উপন্যাস লেখা উচিত। মানুষকে যেমন পিতৃঋণ-মাতৃঋণ শোধ করতে হয়, দেশমাতার ঋণও শোধ করতে হয়। একজন লেখক সেই ঋণ শোধ করেন লেখার মাধ্যমে।

লেখা শুরু করলাম। *জোছনা ও জননীর গল্প* ধারাবাহিকভাবে ভোরের কাগজে ছাপা হতে লাগল। আমি কখনোই কোনো ধারাবাহিক লেখা শেষ করতে পারি না। এটিও পারলাম না। ছয়-সাত কিস্তি লিখে লেখা বন্ধ করে দিলাম। দু'বছর পর আবার শুরু করলাম। আবারো কয়েক কিস্তি লিখে লেখা বন্ধ। আর লেখা হয় না। অন্য লেখা লিখি, নাটক বানাই, সিনেমা বানাই, মুক্তিযুদ্ধের লেখাটা আর ধরা হয় না। মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে— তখন নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেই যে, লিখব একদিন লিখব। ব্যস্ততা কমলেই লেখা শুরু করব। এখনো সময় আছে। অনেক সময়।

একদিন হঠাৎ টের পেলাম অনেক সময় আমার হাতে নেই। সময় শেষ হয়ে গেছে। *জোছনা ও জননীর গল্প* আর লেখা হবে না। তখন আমি শুয়ে আছি সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালের একটা ট্রলিতে। দু'জন নার্স ট্রলি ঠেলে আমাকে অপারেটিং টেবিলে নিয়ে যাচ্ছেন। ওপেন হার্ট সার্জারি হবে। আমাকে একটা ঘুমের ইনজেকশন দেয়া হয়েছে। চোখের পাতা ভারী হতে শুরু করেছে। হাসপাতালের আলোর তীব্রতা দ্রুত কমে যাচ্ছে।

যখন অচেতন হতে শুরু করেছি, তখন মনে হলো *জোছনা ও জননীর গল্প* তো লেখা হলো না। আমাকে যদি আর একবার পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়— আমি এই লেখাটি অবশ্যই শেষ করব। অচেতন হবার আগ মুহূর্তে হঠাৎ আনন্দে অভিভূত হলাম। কারণ তখনই প্রথম টের পেলাম আমি আসলেই একজন লেখক। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি যাবার আগের মুহূর্তে অসমাপ্ত লেখার চিন্তাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা।

দেশে ফিরে লেখায় হাত দিলাম। শরীর খুব দুর্বল। দিনে দুই তিন পাতার বেশি লিখতে পারি না। এইভাবেই লেখা শেষ করেছি। এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি দেশমাতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছি। এই আনন্দের কোনো সীমা নেই।

জোছনা ও জননীর গল্প কোনো ইতিহাসের বই না, এটা একটা উপন্যাস। তারপরেও ইতিহাসের খুব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা আমি করেছি। সেখানেও ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে।

হওয়াটাও স্বাভাবিক। উপন্যাস যেহেতু কোনো আসমানী কিতাব না, এইসব ভুল-ভ্রান্তি দূর করার উপায় আছে।

উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে সেই সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষজন এনেছি। এই স্বাধীনতা একজন ঔপন্যাসিকের আছে। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় কোনো ভুল যদি করে থাকি, তার জন্যে আগেভাগেই ক্ষমা চাচ্ছি। অতি বিনয়ের সঙ্গে সেই বিখ্যাত উক্তি মনে করিয়ে দিচ্ছি— একজন লেখক যা লিখবেন, সেটাই সত্যি।

> "সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
> কবি, তব মনোভূমি রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো॥"

উপন্যাসে বর্ণিত প্রায় সব ঘটনাই সত্যি। কিছু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। কিছু অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে ধার নেয়া। প্রকাশিত হবার আগেই এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি অনেককে পড়িয়েছি। যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখে নি (এই প্রজন্মের পাঠকদের কথা বলছি) তারা পড়ার পর বলেছে— উপন্যাসের অনেক ঘটনাই তাদের কাছে কাল্পনিক বলে মনে হচ্ছে, এরকমও কি হয়?

তাদের কাছে আমার একটাই কথা— সে বড় অদ্ভুত সময় ছিল। স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মিশ্র এক জগৎ। সবই বাস্তব, আবার সবই অবাস্তব। আমি সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর সুররিয়েলিস্টিক সময় পার করে এসেছি। তার খানিকটাও যদি ধরে থাকতে পারি, তাহলেই আমার মানবজীবন ধন্য।

জোছনা ও জননীর গল্প বইটি লেখার ব্যাপারে নানান তথ্য দিয়ে যারা আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত বইগুলি আমাকে খুব সাহায্য করেছে। বিশেষ করে উল্লেখ করছি রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর লেখা *৭১-এর দশমাস* গ্রন্থটি। দীর্ঘ দশমাসের প্রতিদিনের ঘটনা তিনি খুব সুন্দর করে সাজিয়েছেন। লেখক-লেখিকাদের ডায়েরির মতো লেখা বইগুলিও আমাকে সাহায্য করেছে। ঢাকা শহরে প্রতিদিন কী ঘটছিল ডায়েরি পড়ে তা বোঝা যাচ্ছিল। তবে এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা খটকার কথাও বলি। ডায়েরি জাতীয় গ্রন্থগুলি পড়ে আমার মনে হয়েছে সেগুলি তখনকার লেখা না। পরে তারিখ দিয়ে সাজানো হয়েছে। কারণ একজন কোনো একটি বিশেষ দিনে লিখছেন— ঢাকা শহরে সকাল থেকেই প্রবল বর্ষণ, আরেকজন একই দিনে লিখছেন— কঠিন রোদ। রোদে ঢাকা শহর ঝলসে যাচ্ছে। একজন লিখছেন— এই মাত্র খবর পেলাম প্রবাসী সরকার শপথ

নিয়েছে। অথচ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে তার দু'দিন পরে। ডায়েরি রচনায় রাজনৈতিক মতাদর্শও কাজ করেছে। কারো কারো ডায়েরিতে প্রতিদিনকার সমস্ত খুঁটিনাটি আছে, কিন্তু জিয়াউর রহমান নামের একজন মেজর যিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধে সবাইকে আহ্বান করেছেন সেই উল্লেখ নেই। তাঁর নামটিও নেই।

জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের বিখ্যাত ভাষণ প্রসঙ্গেও একই ব্যাপার। জাস্টিস মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থ *বাংলাদেশের তারিখ* প্রথম সংস্করণে তিনি উল্লেখ করেছেন ভাষণের শেষে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'জয় বাংলা। জিয়ে পাকিস্তান।' দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি 'জিয়ে পাকিস্তান' অংশটি বাদ দিলেন। কবি শামসুর রাহমানের লেখা আত্মজীবনী যা দৈনিক জনকণ্ঠে 'কালের ধুলোয় লেখা' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে সেখানেও তিনি বলেছেন শেখ মুজিবুর রহমানের শেষ কথা ছিল 'জিয়ে পাকিস্তান'। আরো অনেকের কাছে আমি এ ধরনের কথা শুনেছি, যারা আওয়ামী ভাবধারার মানুষ। সমস্যা হলো আমি নিজে ৮ এবং ৯ মার্চের সমস্ত পত্রিকা খুঁজে এরকম কোনো তথ্য পাই নি। তাহলে একটি ভুল ধারণা কেন প্রবাহিত হচ্ছে?

বঙ্গবন্ধু যদি 'জিয়ে পাকিস্তান' বলে থাকেন তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই। তিনি যা বলেছেন অবশ্যই ভেবে চিন্তেই বলেছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর আলোচনার পথ খোলা রাখতে হবে। তাঁকে সময় নিতে হবে। ৭ই মার্চে যুদ্ধ ঘোষণার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ গেটেসবার্গ এড্রেসের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। এখানে কোনো অস্পষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয় না।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলের পনেরো খণ্ডের মধ্যে সাতটি খণ্ড আমি মন দিয়ে পড়েছি। আমার উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের দলিল থেকে সরাসরি অনেক অংশ ব্যবহার করেছি। এই দলিল নিয়েও আমার কিছু খটকা আছে। একটি শুধু বলি— রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বন্দি তরুণীদের উপরে নির্যাতনের সাক্ষ্য গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে তাদেরকে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হতো। যে তরুণীদের রাখা হয়েছে ভোগের জন্যে তাদেরকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখার পেছনের যুক্তি আমার কাছে পরিষ্কার না। তারপরেও ধরে নিলাম তাই করা হয়েছে। যা আমার কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য না তা হলো সাক্ষ্যদানকারী বলছেন এইসব তরুণীদের সঙ্গে বই-খাতা-কলম ছিল। অর্থাৎ স্কুল বা কলেজে যাবার পথে তাদের ধরা হয়েছে। যে ভয়ঙ্কর সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে-সময়

স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সবই বন্ধ। বইখাতা নিয়ে কারো বাইরে যাবার প্রশ্নই উঠে না। আমার ধারণা সাক্ষ্যপ্রমাণমূলক তথ্যগুলি ভালোমতো যাচাই করা হয় নি। তাছাড়া জাতিগতভাবেও আমরা অতিকথন পছন্দ করি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম ছোট করে দেখানোর একটি প্রবণতাও আমাদের আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর কেউ যদি বাংলাদেশে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস এবং ছোটগল্প পড়ে যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা করতে চায় তাহলে তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিষয়ে কিছুই জানবে না। আমাদের গল্প উপন্যাসে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর বিষয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। লেখকরা হয়তো ভেবেছেন এতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবের হানি হবে।

ঋণ স্বীকারে অগৌরবের কিছু নেই। মহান জাতি এবং মহান মানুষরাই ঋণ স্বীকার করেন। আমি আমার বইটিতে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে যেসব ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের একটি তালিকা দিতে চেয়েছিলাম, যাতে পাঠকরা এই দীর্ঘ তালিকা পড়ে একবার শুধু বলেন— 'আহারে!'

তালিকা শেষপর্যন্ত দিলাম না, কারণ তাতে বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা আরো একশ' বাড়ত। তাছাড়া এই তালিকা যুক্ত করলে অবশ্যই যুদ্ধে শহীদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেসময়কার ইপিআর (বর্তমান বিডিআর), পুলিশ বাহিনী, আনসার বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা দিতে হতো। আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, পূর্ণাঙ্গ তালিকা আমাদের হাতে নেই। এখনো তৈরি হচ্ছে। তেত্রিশ বছর আগে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তালিকা তৈরির কাজ শেষ হয় নি। কবে শেষ হবে?

বীরশ্রেষ্ঠ তালিকার দিকে আমি প্রায়ই তাকাই। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলি। এই তালিকায় একজনও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা নেই। অথচ আমি জানি এবং খেতাব যারা দিয়েছেন তারাও জানেন, বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই অসাধারণ সাহস দেখিয়েছেন। যুদ্ধের ট্রেনিং বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই তাঁরা যা করেছেন তার তুলনা হবে না। অথচ এরা কেউ স্বীকৃতি পান না। কেন না?

আমার এই বইটির অসম্পূর্ণতার মধ্যে একটি হলো আমি পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা অত্যাচারিত নারীদের বিষয়টি আনতে পারি নি। বিষয়টি এতই স্পর্শকাতর এবং এতই কষ্টকর যে কিছুতেই লিখতে পারলাম না। আশা করছি অন্যরা লিখবেন। তাদের কলমে এইসব হতভাগ্য তরুণীর অশ্রুজল উঠে আসবে।

এখন নিতান্তই ব্যক্তিগত একটি বিষয় উল্লেখ করি, আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে আমার জন্মদিনে গুলতেকিন আমাকে একটা খাতা উপহার দিয়েছিল। স্পাইরেল বাইন্ডিং করা পাঁচশ পৃষ্ঠার নীল মলাটের খাতা। তার অনুরোধ ছিল প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে হলেও যেন আমি খাতাটায় মুক্তিযুদ্ধের একটা বড় উপন্যাস লিখি।

সারা জীবনই গুলতেকিনকে অসুখী করেছি। মনে হয় আজ সে খুশি হবে।

পরম করুণাময় আমাকে এই গ্রন্থটি লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি জানাচ্ছি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। দল-মত-ধর্ম সবকিছুর উর্ধ্বে একটি সুখী সুন্দর বাংলাদেশের কামনা করে পূর্বকথা শেষ করছি।

হুমায়ূন আহমেদ

নুহাশ পল্লী
গাজীপুর

নীলগঞ্জ হাইস্কুলের আরবি শিক্ষক মাওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরী কমলাপুর রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বয়স প্রায় ষাট। স্থূলকায় বেঁটেখাটো মানুষ। মুখভর্তি দাড়ি। দাড়ির রঙ সাদাও না কালোও না। সাদা-কালোর মাঝামাঝি। মাথা সম্পূর্ণ কামানো। জুম্মাবার সকালে নাপিত এসে তাঁর মাথা কামিয়ে দিয়ে যায়। কামানো মাথায় না-কি পাগড়ি পরতে সুবিধা। শুক্রবারে তিনি পাগড়ি পরেন। চোখে সুরমা দেন। কানের লতিতে সামান্য আতর দেন। জানু পর্যন্ত লম্বা পিরান পরে জুম্মার নামাজে ইমামতি করতে যান। গত পনেরো বছর ধরেই তিনি এই কাজ করছেন। নীলগঞ্জ জুমা মসজিদের আলাদা ইমাম আছে। শুধু জুম্মার নামাজের দায়িত্ব তিনি পালন করেন।

ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীর হাতে ধবধবে সাদা রঙের একটা রাজহাঁস। তিনি ডান হাতে রাজহাঁসের গলা চেপে ধরে আছেন। রাজহাঁস ছটফট করছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে। কাশেমপুরীর মুখ থমথম করছে, কারণ ট্রেন থেকে নামার সময় এই বিশাল পক্ষী ঠোকর দিয়ে তাঁর কনুই থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে। তাঁকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড়। জনতা কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে। কাশেমপুরী ও তাঁর রাজহাঁস জনতার মধ্যে একধরনের আনন্দ মিশ্রিত আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

ইরতাজউদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, ব্যাপারটা কী ? আপনারা রাজহাঁস এর আগে দেখেন নাই ? যান যান, কাজে যান। অকাজে সময় নষ্ট করছেন কেন ? আপনাদের কোনো কাজ নাই ?

কাজে যাওয়ার প্রতি কারো কোনো আগ্রহ দেখা গেল না, কিংবা কারো হয়তো কোনো কাজ নেই। তারা ইরতাজউদ্দিনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের সঙ্গে আরো কয়েকজন যুক্ত হলো। এই পর্যায়ে রাজহাঁস আরেকবার ঠোকর দিল। সেই আগের জায়গায়, বাঁ হাতের কনুইয়ে। ইরতাজউদ্দিন 'বাপ রে!' বলে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। জনতার আনন্দের সীমা রইল না। তাদের প্রতীক্ষা বৃথা যায় নি। এতক্ষণে দেখার মতো ঘটনা ঘটেছে। ইরতাজউদ্দিন বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, মানুষ তার নিজ প্রজাতির দুঃখ-কষ্টে এত আনন্দিত হয় কেন ? তিনি

ব্যথা পেয়েছেন। এতে অন্যরা আনন্দিত হবে কেন ? এর মধ্যে রহস্যটা কী ? ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে একসময় ভাবতে হবে। এখন কিছুই ভাবা যাবে না মাথা গরম হয়ে আছে। এর মধ্যে একজন উপদেশ দিতে এগিয়ে এলো। গম্ভীর গলায় উপদেশ দিল। জাতি হিসেবে বাঙালির উপদেশপ্রীতি আছে।

চাচামিয়া, ঠোঁট চাইপ্যা ধরেন। ঠোঁট চাইপ্যা ধরলে আর ঠোকর দিব না

ইরতাজউদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, আমার যা করার আমি করব। এ নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি কথা বলবেন না।

উপদেশদাতার উৎসাহ তাতে কমল না। সে জনতার দিকে তাকিয়ে বলল জোড়া সাথে না থাকনে এই অবস্থা। জোড়া সাথে থাকলে রাজহাঁস শান্ত থাকে মাওলানা সাব, এর জোড়াটা কই ?

ইরতাজউদ্দিন কটমট করে তার দিকে তাকালেন। জবাব দিলেন না।

ফাল্গুন মাসের শুরু। রাত এগারোটার মতো বাজে। গ্রামে এই সময়ে শীত থাকে। নীলগঞ্জে তাঁকে কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমুতে হয়। এখানে ভ্যাপসা গরম। আকাশে মেঘ আছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ফাল্গুন মাসে এরকম ভ্যাপসা গরম থাকার কথা না। আকাশে মেঘ থাকার জন্যেই বোধহয় এই অস্বাভাবিক উত্তাপ। বিদ্যুৎ যেভাবে চমকাচ্ছে তাতে মনে হয় বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি নামলেও সমস্যা। তিনি ছাতা আনেন নি। বাইরে বের হলে তিনি সবসময় ছাতা সঙ্গে রাখেন। এবারই ভুল করে ছাতা আনেন নি। বয়স যে হচ্ছে এটা তার লক্ষণ। বয়সকালেই মানুষ ছোটখাটো ভুল করতে থাকে। ছোটখাটো ভুল করা যখন অভ্যাস হয়ে যায় তখন করে বড় ভুল।

ইরতাজউদ্দিনের গায়ে তসরের গলাবন্ধ কোট। গলায় মাফলার। গরমে তার গা ঘেমে যাচ্ছে। কে জানত ঢাকা শহরে ফাল্গুন মাসের শুরুতে শীত থাকে না। শহরে মানুষ বেশি হয়ে গেছে। মানুষের শরীরের গরমে শহর গরম। কত লক্ষ লোক এখন এই শহরে বাস করছে কে জানে! সংখ্যাটা জানা থাকা দরকার।

তাঁর পানির পিপাসা হচ্ছে। পানি কোথায় পাওয়া যায় ইরতাজউদ্দিন জানেন না। এরা এত বড় স্টেশন বানিয়ে রেখেছে কিন্তু পানির ব্যবস্থা রাখে নি। পুটলা-পুঁটলি, পানির পিপাসা এবং কনুইয়ে হাঁসের কামড় নিয়ে তিনি বড়ই বিব্রত বোধ করছেন। তাঁকে যেতে হবে মালিবাগ। ১৮/৬ পশ্চিম মালিবাগ, গলির ভেতর বাসা। আগে একবার মাত্র এসেছেন, এখন খুঁজে পাবেন কিনা কে জানে। ঢাকা শহরের সব গলি তাঁর কাছে একরকম লাগে। শুধু গলি কেন, এই

শহরের মানুষগুলিও একরকম লাগে। মানুষ তো না, যেন মানুষের ছায়া। মানুষের সঙ্গে মানুষের তফাত করা যায়, ছায়ার সঙ্গে ছায়ার তফাত করা যায় না। ঢাকা হলো ছায়ামানুষের দেশ। ছায়ানগরী।

কমলাপুর থেকে মালিবাগ এক টাকা ভাড়ায় ইরতাজউদ্দিন একটা রিকশা জোগাড় করে ফেললেন। রিকশাওয়ালা তাঁকে ঠকালো কিনা তিনি বুঝতে পারছেন না। ঢাকা শহরে তাঁর আসা হয় না। রিকশা ভাড়া সম্পর্কে তাঁর ধারণা নেই। তিনি কাউকে ঠকাতে চান না। কারো কাছ থেকে ঠকতেও চান না। শহরের মানুষ অন্যকে ঠকাতে ভালোবাসে।

রিকশাওয়ালা ভাই, আপনার নাম কী?

বদরুল।

শুনেন ভাই বদরুল, এক টাকার বদলে আমি আপনাকে দুই টাকা দেব, আপনি বাসাটা খুঁজে বের করে দেবেন। আমার কাছে ঠিকানা আছে— ১৮/৬ পশ্চিম মালিবাগ। রাজি আছেন? রাজি থাকলে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। রাজি না থাকলে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নাই।

বাসা রেল গেইটের লগে?

এইসব আমার কিছুই মনে নাই। একবার মাত্র এসেছিলাম। শুধু মনে আছে বাসার সঙ্গে একটা ছাতিম গাছ আছে। মরা গাছ। ছাতিম হলো পল্লী গ্রামের গাছ। এরা শহরে বাঁচে না বলেই মরা।

উঠেন দেহি আল্লাহ ভরসা।

আপনাকে আলহামদুলিল্লাহ বলতে বলেছিলাম, বলেন আলহামদুলিল্লাহ।

রিকশাওয়ালা বিস্মিত গলায় বলল, আলহামদুলিল্লাহ।

রাত কম হয় নি অথচ দোকানপাট খোলা, রাস্তায় প্রচুর লোক, চায়ের দোকানে গান বাজছে। এর মানে কী? এরকম কি সারারাতই চলবে? এরা রাতে ঘুমুবে না? কিছুদূর যেতেই তাঁর রিকশা একটা মিছিলের মধ্যে পড়ে গেল। বড় কিছু না, পঁচিশ-ত্রিশজনের মিছিল। তবে তাদের সবার হাতেই মশাল। মশাল থেকে আলো যত না বের হচ্ছে তারচে' বেশি বের হচ্ছে ধোঁয়া। প্রত্যেকের মুখ ঘামে চকচক করছে। তাদের গলা তত জোরালো না। মনে হয় অনেকক্ষণ মিছিল করে তারা ক্লান্ত।

বদরুল রাস্তার একপাশে রিকশা দাঁড় করিয়ে কৌতূহলী চোখে মিছিলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা একটাই শ্লোগান দিচ্ছে— 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো'। ইরতাজুদ্দিন ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন— এটা কেমন শ্লোগান?

'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' কেন ? স্লোগান হওয়া উচিত শান্তিবিষয়ক— 'নেভাও নেভাও আগুন নেভাও'।

মিছিল দেখে রাজহাঁস উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। লাফ দিয়ে নেমে পড়তে চাচ্ছে। ইরতাজউদ্দিন বিরক্তমুখে হাঁসের গলা চেপে ধরে বসে আছেন। রাজহাঁস অবাক হয়ে মিছিলের মশাল দেখছে। তার জীবন কেটেছে কুপি এবং চাঁদের আলোর আশপাশে। মশালের আলোয় সে ইরতাজউদ্দিন সাহেবের মতোই অভ্যস্ত নয়। মাঝে মাঝেই সে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

মিছিল হুট করে একটা গলির ভেতর ঢুকে গেল। হঠাৎ চারদিক শান্ত হয়ে গেল। রিকশাওয়ালা রিকশা চালাতে শুরু করল। খুশি খুশি গলায় বলল, রাজহাঁসটার দাম কত হইছে ছার ?

ইরতাজউদ্দিনের মন খারাপ হয়ে গেল। শহরের মানুষ সবকিছু বিবেচনা করে দাম দিয়ে। ভালো কিছু দেখলে প্রথমেই সে দাম জিজ্ঞেস করবে।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, হাঁসটা ঘরের, খরিদ করি নাই। আমার ছোটভাই থাকে মালিবাগে, তার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। না, ঠিক তার জন্য না। তার একটা মেয়ে আছে, এপ্রিল মাসে তার বয়স হবে চার। তার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। শিশুরা পশুপাখি পছন্দ করে।

ও।

শহর বন্দরে থাকে, এইসব জিনিস তো দেখে না।

ইরতাজউদ্দিন সাহেব লক্ষ করলেন তাঁর ক্ষুধাবোধ হয়েছে। নানান উদ্বেগ ও উত্তেজনায় তাঁর ক্ষুধার কথা এতক্ষণ মনে হয় নি, এখন ক্ষুধা জানান দিচ্ছে। সন্ধ্যায় কিছু খাওয়া হয় নি। রাত হয়েছে মেলা। বারোটার কম না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিধে সহ্য করার ক্ষমতাও মানুষের কমে যায়। বয়সে শুধু যে শরীর ভাঙে তাই না, শরীরের ভেতরে যে আত্মা বাস করে সেই আত্মাও ভাঙতে থাকে। আত্মা ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণে বুড়োরা নিজের অজান্তেই ভ্রান্তির জগতে চলে যায়। তিনি নিজেও চলে গিয়েছেন কিনা কে জানে। একমাত্র সত্যবাদীতাই ভ্রান্তির জগতে প্রবেশে বাধা দেয়। তিনি এই কারণেই সত্য কথা বলেন। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে তিনি মিথ্যা বলেছেন— এরকম মনে পড়ে না।

মালিবাগে অনেকক্ষণ ধরেই রিকশা ঘুরছে। বাসা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নাম্বারের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। এই তেরো নম্বর বাড়ি, পরেরটাই একশ' এগারো। মাঝখানের নম্বরগুলি গেল কোথায় ? পশ্চিম মালিবাগ যদি থাকে তাহলে পূর্ব মালিবাগও থাকার কথা। পূর্ব মালিবাগ বলে কিছু নেই। আশ্চর্য

কথা। গলিতে লোকজন তেমন নেই, মাঝে মাঝে যে দু'একজনকে পাওয়া যাচ্ছে তারা এই পৃথিবীতে বাস করে বলেই মনে হয় না। ১৮/৬ বাসাটা কোথায় ?— জিজ্ঞেস করার পর অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর হাই তোলে। বিস্মিত মানুষ হাই তুলতে পারে না। এদের বিস্ময় যেমন মেকি, হাইটাও তেমনি মেকি। শহরের সবকিছুই মেকি।

এতক্ষণ ধরে মাফলার পরে থাকায় গলা চুলকাচ্ছে। দুটা হাতই বন্ধ, গলা চুলকানো সম্ভব না। মানুষের তিনটা করে হাত থাকলে ভালো হতো। তিন নম্বর হাতটা সময়ে অসময়ে কাজে ল্যাগত। এই ধরনের অদ্ভুত চিন্তা মাথায় আসায় ইরতাজউদ্দিন মনে খুবই দুঃখ পেলেন। আল্লাহপাক অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মানুষ বানিয়েছেন। তিনি যদি মনে করতেন মানুষের তিনটা হাত প্রয়োজন, তিনি তিনটাই দিতেন। ইরতাজউদ্দিন মনে মনে তিনবার বললেন, তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ।

রাজহাঁসটা বড়ই যন্ত্রণা করছে। তিনি গলা চেপে ধরে আছেন এই অবস্থাতেও কামড়াতে চেষ্টা করছে। দুটা হাঁস আনেন নি। তাঁর দুটা আনারই পরিকল্পনা ছিল। একটাকে ধরা গেল না। মেয়ে-হাঁসটা ধরা পড়ল। তার পুরুষ সঙ্গী ঝাঁপিয়ে পড়ল পুকুরে। বেচারা এখন বোধহয় সঙ্গিনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। জোড় ভেঙে একটাকে আনা ঠিক হয় নি। ইরতাজউদ্দিনের মন খারাপ লাগছে। বোবা প্রাণী মনের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারবে না। একজন আরেকজনকে খুঁজবে। মানুষের নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হবে। তারপরেও তাকে বাস করতে হবে মানুষের সঙ্গে। এই তাদের নিয়তি।

বাসা শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল। এই তো লেখা— ১৮/৬। এই তো ছাতিম গাছ। আগে যেমন মরা মরা ছিল, এখনো মরা মরা। ইরতাজউদ্দিন সাহেব রিকশাওয়ালাকে দুই টাকার বদলে অতিরিক্ত একটা আধুলি দিলেন। তাঁর ইচ্ছা করছে এক টিন মুড়িও দিয়ে দিতে। শাহেদের কথা মনে করে এনেছেন বলে দিতে পারছেন না।

বদরুল মিয়া।

জি ছার।

আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। আমি আপনার জন্য খাস দিলে দোয়া করব।

বদরুল গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, আপনি আজিব লোক।

আজিব কেন ?

বখশিশ দিলেন। আবার দোয়া করলেন। কেউ এমুন করে না।

ইরতাজউদ্দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, আমরা সবাই আজিব। আমি যেমন আজিব, আপনিও আজিব। আল্লাহপাক আজিব পছন্দ করেন বলেই এই দুনিয়ায় আজিবের ছড়াছড়ি।

বাসার সবাই ঘুমে।

ঘর অন্ধকার। গেট তালাবন্ধ। ইরতাজউদ্দিন বিরক্ত হচ্ছেন। শহরের লোকজনের অবিশ্বাস দেখে বিরক্ত। গেটে তালা দেওয়ার দরকার কী?

অনেকক্ষণ গেট ধরে ধাক্কাধাক্কি এবং উঁচু গলায় 'শাহেদ' 'শাহেদ' বলে চিৎকারের পর ঘরের ভেতরে বাতি জ্বলল। অপরিচিত একজন লোক দরজা খুলে বের হয়ে এসে বললেন, কে?

লোকটা লম্বা ও ফর্সা। গলার স্বর মেয়েলি। গলার স্বর শুনে বোঝা যাচ্ছে তিনি ভয় পেয়েছেন।

আপনি কে?

আমি ইরতাজউদ্দিন। নীলগঞ্জ থেকে আসছি। এসিসটেন্ট হেডমাস্টার, আরবি ও ধর্ম শিক্ষক। নীলগঞ্জ হাইস্কুল।

কাকে চান?

শাহেদের কাছে এসেছি। আমি শাহেদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনাকে সালাম দিতে ভুলে গেছি। গোস্তাকি মাফ হয়। আসসালামু আলায়কুম।

লোকটি এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখন দরজার আড়ালে চলে গেলেন। তবে দরজা খোলা, লোকটাকে এখনো দেখা যাচ্ছে। যে-কোনো কারণেই হোক তিনি ভয় পাচ্ছেন। তাঁকে দেখেও লোকজন ভয় পেতে পারে— এই চিন্তাটা ইরতাজউদ্দিনকে পীড়িত করছে। কী করে তিনি লোকটার ভয় ভাঙাবেন তাও বুঝতে পারছেন না। লোকটা সালামের জবাব দেয় নাই। এটা তো ঠিক না। সালাম হচ্ছে শান্তির আদান-প্রদান।

শাহেদ নামে কেউ এই বাড়িতে থাকেন না।

থাকেন না মানে?

উনি চলে গেছেন। আমি নতুন ভাড়াটে।

কোথায় গেছে জানেন?

না।

কেউ কি জানে?

আমি জানি না কেউ জানে কি-না।

ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করার উপক্রম করেছেন। ইরতাজউদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, ভাইসাহেব, আপনি একটু আসবেন এদিকে। গেটটা খুলবেন ?

কেন ?

আমার সঙ্গে একটা রাজহাঁস ছিল, ঐটা আপনাকে দিয়ে যেতাম।

রাজহাঁস ?

শাহেদের বাচ্চার জন্যে এনেছিলাম। এত রাতে এই হাঁস নিয়ে কোথায় ঘুরব ? হাঁসটা আপনি গ্রহণ করলে আমার উপকার হয়।

অন্যের হাঁস আমি খামাখা রাখব কেন ?

আপনার ঘরেও নিশ্চয়ই বাচ্চা-কাচ্চা আছে, তারা খুশি হবে।

ভদ্রলোক দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে এলেন। দরজার ফাঁকে তার স্ত্রীর মুখ দেখা যাচ্ছে। তিনিও কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছেন হাঁসটার দিকে। ইরতাজউদ্দিন ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, এই রাজহাঁসটা আর জিনিসগুলি রাখলে আমি খুশি হবো। অস্বস্তি বোধ করার কিছুই নেই। হাঁসটা নিয়ে আমি বিপদে পড়েছি।

দরজার ফাঁকে চৌদ্দ-পনেরো বছরের অপরূপ রূপবতী একটি কিশোরীর মুখ দেখা গেল। মেয়েটির নাম রত্নেশ্বরী, সে ভিকারুন নিসা নুন স্কুলে ক্লাস টেন-এ পড়ে। রত্নেশ্বরী বড়ই অবাক হয়েছে। তার জীবনে এমন বিস্ময়কর ঘটনা আর ঘটে নি। রাতদুপুরে সাধু সাধু চেহারার এক লোক এসে তাদের রাজহাঁস দিতে চাচ্ছে। আগামীকাল ক্লাসে গল্পটা কীভাবে বলবে, তা ভেবেই তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। গল্পটা অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। সন্ন্যাসী ধরনের এই লোকটার একটা ছবি তুলে রাখতে পারলে ভালো হতো।

রত্নেশ্বরী ফিসফিস করে তার মাকে বলল, মা, এই হাঁসটা কি আমরা রাখব ?

রত্নেশ্বরীর মা নিচু গলায় বললেন, জানি না। দেখি তোর বাবা কী বলেন।

ভদ্রলোক কে মা ?

জানি না।

ইরতাজউদ্দিন সাহেব রত্নেশ্বরীর বাবার দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, ছোট মেয়েটা কি আপনার কন্যা ? বড়ই মিষ্টি চেহারা। কী নাম তোমার মা ?

রত্নেশ্বরী জবাব দেয়ার আগেই তার বাবা বললেন, আপনি এখন যান। আমরা হাঁস-ফাঁস কিছু রাখব না।

ইরতাজউদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, আচ্ছা না রাখলেন, গেটটা খুলুন। আমার বাথরুমে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

রত্নেশ্বরীর বাবা বললেন, গেট খোলা যাবে না। আমার কাছে গেটের চাবি নাই।

কথা সত্যি না। চাবি ঘরেই আছে। ওয়ারড্রোবের উপর রাখা আছে। রত্নেশ্বরীর মা ফিসফিস করে বললেন, খুলে দাও না। বেচারা বুড়ো মানুষ। রত্নেশ্বরীর বাবা চাপা গলায় বললেন, যা বুঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। যাও, ভেতরে যাও। স্ত্রী-কন্যাকে ভেতরে ঢুকিয়ে তিনি শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বারান্দার বাতির সুইচ ভেতরে। ভেতর থেকে সুইচ নিভিয়ে দিয়ে বারান্দা অন্ধকার করে দেয়া হলো। ইরতাজউদ্দিন দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যথা ও বিস্ময়ে তিনি খানিকটা কাতর। এরা এমন করল কেন? মানুষের প্রতি মানুষের সামান্য মমতা থাকবে না!

গেটের উপর দিয়ে তিনি রাজহাঁসটা ভেতরে ছুড়ে দিলেন। হাঁসটা থাকুক। মুড়ির টিন পুটলা-পুঁটলি সঙ্গে নিয়েই বা কী হবে? রিকশাওয়ালাটা থাকলে তাকে দিয়ে দেয়া যেত। থাকুক পুটলা-পুঁটলি গেটের সামনে। অভাবী লোকজন এসে নিয়ে যাবে। বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তবু ইরতাজউদ্দিন দাঁড়িয়ে আছেন। তার কেন জানি মনে হচ্ছে বন্ধ দরজা আবার খুলে যাবে। পরীর মতো দেখতে কিশোরী মেয়েটা তাকে বলবে, আপনি ভেতরে আসুন। মা আপনাকে ভেতরে আসতে বলেছে।

রাজহাঁসটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনি হাঁসটাকে বললেন, যাই রে। রাজহাঁস কুৎসিত একধরনের শব্দ করল। সম্ভবত তাঁকে যাবার অনুমতি দিল। ইরতাজউদ্দিনের মনে হলো, যে পাখি যত সুন্দর তার কণ্ঠস্বর তত কুৎসিত। যেমন ময়ূর। সে দেখতে সুন্দর কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কর্কশ। একমাত্র ব্যতিক্রম কাক। সে নিজে অসুন্দর, তার কণ্ঠস্বরও অসুন্দর।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। অসহ্য গরমের পর বৃষ্টিটা ভালো লাগছে। ইরতাজউদ্দিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছেন। বৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন আঠালো ভাব। শরীরের যে জায়গায় পড়ছে সেখানটাই আঠা আঠা হয়ে যাচ্ছে।

তিনি গলি থেকে বের হলেন, বৃষ্টিও থেমে গেল। বড় রাস্তায় আবারো একটা মশাল মিছিল। এই মিছিলটা আগেরটার চেয়ে ছোট। না-কি আগের মিছিলটাই ঘুরে এসেছে? ইরতাজউদ্দিন মিছিলের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন।

যেন তিনি মিছিলের একজন। এই মিছিল কোন দিকে যাচ্ছে তিনি জানেন না। তিনি নিজে কোথায় যাবেন তাও জানেন না। পল্লী অঞ্চল হলে যে-কোনো একটা বাড়িতে গিয়ে বিপদের কথা বললেই আশ্রয় পাওয়া যেত। তারা অজুর পানি দিত। ভাত-ডালের ব্যবস্থা করত। গরম ধোঁয়া উঠা ভাতের সঙ্গে ডাল। একটা ঝাল কাঁচামরিচ, একটা পেঁয়াজ। ইরতাজউদ্দিনের পেট মোচড় দিয়ে উঠল। এতটা ক্ষিধে পেয়েছে তিনি বুঝতেই পারেন নি। ধোঁয়া উঠা ভাতের ছবি মাথা থেকে যাচ্ছেই না।

মিছিলের সঙ্গে তিনি কোথায় যাচ্ছেন ? কেনই বা যাচ্ছেন ? তাঁর উচিত রাতের জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজে বের করা। এত রাতে কোনো হোটেল খুঁজে বের করা সম্ভব না। তাছাড়া হোটেলে রাত কাটাবার মতো সঙ্গতিও তাঁর নেই। সবচে' ভালো হয় কমলাপুর রেলস্টেশনে চলে যাওয়া। কোনো একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাতটা পার করে দেয়া। স্টেশনের আশেপাশে অনেক ভাতের দোকান আছে। প্রথমেই হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেতে হবে।

একজন মশালধারী ইরতাজউদ্দিনের কাছে চলে এসেছে। পাশাপাশি হাঁটছে এবং কৌতূহলী চোখে তাঁকে দেখছে। ইরতাজউদ্দিনের ইচ্ছা হচ্ছে তাঁকে বলেন, মশাল শব্দটা আরবি, এটা জানেন ? জ্ঞান জাহির করার জন্যে বলা না। আলাপ আলোচনা শুরুর জন্যে বলা। আলাপ শুরু হলে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন— মধ্যরাতে মশাল মিছিল কেন হচ্ছে ? ইলেকশন হয়ে গেছে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টা আসনের মধ্যে ১৬৭টা পেয়েছে আওয়ামী লীগ। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টো পেয়েছে ৮৩টা। হয়েই তো গেছে, আর কী ? এখন কেন মধ্যরাতে 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' ? হাতে মশাল আছে বলেই কি আগুনের কথা মনে আসছে ?

হাতে মশাল থাকলেই আগুন জ্বালাতে ইচ্ছা করে। হাতে তলোয়ার থাকলে কোপ বসাতে ইচ্ছা করে। বন্দুক থাকলে ইচ্ছা করে গুলি করতে। মানবচরিত্র বড়ই অদ্ভুত! আচ্ছা কারোর হাতভর্তি ফুল দিয়ে দিলে সে কী করবে ? ফুল বিলাতে শুরু করবে ?

ইরতাজউদ্দিন থমকে দাঁড়ালেন, কী আশ্চর্য, তিনি শাহেদের আগের বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মিছিল চক্রাকারে ঘুরছে। তাকে এনে ফেলেছে আগের জায়গায়। গেটের সামনে রাখা মুড়ির টিন দু'টা নেই, তবে গেটের ভেতরে রাজহাঁসটাকে দেখা যাচ্ছে। ঘরের এক কোনায় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। এরাও বোধহয় মানুষের শরীরের গন্ধ চেনে। রাজহাঁস গোপন আশ্রয় ছেড়ে ডানা মেলে ছুটে আসছে ইরতাজউদ্দিনের দিকে। কী অপূর্ব দৃশ্য!

ইরতাজউদ্দিন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন। এখন গন্তব্য ঠিক করা— কমলাপুর রেলস্টেশন। রাজহাঁসটা ঘাড় ঘুরিয়ে ইরতাজউদ্দিনকে দেখছে। সে কি বিস্মিত হচ্ছে? বিস্মিত হবার ক্ষমতা কি এদের দেয়া হয়েছে?

শাহেদের ঠিকানা বের করতে ইরতাজউদ্দিন সাহেবের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা লেগেছে। এই চব্বিশ ঘণ্টা বলতে গেলে তার পথে পথেই কেটেছে। রাত কাটিয়েছেন কমলাপুর রেলস্টেশনে। স্টেশনের কাছেই এক মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে শাহেদের খোঁজে বের হলেন। সেই অনুসন্ধানের ইতি হলো রাত ন'টা পঁচিশ মিনিটে। রায়েরবাজারের গলির ভেতর পুরনো ধরনের দোতলা বাড়ি। একতলায় বাড়িওয়ালা থাকেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার এই বাড়ির সামনেও একটা ছাতিম গাছ। তবে এই গাছটা সতেজ। শাহেদ কি ঠিক করেছে ছাতিম গাছ নেই এমন কোনো বাড়ি সে ভাড়া করবে না?

ইরতাজউদ্দিনের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। শাহেদকে খুঁজে বের করার পরিশ্রমে মনে হয় তার বয়স বেড়ে গেছে। চোখ টকটকে লাল। প্রচণ্ড গরমেও তার শীত শীত লাগছে, জ্বরের পূর্বলক্ষণ।

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, ভাইজান, আপনার এ-কী অবস্থা? এরকম দেখাচ্ছে কেন আপনাকে, শরীর খারাপ নাকি?

ইরতাজউদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, শরীর ঠিকই আছে। পরিশ্রম হয়েছে। তোমার বাসা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শেষপর্যন্ত অফিসে গেলাম। আজ যে অফিস ছুটি তাও জানতাম না।

বাসার ঠিকানা পেলেন কী করে?

অফিসের দারোয়ানের কাছ থেকে তোমার এক কলিগের ঠিকানা পেলাম, রহমান সাহেব। তিনি থাকেন বাসাবো নামের একটা জায়গায়। তাঁকে খুঁজে বের করলাম। তিনি আবার তোমার ঠিকানা জানেন না। তবে অন্য একজনকে চিনেন যে তোমার ঠিকানা জানে। সে এক লম্বা গল্প। শুনে লাভ নেই। বাসার লোকজন কোথায়? রুনি, রুনির মা?

শাহেদ ইতস্তত করে বলল, আসমানী তার মা'র বাসায় গেছে। আপনি আসার কিছুক্ষণ আগে গেল। আমার শাশুড়ির শরীর খারাপ, খবর পেয়ে গেছে।

তুই যাস নি কেন? শাশুড়ি হলেন মাতৃসম। তার সেবা করলে মাতৃঋণ শোধ হয়। তোর জন্মের পর পর মা মারা গেলেন। তুই তো আর মাতৃঋণ শোধ করার সুযোগ পাস নাই। পিতৃঋণ শোধ না করলে চলে, মাতৃঋণ শোধ করতে

হয়। যাইহোক, তোদের বাথরুম কোনদিকে? গোসল করব। অনেক নামাজ কাজা হয়েছে। ঘরে জায়নামাজ আছে?

শাহেদ লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, জি-না। পরিষ্কার চাদর আছে, বিছিয়ে দিচ্ছি।

ইরতাজউদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, নামাজ পড়িস আর না পড়িস মুসলমানের ছেলে এই কারণেই ঘরে একটা জায়নামাজ, একটা তসবি, একটা টুপি এইসব থাকা দরকার।

ভাইজান, গরম পানি লাগবে? পানি গরম করে দেই?

গরম পানি লাগবে না।

আপনি কি খেয়ে এসেছেন ভাইজান?

না। তবে রাতে কিছু খাব না। জ্বর জ্বর লাগছে। উপাস দেব। উপাস হলো জ্বরের একমাত্র ওষুধ।

জ্বর গায়ে গোসল করবেন?

বললাম না শরীর অশুচি হয়ে আছে। গোসল না করলে নামাজ পড়তে পারব না।

শাহেদের ইচ্ছা করছে তার ভাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখতে। সাহসে কুলাচ্ছে না। তাদের ভাইয়ে ভাইয়ে দূরত্ব অনেক বেশি। ইরতাজউদ্দিনের জন্মের পর আরো পাঁচ ভাইবোনের পরের জন শাহেদ। বিস্ময়কর ঘটনা হলো, তাদের মাঝখানের পাঁচ ভাইবোন জন্মের এক মাসের ভেতর মারা গেছে। সবারই একই অসুখ— হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে শরীরে খিঁচুনি। নিঃশ্বাসের কষ্ট। জন্মের পনেরো দিনের দিন শাহেদেরও এই রোগ হলো। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। প্রবল খিঁচুনি। শাহেদের বাবা আধাপাগলের মতো হয়ে গেলেন। তিনি মসজিদে ছুটে গিয়ে ইমাম সাহেবকে বললেন, আমি আমার জীবনে একটা ভয়ঙ্কর পাপ করেছি। আমার পুত্রকন্যারা মারা যাচ্ছে— তার কারণ আর কিছু না, পাপের শাস্তি। আমি সবার সামনে অপরাধ স্বীকার করব, আল্লাহ্ যেন আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করে।

জানা গেল তিনি একটা খুন করেছেন। অপরাধ স্বীকার করে তিনি পুলিশের কাছে ধরা দেন। বিচারে তার যাবজ্জীবন হয়। তিনি হাসিমুখে জেল খাটতে যান। কারণ তার কনিষ্ঠ পুত্রটির জীবন রক্ষা হয়। শাহেদের বাবার মৃত্যু হয় জেলখানাতে। ইরতাজউদ্দিন অতি অল্পবয়স থেকেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নেন। ছোটভাইকে প্রায় কোলে করেই তিনি বড় করেন। অনেক বয়স পর্যন্ত শাহেদ ইরতাজউদ্দিনের বুকে না শুয়ে ঘুমুতে পারত না। ক্লাস থ্রি'তে পড়ার

সময় শাহেদের একবার টাইফয়েড হলো। একুশ দিনের জ্বরের আটদিন ইরতাজউদ্দিন তাঁর ভাইকে কোলে নিয়ে বসে থাকলেন। কোল থেকে নামালেই সে চিৎকার করতে থাকে। কোলে তুলে নিলেই শান্ত। শাহেদের সঙ্গে ইরতাজউদ্দিনের সম্পর্ক ভাই-ভাই সম্পর্ক না। অনেকটাই পিতা-পুত্র সম্পর্ক।

শাহেদ বলল, ভাইজান, আপনি এক কাজ করুন। বাসার দরজা বন্ধ করে গোসল করতে যান। আমি আসমানীকে নিয়ে আসছি। বেশিক্ষণ লাগবে না। আমি যাব আর আসব।

ইরতাজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, সে গেছে তার অসুস্থ মাকে দেখতে, তুই তাকে নিয়ে আসবি কেন? এটা আবার কী রকম কথা?

শাহেদ লজ্জিত গলায় বলল, আমার শাশুড়ি ভালো আছেন ভাইজান, আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আসমানী আমার সঙ্গে রাগারাগি করে চলে গেছে।

ইরতাজউদ্দিন বিরক্ত চোখে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি, এ কেমন কথা? মেয়েরা হচ্ছে জন্মদাত্রী জননী। হাজার ভুল করলেও এদের উপর রাগ করতে নেই। এদের উপর রাগ করাটাই কাপুরুষতা। অক্ষম এবং দুর্বল পুরুষরাই শুধু স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি করে।

ভাইজান, বেশিক্ষণ লাগবে না, একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে যাব আর চলে আসব।

আচ্ছা।

আসমানীর সঙ্গে শাহেদের ঝগড়ার কারণ অতি তুচ্ছ। মজার ব্যাপার হলো, তাদের সব বড় বড় ঝগড়াই তুচ্ছ কারণে হয়েছে। আজকের ঝগড়ার বিষয়বস্তু বাথরুমের ছিটকিনি। ছিটকিনি খুলে পড়ে গেছে। আসমানী কয়েক দিন ধরেই বলছে তিনটা আধ ইঞ্চি পেরেক আনতে। শাহেদ রোজই বলছে নিয়ে আসব কিন্তু আনছে না।

এই ছিটকিনি নিয়েই শাহেদের সঙ্গে আসমানীর ঝগড়া হয়ে গেল। ভয়াবহ ধরনের ঝগড়া। আজ সন্ধ্যাবেলা শাহেদ মোহাম্মদপুর বাজার থেকে চাল-ডাল কিনে ফিরেছে। ঘরে ঢোকা মাত্র আসমানী বলল, পেরেক এনেছ?

শাহেদ পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে বলল, পেরেক পেরেক করে তুমি দেখি আমার মাথা খারাপ করে ফেললে। কানু বিনে গীত নেই। তোমারও দেখি পেরেক ছাড়া কথা নেই। মাথার মধ্যে একটা জিনিস ঢুকলে আর বের হয় না।

আসমানী বলল, তার মানে তুমি আনো নি?

না।

আনো নি কেন ?

ভুলে গেছি এই জন্যে আনি নি। সবার স্মৃতিশক্তি তো আর তোমার মতো না। সবাই তো আর হাতি না যে সব কিছু মনে থাকবে।

তার মানে কি এই যে তুমি কোনোদিনই আনবে না ?

শাহেদ গম্ভীর মুখে বলল, এখনই তোমার পেরেক এনে দেব। এটা নিয়ে আর কথা শুনতে চাই না।

এমন কী কথা আমি তোমাকে বললাম ?

যা বলেছ যথেষ্টই বলেছ।

শাহেদ হনহন করে বের হয়ে গেল। যাওয়ার সময় দরজাটা ধড়াম করে লাগিয়ে রাগ দেখিয়ে গেল। আসমানীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেচারা বাজার নিয়ে ফিরেছে। এর মধ্যেই পেরেকের ব্যাপারটা না তুললেও হতো। বাড়িওয়ালার শালা মজনুকে একটা টাকা দিলে সে এনে দিত। শাহেদের যখন মনে থাকে না, তখন শুধু শুধু তাকে বিরক্ত করা কেন ? আসমানীর নিজের উপরই রাগ লাগছে। সে ঠিক করে ফেলল, শাহেদ এলে সে এমন কিছু করবে যেন সে রাগ ভুলে আচমকা খুশি হয়ে উঠে। শাহেদকে হঠাৎ খুশি করার একটা পদ্ধতি সে জানে। সমস্যা হলো পদ্ধতিটা ব্যবহার করতে তার খুব লজ্জা লাগে।

তিনটা পেরেক হলেই হয়, শাহেদ এক কেজি পেরেক নিয়ে ফিরল। পেরেকের সঙ্গে হাতুড়ি, স্ক্রুড্রাইভার। নিজেই খুটখুট করে বাথরুমের ছিটকিনি লাগাল। আসমানীকে বলল, যাও, তোমার বাথরুম ঠিক হয়েছে। এখন ছিটকিনি লাগিয়ে বাথরুমে গিয়ে বসে থাক। ঘড়ি দেখে দু'ঘণ্টা বসে থাকবে। দু'ঘণ্টার আগে যদি বের হও তোমার খবর আছে।

আসমানী আহত গলায় বলল, আমাকে বাথরুমে বসে থাকতে হবে কেন ?

বসে থাকতে হবে কারণ পেরেক এনে ছিটকিনি লাগানো হয়েছে। পেরেক, পেরেক, পেরেক! আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দেশের কী অবস্থা! বেতন হবে কি হবে না, অফিস থাকবে কি থাকবে না— এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। পেরেক পেরেক পেরেক। আমার লাইফটাকে কয়লা বানিয়ে ফেললে।

আমি তোমার জীবন কয়লা বানিয়ে ফেলেছি ?

হ্যাঁ।

আসমানীর চোখে পানি এসে গেল। চোখের এই পানি শাহেদকে কোনোক্রমেই দেখানো যায় না। সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আমার জন্য

তোমার জীবন যেন কয়লা না হয় সেই ব্যবস্থা করছি। এখন থেকে তোমার জীবন হবে চন্দনকাঠ।

বলেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। শাহেদ সামনে থাকলে সে দেখে ফেলবে আসমানী কাঁদছে। এটা হতে দেয়া যায় না। কাঁদতে কাঁদতেই আসমানী ডাল চড়াল, ডিমের ঝোল রান্না করল। রাত ন'টায় সহজ গলায় বলল, আমি যাচ্ছি।

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছ?

কলাবাগানে মা'র কাছে যাচ্ছি। এখন থেকে মা'র জীবন কয়লা বানাব। তোমার মূল্যবান চন্দনকাঠ জীবন কয়লা করব না।

আসমানী, তোমার কি মনে হয় না তুমি বাড়াবাড়ি করছ?

না, আমার সে-রকম মনে হচ্ছে না। আলমারির চাবি ড্রেসিং টেবিলে রেখে গেলাম। রুনির জামা-কাপড় পাঠিয়ে দিও। আমার কোনো কিছু পাঠাতে হবে না।

তার মানে কি পুরোপুরি বিদায়?

হ্যাঁ।

রুনি মায়ের কোলে। গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে। এমনিতে সে রাত এগারোটা পর্যন্ত জেগে থাকে, আজ ন'টা বাজতেই ঘুম। রুনি জেগে থাকলে আসমানীর যাওয়া এত সহজ হতো না। রুনি কিছুতেই বাবাকে ছেড়ে যাবে না। শাহেদ শুকনো গলায় বলল, যেতে চাও যাবে। রাতদুপুরে যাবার দরকার দেখি না। সকাল হোক তারপর যাবে।

আসমানী বলল, কোনো অসুবিধা নেই। মজনু আমাকে পৌঁছে দেবে। ওকে রিকশা আনতে বলে এসেছি।

ওকে আবার কখন বললে?

আধঘণ্টা আগে বলে এসেছি। তোমার সামনে দিয়েই গিয়েছি। তুমি খবরের কাগজ পড়ছিলে বলে দেখ নি।

আসমানীর গলার স্বরে কোনো রাগ নেই। যেন তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া হয় নি। সবকিছু স্বাভাবিক আছে।

শাহেদ দ্রুত চিন্তা করছে। এই মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত? ক্ষমা প্রার্থনা করা যেতে পারে। সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই যে লাভ হবে তাও মনে হচ্ছে না। আসমানী প্রচণ্ড রেগে গেছে। এই রাগ সহজে যাবে না। ভোগাবে। সবচেয়ে ভালো হবে রাগ কমানোর জন্যে সময় দিলে। দু'দিন পর কলাবাগানে মুখ কালো করে উপস্থিত হলেই আসমানীর রাগ

অনেকটা কমে যাবে। যেতে হবে গভীর রাতে, সাড়ে এগারোটা-বারোটার দিকে। গভীর রাতে যাওয়ার সুবিধা হলো, আসমানী তাকে এত রাতে একা একা বাসায় ফিরতে দেয় না।

কাজেই এই মুহূর্তে রাগ কমানোর জন্যে ব্যস্ত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং নিজের রাগ খানিকটা দেখানো যেতে পারে। শাহেদ রাগ দেখানোর জন্যে কঠিন চোখে আসমানীর দিকে তাকিয়ে রইল। চেষ্টা করল পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকতে। আসমানী স্বামীর সর্পদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সহজ গলায় বলল, আমি যাচ্ছি। দরজা লাগিয়ে ঘুমুবে।

দরজা লাগিয়ে ঘুমাই না খোলা রেখে ঘুমাই সেটা আমার ব্যাপার। তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না। তুমি যাও, তোমার মায়ের কোলে গিয়ে ঘুমিয়ে থাক।

দয়া করে চব্বিশ ঘন্টা পার না হতেই আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে রাতদুপুরে উপস্থিত হবে না।

এত শখ আমার নাই। তুমি বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে আমার সব শখ মিটিয়ে ফেলেছ।

শাহেদ আরো কঠিন কিছু বলতে যাচ্ছিল, সেই সুযোগ পাবার আগেই আসমানী বের হয়ে গেল। শাহেদ পরের পাঁচ মিনিট ঝিম ধরে বসে থাকল। তার মাথায় ভালো একটা আইডিয়া এসেছে। আসমানী রিকশা করে গিয়েছে। সে যদি দ্রুত বের হয়ে একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে কলাবাগানে চলে যায়, তাহলে মজা মন্দ হয় না। আসমানী রিকশা থেকে নেমে দেখবে— শাহেদ বারান্দায় বসে গম্ভীরমুখে খবরের কাগজ পড়ছে। হাতে চায়ের কাপ।

পরিকল্পনা কাজে লাগানো গেল না, কারণ শাহেদ যখন বেবিট্যাক্সির সন্ধানে যাবে বলে ঠিক করেছে তখনই ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীর গলা শোনা গেল, শাহেদ আছ? শাহেদ? এটা কি শাহেদের বাসা?

ইরতাজউদ্দিন সাহেব কাজা নামাজ শেষ করলেন। একঘন্টার মতো লাগল নামাজ শেষ করতে। নিজেই খবরের কাগজ খুঁজে বের করে পড়লেন। খবরের কাগজের কোনো কিছুই বাদ দিলেন না। শুধুই মিটিং-মিছিলের খবর। অফিস-আদালত কলকারখানা শেখ সাহেবের আঙুলের ইশারায় চলছে। মেয়েরা গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে। রেডিও-টিভিতে জাতীয় সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। কাগজ পড়ে আরো আধ ঘন্টা গেল। শাহেদ ফিরল না, ইরতাজউদ্দিন সাহেব খুবই বিরক্ত হলেন। যাবে আর আসবে বলে কেউ দেড় ঘন্টার জন্যে উধাও হয়? কথায়-কাজে মিল থাকতে হয়। গোসলের পর তার ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। যে জ্বর

আসব আসব করছিল তা মনে হয় আপাতত সরে গেছে। ইরতাজউদ্দিন সাহেব একফাঁকে রান্নাঘর থেকে ঘুরে এলেন। খাবার থাকলে খেয়ে নেবেন। ডিমের ঝোল আছে, ডাল আছে, কিন্তু ভাত নেই। চারটা চাল তিনি নিজেই চড়িয়ে দিতে পারেন। নিজের রান্না তিনি নিজে করেন। কয়েক মুঠ চাল সিদ্ধ করা কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু আসমানী ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। মুখে প্রকাশ না করলেও বিরক্ত হবে। মেয়েরা কোনো এক বিচিত্র কারণে বাড়ির পুরুষদের রান্নাঘরে দেখলে বিরক্ত হয়।

ইরতাজউদ্দিনের সময় কাটছে না। তিনি বারান্দায় চলে এলেন। ছোট বারান্দা। দু'টা বেতের চেয়ার পাশাপাশি সাজানো। বারান্দা থেকে রাস্তার খানিকটা দেখা যায়। তিনি চেয়ারে বসলেন।

বারান্দায় কিছু হাওয়া আছে। বসার চেয়ারটাও আরামদায়ক। বসে থাকতে ভালো লাগছে। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। শাহেদ এত দেরি করছে কেন? রাত বেশি হয়ে গেলে আসমানীকে সঙ্গে নিয়ে ফেরা ঠিক হবে না। ইরতাজউদ্দিন ঝিমুতে লাগলেন। ঘুমটা কাটানো দরকার। রুনি এসে দেখবে তার বড় চাচা বারান্দায় চেয়ারে বসে হা করে ঘুমাচ্ছে। বিকট শব্দে তার নাক ডাকছে। এই দৃশ্য তার ভালো লাগবে না। সে সারাজীবন মনে করে রাখবে। বড় চাচার কথা মনে হলেই এই দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠবে। একটা কোনো জিনিস শিশু অবস্থায় মাথায় ঢুকে গেলে আর বের হয় না।

ইরতাজউদ্দিন ঘুম তাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তিনি তাঁর বিয়ের দিনের কথা মনে করলেন। ঘুম তাড়াবার এটা হলো অব্যর্থ ওষুধ, কোরামিন ইনজেকশান। বিয়ের স্মৃতি একবার মনে হলে কোথায় যাবে ঘুম! তিনি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন— বরযাত্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বড়লেখা গ্রামে। সুন্দর করে সাজানো বিয়েবাড়ি। কলাগাছ দিয়ে একটা গেট করা হয়েছে। গেটে লেখা— 'স্বগতম'। বানানটা ভুল, আকার বাদ পড়েছে। কিন্তু বিয়েবাড়ি কেমন যেন ঝিম ধরে আছে। কন্যাপক্ষ কারো মুখে কোনো কথা নেই।

চারদিকে ফিসফাস। কানাকানি। কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল কন্যার কলেরা হয়েছিল। সকাল থেকে ভেদবমি হয়ে আছরের নামাজের ওয়াক্তে মারা গেছে। তারপর শোনা গেল— এখনো মারা যায় নি, বেঁচে আছে। চিকিৎসার জন্যে তাকে সদরে নেয়া হয়েছে। তবে বাঁচার আশা ক্ষীণ। আসল খবর জানা গেল অনেক পরে। মেয়ের কলেরা হয় নি, তাকে সদরেও নেয়া হয় নি। সে পালিয়ে গেছে। তার এক দূরসম্পর্কের খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে শেষরাতের ট্রেনে কোথায় যেন চলে গেছে।

ইরতাজউদ্দিন আর বিয়ে করেন নি। তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বিয়েতে রাজি করানোর তেমন চেষ্টাও কেউ করে নি। তাঁর মুরুব্বি কেউ ছিল না।

ভোররাতে যে মেয়েটি পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে ইরতাজউদ্দিন মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে সে তার স্ত্রীর মতোই আচরণ করে। স্বপ্ন দেখার সময় ইরতাজউদ্দিন লজ্জা পান। স্বপ্ন ভেঙে যাবার পরেও লজ্জা পান। স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর তিনি আল্লাহ্‌পাকের কাছে করুণ গলায় বলেন— হে পারোয়ার দিগার! তুমি আমাকে নিয়ে কেন এই খেলা খেলছ ? আমি তো খুবই নাদান বান্দা। আমি যখন মেয়েটিকে পুরোপুরি ভুলে যাই, তখন স্বপ্নে আবার তাকে আমার কাছে নিয়ে আস কেন ? এই ধরনের হৃদয়হীন খেলা শুধু শিশুরাই খেলে। তুমি কি শিশু ?

ইরতাজউদ্দিন বেতের চেয়ারে কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বপ্নে মেয়েটিকে দেখলেন। এইবার মেয়েটির কোলে চার-পাঁচ বছরের একটি শিশু। শিশুটি দেখতে রুনির মতো। তবে খুবই রোগা। মনে হয় অসুস্থ।

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি এখনো ঘুমাচ্ছ ? বাইরে কী অবস্থা তুমি জানো না ? বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মিলিটারিরা সমানে গুলি করছে। নাও, ওকে কোলে নাও, চল পালাই।

ইরতাজউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললেন তিনি স্বপ্ন দেখছেন। ঘুম ভাঙলেই এই দৃশ্য মিলিয়ে যাবে। তিনি চেষ্টা করলেন জেগে উঠতে, চেষ্টা তেমন জোরালো না। কারণ স্বপ্নটা দেখতে তাঁর ভালো লাগছে। মেয়েটার (নাম আসমা বেগম) ভীত মুখ দেখে মজা লাগছে। কারণ তিনি জানেন যা ঘটছে স্বপ্নে ঘটছে। ভয় পাবার কিছু নেই।

এ কী, তুমি এখনো বসে আছ! মেয়েটাকে কোলে নাও। তার জ্বর।

ইরতাজউদ্দিন লজ্জিত গলায় বললেন, মেয়েটার নাম কী ?

আসমা অত্যন্ত বিরক্ত হলো। এই ভয়ঙ্কর সময়ে তুমি তামশা করছ ? নিজের মেয়ের নাম তুমি জানো না ?

এই বলেই সে চুপ করে মেয়েটাকে ইরতাজউদ্দিনের কোলে ফেলে দিল। তখন বাইরের হৈচৈ প্রবল হলো। লোকজন 'আগুন আগুন' করছে। চারদিকে ছোটাছুটি করছে। মেশিনগানের একটানা গুলির শব্দও শোনা যাচ্ছে। ইরতাজউদ্দিন মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ছুটে রাস্তায় নেমে এলেন। রাস্তায় শত শত মানুষ। সবাই একসঙ্গে দৌড়াচ্ছে। আসমা শক্ত করে ইরতাজউদ্দিনের বাঁ হাত ধরে আছে। একজন রূপবতী তরুণী তাঁর হাত ধরে দৌড়াচ্ছে— এটা

একটা লজ্জাজনক দৃশ্য। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে একটা সুবিধা হয়েছে, কেউ তাদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। রোজ-হাসরের মতো অবস্থা। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। সবাই 'ইয়া নফসি' 'ইয়া নফসি' করছে। মহাবিপদের আশঙ্কায় সবাই ভীত।

বিপদের উপর বিপদ, লোকজন যে দিকে যাচ্ছে ঠিক সেই দিক থেকেই আরো একদল মানুষ দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। তারা 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করছে। তাদের চিৎকারে ইরতাজউদ্দিনের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন— সত্যি সত্যি বিশাল মিছিল বের হয়েছে। রাস্তায় শত শত মানুষ। তাদের হাতে লাঠিসোটা, বর্শা। তারা আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছে— 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা'। মিছিলের সঙ্গে একটা ঠেলাগাড়িও যাচ্ছে। ঠেলাগাড়ির মাঝখানে একজন পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার হাতে একটা তলোয়ার।

ইরতাজউদ্দিন মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। 'জয় বাংলা' বাক্যটা তাঁর ভালো লাগছে না। 'জয় বাংলা' এসেছে 'জয় হিন্দ' থেকে। এটা ঠিক না। তাছাড়া লাঠিসোটা, বল্লম দিয়ে কিছু হয় না। একশ' বছর আগেও বাঁশের কেল্লা দিয়ে তিতুমীর কিছু করতে পারে নি। শুধু শুধুই পরিশ্রম। এটা একটা আফসোস যে বাঙালি জাতি কাজে পরিশ্রম করতে পারে না, অকাজে পারে।

শাহেদ রাত বারোটার দিকে শুকনো মুখে ফিরল। সঙ্গে কেউ নেই। সে একা ফিরেছে। ইরতাজউদ্দিন বললেন, কিরে এত দেরি ? শাহেদ মাটির দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, ওদের পেলাম না ভাইজান।

পেলি না মানে কী ?

আমার শাশুড়ির এক দূরসম্পর্কের বোন থাকেন ভূতেরগলিতে। ওরা দল বেঁধে ঐ বাড়িতে গিয়েছে। এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম যদি ফেরে। ফেরে নি। মনে হয় থেকে যাবে। মাঝে মাঝে ওরা সেখানে থেকে যায়। ঐ মহিলা রুনিকে খুব আদর করেন। ওদের কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই তো, রুনিকে নিজের মেয়ের মতো দেখেন। বলতে গেলে উনিই জোর করে রেখে দিয়েছেন।

ইরতাজউদ্দিনের মন আবারো খারাপ হলো। শাহেদ মিথ্যা কথা বলছে। হড়বড় করে মিথ্যা বলছে। বউ আসতে রাজি হয় নি, এটা বললেই হয়। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলার দরকার কী ? মিথ্যা এমন জিনিস যে কয়েকবার বললেই অভ্যাস হয়ে যায়। তখন কারণ ছাড়াই মিথ্যা বলতে ইচ্ছা করে।

ভাইজান, আপনি কি শুয়ে পড়বেন ? রাত অনেক হয়েছে। শুয়ে পড়াই ভালো। বিছানা করে দেই ?

দে।

খালি পেটে ঘুমুবেন ? ক্ষুধা হয় নি ?

ক্ষুধা হয়েছে তারপরেও ইরতাজউদ্দিন বললেন, না। মিথ্যা বলা হলো। তিনি যদি বলতেন ক্ষুধা হয়েছে, তাহলে ভাত রাঁধার ব্যাপার চলে আসবে। শাহেদ বিব্রত হবে। সে তার বড় ভাইকে ভাত রাঁধতে দেবে না। নিজেই রাঁধতে গিয়ে ছেড়াবেড়া করবে। এরচেয়ে মিথ্যা বলাই ভালো। উপকারী মিথ্যা। তারপরেও মিথ্যা মিথ্যাই। অপকারী মিথ্যা যেমন দূষণীয়, উপকারী মিথ্যাও তেমনি দূষণীয়। ইরতাজউদ্দিন ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোকে ক্ষুধা হয় নি বলেছিলাম এটা ঠিক না, মিথ্যাচার করেছি। ক্ষুধা হয়েছে। তবে কিছু খাব না। শুয়ে পড়ব। বিছানা করে দে। মশারি খাটাবি না।

মশারি না খাটালে ঘুমুতে পারবেন না। খুব মশা।

থাকুক মশা। মশারির ভেতর আমার ঘুম আসে না। দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে।

শাহেদ বসার ঘরে তার ভাইয়ের জন্য বিছানা করল। খুঁজে-পেতে একটা হাতপাখাও বের করল। ইরতাজউদ্দিন শোবার সময় অবধারিতভাবে সিলিং ফ্যান বন্ধ করে দেবেন। কারণ, ফ্যানের বাতাসেও তিনি ঘুমুতে পারেন না। ফ্যানের বাতাসে না-কি তাঁর শরীর চিড়বিড় করে।

মশা আসলেই বেশি। চারদিকে পিনপিন করছে। বাতি নেভালে কী অবস্থা হবে কে জানে। হয়তো এই গরমেও চাদর মুড়ি দিয়ে শুতে হবে। ইরতাজউদ্দিন যেসব কারণে ঢাকা আসতে চান না মশা তার একটি। তিনি ছোটভাইকে বললেন, তুই শুধু শুধু জেগে আছিস কেন ? শুয়ে পড়।

শাহেদের কিছুক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছা করছে। দেড়টা-দুটার আগে সে কখনো ঘুমায় না। এখন বাজছে মাত্র সাড়ে বারটা। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তার মেজাজ খারাপ হয়েছে। তার বড়ভাই এসেছেন— এটা জানার পরেও আসমানী তার সঙ্গে আসবে না, এটা ভাবাই যায় না। শাহেদ খুবই করুণ গলায় বলেছে, ভাইজান এসেছে। আস, প্লিজ আস। তার উত্তরে আসমানী বলেছে, তোমার ভাইজান এসেছে, তুমি তাকে কোলে নিয়ে বসে থাক। আমি কী জন্যে যাব ?

আসমানী এধরনের কথা বলতে পারে তা শাহেদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না। তার খুবই মনখারাপ হয়েছে। ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করে সে মনখারাপ-ভাবটা কাটাতে চাচ্ছে। কিন্তু ইরতাজউদ্দিনের মনে হয় গল্প করার মতো অবস্থা না।

শাহেদ বলল, ভাইজান, ঢাকায় কোনো কাজে এসেছেন ? না-কি বেড়াতে এসেছেন ?

কাজে এসেছি। তোদের দেখতে এসেছি, এটাও তো একটা কাজ। কাজ না ?

জি কাজ।

ভালো আতর কিনব। আতর শেষ হয়ে গেছে।

আমি আতর কিনে দেব।

তোকে কিনতে হবে না। আতরের ভালো-মন্দ তুই কী বুঝিস! আমিই কিনব। আর স্কুলের জন্যে একটা পতাকা কিনতে হবে। আগেরটার রঙ রোদে জ্বলে গেছে।

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, কী পতাকা কিনবেন ?

ইরতাজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, জাতীয় পতাকা। এছাড়া আর কী পতাকা আছে!

ভাইজান, পতাকা কেনাটা ঠিক হবে না।

কেন ঠিক হবে না ?

দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে— নতুন পতাকা আসবে।

হুজুগের কথা আমার সঙ্গে বলবি না। দেশ স্বাধীন হয়েই আছে। নতুন করে আবার স্বাধীন কীভাবে হবে ?

শাহেদ নরম গলায় বলল, ভাইজান, আপনি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন না।

ইরতাজউদ্দিন ভাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, পরিস্থিতি তোরা বুঝতে পারছিস না। 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা' বলে চেঁচালেই দেশ স্বাধীন হয় না। পাকিস্তানি মিলিটারি যখন একটা ধাক্কা দিবে, তখন কোথায় যাবে 'জয় বাংলা'!

শাহেদ বলল, ভাইজান, আমি দু'একটা কথা বলি ?

ইরতাজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, কথা বলার দরকার নাই। যা, ঘুমুতে যা। সকালে কথা হবে। সিলিং ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে যা।

ঢাকায় কতদিন থাকবেন ?

কাল সকালে চলে যাব ইনশাল্লাহ।

কালকের দিনটা থেকে যান।

কালকের দিনটা থেকে গেলে কী হবে ?

শাহেদ জবাব দিতে পারল না। ইরতাজউদ্দিন সাহেব প্রশ্নের উত্তর দেন পাল্টা প্রশ্ন দিয়ে। সেইসব প্রশ্ন আচমকা চলে আসে বলে তার জবাব চট করে দেওয়া যায় না। ইরতাজউদ্দিন হাই তুলতে তুলতে বললেন, থেকে যেতাম, রুনি কত বড় হয়েছে দেখার শখ ছিল। উপায় নেই, স্কুল খোলা। স্কুল কামাই দিয়ে তো আর শখ মেটানো যায় না। আগে স্কুল, তারপর অন্য কিছু। মানুষকে কম্পাসের মতো হতে হয় বুঝলি। কম্পাসের কাঁটা যেমন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির হয়ে থাকে, মানুষকেও সে-রকম থাকতে হয়। মনের কাঁটাটাকে আমি স্কুলের দিকে ঠিক রেখে বাকি কাজকর্মগুলো করি।

ইরতাজউদ্দিনের মনে হলো তিনি ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই এক সমস্যা হয়েছে। কথা বলতে গেলেই বক্তৃতার ভঙ্গি চলে আসে। দীর্ঘদিন মাস্টারি করার কুফল। সবাইকে ছাত্র মনে হয়।

শাহেদ।

জি।

ঘরে চিড়ামুড়ি জাতীয় কিছু আছে ? এখন কেমন জানি ক্ষিধেটা বেশি লাগছে।

শাহেদ শুকনো মুখে উঠে গেল। কারণ সে মোটামুটি নিশ্চিত ঘরে কিছু নেই। আর থাকলেও সে খুঁজে পাবে না। চিড়ামুড়ি তো নিশ্চয়ই নেই। চানাচুর থাকতে পারে। সেই চানাচুর রান্নাঘরের অসংখ্য কৌটার কোনটায় আছে কে বলবে ? একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে ছাতা পড়া বাসি চানাচুর দেওয়া যায় না।

পিরিচে ঢাকা দেওয়া আধগ্লাস দুধ পাওয়া গেল। দুধ থেকে কেমন টকটক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। নষ্ট হয়ে গেছে কি-না কে বলবে। শাহেদ লজ্জিত ভঙ্গিতে দুধের গ্লাস নিয়ে ভাইয়ের সামনে রাখল। বিব্রত গলায় বলল, আর কিছু পেলাম না ভাইজান।

ইরতাজউদ্দিন একচুমুকে দুধটা খেয়ে ফেললেন। খেতে গিয়ে টের পেলেন দুধটা নষ্ট। না খেলে শাহেদ মনে কষ্ট পাবে বলেই গ্লাসের তলানি পর্যন্ত শেষ করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

শাহেদ বলল, ভাইজান, দুধটা কি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ?

না।

আবারো একটু মিথ্যা বলতে হলো। শাহেদের মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কী। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াটা কি ঠিক হলো ? না, ঠিক হয় নি। সত্যের জন্য কেউ যদি মনে কষ্ট পায় তাহলে পাক। ইরতাজউদ্দিন বললেন, দুধটা টকে গেছে। তবে খেতে খারাপ লাগে নি।

দুধ খেতে গিয়ে তার একটা মজার স্মৃতি মনে পড়ল। গতবছর জুন মাসে শান্তাহার স্টেশনে তিনি দুধ খাওয়ার একটা দৃশ্য দেখেছিলেন। তিনি যাবেন বগুড়া। ট্রেনের জন্য শান্তাহারে তাঁকে চারঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ট্রেন বিকেল পাঁচটায়। স্টেশনের ওয়েটিংরুমের একটা ইজিচেয়ারে তিনি শুয়ে পড়লেন এবং একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেন ওয়েটিংরুম ভর্তি মানুষ। চারদিক গমগম করছে। মনে হচ্ছে বিরাট জলসা। আসরের মধ্যমণি হয়ে যিনি বসে আছেন তাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে কিন্তু ঠিক চেনা যাচ্ছে না। হৃষ্টপুষ্ট একজন মানুষ, মাথায় গোল টুপি। মুখভর্তি সফেদ দাড়ি। তার হাতে কে একজন কানায় কানায় ভর্তি একগ্লাস দুধ এনে দিল। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমার নিজের গাইয়ের দুধ। হুজুরের জন্য এনেছি। মাওলানা ধরনের মানুষটা দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, দুধ খেতে ইচ্ছা করতেছে না। তবে দুধ এবং মধু এই দুই তরল খাদ্যদ্রব্য আমাদের আখেরি নবির বড়ই পছন্দের পানীয়। কাজেই খাচ্ছি। বলেই তিনি একচুমুকে গ্লাস শেষ করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। খুবই ভালো দুধ। কালো গাইয়ের দুধ?

যে লোক দুধ এনেছিল সে বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, জি হুজুর।

দুধে চুমুক দিয়েই বুঝেছি। কালো গাইয়ের দুধ ছাড়া দুধ এত মিষ্টি হয় না।

ইরতাজউদ্দিন তখনি মাওলানা সাহেবকে চিনলেন— ইনি মাওলানা ভাসানী। পত্রিকায় কত ছবি দেখেছেন। এই প্রথম সামনাসামনি দেখা।

ইরতাজউদ্দিন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। মাওলানা ভাসানী তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, ঘুম ভালো হয়েছে? যেন কতদিনের চেনা মানুষ।

ইরতাজউদ্দিন বিনয়ের সঙ্গে বললেন, জি।

আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করেছি, কিছু মনে করবেন না।

ইরতাজউদ্দিন আরো লজ্জার মধ্যে পড়ে গেছেন। এরকম একজন বিখ্যাত মানুষের সামনে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা যায় না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মাওলানা তখন অন্যপ্রসঙ্গে চলে গেছেন। স্যুট পরা রোগামতো এক ভদ্রলোককে বলছেন— দেশের অবস্থা শুনবা? পাঁচটা গ্রামে ঘুরে আমি একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ভাঙাতে পারি নাই। এই হলো দেশের অবস্থা। কিছু একটা করা দরকার। কিছু করো। মাছি আর কত মারবা? অনেক তো মাছি মারলা।

মাওলানা ভাসানী ওয়েটিংরুমেই আছরের নামাজ পড়লেন। বিরাট জামাত হলো। ইরতাজউদ্দিন সেই জামাতে সামিল হলেন। জামাতে সামিল হওয়ার জন্য তিনি ট্রেন ফেল করলেন। কারণ মাওলানা দীর্ঘ দোয়া শুরু করলেন। সেই

দোয়া চল্লিশ মিনিট স্থায়ী হলো। এর মধ্যে ইরতাজউদ্দিন সাহেবের গাড়ি ছেড়ে দিল। একবার ইরতাজউদ্দিন ভাবলেন, দোয়া ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে গাড়ি ধরে ফেলেন। শেষপর্যন্ত তিনি তা করলেন না। দোয়ার মাঝখানে উঠে যাওয়া যায় না, সেটা অভদ্রতা হয়। এতবড় একজন মানুষের সঙ্গে তিনি অভদ্রতা করতে পারেন না। ট্রেন ফেল করা এমন কোনো বড় ব্যাপার না। একটা ফেল করলে আরেকটা পাওয়া যায়। এই ধরনের মানুষের সঙ্গ সবসময় পাওয়া যায় না।

নষ্ট দুধ খেতে দিয়ে শাহেদ কেমন মনমরা হয়ে আছে। মাওলানা ভাসানীর গল্পটা বলে তার মনমরা ভাবটা কাটাবেন কি-না ইরতাজউদ্দিন তা ধরতে পারলেন না। শাহেদ বলল, ভাইজান, শুয়ে পড়েন। তিনি শুয়ে পড়লেন।

ফ্যানটা বন্ধ করে দে।

ফ্যান থাকুক-না ভাইজান। গরম খুব বেশি।

ফ্যানের বাতাসে ঘুম হয় না— এটা কতবার বলব!

শাহেদ ফ্যান বন্ধ করে দিল।

ইরতাজউদ্দিন সাহেব ক্লান্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। এক ঘুমে রাত পার করে দিলেন। এত তৃপ্তি করে তিনি অনেকদিন ঘুমুন নি। ঘুম ভেঙে তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন, তার উপরে মশারি খাটানো আছে এবং ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে। তার ঘুমের মধ্যেই শাহেদ এই কাজটি করেছে। এতে তাঁর ঘুমের কোনো অসুবিধা হয় নি। বরং অন্য দিনের চেয়েও অনেক তৃপ্তি করে ঘুমিয়েছেন। মশারি এবং ফ্যান সম্পর্কে তার এতদিনের ধারণায় কিছু ভুল আছে। এই ভুল শোধরাতে হবে। মানুষমাত্রই ভুল করে, তবে তার সুবিধা হচ্ছে সে ভুল শোধরাবার সুযোগ পায়।

শাহেদের অফিস মতিঝিলে। আধুনিক কেতার ছিমছাম অফিস বলতে যা বোঝায়, এই অফিস মোটেই সে-রকম না। আউলা ঝাউলা অফিস। অফিসের কর্মচারীদের টেবিল চেয়ারের পাশেই গাদা করে রাখা মালামাল। যদিও মালামাল রাখার জন্যে নিচে গোডাউন আছে। কোনো অফিস ঘরেই খাটিয়া থাকার কথা না, এই অফিসে খাটিয়া পাতা আছে। প্রায়ই সেখানে কাউকে না কাউকে গড়াগড়ি করতে দেখা যায়। কেউ কিছু মনে করে না। আশপাশের সাত-আট তলা দালানের মাঝখানে কটকটা হলুদ রঙের (শাহেদের ভাষায় 'গু-কালার') দোতলা দালান। বারো হাত কাকুড়ের সাড়ে পনেরো হাত বিচির মতো বিশাল এক সাইনবোর্ড। সেখানে লেখা— United Commercial. সাইনবোর্ডের কয়েকটা অক্ষর মুছে গেছে। তাতেও কারো কোনো গরজ নেই।

সাড়ে বত্রিশ ভাজা অফিস। ইন্সুরেন্স, ইনডেনটিং, শেয়ার বিজনেস। অফিসের মালিকের নাম মইন আরাফী। মুর্শিদাবাদ বাড়ি। দেশ বিভাগের সময় দুইশ' 'রুপেয়া', একটা রুপার হুক্কা এবং একটা দামি শাল নিয়ে চলে এসেছিলেন। শাল বিক্রি করে প্রথম তিনি ফলের ব্যবসা শুরু করেন। রুপার হুক্কাটা অনেক কষ্টে রক্ষা পায়। সেই হুক্কা তিনি অফিসে ব্যবহার করেন। মইন আরাফী সাহেবের ধারণা, হুক্কা টানার সময় হুক্কা কথা বলে। কাজকর্ম যখন থাকে না তখন না-কি হুক্কার কথা শুনতে ভালো লাগে। মইন আরাফী সাহেব এখন লক্ষপতির উপরে যা আছে সেই পতি। ভদ্রলোকের মাথায় যখন যে বিজনেস এসেছে তিনি করেছেন এবং টাকা এসেছে জলের মতো।

ভদ্রলোকের বয়স ষাট। বেটে গাট্টাগুট্টা চেহারা। টকটকে গৌরবর্ণের মানুষ। মাথায় কোনো চুল নেই, কিন্তু বাদামি রঙের বাহারি গোঁফ আছে। অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। কোনো কর্মচারীকে যখন তার প্রয়োজন হয়, তিনি তাকে ডেকে পাঠান না। নিজে তার কাছে উপস্থিত হন। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। এবং একটা পর্যায়ে বলেন, Be happy man! Be happy!

অফিসে তাঁর নাম 'বি হ্যাপি স্যার'। অফিসের সমস্ত কর্মচারী মানুষটিকে সত্যিকার অর্থেই পছন্দ করে। বিবাহ বার্ষিকী, ছেলের জন্মদিন, মেয়ের পানচিনিতে বি হ্যাপি স্যারের দাওয়াত হয়। ভদ্রলোক যান বা না যান, একটা উপহার পাঠান। বেশ দামি উপহার।

শাহেদ অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মেজাজ যথেষ্ট পরিমাণ খারাপ। ঘড়িতে ন'টা বাজছে। দশটা থেকে অফিস। সে একঘণ্টা আগে চলে এসেছে। দেরি করে অফিসে আসার নানান কারণ থাকে। একঘণ্টা আগে অফিসে আসার কারণ একটাই— বেকুবি। শাহেদ বেকুব না। আসমানীর সঙ্গে রাগ দেখাতে গিয়ে সে কাজটা করেছে। এই রাগটা না দেখালে একঘণ্টা আগে অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো না।

আসমানী চারদিন বাবার বাড়িতে পার করে আজ সকালে হাসিমুখে হাতে একটা ছোট্ট টিফিন কেরিয়ার ঝুলিয়ে উপস্থিত হয়েছে। শাহেদের সঙ্গে কোনো সমস্যাই হয় নি— এরকম ভঙ্গি করে বলেছে, এই, রিকশা ভাড়াটা দিয়ে এসো তো। আমার কাছে ভাংতি নেই। নাশতা করেছ ? আমি নাশতা নিয়ে এসেছি।

শাহেদ জবাব না দিয়ে রিকশা ভাড়া দিতে গেল। একবার ভাবল রিকশা ভাড়া দিয়েই সে দিলবাগ রেস্টুরেন্টে চলে যাবে। সেখানে পরোটা বুন্দিয়া নাশতা খেয়ে সোজা অফিস। এতে রাগ দেখানো হবে। কাজটা করতে পারল না, কারণ রুনিকে আদর করা হয় নি। চারদিন মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় নি। তার কাছে মনে হচ্ছে চার বছর।

পত্রিকা দিয়ে গেছে। শাহেদ পত্রিকা হাতে ঘরে ঢুকল। সে ঠিক করেছে, আসমানীর কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেবে না। মুখের সামনে পত্রিকা ধরে রাখবে। শাহেদ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল, আসমানী খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘর ঠিকঠাক করছে। তারচেয়েও বিস্ময়কর রুনির ব্যবহার। সে কাগজে ছবি আঁকছে। একবারও বাবার দিকে তাকাচ্ছে না। যেন সে বাবাকে চিনতেই পারছে না।

আসমানী বলল, এই ক'দিন কোথায় খেয়েছ ? নিজে রান্না করেছ, না হোটেলে ?

শাহেদ গম্ভীর গলায় বলল, হোটেলে।

ভাইজান কবে গেছেন ?

শাহেদের বলতে ইচ্ছা করছে, তা দিয়ে তোমার কী দরকার ? মনের ইচ্ছা চেপে রেখে বলল, যেদিন এসেছেন তার পরদিনই চলে গেছেন।

আমি উনাকে চিঠি লিখেছিলাম আমচুর নিয়ে আসতে। এনেছেন ?

শাহেদ জবাব দিল না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এইসব হচ্ছে আসমানীর খাতির জমানো কথা। খেজুড়ে আলাপ। এই আলাপে যাবার কোনো মানে হয় না।

আসমানী বলল, তোমাকে নাশতা দিয়ে দেই ? চালের আটার রুটি আর কবুতরের মাংস।

কবুতর খাই না।

কবুতর খাও না কেন ?

কেন খাই না এত ব্যাখ্যা তো দিতে পারব না। খাই না মানে খাই না।

কবুতরের মাংস ছাড়া অন্য কোনো মাংস হলে খাবে ?

শাহেদ বিরক্ত চোখে তাকাল। আসমানীর চোখে-মুখে চাপা হাসি। আসমানী বলল, তুমি কবুতরের মাংস খাও না, আমি জানি। মা কবুতরের মাংস রান্না করেছিল। আমি ফ্রিজের বাসি গরুর মাংস নিয়ে এসেছি। গরম করে দিচ্ছি, তুমি খাও।

শাহেদ কিছু বলল না। গভীর মনোযোগে পত্রিকা পড়তে লাগল। তার মেজাজ খারাপ হচ্ছে রুনির দিকে। মেয়েটা বাবাকে চিনতে পারছে না— এই ঢং কোত্থেকে শিখেছে ? নিশ্চয়ই মা'র কাছ থেকে। কাগজে কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং আঁকাটা কি এখন এতই জরুরি ? তার উপর দেখা যাচ্ছে তার বাঁ হাতের একটা আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কী করে ব্যথা পেয়েছে এটাও সে বলবে না ?

আসমানী বলল, হ্যালো রাগ কুমার! তুমি যদি ভাবো আমি তোমার কাছে সরি বলব, তাহলে ভুল করেছ। তোমার উপর রাগ করে আমি যে চারদিন মায়ের কাছে ছিলাম, আমি ঠিকই করেছি। তবে বড় ভাইজানের সঙ্গে দেখা করতে আসি নি— এটা খুবই বড় ভুল হয়েছে। এই ভুলের জন্যে আমি বড় ভাইজানের কাছে ক্ষমা চাইব। তোমার কাছে ক্ষমা চাইব কেন ?

শাহেদ বলল, আমি তো তোমাকে ক্ষমা চাইতে বলছি না। কেন এত কথা বলছ ?

আসমানী বলল, তুমি যদি স্বাভাবিকভাবে আমার সঙ্গে কথা না বলো, তাহলে আমি কিন্তু আবার মা'র কাছে চলে যাব।

যেতে চাইলে যাবে।

মাংস গরম করে এনেছি, খেতে এসো। আচ্ছা আমি ভুল করেছি। সরি। এখন পায়ে ধরতে পারব না। রাতে পায়ে ধরব। সত্যি পায়ে ধরব।

এই কথার পর শাহেদের উচিত ছিল স্বাভাবিকভাবে খেতে বসা। ঝোল ঝোল মাংস, চালের আটার রুটি তার খুবই পছন্দের খাবার। আসমানী নিঃশর্ত

ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যেই বোধহয় হঠাৎ শাহেদের রাগ বেড়ে গেল। সে খবরের কাগজ ছুড়ে ফেলে গটগট করে বের হয়ে গেল। তার রাগটা কমে গেল রিকশায় উঠার সঙ্গে সঙ্গে। তখন আর ফেরা যায় না। রিকশাওয়ালা রিকশা টানতে শুরু করেছে।

শাহেদ দাঁড়িয়ে আছে অফিসের সামনে। অফিস খুলেছে। সে ইচ্ছা করলেই তার চেয়ারে বসতে পারে। অফিসের পাশেই ছাপড়া রেস্টুরেন্টের মতো আছে। রেস্টুরেন্টের মালিক বিহারি, সে সকালে রুমালি রুটি এবং মুরগির লটপটি নামে একটা খাদ্য তৈরি করে। অতি সুস্বাদু। অফিসের পিওন পাঠিয়ে সেখান থেকে নাশতা আনা যায়। ভালো ক্ষিধে লেগেছে। ক্ষিধের চোটে বুক জ্বালা করছে। কিন্তু শাহেদের অফিসে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না। তার ইচ্ছা করছে বাসায় ফিরে যেতে।

কেমুন আছেন Young man ?

শাহেদ চমকে তাকাল। 'বি হ্যাপি স্যার' ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন। এই ভদ্রলোকের শরীর ভারী কিন্তু তিনি হাঁটেন নিঃশব্দে।

অফিসে এখন এমুন কী কঠিন কাজ যে Early আসতে হোবে ?

স্যার, ভালো আছেন ?

অফকোর্স ভালো আছি। আপনার ছোট বাচ্চাটা কেমুন আছে— Little baby ?

স্যার, ভালো আছে।

Be happy young man! Be happy!

বলেই আরাফী সাহেব শাহেদের কাঁধে হাত রাখলেন। শাহেদ জানে, ভদ্রলোক কাঁধ থেকে হাত সরাবেন না। এইভাবেই অফিসে ঢুকবেন। ভদ্রলোকের ব্যবহার কতটুকু আন্তরিক এবং কতটুকু ভান কে জানে! বস জাতীয় মানুষদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায় তখন মনে হয় কোথাও বোধহয় সমস্যা আছে।

শাহেদ সাব।

জি স্যার।

ব্যবসা তো সব বন্ধ। 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করলে তো পেটে দানাপানি আসবে না। ঠিক বুলেছি ?

বসদের সব কথাতেই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তে হয়। শাহেদ তাই নাড়ল।

মইন আরাফী হাসিমুখে বললেন, বি হ্যাপি ইয়াং ম্যান। বি হ্যাপি।

শাহেদ মনে মনে ঠিক করল কোনো একদিন সুযোগ পেলে সে জিজ্ঞেস করবে— 'বি হ্যাপি' বলা তিনি কবে থেকে শুরু করেছেন ? প্রথম তিনি কাকে বলেছিলেন, বি হ্যাপি ?

ঢিলাঢালাভাবে অফিস শুরু হয়েছে। অফিসের লোকজনও সব আসে নি। চারদিক ফাঁকা ফাঁকা। এই অফিস আগে গমগম করত। নানান ধরনের লোকজন নানান ধান্ধায় ঘুরত। একতলার গোডাউন সেকশনে হৈহল্লা হতো। মারামারি মাথা ফাটাফাটি হতো। এখন সব ফাঁকা। গোডাউনে কোনো মাল নেই। অফিসের লোকজনেরও কোনো কাজকর্ম নেই। আগে যেখানে হেড ক্যাশিয়ার আসগর আলি দেওয়ান এক হাজার ভাউচারে সই করতেন, সেখানে উনি এখন পনেরো-বিশটার বেশি ভাউচার সই করেন না। হাতের কাজ শেষ হয়ে যায় দুপুরের আগেই। তখন তিনি আরাম করে পান খান এবং এই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করেন। এই বিষয়ে গল্প করতে তাঁর ভালো লাগে। তাঁর ধারণা এই দেশের কপালে আল্লাহপাক বোল্ড লেটারে লিখে দিয়েছেন— 'Closed'. রেস্টুরেন্টে যেমন 'Closed' সাইনবোর্ড ঝুলায় সে-রকম। তাঁর ধারণা এই দেশের অতীতে কিছু হয় নি, ভবিষ্যতেও কিছু হবে না। কেউ তাঁর কথার বিরোধিতা করলে তিনি ঠাণ্ডা গলায় বলেন, আপনার পুরা নামটা যেন কী ? আব্দুল গনি না ? এখন থেকে নামের শেষে 'শিশু' টাইটেল লাগায়ে দেন। বর্তমানে আপনার নাম আব্দুল গনি শিশু। আপনার চিন্তাশক্তি শিশু লেভেলে। বুঝেছেন ?

দেওয়ান সাহেবের আশপাশে কেউ যায় না। আগ বাড়িয়ে 'শিশু' টাইটেল নেয়ার দরকার কী ?

দুপুর বারোটার দিকে দেওয়ান সাহেব পান-জর্দা নিয়ে বসলেন। শাহেদের দিকে হাত ইশারা করে বললেন, একটু শুনে যান।

শাহেদ বলল, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথাবার্তা শুনতে ইচ্ছা করছে না।

দেওয়ান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, কাছে আসেন। অন্য ব্যাপার। মুখোমুখি না বসলে বলা যাবে না। জরুরি ব্যাপার।

শাহেদ নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠে এসে দেওয়ান সাহেবের সামনের চেয়ারে বসল।

দেওয়ান সাহেব বললেন, পান খাবেন না-কি ?

শাহেদ বলল, আমি পান খাই না।

খান না বলেই তো খাবেন। টেস্ট কী রকম দেখবেন।

জরুরি ব্যাপারটা কী বলেন।

দেওয়ান সাহেব পান চিবুতে চিবুতে বললেন, ছটফট করছেন কেন? হাতে কোনো কাজ নাই। ছটফট করারও কিছু নাই। আপনার একটা চিঠি আছে আমার কাছে।

কী চিঠি?

কাল তো আপনি অফিসে আসেন নাই। গৌরাঙ্গ বাবু আপনাকে খুব ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করছিলেন। একটা চিঠি আমার কাছে দিয়ে গেলেন। খামের উপরে লেখা— জরুরি।

শাহেদ বলল, চিঠিটা দিন।

দেওয়ান সাহেব বললেন, দিচ্ছি। এত অস্থির হচ্ছেন কেন? দেশ কোন দিকে যাচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন?

না।

দেশের ইকনমি টোটালি ধ্বংস হয়ে গেছে, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। শেষ ভরসা আমেরিকা। পিএল ফোর এইটির গম। গম যাবে আমরাও যাব।

শাহেদ বলল, ও আচ্ছা।

দেওয়ান সাহেব গলা নিচু করে বললেন, আমাদের অফিস যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এটা জানেন?

জানি না তো।

আমাদের বি হ্যাপি স্যার, আপনাদের সবার চোখে আদর্শ মানব, তলে তলে সব বিক্রি করে দিচ্ছেন। ক্যাশ নিয়ে চলে যাবেন করাচি। ফ্যামিলি চলে গেছে। তিনি থেকে গেছেন। আগামী মাসে বেতন হবে না। বুড়ো আঙুলে সামান্য চিনি মাখিয়ে চুষতে হবে। যাদের ডায়াবেটিস আছে, তারা চুষবে শুধু বুড়ো আঙুল।

শাহেদ বলল, আপনাকে কে বলেছে অফিস বিক্রি হয়ে যাচ্ছে?

দেওয়ান সাহেব বললেন, এইসব গোপন কথা কি কেউ আগ বাড়িয়ে বলে? হাবে ভাবে বুঝেছি। তবে স্যারের ফ্যামেলি যে করাচি চলে গেছে এইটা জানি। তাদের পিআইএর টিকিট আমি কেটেছি।

বাড়িতে কি স্যার একা থাকেন?

একা থাকেন, না-কি দোকা থাকেন আমি জানি না। তবে স্যারের ফ্যামিলি যে ফুড়ুৎ করে চলে গেছে এইটা জানি। বি হ্যাপি স্যারের নাম এখন হওয়া উচিত 'বি স্যাড স্যার'।

শাহেদ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, চিঠিটা দিন, চলে যাই।

দেওয়ান সাহেব বললেন, কথা শুনতে ভালো লাগছে না? সত্য কথার প্রধান সমস্যা হলো, সত্য কথা শুনতে ভালো লাগে না। যে বলে তাকেও ভালো লাগে না। মিথ্যা কথা শুনতে ভালো লাগে। যে বলে তাকেও বড় আপন মনে হয়। যা হোক, আমার সঙ্গে কথা বলতে না চাইলে নাই। এই নিন গৌরাঙ্গ বাবুর চিঠি।

গৌরাঙ্গের সঙ্গে শাহেদের খুব যে মাখামাখি পরিচয় তা-না। গৌরাঙ্গ এবং শাহেদ একই দিনে এই অফিসে চাকরিতে জয়েন করেছিল। কাকতালীয়ভাবে দু'জনের পরনেই ছিল ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি। গৌরাঙ্গ সেদিন অবাক হয়ে বলেছিল, শাহেদ ভাই, আমাদের কোইনসিডেন্সটা দেখেছেন? পয়েন্টে পয়েন্টে মিলে যাচ্ছে।

তারচেয়েও বড় মিল যেটা পাওয়া গেল— দু'জনেরই প্রথম সন্তান কন্যা। একজনের নাম রুনি, আরেকজনের রুনু।

গৌরাঙ্গ এই মিল দেখে অফিসের শেষে ক্যান্টিনে চা খেতে খেতে বলল— আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে ঈশ্বরের একটা খেলা আছে। দেখবেন আমাদের জীবনে একজনের ঘটনার সঙ্গে আরেকজনের ঘটনা মিলে যাবে। আমি যেদিন অফিসে নীল শার্ট পরে আসব দেখা যাবে আপনিও নীল শার্ট পরে এসেছেন। আমার পরিবারে যেদিন আনন্দের কোনো ঘটনা ঘটবে, আপনার পরিবারেও ঘটবে। আমার ঠাকুরমা যেদিন মারা যাবে, দেখা যাবে আপনার দাদিও সেদিন মারা যাবে।

শাহেদ হেসে ফেলল।

গৌরাঙ্গ বলল, হাসছেন কেন?

শাহেদ বলল, কোনো কারণ ছাড়াই হাসছি।

গৌরাঙ্গ আহত গলায় বলল, আমি সিরিয়াস একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছি, আপনি হেসে দিলেন কেন?

সরি।

না, এরকম করবেন না। এতে আমি মনে কষ্ট পাই।

কিছুদিনের মধ্যেই শাহেদ লক্ষ করল গৌরাঙ্গের স্বভাবই হলো তুচ্ছ সব কারণে মনে কষ্ট পাওয়া। যেমন একদিন গৌরাঙ্গ এসে শাহেদের টেবিলে বসতে বসতে বলল, আজ থেকে আমি আপনাকে 'তুই' করে বলব। আপনিও আমাকে 'তুই' করে বলবেন। দিস ইজ ফাইনাল।

শাহেদ অবাক হয়ে বলল, কেন?

গৌরাঙ্গ আহত গলায় বলল, কারণ আমরা বন্ধু, এই জন্যে। আপনি কখনো শুনেছেন দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু একে অন্যকে আপনি করে বলছে?

শাহেদ কিছু বলল না।

গৌরাঙ্গ বলল, তুই রাজি না?

শাহেদ বলল, একমাসও হয় নি আমাদের পরিচয়, এর মধ্যে হঠাৎ করে একদিন দু'জন দু'জনকে তুই বলছি— এটা চোখে লাগবে না?

গৌরাঙ্গ বলল, কার চোখে লাগবে?

শাহেদ বলল, সবার।

গৌরাঙ্গ বলল, ঠিক আছে, আপনাকে তুই বলতে হবে না। আমিও বলব না। কথা দিচ্ছি প্রয়োজন ছাড়া আমি আপনার সঙ্গে কথাও বলব না।

গৌরাঙ্গ নিজের টেবিলে ফিরে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল আরেক সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলে সে জায়গা বদল করছে। আগের জায়গাটা ছিল শাহেদের মুখোমুখি, এখনেরটা দূরে। এই অবস্থায় চার-পাঁচ দিন কাটাবার পর গৌরাঙ্গ আবার আগের জায়গায় চলে এলো। বিকেলে অফিস শেষ করে জোর করে ক্যান্টিনে চা খাওয়াতে নিয়ে এলো শাহেদকে।

হাস্যকর যেসব ছেলেমানুষী গৌরাঙ্গের মধ্যে আছে তার কিছু কিছু শাহেদের বেশ ভালো লাগে, আবার কিছু কিছু খুবই বিরক্তিকর।

সবচে' বিরক্তিকর হলো, গৌরাঙ্গের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া। যে রাতে নিমন্ত্রণ সেই রাতে অবধারিতভাবে গৌরাঙ্গ কিছু মদ্যপান করবে। দু'পেগ খাওয়ার পর বদ্ধ মাতাল। তখন কথাবার্তার ঠিক ঠিকানা নেই। এই হাসছে, এই কাঁদছে, এই পা ধরতে আসছে। খাওয়াদাওয়া শেষ করার পর বাড়িতে ফেরার নাম নেয়া যাবে না। গৌরাঙ্গ কিছুতেই বাড়ি ফিরতে দেবে না। তাকে থাকতেই হবে। একটা পর্যায় আসে যখন গৌরাঙ্গের স্ত্রী নীলিমা এসে করুণ গলায় বলে, ভাই, আপনি থেকে যান। আপনি চলে গেলে সে বড় যন্ত্রণা করবে। কাঁদবে, জিনিসপত্র ভাঙবে। শাহেদকে অতি অনাগ্রহের সঙ্গে রাতে থেকে যেতে হয়।

গৌরাঙ্গের চিঠি হাতে নিয়ে শাহেদ বসে আছে। চিঠি খুলতে ভরসা পাচ্ছে না। সে নিশ্চিত চিঠিতে কোনো একটা নিমন্ত্রণের ব্যাপার আছে।

গৌরাঙ্গ লিখেছে—

> প্রিয় মিতা,
>
> আমার জীবনে দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। অতীব অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যাহা পত্র মারফত বলা

সম্ভব নহে। আমি অফিসে আসিয়া আপনাকে না পাইয়া হতাশ হইয়া বাসায় ফিরিয়া গেলাম। মিতা, পত্র পাওয়া মাত্র যেখানে যে অবস্থায় আছেন আমার বাড়িতে চলিয়া আসিবেন। যদি না আসেন, ঈশ্বরের দোহাই বাকি জীবন আমি আপনার সহিত কোনো বাক্যব্যয় করিব না। আমি তিন দিনের আর্নড লিভ নিয়া বাড়িতে বসিয়া আছি আপনার অপেক্ষায়।

ইতি

গৌরাঙ্গ

শাহেদ মনে মনে বলল, অসম্ভব টু দা পাওয়ার টেন। যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। চারদিন হয়েছে সে তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে নি। আজ পুরনো ঢাকায় গৌরাঙ্গের সঙ্গে দেখা করার অর্থ রাতে ফেরা যাবে না। মেয়ের সঙ্গে আরো একদিন কথা হবে না।

অফিস ছুটি হয় পাঁচটায়, তিনটা বাজতেই দেখা গেল কর্মচারীরা উঠতে শুরু করেছে। বি হ্যাপি স্যার লাঞ্চের সময় চলে গেছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত কী একটা কাজে (চিটাগাং পোর্টে জাহাজে মাল খালাস বিষয়ক কাজ) তিনি চিটাগাং যাচ্ছেন। ফিরবেন দু'দিন পর। কর্মহীন অফিসে পাঁচটা পর্যন্ত বসে থাকার অর্থ হয় না।

শাহেদ চারটার দিকে উঠল। দেওয়ান সাহেব একা বসে আছেন। তিনি কখনো অফিস শেষ হবার আগে চেয়ার ছেড়ে উঠেন না। তিনি শাহেদকে বললেন, আরো কিছুক্ষণ থাকুন না। দুই ভাই একসঙ্গে বের হই।

শাহেদ বলল, কাজ আছে।

দেওয়ান সাহেব বললেন, বাঙালির এখন কাজ কী ? বর্ষার ঘোঁতা ব্যাঙের মতো গলা ফুলিয়ে শ্লোগান দেয়া— 'জয় বাংলা', 'জয় বাংলা'। এখন আমাদের কী শ্লোগান হওয়া উচিত জানেন ? আমাদের শ্লোগান হওয়া উচিত— 'নয় বাংলা', 'নয় বাংলা'। অর্থাৎ বাংলা না, অন্য কিছু। শুনেন শাহেদ সাহেব, এখনো সময় আছে। আমরা যদি বাঁচতে চাই আমাদের খোল নলচে সব বদলাতে হবে। পোশাক চেঞ্জ করতে হবে। লুঙ্গি শাড়ি চলবে না। ফুড হ্যাবিট বদলাতে হবে। No Fish No Rice. বাংলা ভাষা বাতিল। কথা বলতে হবে অন্য ভাষায়— উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি চলতে পারে। বুঝতে পারছেন, না-কি পারছেন না ?

আপনি আগে ভালোমতো বুঝে নিন।

চা খাবেন না-কি ? আসুন আপনাকে এক কাপ বিদায়ী চা খাওয়াই।

চা খাব না।

তাহলে আর আপনাকে আটকে রেখে কী হবে! চলে যান। 'নয় বাংলা'।

বাসায় ফেরার পথে শাহেদ মরণচাঁদের দোকান থেকে এক সের রসগোল্লা কিনল। রসগোল্লা আসমানীর পছন্দের মিষ্টি। রসগোল্লা খাওয়ার কায়দাটাও তার অন্যরকম। প্রথমে চিপে রস বের করে রসহীন রসগোল্লা খায়। পরে চুমুক দিয়ে খায় রসটা। সব বয়স্ক মানুষদের কর্মকাণ্ডেই কিছু ছেলেমানুষী থাকে। আসমানীর রসগোল্লা খাওয়ার মধ্যে ছেলেমানুষীটা আছে। তার একটা পছন্দের মিষ্টি নিয়ে বাসায় ফেরার অর্থই হচ্ছে আসমানীকে নিঃশব্দে বলা— 'আই অ্যাম সরি।' বেচারি আজ সকালে কষ্ট করে খাবার গরম করে টেবিলে দিয়েছে, সে রাগ দেখিয়ে চলে এসেছে— এটা ঠিক হয় নি।

ইত্তেফাক অফিসের সামনে মাঝে মধ্যে পাখিওয়ালা বসে। খাঁচায় বন্দি পাখি বিক্রি হয়। টিয়া, মুনিয়া, কালিম পাখি, ঘুঘু। রুনির জন্যে একটা পাখি কিনে নিলে হুলুস্থুল ঘটনা হবে। খাঁচা হাতে সারা বাড়িতে ছোটাছুটি করবে। পাখি কেনা নিতান্তই বাজে খরচ। এই পাখি কয়েক দিন পরেই ছেড়ে দিতে হবে। যে মেয়ের সঙ্গে চারদিন কথা হচ্ছে না, সেই মেয়ের আনন্দের জন্যে কয়েকটা সস্তার মুনিয়া পাখি কেনা যেতে পারে। শাহেদ রিকশা নিয়ে পাখিওয়ালার খোঁজে ইত্তেফাক অফিসের সামনে গেল। সে পাঁচটা মুনিয়া পাখি কিনল দেড় টাকা দিয়ে। খাঁচাটা ফ্রি।

এক হাতে মিষ্টি অন্য হাতে পাখির খাঁচা নিয়ে শাহেদ বাসায় ফিরল বিকেল পাঁচটায়। অমঙ্গল আশঙ্কার মতো তার মনে হচ্ছিল বাসায় ফিরে দেখবে কেউ নেই। দরজায় তালা ঝুলছে। তালার ফাঁকে গুঁজে রাখা নোট— 'চলে গেলাম'। ভোরবেলা নাশতা না খাওয়া এবং রাগ দেখানোর শাস্তি আসমানী দেবে না— তা হবে না।

দরজায় তালা নেই। হঠাৎ শাহেদের মন আনন্দে পূর্ণ হলো। নিজের ছোট্ট বাসাটাকে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা'। তার কাছে মনে হলো শুধু বেঁচে থাকার জন্যে হলেও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়।

আসমানী তাকে দেখে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, এখন চা খাবে, না-কি গোসল করে চা খাবে? (অফিস থেকে ফিরে শাহেদ গরম পানি দিয়ে গোসল সেরে চা খায়।) শাহেদ বলল, এখন এক কাপ খাব। গোসল সেরে আরেক কাপ খাব।

আসমানী বলল, আবার পাখি এনেছ? এইগুলাকে কে দেখবে? দু'দিন পর রুনির শখ মিটে যাবে, তারপর কী হবে?

শাহেদ কিছু না বলে হাসল। হাসি দিয়ে জানান দেয়া— এখন আর আমাদের মধ্যে কোনো ঝামেলা নেই।

আসমানী বলল, চুলায় গরম পানি আছে, বালতিতে ঢেলে দিচ্ছি।

শাহেদ বলল, আমি ঢেলে নেব। রুনি কোথায় ?

আসমানী বলল, ও বাসায় নেই। ও মা'র বাসায় চলে গেছে।

শাহেদ বলল, তার মানে ?

আসমানী বলল, মেয়ে তার নানির বাসায় গেছে, এর আবার মানে কী ? তার ছোট মামা এসেছিল, সে তার ছোট মামার সঙ্গে চলে গেছে।

শাহেদ বলল, ও আচ্ছা।

সে কিছুতেই রাগ সামলাতে পারছে না। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সকালে নাশতা নিয়ে সে যে কাণ্ডটা করেছে, আসমানী তার শোধ তুলেছে। মেয়েকে নানির বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। খুব কঠিন কিছু কথা আসমানীকে বলতে পারলে ভালো হতো। বলতে ইচ্ছা করছে না।

আসমানী চা এনে সামনে রাখল। শাহেদ বলল, রুনিকে একা পাঠিয়ে দিলে কেন ? তুমিও সঙ্গে যেতে।

আসমানী বলল, আমিও যাব। আমি তোমার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এই তো এখন যাব।

তুমিও যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

কেন জানতে পারি ?

তোমার সঙ্গে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছা করছে না বলে চলে যাব। নিরিবিলি কয়েকটা দিন থাকব। বই পড়ব, গান শুনব। রিলাক্স করব।

শাহেদ বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

আসমানী বলল, বাথরুমে গরম পানি দিয়ে এসেছি। গোসল করতে চাইলে করো।

গোসল সেরে এসে শাহেদ দেখে, আসমানী বাসায় নেই। সত্যি সত্যি চলে গেছে। শাহেদ রাত আটটা পর্যন্ত বারান্দার চেয়ারে বসে থাকল। তারপর ঠিক করল গৌরাঙ্গের বাড়িতে যাবে। রাতটা সেখানেই কাটাবে। সে সঙ্গে করে আসমানীর জন্যে কেনা রসগোল্লার হাঁড়িটা নিয়ে নিল। আরেক হাতে নিল খাঁচার মুনিয়া পাখি। আসমানীর উপর সে যতটা রেগেছে, মেয়ের উপর ঠিক ততটাই রেগেছে। তার কাছে মনে হচ্ছে রুনিকে পাখি উপহার দেবার কোনো মানে হয় না। পাখিগুলি সে দেবে গৌরাঙ্গের মেয়েকে।

গৌরাঙ্গের বাড়ি পুরনো ঢাকার বংশাল রোডে। গলির ভেতর গলি, তার ভেতর গলি। শেষ গলিটা এতই সরু যে রিকশা চলার কথা না, তারপরেও রিকশা চলে। ফিতার মতো সরু গলির দু'দিকেই নর্দমা। নর্দমায় মরা বেড়াল, মুরগির নাড়িভুঁড়ি থাকবেই। ঠিকই গন্ধ আসবে। মনে হবে এখানে কেন এসেছি ? এই রাস্তায় হাঁটার অভ্যাস না থাকলে নর্দমায় পা পড়বেই।

গৌরাঙ্গ যে বাড়িতে থাকে সেটা তিনতলা। বাড়ির প্রথমতলায় সিমেন্ট রঙের দোকান। দোতলায় থাকে গৌরাঙ্গ। তিনতলায় গৌরাঙ্গের শ্বশুর হরিভজন সাহা। সাহা সম্প্রদায়ের মানুষজন মিষ্টভাষী হয়ে থাকে। এই ভদ্রলোক সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। তিনি কারো সঙ্গেই সহজভাবে কথা বলেন না। ধুতি পরার চল এই দেশ থেকে উঠে গেছে, হরিভজন সাহা এখনো ধুতি পরেন। শ্বশুরের সঙ্গে গৌরাঙ্গের সম্পর্ক খুবই খারাপ। কথাবার্তা প্রায় বন্ধ। গৌরাঙ্গ স্ত্রীর অগোচরে শ্বশুরকে ডাকে 'চামচিকা বাবাজি'। বাড়িটা গৌরাঙ্গের শ্বশুরের। প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ গৌরাঙ্গের তার শ্বশুরকে পঞ্চাশ টাকা দেয়ার কথা। সে কিছুই দেয় না।

শাহেদ গৌরাঙ্গের বাড়ি পৌঁছল রাত ন'টায়। দরজা খুলে দিল নীলিমা। সে আনন্দিত গলায় বলল, আপনি তাহলে এসেছেন! আপনার বন্ধুর তো মাথা খারাপের মতো হয়ে গেছে। আপনি না এলে কী যে করত কে জানে! সন্ধ্যা থেকে গ্লাস নিয়ে বসেছে। বুঝতেই পারছি আজ একটা কাণ্ড হবে।

'পটে আঁকা ছবি' বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে তা নীলিমার জন্যে খুবই প্রযোজ্য। শাহেদের ধারণা সে তার সারা জীবনে এত রূপবতী কোনো তরুণীকে দেখে নি। ভবিষ্যতে দেখবে সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। প্রথমবার দেখে সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। এর পরে অনেকবারই দেখা হয়েছে। শাহেদ প্রতিবারই হকচকিয়েছে। আজ নিশ্চয়ই কোনো উৎসব। নীলিমা সাজগোজ করেছে। খোঁপায় গন্ধরাজ ফুল গুঁজেছে। পরনের তাঁতের শাড়িটা দামি। নতুন শাড়ি, আজই পরেছে। শাড়ি থেকে নতুন নতুন গন্ধ আসছে। শাহেদের মনে হলো—এই মেয়ের সাজ করার দরকার কী ?

ঘরের ভেতর থেকে গৌরাঙ্গ ভারি গলায় বলল, নীলু, শাহেদ এসেছে ? (মদ খেলে গৌরাঙ্গের গলা ভারি হয়ে যায়।)

নীলিমা কিছু বলার আগেই গৌরাঙ্গ দরজা খুলে বাইরে চলে এলো। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে তো বলেছি শাহেদ আসবে। বলেছি, না-কি বলি নাই ?

বলেছ।

গৌরাঙ্গ রাগী গলায় বলল, তাহলে কেন বললে সে আসবে না ?

নীলিমা বলল, রাত বেশি হয়ে গেছে বলে বলেছি। এত রাত করে উনি আসবেন ভাবি নি।

অবশ্যই সে রাত করে আসবে। রাত একটা বাজলেও সে আসবে। আমি তাকে আসতে বলেছি, সে আসবে না— আমার বন্ধু সম্পর্কে এটা তুমি কী ভাবলে ?

নীলিমা চাপা গলায় বলল, চিৎকার করছ কেন ?

তুমি আমার বন্ধু সম্পর্কে উল্টাপাল্টা কথা বলবে, আর আমি চিৎকার করব না! অবশ্যই চিৎকার করব। তিনতলায় তোমার বাবা থাকে বলে আমি কি ভয় পাই না-কি ? চামচিকা বাবাজিকে গৌরাঙ্গ... দিয়েও পুছে না। (গৌরাঙ্গ অবলীলায় কুৎসিত কথাটা বলল। নীলিমা বিব্রত ভঙ্গিতে শাহেদের দিকে তাকাল। বেচারি খুবই লজ্জা পাচ্ছে।)

নীলিমা বলল, ভাই, আপনি আপনার বন্ধুকে সামলান। এই জিনিস সহ্য করতে পারে না, তারপরেও রোজ খাওয়া চাই। কী যে যন্ত্রণা!

গৌরাঙ্গ হঠাৎ খুবই বিস্মিত হয়ে বলল, খাঁচাতে করে কী এনেছিস ? পাখি ? (সামান্য মদ্যপান করার পরই সে শাহেদকে 'তুই' করে বলে।)

শাহেদ বলল, হ্যাঁ।

গৌরাঙ্গ বলল, তুই নীলিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখ— আমি কিন্তু তাকে বলেছি শাহেদ আজ পাখি নিয়ে আসবে। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ করে মনে হলো। প্রথমে আমি বললাম রুনুকে, তারপর বললাম তার মা'কে। তোর তো বিশ্বাস হচ্ছে না। তুই রুনুকে প্রথম জিজ্ঞেস কর, তারপর রুনুর মা'কে জিজ্ঞেস কর। তোর চোখ দেখেই মনে হচ্ছে তুই বিশ্বাস করছিস না।

শাহেদ বলল, বিশ্বাস হবে না কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে।

তারপরেও তুই জিজ্ঞেস কর। তোকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

নীলিমা বলল, ভাই, আপনি জিজ্ঞেস করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন তো। জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত সে একই কথা বলতে থাকবে। আপনি যে পাখি নিয়ে আসবেন এটা সে সত্যি বলেছে। আমার কথাটা বিশ্বাস করুন। আপনি বিশ্বাস না করা পর্যন্ত সে হৈচৈ করতেই থাকবে।

গৌরাঙ্গ বলল, তোমার কি ধারণা আমি মাতাল হয়ে গেছি ?

নীলিমা বলল, হ্যাঁ।

গৌরাঙ্গ আহত গলায় বলল, তুমি আমার বন্ধুর সামনে আমাকে মাতাল বললে ? তুমি ? আজকের এই Very special day-তে ?

শাহেদ বলল, আজকের দিনটা কী ? ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ?

নীলিমা বলল, এইসব কিছু না। ও শুধু শুধু হৈচৈ করছে।

গৌরাঙ্গ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার বন্ধু আজ রাতে থাকবে। আগে তার ঘর ঠিক কর। তার রাতে একটু পর পর জল খাওয়ার অভ্যাস। জলের ব্যবস্থা রাখ। একটা জগ আর গ্লাস।

নীলিমা বলল, উনি যদি থাকেন তাহলে কী দিতে হবে দিতে হবে না তা আমি জানি।

গৌরাঙ্গ বলল, তুমি কিছুই জানো না। তুমি যা পার তার নাম কট কট করে কথা বলা। তুমি কটকটি রানী। এর বেশি কিছু না। কটকটি, তুমি এখন আমার সামনে থাকবে না। তোমাকে দেখলেই আমার রাগ লাগছে। তুমি আমার বন্ধুর রাতে থাকার ব্যবস্থা করো।

যে-কারণে আজ শাহেদের নিমন্ত্রণ সেই কারণ জানা গেল। গৌরাঙ্গের শ্বশুর তাকে নগদ আঠারো হাজার টাকা দিয়েছেন। গৌরাঙ্গ নিচু গলায় বলল, চামচিকার ভীমরতি হয়েছে। সে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে। বুড়ার মাথায় বুদ্ধির ছিটাফোঁটা নাই। দেশ জয় বাংলা হয়ে যাচ্ছে। আমরা তখন আর সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন থাকব না। আমাদের অবস্থা হবে— 'নিজের দেশের মাটি দবদবাইয়া হাঁটি' টাইপ। তুই এখন কেন চলে যাচ্ছিস ? ইন্ডিয়া গিয়ে তুই করবি কী ? তোর পাকা... ছিঁড়বি ?

শাহেদ বলল, প্রথম সুসংবাদটা তো শুনলাম। দ্বিতীয়টা কী ?

গৌরাঙ্গ বলল, দ্বিতীয়টা ফালতু।

ফালতুটাই শুনি।

নীলু রেডিও অডিশনে পাস করেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত। সি গ্রেড পেয়েছে।

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, ভাবি গান জানেন— তা তো জানতাম না!

গৌরাঙ্গ বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, রবীন্দ্রসঙ্গীত আবার গাইতে জানতে হয় না-কি ? রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হলে হাঁপানি থাকতে হয়, আর না-কি সুরে গলা টানতে হয়। তোর বৌদির হাঁপানি আছে। আর নাকেও সে কথা বলতে পারে।

শাহেদ বলল, ভাবির গান শুনব না ?

গানের নামও মুখে আনবি না। তোর বৌদির হাঁপানির টান আমার অসহ্য। আমার সিক্সথ সেন্স কেমন প্রবল হয়েছে সেটা বল। কী সুন্দর এডভান্স বলে দিলাম— তুই পাখি নিয়ে আসবি। পয়েন্টে পয়েন্টে মিলেছে কি-না বল।

মিলেছে।

আমি এডভান্স অনেক কিছু বলতে পারি। ঐ চামচিকা ইন্ডিয়াতে পৌঁছেই খাবি খেয়ে মারা যাবে, এটাও তোকে এডভান্স বলে দিচ্ছি। মিলিয়ে নিস।

গৌরাঙ্গ গ্লাসে লম্বা করে চুমুক দিয়ে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।

শাহেদ রাতের খাওয়া খেল একা। নীলিমা বলল, আপনাকে একা খেতে হচ্ছে আমি খুবই লজ্জা পাচ্ছি। রুনুও বাসায় নেই। ও থাকলে আপনার সঙ্গে বসত।

রুনু কোথায়?

সে উপরেরতলায় ওর দিদিমা'র কাছে। তার শরীরটা ভালো না। জ্বর এসেছে। আমি আপনার পাখির খাঁচা তাকে দিয়ে এসেছি। খুব খুশি। ও আচ্ছা ভাই, আপনাকে একটা কথা বলা দরকার— আপনি আজ পাখি নিয়ে আসবেন এরকম কোনো কথা রুনুর বাবা বলে নি। মদ বেশি খেয়ে ফেলেছে বলে যা মনে আসছে বলছে। ভাই, আপনাকে একটা অনুরোধ করব, আপনি কি রাখবেন?

শাহেদ বলল, অবশ্যই রাখব।

আপনার বন্ধু আপনাকে এতই পছন্দ করে যে সে আপনার কোনো কথা ফেলবে না। আপনি কি তাকে একটু বলবেন মদটা ছেড়ে দিতে? আমি নিশ্চিত আপনি একবার বললে সে আর এই জিনিস খাবে না।

ভাবি, আমি বলব।

রাত দু'টায় হৈচৈ-এর শব্দে শাহেদের ঘুম ভাঙল। হৈচৈ-এর কারণ গৌরাঙ্গের ঘুম ভেঙেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে স্ত্রীর হাত ধরে শাহেদের ঘরে ঢুকল। গম্ভীর গলায় বলল, তুই গান শুনতে চেয়েছিলি, ওকে নিয়ে এসেছি।

শাহেদ বলল, বেচারি সারাদিন খাটাখাটনি করেছে। এখন রাত দু'টা। আরেকদিন এসে গান শুনব।

গৌরাঙ্গ বলল, আরেকদিন কী? আজই গান হবে। আমি তবলা হারমোনিয়াম নিয়ে আসছি।

শাহেদ বলল, তবলা কে বাজাবে?

গৌরাঙ্গ বলল, আমি বাজাব। আর কে বাজাবে?

নীলিমা গান করছে। শাহেদ অবাক হয়ে কিন্নর কণ্ঠ শুনল। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে কেউ অতি সুরেলা গলায় গান করছে—

ওপারে মুখর হলো কেকা ঐ
এপারে নীরব কেন কুহু হায়

পুলিশ ইন্সপেক্টর মোবারক হোসেন গত দু'বছরে সকাল হওয়া দেখেন নি। তিনি ঘুমুতে যান রাত দেড়টার দিকে। তাঁর ঘুমের সমস্যা আছে। শোয়ামাত্র ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করতে করতে কোনোদিন রাত তিনটাও বেজে যায়। যে রাত তিনটায় ঘুমুতে যায়, সে সুবেহ্সাদেক দেখবে এরকম আশা করা অন্যায়। তবে আজ তিনি বাড়ির ছাদে উঠে সকাল হওয়া দেখলেন। সোবহানবাগে তাঁর একতলা পাকাবাড়ির ছাদটা সুন্দর। ছাদে উঠলে মনে হয় গ্রামে চলে এসেছেন। চারদিকে প্রচুর গাছপালা থাকায় উপর থেকে কেমন জঙ্গল জঙ্গল লাগে। গাছপালার মাথায় রাত কেটে সকাল হওয়ার দৃশ্য অপূর্ব, যে-কেউ মোহিত হবে। মোবারক সাহেব এই দৃশ্য দেখলেন, মোহিত হলেন, এরকম বলা যায় না। কোনো কিছু দেখে মোহিত হওয়া তাঁর চরিত্রের মধ্যে নেই। তাঁর মন অসম্ভব খারাপ। শরীরও খারাপ, প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। এই অবস্থায় প্রকৃতির শোভায় মন বসে না।

তার স্ত্রীর সন্ধ্যা থেকে প্রসবব্যথা শুরু হয়েছে। পানি ভেঙেছে রাত একটার দিকে। তখন থেকেই খিঁচুনির মতো হচ্ছে। লক্ষণ ভালো না, তবে মোবারক হোসেন তার জন্য খুব চিন্তিতও বোধ করছেন না। মেয়েছেলের প্রাণ, কই মাছের প্রাণের চেয়েও শক্ত। যাই যাই করবে কিন্তু যাবে না। ঘরে অভিজ্ঞ ধাই আছে। এর হাতেই তার আগের তিনটি সন্তান হয়েছে। তিনটাই মেয়ে। খুবই আফসোসের ব্যাপার। এবারেরটা ছেলে হবার সম্ভাবনা আছে। আজমির শরিফের সুতা এনে পরানো হয়েছে। শাহজালাল সাহেবের দরগায়ে তিনি নিজে গিয়ে সিন্নি চড়িয়ে এসেছেন। সময়ের অভাবে শাহ পরাণের মাজারে যেতে পারেন নি। এটা একটা ভুল হয়েছে। শাহ পরাণ শাহ জালাল সাহেবের ভাগ্নে। মামা-ভাগ্নে দু'জনের কবর জিয়ারত না করলে মনের বাসনা পূর্ণ হয় না— এরকম কথা প্রচলিত আছে।

এবার যে তাঁর স্ত্রীর প্রসবব্যথা জটিল আকার ধারণ করেছে— এটা একটা শুভ লক্ষণ। পুত্রসন্তান প্রসবে যন্ত্রণা বেশি হয়। জমিলার ব্যথার নমুনা দেখে

আশা করা যাচ্ছে শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। তবে মানুষ সব সময় যা আশা করে তা হয় না, এটাই চিন্তার কথা।

তার এখন খারাপ সময় যাচ্ছে। ছিলেন আইবিতে, সাদা পোশাক থেকে হঠাৎ বদলি করে দিল ইউনিফর্মে। তাঁর খুশি হওয়ারই কথা। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা পুলিশ ইন্সপেক্টর হলো ডাল বরাবর। তাদের দেখায় প্রাইভেট কলেজের বাংলার প্রফেসরের মতো। বাজারে গেলে মাছওয়ালাও ফিরে তাকায় না। পুলিশের চাকরির আসল মজা ইউনিফর্মে। দেখামাত্র সবাই সমীহ করে তাকাবে। কিন্তু এমনই তাঁর কপাল, খাকি পোশাকটা পরার পর থেকেই শুরু হলো যন্ত্রণা। পোশাকটা পরার পর থেকে বলতে গেলে রোজই হাঙ্গামা হুজ্জত হচ্ছে। বাঙালি অদ্ভুত এক জাতি। যাদের বিশ্বাস করে তাদের সব কথা বিশ্বাস করে। তারা যদি বলে— চিলে কান নিয়ে গেছে— কান নিয়েছে কি নেয় নি যাচাই করে না। গালের পাশে হাত দিলেই বুঝবে কান এখনো আছে। জুলপির পাশে ঝুলছে। তারপরেও লাঠিসোটা নিয়ে দলবেঁধে ছুটতে থাকে চিলের পিছনে। আবার যাদের অবিশ্বাস করে তাদের কোনো সত্য কথাও বিশ্বাস করে না। তথ্যমন্ত্রী সাহাবুদ্দিন সাহেব বললেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইসলাম এবং পাকিস্তানের ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারিত হবে না। এতেই লেগে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। ধরোরে, মারোরে, জ্বালাওরে, পোড়াওরে। একটা লোক একটা কথা বলেছে তাতেই এই ? রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন কী রসগোল্লা ? প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কী ? তথ্যমন্ত্রী তো ভুলও বলেন নি। ইসলামি কোনো গান কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ? তাঁর কোনো গানে কি মা আমিনার কথা আছে ? নজরুল তো অনেক হিন্দু-গান লিখলেন। শ্যামাসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ দু'একটা ইসলামি গান তো লিখতেও পারতেন। যে গান লিখতে পারে, সে হিন্দু গান মুসলমান গান সবই লিখতে পারে। লিখলেন না কেন ? দাড়ি রাখার সময় তো এক হাত লম্বা দাড়ি রেখে ফেললেন। কুর্তা যেটা পরেন সেটাও তো ইসলামি কুর্তা। তিনি যদি দু'একটা ইসলামি গান লিখতেন, তাহলে এই সমস্যা হতো না।

মিটিং মিছিল, লাঠি চার্জ, কাঁদানি গ্যাস। সামান্য গানের জন্যে কী অবস্থা!

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হামিদুর রহমান সাহেব একটা কথার কথা বলেছেন। সেটা নিয়েও কত কাণ্ড! সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তো আর ঘাস খেয়ে হয় না। এরা যখন কথা বলে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বলে। ভদ্রলোক আরবি হরফে বাংলা লেখার কথা বলেছেন। কথা যে খুব খারাপ বলেছেন তাও

তো না। গ্রামের অনেক মানুষ আছে, যারা বাংলা জানে না। কিন্তু কোরান শরীফ পড়তে পারে। তারা তখন বাংলাও পড়তে পারবে। এটা খারাপ কী? আরবি হরফে বাংলা লিখলে বাংলার ইজ্জত কমে না। ইজ্জত বাড়ে। নবিজীর ভাষায় বাংলা লেখা হচ্ছে এটা কি কম কথা? কত বড় ইজ্জত! আচ্ছা তারপরেও তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এটা খারাপ। যদি খারাপ হয়ও এত হৈচৈ করার কী আছে? অদ্ভুত একটা জাতি। শান্তি চায় না, চায় অশান্তি। অশান্তি ছাড়া তাদের ভালো লাগে না। আয়ুব খানের মতো নেতাকে পছন্দ না। ভোট দিতে হবে থুড়থুড়ি বুড়ি ফাতেমা জিন্নাহকে। মেয়েছেলে হবে দেশের প্রধান। কথা হলো? হাদিস-কোরানে আছে মেয়েছেলেকে রাষ্ট্রপ্রধান করা যাবে না। সেই ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেওয়ার জন্য লাফাচ্ছে মাওলানা ভাসানী। হাদিস-কোরান জানা একজন মানুষ। নামের আগে মাওলানা। তাকে ভোট দিলে তোমার লাভটা কী? দেশে অশান্তি হয় এটাই লাভ। কী আশ্চর্য দেশ! কী আশ্চর্য দেশের নেতা!

নতুন একটা জিনিস শুরু হয়েছে— দফা। আজ ছয় দফা। কাল এগারো দফা। তারপরের দিন চৌদ্দ দফা। দফাই যে দেশের দফা রফা করবে এই সাধারণ জ্ঞানটা যে জাতির নাই, সে জাতির ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার।

মোবারক হোসেনের ধারণা আগরতলা মামলাটা প্রত্যাহার করা আয়ুব খানের জন্য খুব বড় বোকামি হয়েছে। আয়ুব খান বোকা না, সে এত বড় বোকামি করল কেন? এই কাজটায় তার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালি জাতি দুর্বলতার গন্ধ পেলে লাফিয়ে ওঠে। এখন শুরু করেছে লাফ-ঝাঁপ। শেখ মুজিবুর রহমান হিরো বনে গেছেন। আয়ুব খানের উচিত ছিল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া। দশ-বারোটাকে ফাঁসিতে ঝোলালে সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত। বাঙালি গরমের ভক্ত নরমের যম। একটু নরম দেখলে আর উপায় নেই— ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। তারা যত ঝাঁপ দেবে পুলিশ তত বিপদে পড়বে। বাঙালি জাতির যত রাগ খাকি পোশাকের দিকে। পুলিশের দিকে ঢিল মারতে পারলে তারা আর কিছু চায় না। আসাদুজ্জামানের মৃত্যুর পর পর কী অবস্থা! মানুষ দেখতে দেখতে ক্ষেপে গেল। তাঁর নিজের জীবন নিয়ে টানাটানি। আরেকটু হলে মারাই পড়তেন। আস্ত একটা ইট এসে পড়ল বাঁ হাতের কনুইতে। মট করে শব্দ। হাত যে ভেঙে গেছে তখনো বোঝেন নি। বোঝার কথা না। মাথা ছিল পুরোপুরি আউলা। ভাঙা হাত জোড়া লাগলেও পুরোপুরি সারে নি। অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় ব্যথা হয়। হাতে জোর বলতে কিছু নেই। পানিভর্তি গ্লাস পর্যন্ত এই হাতে তুলতে পারেন না।

মোবারক হোসেন বিষণ্ন মুখে ছাদ থেকে নেমে এলেন।

বাড়ির ভেতর থেকে তখনো কোনো খবর আসে নি। লেডি ডাক্তারের খোঁজে একজন গিয়েছে। পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা এসেছেন। ভদ্রমহিলা খুব পর্দা মানেন। আজ দেখা গেল পর্দার বরখেলাপ করেই মোবারক হোসেনের সঙ্গে কথা বললেন। কথার বিষয়বস্তু হচ্ছে; রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।

মোবারক হোসেন বললেন, আচ্ছা, দেখি। তার মেজাজ আরো খারাপ হলো। রোগী আবার কী! গর্ভবতী মহিলা সন্তান প্রসব করছে। সাধারণ একটা ব্যাপার। হাসপাতাল-ফাসপাতাল আবার কী!

সকাল আটটার দিকে জমিলার অবস্থা আরো খারাপ হলো। খিঁচুনি বেড়ে গেল। তিনি ক্লান্ত গলায় তাঁর মাকে ডাকতে লাগলেন। সেই মা অনেককাল আগে মারা গেছেন। কন্যার অসহনীয় কষ্টের সময় তিনি পাশে থাকতে পারবেন না। তাঁর কন্যা বারবার ডাকতে লাগল, মাইজি ও মাইজি।

দুপুর একটায় জমিলা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে মারা গেলেন।

মোবারক হোসেন স্ত্রীর মৃত্যুতে দুঃখিত হলেন ঠিকই, সেই দুঃখের মধ্যেও কিছু আনন্দ লেগে থাকল। পরপর তিনটি কন্যাসন্তানের পর তাঁর এবার পুত্র হয়েছে। গায়ের রঙ সুন্দর, ধবধবে সাদা। নাক খাড়া, মেয়েগুলোর নাকের মতো উপজাতীয় টাইপ থ্যাবড়া নাক না।

তিনি ছেলের নাম রাখলেন, ইয়াহিয়া।

একজন নবির নামে নাম, তবে এই নামকরণের শানে-নুযুল অন্য।

তাঁর ছেলের জন্ম ১৯৬৯ সনের ২৫ মার্চ। ঐ দিন জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় যান এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অবস্থা ঠাণ্ডা। জ্বালাও-পোড়াও, মারামারি, কাটাকাটি বন্ধ। 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো' বন্ধ। শহরে মিলিটারি নেমে গেল। ভীতু বাঙালি বলতে গেলে ভয়ে গর্তে ঢুকে গেল। পুলিশরা ইজ্জত ফিরে পেল। এখন আর খাকি পোশাক দেখলে কেউ বলে না— ঠোলা।

মোবারক হোসেন ইয়াহিয়া নামক যে জেনারেলের কারণে এই ঘটনা ঘটল, তাকে সম্মান করেই ছেলের নাম ইয়াহিয়া রাখলেন। ছেলের জন্যে আকিকা করলেন শাহজালাল সাহেবের দরগায়।

আয়ুব খানের লেখা যে-চিঠিতে এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল, মোবারক হোসেন সেই চিঠি যত্ন করে পত্রিকা থেকে কেটে রেখে দিলেন।

আয়ুব খান সাহেব জেনারেল ইয়াহিয়াকে লিখলেন—

প্রেসিডেন্ট হাউজ
২৪ মার্চ ১৯৬৯

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

অতীব দুঃখের সহিত আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে যে, দেশের সমুদয় বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান উদ্বেগজনক অবস্থার যদি অবনতি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এমতাবস্থায় ক্ষমতার আসন থেকে নামিয়া যাওয়া ছাড়া আমি কোনো গত্যন্তর দেখিতেছি না। তাই আমি পাকিস্তান দেশরক্ষা বাহিনীর হস্তে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া যাওয়ার সাব্যস্ত করিয়াছি, কেননা সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার একমাত্র কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র।

আয়ুব খান

পুত্র ইয়াহিয়া আশীর্বাদ হিসেবে জন্ম নিয়েছে— এই বিশ্বাস মোবারক হোসেনের মনে শিকড় গেড়ে বসে গেল। ভালো যা হয় তাই তিনি পুত্রের জন্মের কারণে হচ্ছে বলে ধরে নেন। এই সময় তিনি তাঁর মৃতা মা'কেও স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে তিনি শিশু ইয়াহিয়াকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। হঠাৎ সেখানে মোবারক হোসেনকে দেখে কিছু রাগ কিছু বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, ও মনু (মোবারক হোসেনকে তিনি মনু ডাকতেন), তোর বিপদআপদের দিন শেষ। এই ছেলে তোর জন্য কবজ হিসাবে দুনিয়াতে আসছে। এরে ভালো মতো দেখভাল করবি। বৎসরে একবার এরে আজমিরে নিয়া যাবি। আর মাঝেমধ্যে হরিণের মাংস দিয়া ভাত খাওয়াবি।

পুত্রের দেখভালের জন্যে তিনি পরের বৎসর সাফিয়া নামের এক মধ্যবয়স্ক মহিলাকে বিয়ে করেন। এই বিয়ে তাঁর জীবনে আশীর্বাদের মতোই হয়েছিল।

সাফিয়া মোটাসোটা ধরনের মহিলা। তার প্রধান যে তিনটি গুণ মোবারক হোসেনের চোখে পড়ল তা হলো— এই মহিলার রাঁধার হাত খুব ভালো। সে যা-ই রাঁধে অমৃতের মতো লাগে।

মহিলা তার স্বামীকে যমের মতো ভয় পায়। (মোবারক হোসেনের মতে, এই গুণটি স্ত্রীদের মহত্তম গুণের একটি। যে পরিবারে স্ত্রী স্বামীকে ভয় পায় না, মান্য করে না, সেই পরিবারে কখনো সুখ আসে না।)

সাফিয়ার তৃতীয় গুণটি কোনো গুণের মধ্যে পড়ে না। বেকুবির মধ্যে পড়ে। অতি বোকা মহিলাদের মধ্যে এই গুণটি দেখা যায়। তারা স্বামীর সংসারের সবকিছুকেই নিজের মনে করে। স্বামীর আগের পক্ষের সন্তানকে তারই সন্তান বলে ভাবতে থাকে। সাফিয়ার ক্ষেত্রেও এই জিনিস ঘটল। মোবারক হোসেনের তিন মেয়ে অতি দ্রুত হয়ে গেল তার তিন মেয়ে। ছেলেটিকেও যেন সে-ই কিছুদিন আগে প্রসব করেছে।

মোবারক হোসেন একদিন দুপুরে হঠাৎ কী জন্যে যেন বাসায় এসেছেন। তিনি শোবার ঘরে ঢুকে দেখেন, মেঝেতে পাটি বিছিয়ে সাফিয়া পান খাচ্ছে। তার তিন মেয়ের একজন সাফিয়ার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। একজন গায়ে হেলান দিয়ে আছে। আর তৃতীয়জন হাত-পা নেড়ে গল্প করছে। তিন মেয়ের মুখেই পান।

বাবাকে দেখে তিন মেয়ে অতি দ্রুত পালিয়ে গেল। সাফিয়া হঠাৎ এমন ভয় পেলেন যে মুখ থেকে পানের রস বের হয়ে শাড়িতে পড়ে গেল। মোবারক হোসেন অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। মা'র চেয়ে যে মাসির দরদ বেশি, সেই মাসি হলো ডান। মা'র চেয়ে যদি সৎমায়ের দরদ বেশি হয়, তাহলে সেই সৎমা ডানের চেয়েও খারাপ। মেয়েদের নিয়ে পান খাওয়া-খাওয়ি আবার কী ? পান-বিড়ি-সিগারেট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাওয়া যায় না।

মোবারক হোসেন ভয়ে অস্থির হয়ে যাওয়া স্ত্রীকে শুধু বললেন, আড্ডা গুলবাজি কম করবা। এইসব আমার পছন্দ না। সাফিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। আবার তার মুখে থেকে পানের রস গড়িয়ে পড়ল।

তার ছেলে যে সৌভাগ্যের কবচ হয়ে এসেছে— এই বিষয়ে মোবারক হোসেন নিশ্চিত হলেন ১৯৭০ সনের ১ জানুয়ারিতে। এই দিনই ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করার অনুমতি দিলেন। মোবারক হোসেন খান ঐ দিনই বদলি হলেন খাকি পোশাক থেকে ডিএসবি-তে। খাকি পোশাক বাতিল। এখন সাদা পোশাকের চাকরি, তাও আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। দেশে অরাজকতা চলছে, এই সময়ে খাকি পোশাক বিপদজনক পোশাক। দেশের লোকজন ধরেই নিয়েছে, খাকি পোশাক মানেই খারাপ জিনিস। খাকি পোশাক মানেই শত্রু।

গোয়েন্দা বিভাগে যোগ দেয়ার দু'মাসের মাথায় মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখ যেদিন তাঁর ছেলের বয়স এক বছর, তাঁর ডাক পড়ল সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। কর্নেল শাহরুখ খান তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। কথা বলবেন সন্ধ্যা সাতটায়, মোহাম্মদপুরের শেরশাহ্ সুরি রোডের এক বাসায়।

সেদিন বিকাল পাঁচটায় ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি বাড়িতে মিলাদের আয়োজন করেছেন। আত্মীয়স্বজনদের খবর দিয়েছেন। কাচ্চি বিরিয়ানি রাঁধার জন্যে পুরনো ঢাকা থেকে বাবুর্চি সাল্লু মাতবরকে আনা হয়েছে। মোবারক হোসেন সামান্য দুশ্চিন্তায় পড়লেন। মিটিং কতক্ষণ চলবে কে জানে! ছেলের প্রথম জন্মদিনে মিলাদ হবে আর তিনি থাকতে পারবেন না— এটা অবশ্যই একটা আফসোসের ব্যাপার। তবে তাঁর ধারণা এই মিটিংয়ে তার জন্যে শুভ কিছু আছে। তা না থাকলে বেছে বেছে ছেলের জন্মদিনেই এই মিটিং পড়বে কেন?

কর্নেল শাহরুখের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি সন্ধ্যা ছ'টার সময়ই উপস্থিত হলেন। যে বাড়িতে মিটিং হচ্ছে সেটা কোনো অফিস না। একজনের বাড়ি। ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। তাদের হৈচৈ কান্নাকাটি সারাক্ষণ হচ্ছে। সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের একজন বড় কর্তা তাকে এ ধরনের একটা বাড়িতে ডেকেছেন তা ভাবাই যায় না। মোবারক হোসেনকে বসার ঘরে এক ঘন্টা বসে থাকতে হলো। বসার ঘর দেখে মনে হয় না এখানে কেউ বসে। এক দিকে গাবদা গাবদা কিছু সোফা। অন্য দিকে তিন-চারটা বেতের চেয়ার। সোফার কভার নেই। একটা সোফার গদি ছিঁড়ে ভেতরের কাঠ বের হয়ে গেছে। ঘরের সাজসজ্জা বলতে দেয়ালে কাবা শরীফের ছবি। ছবিটা ঝকঝকে। ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় তাঁর ডাক পড়ল।

কর্নেল সাহেবকে দেখে মোবারক হোসেন ধাক্কার মতো খেলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, একুশ-বাইশ বছরের একজন রূপবান যুবক, চুপ করে বসে আছে। প্রেমঘটিত জটিলতায় সে কিছু সমস্যায় আছে। যার জন্যে তার বয়স সামান্য বেশি লাগছে।

যে ঘরে কর্নেল সাহেব বসে আছেন, সেই ঘরটা বেশ বড়। তবে ঘরে আলো কম। এই কম আলোতেও কর্নেল সাহেবের চোখে কালো চশমা। কালো চশমার কারণে মনে হচ্ছে, কর্নেল সাহেবের চোখ উঠেছে। কর্নেল সাহেব ছাড়াও ঘরে আরেকজন ব্যক্তি উপস্থিত। তিনি সম্ভবত বাঙালি। তবে সাধারণ বাঙালির চেয়ে অনেক লম্বা। তিনি বসেছেন বড় একটা টেবিলের পেছনে। তাঁর সামনে চায়ের কাপ। চায়ের কাপটা এস্ট্রে হিসেবে কাজ করছে। চায়ের কাপের পাশে

ছ'প্যাকেট K-2 সিগারেট। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ বা তারচেয়ে বেশি। চিমশে ধরনের চেহারা। আজ শেভ করেন নি বলে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কোনো কারণ ছাড়াই তিনি মাঝে মাঝে ঠোঁট ফাঁক করছেন। তখন তাঁর দাঁত দেখা যাচ্ছে। অতিরিক্ত সিগারেট খাবার জন্যেই হয়তো তাঁর দাঁতে লাল লাল ছোপ পড়েছে। ভদ্রলোকের সমস্ত মনোযোগ তাঁর সামনে রাখা চায়ের কাপের দিকে। তিনি একবারও মোবারক হোসেনের দিকে তাকান নি। কর্নেল সাহেব তাকিয়েছেন কি-না তাও মোবারক হোসেন ধরতে পারছেন না। কারণ কর্নেল সাহেবের চোখ কালো চশমায় ঢাকা।

ইন্সপেক্টর মোবারক হোসেন, সিট ডাউন প্লিজ।

মোবারক হোসেন কর্নেল সাহেবের সামনে রাখা চেয়ারে বসলেন। তাঁর নিজের উপর খুবই রাগ লাগছে, কারণ ঘরে ঢুকে তিনি সালাম দিতে ভুলে গেছেন। এখন সালাম দেয়াটা কি ঠিক হবে?

হাউ আর ইউ ইন্সপেক্টর?

মোবারক হোসেন বললেন, স্যার, আমি ভালো আছি। বলেই মনে হলো এটা কী করলাম! বাংলা তো উনি বুঝবেন না। আর এমন তো না যে ইংরেজি ভাষাটা তাঁর জানা নেই। তিনি অনায়াসে বলতে পারতেন— স্যার, আই এম ফাইন।

কর্নেল সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আচমকা মোবারক হোসেনকে চমকে দিয়ে সুন্দর বাংলায় স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন— ইন্সপেক্টর, তুমি কি কোনো কারণে ভীত?

মোবারক হোসেন বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন, জি-না স্যার।

সরাসরি কাজের কথায় চলে যাই— তুমি কি শেখ মুজিবর রহমানকে কাছ থেকে দেখেছ?

জি-না স্যার।

কখনো তাকে দেখতে যাও নি? তাঁকে সালাম করবার জন্যে যাও নি?

জি-না স্যার।

শত শত মানুষ রোজ তাকে দেখতে যায়। তাঁর দোতলা বাড়ির ব্যালকনির নিচে দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর কথা শোনার জন্যে। তাকে এক নজর দেখার জন্যে। তুমি যাও নি কেন?

মোবারক হোসেন শান্ত গলায় বললেন, স্যার, আমার শেখ সাহেবের বাড়িতে কোনো দিন ডিউটি পড়ে নাই।

ডিউটি পড়লে যাবে ?

অবশ্যই স্যার।

কর্নেল সাহেব এবার মোবারক হোসেনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, তোমার কি ধারণা শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চায় না-কি অখণ্ড পাকিস্তানের কর্তৃত্ব চায় ?

স্যার, আমি জানি না। এইগুলি অনেক বড় ব্যাপার। আমি সামান্য পুলিশ ইন্সপেক্টর। সরকারের নুন খাই।

সরকার যদি শেখ মুজিবের হাতে চলে যায়, তাহলে তো তুমি শেখ মুজিবের নুন খাবে ?

জি স্যার।

কর্নেল সাহেব তাঁর শার্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। সাধারণত সিগারেট প্যাকেটে থাকে— ইনার সিগারেট প্যাকেট ছাড়া অবস্থায় পকেটে আছে। ব্যাপারটা মজার তো! কর্নেল সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তোমার দেশের কোন জিনিসটা সবচে' ভালো ?

মোবারক হোসেন বললেন, স্যার, আপনি তোমার দেশ বলছেন কেন ? দেশটা তো আপনারও।

কর্নেল সাহেবের ঠোঁটে সামান্য হাসি দেখা গেল। তিনি সেই হাসি তৎক্ষণাৎ মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় বললেন— তোমাকে খুশি করার জন্যে বলেছি। এই দেশ যে আমার সেটা আমি জানি। যাই হোক, প্রশ্নের জবাব দাও— তোমার দেশের কোন জিনিসটা তোমার সবচে' ভালো লাগে ?

মোবারক হোসেন শান্ত গলায় বললেন, মুক্তাগাছার মণ্ডা।

জিনিসটা কী ?

এক ধরনের মিষ্টান্ন। ছানা দিয়ে তৈরি হয়। ভাপে পাকানো হয়।

এত জিনিস থাকতে তোমার কাছে তোমার দেশের সবচে' পছন্দের জিনিস মুক্তাগাছার মণ্ডা!

জি স্যার।

ভালো কথা, এখন বলো— তোমার কি মনে হয় এই দেশটা আলাদা হয়ে যাবে ? দুই দেশের পতাকা হবে দুই রকম ?

স্যার পাকিস্তান ভাঙবে না।

কোন যুক্তিতে বলছ ভাঙবে না ?

কোনো যুক্তি না। আমার মন বলছে ভাঙবে না।

কর্নেল সাহেব পকেট থেকে আরেকটি সিগারেট বের করে ঠোঁটে দিতে দিতে বললেন, আমারও তাই ধারণা। যার রাজনৈতিক গুরু সোহ্‌রাওয়ার্দী তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চাইবেন না। তিনি চাইবেন অখণ্ড পাকিস্তানের ক্ষমতায় যেতে। তবে জেনারেল ইয়াহিয়াকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। যদিও জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সব কথাই মেনে নিচ্ছেন। নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাসের পর মাওলানা ভাসানী চাইলেন ইলেকশন পিছিয়ে দিতে। মানুষের এত দুর্ভোগ, এর মধ্যে ইলেকশন কী! কিন্তু শেখ মুজিব ইলেকশন পিছিয়ে দিতে রাজি হলেন না। জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে খুশি করার জন্যে ইলেকশন পিছালেন না। আমার ধারণা ইয়াহিয়া শুধু একটা জিনিসই চাচ্ছেন— যা হবার হোক, যার ইচ্ছা ক্ষমতায় যাক, শুধু পাকিস্তান টিকে থাকুক। ইন্সপেক্টর মোবারক!

জি স্যার

তোমার মনের ইচ্ছাটাও তো সে-রকম। তাই না?

জি স্যার।

তোমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি, এখন থেকে তোমার ডিউটি শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের ধানমণ্ডির বাড়িতে। তুমি সেই বাড়িতে ঢুকবে। নিজের একটা জায়গা করে নিবে। কীভাবে করবে সেটা তোমার ব্যাপার।

স্যার, আমার কাজটা কী?

ঐ বাড়িতে অবস্থান নেওয়াটাই তোমার কাজ। আর কিছু না।

আর কিছুই না?

না আর কিছু না। প্রতি সপ্তাতে একবার বুধবার সন্ধ্যায়— জোহর সাহেবের সঙ্গে এই বাড়িতে দেখা করবে। তার সঙ্গে গল্পগুজব করবে। জোহর কে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। ঐ যে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে।

মোবারক হোসেন জোহর সাহেবের দিকে তাকাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে সালাম দিল। জোহর তার জবাব দিলেন না। আগের মতোই চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল সাহেব বললেন, জোহর পূর্ণিয়া জেলার লোক। আমার অতি ঘনিষ্ঠ একজন। সে একজন কবি। তার শায়ের শুনলে মুগ্ধ হবে। তার পছন্দের কবির নাম শুনলেও তুমি চমকে উঠবে। তার পছন্দের কবির নাম টেগোর। তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।

মোবারক হোসেন চমকালেন না। তবে বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেন। কর্নেল সাহেব বললেন, জোহর একজন চেইন স্মোকার। এখন ইন্সপেক্টর মোবারক বলো তো দেখি— তুমি এই ঘরে ঢোকার পর থেকে জোহর কয়টা সিগারেট খেয়েছে ?

নয়টা।

ভালো। তোমার অবজারবেশন ভালো। তুমি যেতে পার।

স্যার চলে যাব ?

হ্যাঁ চলে যাবে।

স্লামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম। ইন্সপেক্টর শোন, তোমার ছেলের জন্মদিন উৎসব থেকে তোমাকে বঞ্চিত করেছি— এতে তুমি কিছু মনে করবে না। দেশের কল্যাণের জন্যে ছোটখাটো স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়।

মোবারক হোসেন চমকালেন না। এরা তার ছেলের জন্মদিন জানে— এতে বিস্মিত হবার কিছু নাই। গোয়েন্দা বিভাগ তার সম্পর্কে কিছু না জেনেশুনে তাকে ডাকবে না। তার ছেলের নাম যে ইয়াহিয়া— এটাও তারা অবশ্যই জানে।

ইন্সপেক্টর!

ইয়েস স্যার।

তুমি কিছু বলবে ?

জি-না স্যার।

তোমাকে সামান্য টিপস দিয়ে দেই। শেখ মুজিবের আস্থাভাজন হওয়া খুবই সহজ কাজ। এই মুহূর্তে প্রতিটি বাঙালির প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি সমস্ত বাঙালিকে বিশ্বাস করেন আর আমরা প্রতিটি বাঙালিকে অবিশ্বাস করি। তিনিও ভুল করছেন। আমরাও ভুল করছি। ভুলের মাশুল তিনি যেমন দেবেন। আমরাও দেব। কে কতটুকু দেবে কে জানে! ঠিক আছে, তুমি যাও। Happy birthday to your son.

ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর বাড়িটাকে কি বাড়ি বলা যাবে ? বাড়ি মানেই অলস দুপুর। বাড়ি মানেই ভাদ্র মাসের গরমে আচমকা উড়ে আসা হিমেল হাওয়া। বাড়ি মানে বারান্দার রেলিং-এ শুকাতে দেয়া রঙিন শাড়ি।

এখানে সেরকম কিছু নেই— বাজারের মতো ভিড়। এই একদল আসছে। এই যাচ্ছে। যারা আসছে প্রথম কিছুক্ষণ খুবই উত্তেজিত অবস্থায় থাকছে।

কয়েকবার স্লোগান দেয়ার পর তাদের উত্তেজনা ঝপ করে অনেকখানি কমে যাচ্ছে। তখন তাদের খানিকটা দিশাহারাও মনে হচ্ছে। স্লোগান পর্ব শেষ। এখন কী করা উচিত তা বুঝতে না পেরে দিশাহারা। দল নিয়ে এসে হুট করে চলে যাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ থাকতে হয়। দল পরিচালনা করে যারা এসেছেন, শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে তাদের মান থাকে না।

গ্রহকে ঘিরে উপগ্রহ ঘুরপাক খায়। শেখ সাহেব বিশাল গ্রহ। তাকে ঘিরে ঘুরপাক খাওয়া উপগ্রহের সংখ্যাও সেই কারণে অনেক। তাদের ডিঙিয়ে শেখ সাহেবের দেখা পাওয়া মুশকিল। তবু চেষ্টা চালাতে হয়।

মোবারক হোসেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থাকেন। কাণ্ডকারখানা দেখেন। তাঁর ভালোই লাগে। দুপুরে কখনো কখনো বড় বড় হাঁড়ি ভর্তি খাবার আসে। কোনোদিন তেহারি, কোনোদিন খিচুড়ি মাংস। তখন চারদিকে আলাদা উত্তেজনা তৈরি হয়। এই উত্তেজনা দেখতেও খারাপ লাগে না। সবচে' ভালো লাগে পাতি নেতাদের জ্ঞানী জ্ঞানী আলোচনা। পাতি নেতাদের সঙ্গেও পাতি উপগ্রহ থাকে। পাতি নেতাদের আলোচনা চলে পাতি উপগ্রহদের সঙ্গে।

মাওলানা কী চাচ্ছে বুঝলাম না। তার দলের স্লোগান 'ভোটের আগে ভাত চাই'। ভাতের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যেই তো ভোট দরকার। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক না যে, ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর একটা অশুভ আঁতাত হয়েছে। এদিকে আবার কমুনিস্ট পার্টির হাবভাব ভালো লাগছে না। কম্যুনিস্টরা কী করবে না করবে সেটা বোঝা অবশ্যি খুবই মুশকিল। বিষয়টা নিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে বসতে হবে।

যিনি বিষয়টা নিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে বসতে চাচ্ছেন— তাঁর ভঙ্গি এরকম যেন তিনি শেখ সাহেবের প্রধান উপদেষ্টাদের অন্যতম। এই শ্রেণীর নেতারা দলীয় কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যে কিছুক্ষণ পর পর স্লোগানের আয়োজন করে। সবার চেষ্টা থাকে যেন তাদের স্লোগানটা অন্যদের চেয়ে আলাদা হয়।

'ইয়াহিয়ার বুকে লাথি মারো
সোনার বাংলা স্বাধীন করো।'

'একটা দু'টা মিলিটারি ধরো
সকাল বিকাল নাশতা করো।'

ছাত্রনেতাদের ভাবভঙ্গি সবার চেয়ে আলাদা। যেন বিরাট আন্দোলন তারাই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শেখ মুজিবর রহমান সঙ্গে আছেন ভালো কথা। সঙ্গে না থাকলেও খুব অসুবিধা হবে না, আমরা চালিয়ে নিয়ে যাব। দেশ স্বাধীন করা

আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার না। শেখ মুজিবর রহমান এদের প্রশ্রয়ও দিচ্ছেন। প্রশ্রয় না দিয়ে তাঁর হয়তো উপায়ও নেই।

মোবারক হোসেনের এই বাড়িতে তৃতীয় দিনের ঘটনা। সকাল হচ্ছে। শেখ মুজিব ফজরের নামাজ শেষ করে দোতলা থেকে একতলায় নামলেন। সরাসরি এগিয়ে গেলেন মোবারক হোসেনের দিকে। ভরাট গলায় বললেন, তুই কে?

মোবারক হোসেন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

তোকে প্রায়ই দেখি। তুই কে?

স্যার, আমি আইবির লোক।

তোকে কি আমার বাড়িতে ডিউটি দিয়েছে?

জি স্যার।

তোর সঙ্গে পিস্তল আছে?

আছে।

তোর ডিউটি কী?

কে আসে কে যায় এইটা খেয়াল করা।

শেখ সাহেব হেসে ফেলে বললেন, তুই তো তোর গোপন কথা সবই বলে ফেললি। তুই আইবির লোক, তুই তোর পরিচয় গোপন রাখবি না?

আমি সরকারের হুকুমে আসলেও আমি ডিউটি করি আপনার। আমি খেয়াল রাখি যেন কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

আমার ডিউটি করিস কী জন্যে?

কারণ আপনিই সরকার।

শেখ মুজিব এই কথায় খুবই তৃপ্তি পেলেন। মোবারক হোসেনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুই আমার জন্যে কী করতে পারবি?

আপনি যা করতে বলবেন, করতে পারব। যদি বলেন ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়। আমি পড়ব।

তোর নাম কী?

মোবারক হোসেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর।

দেশের বাড়ি কোথায়?

কিশোরগঞ্জ।

ভালো জায়গায় জন্ম। বীর সখিনার দেশ। ছেলেমেয়ে কী?

তিন মেয়ে এক ছেলে। তিন মেয়ের নাম— মরিয়ম, মাসুমা, মাফরুহা আর ছেলের নাম ইয়াহিয়া।

কী বলিস তুই, ছেলের নাম ইয়াহিয়া?

আমার দাদিজান রেখেছেন। নবির নামে নাম।

আয় আমার সঙ্গে।

স্যার, কোথায় যাব?

তোকে নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠব। তারপর তোকে হুকুম দিব ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে। দেখি হুকুম তালিম করতে পারিস কি-না।

মোবারক হোসেন শান্ত গলায় বললেন, স্যার চলেন।

শেখ মুজিব মোবারক হোসেনকে নিয়ে দোতলায় এলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এই আমাদের দু'জনকে নাশতা দাও। এ হলো আমার এক ছেলে।

শেখ মুজিবের চোখে-মুখে তৃপ্তি ও আনন্দ ঝলমল করতে লাগল।

ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীর মনটা আজ খারাপ। তিনি নীলগঞ্জ হাইস্কুলের বারান্দায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে এখন টিচার্স কমনরুমে বসে আছেন। তাঁর হাতে দুদিন আগের বাসি খবরের কাগজ। দুদিন আগে ঢাকা শহরে কী ঘটেছে কাগজে মোটামুটি তাই লেখা। নীলগঞ্জ ঢাকা থেকে দুদিন পিছিয়ে আছে। ইরতাজউদ্দিন খবরের কাগজটা পড়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর মন বসছে না। মেজাজ বিগড়ে গেলে কোনো কিছুতেই মন বসে না। হেডমাস্টার মনসুর সাহেব আজ সকালে তাকে কিছু কথা বলেছেন, যা শোনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মনসুর সাহেব বয়সে তার ছোট। বয়োকনিষ্ঠ একজন মানুষের কাছ থেকে কঠিন কথা শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়। তবে বয়স কোনো ব্যাপার না। ধানী মরিচ সাইজে ছোট হলেও তার ঝাঁঝ বেশি। সেভাবে চিন্তা করলে হেডমাস্টার সাহেবের কঠিন কথাগুলো হজম করে নেওয়া যায়। ইরতাজউদ্দিন হজম করতে পারছেন না। কারণ হেডমাস্টার সাহেবের কথাগুলো তার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না।

ব্যাপারটা সামান্য। ঢাকা থেকে ফেরার সময় তিনি স্কুলের জন্যে একটা বড় পতাকা কিনে এনেছেন। ১২ টাকা নিয়েছে দাম। দাম বেশি নিলেও জিনিসটা সিল্কের তৈরি, সাইজেও আগেরটার তিনগুণ। সবুজ রঙটা গাঢ়। আগেরটার রঙ জ্বলে গিয়েছিল। পতাকাটা আজ তিনি নিজের হাতে টানিয়েছেন। ঝকঝকে নতুন পতাকা বাতাস পেয়ে ডানা মেলে উড়ছে। দেখলেই মন ভরে যায়। বাঁশটা যদি আরো লম্বা হতো আর পতাকাটা আরো বড় হতো, তাহলে অনেক দূর থেকে চোখে পড়ত। মানুষজন অহঙ্কার নিয়ে বলত, ঐ যে দেখা যায় পতাকা— আমাদের নীলগঞ্জ হাইস্কুলের পতাকা। গ্রামের মানুষ ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে অহঙ্কার করতে ভালোবাসে।

ইরতাজউদ্দিন মুগ্ধ চোখে পতাকার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তার কাছে মনে হলো, নীল আকাশে সবুজ রঙের একটা টিয়া পাখি উড়ছে। গভীর আনন্দে ইরতাজউদ্দিন সাহেবের চোখে যখন প্রায় পানি এসে গেছে— তখন

স্কুলের দপ্তরি মধু এসে বলল, আপনেরে হেডস্যার ডাকে। তিনি আনন্দ নিয়েই হেডমাস্টার সাহেবের ঘরে ঢুকলেন। হেডমাস্টার সাহেব তার খুব পছন্দের মানুষ। ইরতাজউদ্দিন মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, পতপত করে নতুন পতাকা উড়ছে— এই সুন্দর দৃশ্যটা হেডমাস্টার সাহেবকে দেখাবেন।

নীলগঞ্জ হাইস্কুলের হেডমাস্টার মনসুর সাহেব তাকে দেখে শুকনো গলায় বললেন, বসুন মাওলানা সাহেব। বলেই তিনি কী একটা লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার সামনে যে কেউ বসেছে, এটা যেন তার আর মনেই রইল না।

মনসুর সাহেব (এমএ. বিটি. গোল্ড মেডেল) মানুষটা ছোটখাটো। গায়ের রঙ ভয়াবহ ধরনের কালো। ছাত্ররা আড়ালে তাকে ডাকে 'অমাবস্যা স্যার'। স্বভাবে-চরিত্রে অসম্ভব কঠিন। গত ন'বছর ধরে তিনি এই স্কুলের হেডমাস্টার। এ ন'বছরে শুধু একদিনই নাকি তাকে হাসতে দেখা গেছে। ১৯৬৩ সালের মে মাসের ৮ তারিখে। সেদিন মেট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছিল এবং নেপালচন্দ্র হাওলাদার নামের এই স্কুলের একজন ছাত্র ফোর্থ স্ট্যান্ড করেছিল। আবারো কোনো একদিন এই স্কুল থেকে কেউ স্ট্যান্ড করলে মনসুর সাহেব হয়তো হাসবেন। সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। গ্রামের স্কুলে ভালো ছাত্র আসছে না।

ইরতাজউদ্দিন বসেই আছেন। হেডমাস্টার সাহেবের লেখালেখির কাজ শেষ হচ্ছে না। ইরতাজউদ্দিনের মনে হলো— হেডমাস্টার সাহেব আজ যেন অন্যদিনের চেয়েও গম্ভীর। মনে হয় তার শরীরটা ভালো না। কিংবা দেশ থেকে খারাপ কোনো চিঠি পেয়েছেন। প্রায়ই হেডমাস্টার সাহেব দেশ থেকে খারাপ চিঠি পান। মনসুর সাহেবের স্ত্রীর মাথা পুরোপুরি খারাপ। ভদ্রমহিলা থাকেন তার বাবার কাছে। সেখানে তার উপর নানান ধরনের চিকিৎসা চলে। চিকিৎসার কারণে কিংবা প্রাকৃতিক কারণে ভদ্রমহিলার মাথা মাঝে-মাঝে ঠিক হয়, তখন হেডমাস্টার সাহেব তাকে নীলগঞ্জ নিয়ে আসেন। সেই সময় হেডমাস্টার সাহেবের মুখ ঝলমল করতে থাকে। তাঁকে দেখে মনে হয় সুখী একজন মানুষ। গায়ের কালো রঙ তখন তেমন কালো লাগে না। সেই সময় প্রায় প্রতিদিনই তিনি স্ত্রীকে নিয়ে সোহাগী নদীর পাড় ধরে হাঁটেন। তাদের বাড়ির কাছেই একটা বটগাছ— যার কয়েকটা ঝুরি নেমে গেছে সোহাগী নদীর পানিতে। সেই বটগাছের গুঁড়িতেও প্রায়ই হেডমাস্টার সাহেবের স্ত্রীকে বসে থাকতে দেখা যায়। ঘোমটাটানা লাজুক ধরনের একটি মেয়ে। যার ভাব-ভঙ্গি এমন যেন নতুন বিয়ে হওয়া বউ, স্বামীর সঙ্গে যার এখনো তেমন করে পরিচয় হয় নি। মহিলা বসে থাকেন, তার আশপাশে হাঁটাহাঁটি করেন হেডমাস্টার সাহেব। বড়ই মধুর দৃশ্য। কিছুদিন পর ভদ্রমহিলার মাথা আবার যথানিয়মে খারাপ হয়। হেডমাস্টার সাহেব

বিষণ্ন মুখে তাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আসেন। স্কুলে ফিরে কিছুদিন তার খুব মেজাজ খারাপ থাকে। অকারণে সবাইকে বকাঝকা করেন। তারপর আবার স্বাভাবিক হয়ে যান। সোহাগী নদীর পাড়ে একা একা হাঁটেন। বটগাছের ঝুরিতে একা বসে থাকেন।

হেডমাস্টার সাহেব লেখা বন্ধ করে চোখ তুলে তাকালেন। প্রায় বিড়বিড় করে বললেন, আমার বড় শ্যালককে একটা পত্র লিখলাম। আমার স্ত্রীর অবস্থা ভালো না। তারা তাকে পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করতে চায়।

কী হয়েছে?

নতুন করে কিছু হয় নাই। পুরনো ব্যাধি। তবে এবার নাকি বাড়াবাড়ি। আমার বড় শ্যালকের স্ত্রীকে মাছ কাটা বটি দিয়ে কাটতে গিয়েছিল। সবাই এখন ভয় পাচ্ছে। ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছে। খুব চিৎকার চেঁচামেচিও না-কি করে।

ইরতাজউদ্দিন কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। তার মনটা খারাপ হলো। আর তখনি ভুরু কুঁচকে হেডমাস্টার সাহেব কথা বলা শুরু করলেন।

ইরতাজউদ্দিন সাহেব।

জি।

দেখলাম স্কুলে একটা পতাকা টানিয়েছেন।

জি, ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছি। বারো টাকা দাম নিয়েছে। কাপড়টা সিল্কের। জাতীয় পতাকা আজকাল পাওয়াই মুশকিল। কেউ বিক্রি করতে চায় না।

নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করেছেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ করার মতো অবস্থা স্কুলের নেই। যেখানে মাস্টারদের বেতন দিতে পারি না...

ইরতাজউদ্দিন নিচু গলায় বললেন, জাতীয় পতাকা অপ্রয়োজনীয় কোনো ব্যাপার না।

পতাকা তো একটা আমাদের ছিল।

সেটার রঙ জ্বলে গেছে।

মনসুর সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, এই দেশের জন্যে রঙ জ্বলে যাওয়া পতাকাই ঠিক আছে, রঙ তো বাস্তবেও জ্বলে গেছে।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনার কথা বুঝলাম না।

হেডমাস্টার সাহেব বিরস গলায় বললেন, এক সময় এই পতাকাটাকে নিজের মনে হতো, এখন হয় না। সারা দেশে কী হচ্ছে খবর নিশ্চয়ই রাখেন, না রাখেন না?

জি, খবর রাখি।

লক্ষণ খুব খারাপ। পতাকা বদলে যেতে পারে। কাজেই আমার ধারণা, আপনি অকারণে দরিদ্র একটা স্কুলের বারোটা টাকা খরচ করিয়ে দিয়েছেন।

ইরতাজউদ্দিন বিস্মিত গলায় বললেন, পতাকা বদল হয়ে যাবে?

হ্যাঁ, যাবে। চট করে বদল হবে না। তবে হবে। লক্ষণ সে-রকমই। মাওলানা ভাসানী পল্টনের মাঠে কী বক্তৃতা দিয়েছেন জানেন?

জি-না।

না জানারই কথা, কোনো কাগজে আসে নাই। সব খবর তো কাগজে আসে না। কোনটা আসবে কোনটা আসবে না তা তারা ঠিক করে দেন।

মাওলানা ভাসানী কী বলেছেন?

তিনি বলেছেন— নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

কী বলেন এসব?

পতাকা বদল হয়ে যাবে। চানতারা পতাকা থাকবে না। মাওলানা সাহেব সুফি মানুষ। উনার জ্বীন সাধনা আছে। জ্বীনদের মারফতে তিনি আগে আগে খবর পান। চানতারা পতাকা থাকবে না।

ইরতাজউদ্দিন চিন্তিত মুখে বললেন, যদি হয়ও সেটা ভালো হবে না।

ভালো হবে না কেন?

হিন্দুর গোলামি করতে হবে। মুসলমান হিন্দুর গোলামি করবে সেটা কি হয়?

হেডমাস্টার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, কপালে গোলামি লেখা থাকলে গোলামি করতে হবে, উপায় কী? তবে দেশ স্বাধীন হলেই হিন্দুর গোলামি করতে হবে— এ কী ধরনের চিন্তা? আপনি আধুনিক মানুষ। আপনি উন্নত চিন্তা করবেন, সেটা তো স্বাভাবিক। এখন তো আমরা গোলামিই করছি। অন্য কিছু তো করছি না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা কত জানেন? শতকরা দশেরও কম। সেনাবাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা জানেন? না জানাই ভালো। পশ্চিমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে যাবার আমাদের উপায় আছে? কোনো উপায় নেই। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ইলেকশানে জিতে কি পেরেছেন এসেম্বলিতে বসতে? পারেন নি। কারণ তাঁকে বসতে দেওয়া হবে না। কোনোদিনও না। এখন যা হচ্ছে তার নাম ধানাই আর পানাই। কাজেই আমাদের সময় হয়ে আসছে পতাকা খুলে ফেলে দেওয়ার।

পতাকা নামিয়ে ফেলব?

হ্যাঁ। আপাতত পুরনো পতাকাই উড়ুক। নতুনটা না।

জি আচ্ছা।

আর পতাকার দাম বাবদ বাইশ টাকা আপনাকে স্কুল ফান্ড থেকে দেওয়া হবে না। পারচেজ কমিটির অনুমোদন ছাড়া আপনি পতাকা কিনেছেন। এটা আপনি পারেন না। সবকিছু নিয়মের ভিতর দিয়ে হতে হবে। নিয়মের বাইরে যাওয়া যাবে না।

জি আচ্ছা।

আর শুনুন, আমার স্ত্রীর জন্য একটু দোয়া করবেন।

জি, অবশ্যই করব। জোহরের নামাজের পরেই দোয়া করব ইনশাআল্লাহ।

ইরতাজউদ্দিন মন খারাপ করে হেডমাস্টার সাহেবের ঘর থেকে বের হলেন।

'স্বাধীন পূর্ববাংলা' এই জাতীয় কথাবার্তা ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এগুলি কোনো কাজের কথা না। অকাজের কথা। অখণ্ড হিন্দুস্তানে মুসলমানরা অনেক কষ্ট করেছে। জিন্নাহ সাহেব মহাপুরুষ মানুষ ছিলেন, তিনি অভাগা মুসলমানদের মুক্তি দিয়েছিলেন। অকৃতজ্ঞের মতো সেইসব কথা ভুলে গেলে চলবে না। মুসলমানদের ভুলে গেলে চলবে না যে কোনো হিন্দুর বাড়িতে তারা ঢুকতে পারত না। হিন্দু বাড়িতে মুসলমান ঢুকলে সেই বাড়ি অপবিত্র হয়ে যেত। হিন্দু ময়রার মিষ্টির দোকানে বসে তারা মিষ্টি খেতে পারত না। মুসলমানরা নগদ পয়সা দিয়ে ভিখিরির মতো দুহাত বাড়িয়ে দিত। মিষ্টি ছুড়ে দেওয়া হতো সেই হাতে। এই অপমানের ভেতর দিয়ে তাঁকে অসংখ্যবার যেতে হয়েছে। আজ যারা 'স্বাধীন বাংলা' 'স্বাধীন বাংলা' করছে, তারা কি এই অপমানের ভেতর দিয়ে গিয়েছে ? মাওলানা ভাসানী তো গিয়েছেন। তাহলে তিনি কেন এই কাণ্ডটা করছেন ? তার মতো বুদ্ধিমান লোক হিন্দুদের চাল বুঝতে পারবেন না তা কী করে হয় ?

ইন্ডিয়া যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র করছে— এ তো বোঝাই যাচ্ছে। পুরো জাতিকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। খুব সূক্ষ্মভাবে করছে। এটা আর কিছুই না, জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে দাবাখেলায় হেরে যাবার শোধ তোলার চেষ্টা। এতদিন পর তারা একটা সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগ তারা হাতছাড়া করবে না।

জোহরের নামাজের পর মাওলানা ইরতাজউদ্দিন পাকিস্তানের সংহতি ও মঙ্গলের জন্য দীর্ঘ প্রার্থনা করলেন। হেডমাস্টার সাহেবের স্ত্রীর বিষয়ে দোয়া করার কথা ছিল। করতে ভুলে গেলেন। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি আবারো নফল নামাজে বসলেন।

সেদিনই দুপুর একটায় রেডিওতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। তারিখটা হলো পহেলা মার্চ ১৯৭১।

রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে তার ভাষণ প্রচার করা হলো। তিনি বললেন—

> যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বশীল দু'টি প্রধান দলের মধ্যকার অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বাধ্য হয়েছি ১৯৭১ সালের ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবি করতে। তবে আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, এ মুলতবি দুই/তিন সপ্তাহের বেশি অতিক্রান্ত হবে না এবং এই স্বল্প পরিসর সময়ে আমি আমাদের দেশের দুই অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সৌহার্দ্য আনয়নে সব ধরনের প্রচেষ্টাই করব।

সন্ধ্যা পার হয়েছে। মাগরেবের নামাজ শেষ করে ইরতাজউদ্দিন রান্না বসিয়েছেন। আয়োজন সামান্য। ভাত, ডাল আর আলুভর্তা। বৈয়মে খাঁটি ঘি আছে। আলুভর্তার সঙ্গে দু'চামচ ঘি দিয়ে দিবেন। ক্ষুধা পেটে অমৃতের মতো লাগবে। নবিজী দু'টা খেজুর খেয়ে অনেক রাত পার করেছেন। সেই তুলনায় রাজ ভোগ।

আলুভর্তা করা গেল না। তিনটা আলু ছিল। তিনটাই পচা। তাছাড়া আলুভর্তার প্রধান উপকরণ কাঁচামরিচ বা শুকনামরিচ কোনোটাই নেই।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। সবসময় সর্ব পরিস্থিতিতে শুকুরগুজার করতে হবে। আল্লাহপাক শুকুরগুজারি বান্দা পছন্দ করেন।

হাঁড়িতে পানি ফুটছে— ইরতাজউদ্দিন ফুটন্ত পানিতে ডাল ছাড়বেন, তার ঠিক আগে আগে মধু এসে বলল, হেড স্যার ডাকে। রাতে তার সাথে আপনেরে খাইতে বলছেন।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, রান্না কী?

মধু বলল, মৈরলা মাছের ঝোল, টাকি ভর্তা, মাষকলাই-এর ডাইল।

রেঁধেছে কে? তুই?

জে।

ইরতাজউদ্দিন আবারো বললেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। মধু হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে থাকে। রান্নাবান্না করে। তার রান্নার হাত খুবই ভালো।

মাছের কাটাকুটা, সামান্য লাউপাতা কুমড়াপাতা দিয়ে সে এমন জিনিস তৈরি করে যে মোহিত হয়ে খেতে হয়। তার রান্না মিষ্টি কুমড়ার ভর্তা যে খায় নি, সে জানেই না ভর্তার স্বাদ কী।

মধু!

জি স্যার।

দেশের অবস্থা তো ভালো না রে মধু। কী হয় কে জানে!

মধু দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, হউক গা। কপালের লিখন না হবে খণ্ডন।

মধুকে অতিরিক্ত আনন্দিত মনে হচ্ছে। কারণে অকারণে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। ইরতাজউদ্দিন ভুরু কুঁচকে বললেন, গাঁজা খেয়েছিস না-কি?

মধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, খাইতেও পারি, আবার নাও খাইতে পারি।

এই জিনিসটা না খেলে হয় না?

হয়। খাইলেও হয়, না খাইলেও হয়।

ইরতাজউদ্দিন ডাল পানিতে ভিজিয়ে ফেলেছেন। পানি থেকে তুলে কুলায় মেলে দিলেন। শুকিয়ে গেলে আবার ব্যবহার করা যাবে। কোনো কিছুই নষ্ট করা উচিত না। আল্লাহপাক অপচয়কারী পছন্দ করেন না।

স্যার গো, দিনের অবস্থা কিন্তু ভালো না। ঝড় তুফান হইতে পারে।

ইরতাজউদ্দিন সামান্য চিন্তিত বোধ করলেন। তিনি যে চালাঘরে বাস করেন তার অবস্থা শোচনীয়। প্রধান খুঁটির সব ক'টাতে উইপোকা ধরেছে। ঝড়ের বড় ঝাপ্টা এই ঘর নিতে পারবে না। ঘর নতুন করে বাঁধতে হবে। ঠিক করে রেখেছিলেন, বর্ষার আগে আগে ঘরের কাজটা ধরবেন। মনে হয় না এইবারও পারবেন। সব নির্ভর করছে আল্লাহপাকের ইচ্ছার উপর। উনি ইচ্ছা করলে হবে। উনি ইচ্ছা না করলে হবে না। তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছুই হবে না। তাহলে মানুষের চেষ্টার মূল্যটা কী?

মধু খিকখিক করে হাসছে। ইরতাজউদ্দিন বললেন, কী হয়েছে?

মধু বলল, কিছু হয় নাই। একটা শিল্লুক মনে আসছে। বলব?

বল শুনি।

> গাই এ ভাঙ্গে নল খাখরী, বাছুর ভাঙ্গে আইল
> ছয় মাস হইল গাই বিয়াইছে বাছুর আইছে কাইল।

কন দেহি জিনিসটা কী?

জানি না।

খুবই সোজা। একটু চিন্তা নিলেই হবে।

চিন্তা নিতে পারছি না।

জিনিসটা হইল গিয়া কচ্ছপের আন্ডা।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, কচ্ছপের আন্ডা হলে তো ভালোই।

আরেকটা বলি?

শিল্লুক শুনব নারে মধু। চল রওনা দেই।

মধু উসখুস করছে। শিল্লুক তার খুব পছন্দের একটা বিষয়। এই অঞ্চলে শিল্লুক-ভাঙ্গানি হিসাবে তার নাম-ডাক আছে। বিয়ে-শাদি হলেই তার ডাক পড়ে। বরযাত্রীদের কঠিন কঠিন শিল্লুক দিয়ে সে নাকানি-চুবানি খাওয়ায়।

দিনের অবস্থা আসলেই ভালো না। আকাশে ঘন মেঘ। মাঝে-মাঝে বিজলি চমকাচ্ছে। বিজলির চমকে দেখা যাচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে মেঘ উড়ে উড়ে আসছে। পশ্চিমি মেঘ ভালো জিনিস না। ঝড়-ঝাপ্টা হবে।

ইরতাজউদ্দিন দ্রুত পা চালাচ্ছেন। বৃষ্টি নামার আগেই হেডমাস্টার সাহেবের বাড়ি পৌঁছানো দরকার। থানার সামনে দিয়ে গেলে সময় বেশি লাগবে। তবে রাস্তা ভালো। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক। জেলেপাড়ার ভেতর দিয়ে গেলে অতি দ্রুত পৌঁছানো যাবে। সমস্যা একটাই— জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। মাঝে-মধ্যে খুব সাপের উপদ্রব হয়। ইরতাজউদ্দিন সাপ ভয় পান।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাতাসও ছেড়েছে। শরীর জুড়িয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক এই অন্ধকারেও চিকচিক করছে। ইরতাজউদ্দিনের মনে হচ্ছে তিনি সড়ক না, নদীর উপর দিয়ে হাঁটছেন। থানার সামনে দিয়ে যাবার সময় তাঁর মুখে পাঁচ ব্যাটারি টর্চের আলো পড়ল। মুখে টর্চের আলো ফেলা বিরাট অভদ্রতা। এই অভদ্রতাটা থানাওয়ালারা সবসময় করে। তাদের দোষও দেয়া যায় না। তাদের মানুষ চিনতে হবে। কে চোর কে সাধু জানতে হবে।

মাওলানা সাহেব, স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আমাকে চিনেছেন? আমি ওসি ছদরুল আমিন।

গলা শুনে চিনতে পারি নাই। পরিচয়ে চিনেছি।

মুখের উপর টর্চের আলো ফেলেছি, বেয়াদবি মাফ করে দিবেন। আপনি যান কই?

হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে যাচ্ছি। উনি খবর পাঠিয়েছেন।

উনাকে আমার সালাম দিবেন। বিশিষ্ট লোক।

অবশ্যই দিব।

দেশের খবর তো মাওলানা সাহেব শুনেছেন— ইয়াহিয়া অধিবেশন স্থগিত করেছে। এখন লাগবে ক্যাঁচাল। ঢাকায় পোস্টিং থাকলে অবস্থা কেরোসিন হয়ে যেত। পাবলিকের সঙ্গে কাটাকাটি মারামারি। পুলিশ দেখলেই পাবলিক ক্ষেপে যায়। ক্ষেপিস কেন রে বাবা ? পুলিশ কি তোরই বাপ-ভাই না ? তুই ভাত-মাছ খাস, পুলিশও খায়। তোর 'গু'-এর যেমন দুর্গন্ধ, পুলিশের 'গু'-তেও সেইরকম দুর্গন্ধ। আচ্ছা ঠিক আছে, মাওলানা সাহেব আপনি যান। আপনাকে দেরি করায়ে দিয়েছি। গায়ে একটা-দু'টা বৃষ্টির ফোঁটাও পড়তেছে। আসসালামু আলায়কুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

ইরতাজউদ্দিন হাঁটতে শুরু করলেন। থানার ওসি'কে রাস্তায় দেখে মধু একটু পিছিয়ে পড়েছিল, এখন সে এগিয়ে এলো। গলা নিচু করে বলল, স্যার, আমরার ওসি সাহেবের বেজায় সাহস এইটা জানেন ?

না।

আরে বাপরে— সাহস কী! তার সাহসের একটা গফ করব ?

দরকার নাই।

তাইলে একটা শিল্লুক ভাঙ্গানি দেন। কন দেখি স্যার— 'চামড়ার বন্দুক বাতাসের গুল্লি' এইটা কী ?

জানি না। কী ?

এইটা হইল গিয়া আপনের— 'পাদ্দ'। পাদে যে শব্দ হয় সেই শব্দটা হইল গুল্লি। চামড়ার বন্দুক হইল— পুটকি।

ইরতাজউদ্দিন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এত বড় বেয়াদব— এ ধরনের অশ্লীল কথাবার্তা তাঁর সঙ্গে বলছে ? কানে ধরে একশবার উঠবোস করানো দরকার। যাতে ভবিষ্যতে কোনোদিন এই ধরনের কথাবার্তা না বলে।

বৃষ্টির ফোঁটা ঘন হয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মধু বলল, লক্ষণ ভালো না, বিষ্টির ফোঁটা পড়তে পড়তে বন হইলে বেজায় পরমাদ।

ইরতাজউদ্দিন কঠিন গলায় বললেন, চুপ করে থাক। আর একটা কথা বললে এমন চড় খাবি...

কথা বইল্যা দোষ কী করলাম!

অনেক দোষ করেছিস। আর কথা না।

হেডমাস্টার সাহেব বারান্দায় চৌকির উপর বসে আছেন। ঘরের ভেতর হারিকেন জ্বলছে। হারিকেনের আলোয় তাঁকে আবছা দেখা যাচ্ছে। বারান্দায় পেতে রাখা চৌকি হেডমাস্টার সাহেবের পছন্দের জায়গা। এখানে বসলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সামনে বুড়ো ফসলের মাঠ। দক্ষিণ দিকে নদী। বর্ষা মৌসুমে সামনের মাঠের পুরোটাই ডুবে যায়। বাতাস এলে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হয়। বারান্দা থেকে এই শব্দ শোনা যায়। হেডমাস্টার সাহেবের বড় ভালো লাগে।

ইরতাজউদ্দিন বারান্দায় উঠতে উঠতে বললেন, আসসালামু আলায়কুম। খবর দিয়েছেন?

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, খানা খেতে ডেকেছি। দিনের পর দিন একা খেতে ভালো লাগে না। মন যখন অস্থির থাকে, তখন আরো ভালো লাগে না।

মধু বদনায় করে পানি নিয়ে এসেছে। জলচৌকিতে দাঁড়িয়ে ইরতাজুদ্দিন পা ধুলেন। উঠে এলেন চৌকিতে। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, আপনার ভাবির কথা মন থেকে দূর করতে পারছি না। শেষে আমার বড় শ্যালককে একটা চিঠি লিখলাম। চিঠিটা আপনাকে পড়ে শোনাতে চাচ্ছি।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, পড়ুন শুনি।

হেডমাস্টার সাহেব তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে চিঠি মুখস্থ বলে যেতে থাকলেন। যে-কোনো চিঠি একবার লেখা হয়ে গেলে দাড়ি-কমাসহ তাঁর মনে থাকে। মানুষটার স্মৃতিশক্তি অস্বাভাবিক।

জনাব আব্দুর রহমান।

প্রিয় ভ্রাতা।

পরসমাচার তোমার ভগ্নির বর্তমান অবস্থার কথা পাঠ করিয়া মুহ্যমান হইয়াছি। এ কী কঠিন পরীক্ষায় পতিত হইলাম? এই পরীক্ষার শেষ কোথায়? বেচারি নিজে কষ্ট পাইতেছে, অন্যদেরও কষ্ট দিতেছে। তাহার বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেয়া যায় সে-সম্পর্কে আমার পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব। এত দূরে বসিয়া প্রকৃত অবস্থা জানা আমার পক্ষে অসম্ভব। তোমরা যাহা ভালো মনে করো তাহাই করা বাঞ্ছনীয়।

তোমার অতি আদরের ভগ্নির জন্যে তোমরা কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিবে না। এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

পাবনা মানসিক হাসপাতালে তাহাকে ভর্তি করাইবার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নাই। আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থনা যেন হাসপাতালে তাহার সুচিকিৎসা হয়।

ইতি

চিঠি মুখস্থ বলা শেষ করে হেডমাস্টার সাহেব ইরতাজউদ্দিনের দিকে তাকালেন। ইরতাজউদ্দিন বললেন, পুনশ্চতে কিছু লিখেছেন?

না।

চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কি একমত?

অবশ্যই।

ইরতাজউদ্দিন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনি একমত না। আপনার মনে সংশয় আছে। সংশয় আছে বলেই আপনি আমাকে চিঠিটা শুনিয়েছেন। আপনার মন চাচ্ছে যেন আমি বলি আপনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন। আপনি আমার Support চাচ্ছেন।

হেডমাস্টার সাহেব কিছু বললেন না। এক দৃষ্টিতে ইরতাজউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনি একটা কাজ করেন। ভাবিকে আপনার কাছে নিয়ে আসেন। আপনার পাশে থাকলে ভাবি সাহেবার মনে একটা পরিবর্তন আসতে পারে। তারপরেও যদি কিছু না হয়, আমরা দু'জন উনাকে হাসপাতালে দিয়ে আসব। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আসব।

আমাকে নিয়ে আসতে বলছেন?

জি।

তাহলে বরং এটাই করি?

হেডমাস্টার সাহেবকে দেখে মনে হলো— তার বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। তিনি সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, ক্ষুধা হয়েছে। খানা দিতে বলেন। আকাশের অবস্থা ভালো না। সকাল সকাল বাড়ি ফিরব। পশ্চিম আকাশ কেমন লাল হয়ে আছে। ঝড়-তুফানের লক্ষণ।

মধু এসে বিড়বিড় করে বলল, খানা দেওন যাইব না। দিরং হইব।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, দেরি হবে কেন? রান্না তো আগেই করা।

মধু সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উদাস চোখে মাথা চুলকাতে লাগল। জানা গেল, কুকুর খাবারে মুখ দিয়েছে বলেই নতুন করে রান্না বসাতে হবে। সেটাই এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। চাল বাড়ন্ত। চাল কিনে আনতে হবে।

হেডমাস্টার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, বলিস কী ?

মধু বলল, হারামি কুত্তা একটা আছে, বড় ত্যক্ত করতাছে। বিষ খাওয়াইয়া এরে মারণ ছাড়া গতি নাই।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, আমার শরীরটা ভালো না। আমি আগেই ঠিক করেছিলাম রাতে কিছু খাব না। এক গ্লাস তোকমার শরবত খেয়ে শুয়ে পড়ব। মাওলানা সাহেবের খাবার ব্যবস্থা করা দরকার। উনি ক্ষুধার্ত। ঘরে চিড়া মুড়ি আছে না ?

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আমার ভাতের ক্ষিধা হয়েছে। এই ক্ষিধা চিড়া মুড়ি খেলে যাবে না। আমি ঘরে গিয়ে ভাত চড়াব।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, মধুকে সঙ্গে নিয়ে যান, রেঁধে দিয়ে আসবে। ও নিজেও চারটা খাবে।

ইরতাজউদ্দিন মধুকে নিয়ে পথে নামলেন। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় উঠার পর পর প্রচণ্ড শব্দে কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকাল।

জঙ্গলের দিক থেকে শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। মধু ভীত গলায় বলল— ঝড় আসতাছে গো। আইজ খবর আছে।

দেখতে দেখতে ঝড় এসে গেল। ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় মধু ছিটকে রাস্তা থেকে খালে পড়ে গেল।

ইরতাজউদ্দিনকে দৌড়ে এসে আশ্রয় নিতে হলো থানায়। ঝড়ের তাণ্ডব চলল অনেক রাত পর্যন্ত। রাতে তাঁকে খেতে হলো ওসি সাহেবের বাসায়। ওসি সাহেবের স্ত্রী লম্বা ঘোমটা টেনে অতি যত্নে ইরতাজউদ্দিনকে খাওয়ালেন। মহিলা সন্তান-সম্ভবা। শরীর ঢেকে ঢুকে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত।

ওসি সাহেব থানায় নেই। ঝড় আসছে দেখে তিনি তিনজন কনস্টেবল নিয়ে বের হয়ে পড়েছেন। তার উদ্দেশ্য ডাকাত হাসান মাঝিকে ধরা। ঝড়-বৃষ্টির রাতে সে নিশ্চয়ই তার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর কাছে রাত কাটাতে আসবে। হাসান মাঝির তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর নাম রঙিলা। সে আগে গৌরীপুরের নটিবাড়িতে নটির কাজ (দেহব্যবসা) করত। হাসান মাঝি তাকে বিয়ে করে মিন্দাপুর গ্রামে ঘর তুলে দিয়েছে। মিন্দাপুর নীলগঞ্জ থেকে দুই-আড়াই মাইল দূরে। সে যে মাঝে-মাঝে এখানে রাত কাটায়, সে-খবর ওসি সাহেব জানেন। তার ভাগ্য ভালো হলে দেখা যাবে ব্যাটা আজই এসেছে।

রান্নার আয়োজন ভালো। গরুর মাংস, পাবদা মাছের ঝোল, করলা ভাজি, বেগুন ভর্তা।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, মাগো, বড়ই তৃপ্তি করে খেয়েছি। আল্লাহ্‌পাক কার রুজি কোথায় রাখেন বলা মুশকিল। খাওয়া শেষ করে তিনি হাত তুলে মোনাজাত করলেন, হে আল্লাহ্‌পাক, হে গাফুরুর রহিম, যে খানা আজ আমি এত তৃপ্তি করে খেয়েছি তার জন্যে তোমার দরবারে শুকরিয়া। যে বিপুল আয়োজন করে আমাকে খাইয়েছে, তার ঘরে যেন এরচেয়েও দশগুণ ভালো খানা সবসময় থাকে— তোমার পাক দরবারে এই আমার প্রার্থনা। আমিন।

দোয়া শেষ করে ইরতাজউদ্দিন তাকিয়ে দেখেন, ওসি সাহেবের স্ত্রী চোখের পানি মুছছে। ইরতাজউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, কাঁদছেন কেন গো মা ?

মহিলা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আপনি এত সুন্দর করে দোয়া পড়লেন! শুনে চোখে পানি এসে গেছে।

ঝড় থামার পর ইরতাজউদ্দিন বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির সামনে এসে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। বাড়ির কোনো চিহ্নই নেই। ঝড় উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। তিনি কিছুই বললেন না। মধু শুধু বলল, স্যার, আফনেরে তো শুয়াইয়া দিছে।

ইরতাজউদ্দিন জবাব দিলেন না। মধু বলল, মন খারাপ কইরেন না। একটা শিল্লুক দেই, ভাঙেন—

যায় না চোখেতে দেখা কর্ণে শোনা যায়
উড়াল দিয়া আসে হে উড়াল দিয়া যায়।

স্যার পারছেন ? খুব সোজা।

ইরতাজউদ্দিন জবাব দিলেন না। মধু আনন্দিত গলায় বলল, এইটা হইল ঝড়। ঝড় উড়াল দিয়া আসে উড়াল দিয়া যায়। এরে চউক্ষে দেখা যায় না।

কলিমউল্লাহ্ নামটা কোনো আধুনিক কবির জন্যে তেমন মানানসই না। কবিতা মানেই তো শব্দের খেলা। কলিমউল্লাহ্ নামের মধ্যে কোনো খেলা নেই। এই নাম উচ্চারণের সময় মুখ বড় হয়ে যায়। জিব দেখা যায়। কিন্তু কলিমউল্লাহ্ একজন কবি। এই মুহূর্তে সে *দৈনিক পাকিস্তান* অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স পঁচিশ। সে জগন্নাথ কলেজে বি.কম পড়ে। বি.কম পরীক্ষা সে আগে দু'বার দিয়েছে। পাশ করতে পারে নি। তৃতীয়বারের জন্যে জোরেসোরে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। কলিমউল্লাহ্‌র বাবা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা ফেলের কথা শুনে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন। তাতে তার তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। সে দু'টা টিউশনি করে। কাটাবনের কাছে একটা হোটেলের সঙ্গে মাসকাবারি ব্যবস্থা করা আছে, সেখানে খায়। রাতে ঘুমাতে যায় ইকবাল হলে। গ্রাম-সম্পর্কের এক বড় ভাই, ইতিহাসের থার্ড ইয়ার অনার্সের ছাত্র রকিব আলি ইকবাল হলে থাকেন। তার ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে থাকা। হলে এই বিষয়টা চালু আছে। রকিব ভাইয়ের বিছানাটা আলাদা রেখে মেঝেতে যে ক'জন ইচ্ছা শুয়ে থাকতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বড় ভাইরা আশ্রয়হীন ছোট ভাইদের না দেখলে কে দেখবে? রুমের দরজা সবসময় খোলা থাকে। রাত একটা দেড়টায় হলে এসে উপস্থিত হলেও তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।

অসুবিধা একটাই— নিরিবিলি কবিতা লেখাটা হয় না। এই কাজটা তাকে করতে হয় টিউশনির সময়। ছাত্রকে এক ঘণ্টা পড়াবার জায়গায় দু'ঘণ্টা পড়ালে সবাই খুশি হয়। বাড়তি সময়টা সে কাজে লাগায়। ছাত্রকে রচনা লিখতে দিয়ে সে কবিতা লেখে। কলিমউল্লাহ্ ঠিক করে রেখেছে কবিতা, লিখে খ্যাতিমান হলে সে একটা কবিতার বই বের করবে। বইটার নাম দিবে 'টিউশন কাব্য'। যে বইটির প্রতিটি কবিতা ছাত্রকে পড়াতে গিয়ে লেখা। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিটি কবিতার শেষে রচনার তারিখ ও স্থান দেয়া থাকবে। যেমন 'মেঘবালিকাদের দুপুর' কবিতার নিচে লেখা থাকবে— মন্টুদের ঝিকাতলার বাসা। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

কবিতার বইটা বের হবে ছদ্মনামে। অনেকগুলি ছদ্মনাম নিয়ে সে চিন্তা করছে। কোনোটিই তেমন মনে ধরছে না। একটা নাম মোটামুটি পছন্দ হয়েছে, সেটা হলো শাহ্ কলিম। এই ছদ্মনামটা মূলের কাছাকাছি। নামের আগে শাহ্ যুক্ত করায় মরমী আধ্যাত্মবাদী কবি ভাব চলে আসে। তারপরেও এই নাম আধুনিক না। গ্রাম্য কবিয়ালটাইপ নাম। যারা মুখে মুখে গান রচনা করে এবং একটা পর্যায়ে গানে নিজের নাম ঢুকিয়ে দেয়। যেমন—

শাহ্ কলিমে কয়
রোজ-হাসরের দিনে তোমার পরাজয় ॥
পিতা নয় মাতা নয়
ব্রাদার ভগ্নি কেহই নয়
হৃদয়ে জাগিবে ভয়,
জানিবা নিশ্চয়।
রোজ-হাসরের দিনে তোমার পরাজয়।

'শাহ্ কলিম'-এর পাশাপাশি আরেকটা নাম তার পছন্দের তালিকায় আছে— 'ধূর্জটি দাশ'। কঠিন নাম, তবে বেশ আধুনিক। শাহ্ কলিম নামটা মনে এলে একটা বোকা-সোকা বাবরি চুলের লোকের চেহারা মনে আসে। ধূর্জটি দাশ-এ মনে হয় গম্ভীর চোখে চশমা পরা বুদ্ধিমান একজন মানুষ। নামটা হিন্দু, এটা একটা সমস্যা। সে যদি কোনো একদিন খুব বিখ্যাত হয়ে যায়, তাহলে সমালোচকরা তাকে ধরবে। আপনি কেন হিন্দু ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন? এটা কি হীনমন্যতার কারণে? মুসলমান নাম কবির নাম হিসেবে চলে না এই বোধ থেকে? এ দেশের অনেক কবিই তো ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন। এমনকি আমাদের প্রধান কবি শামসুর রাহমানও এক সময় ছদ্মনামে লিখতেন। হিন্দু ছদ্মনাম লেখার কথা তো তাঁর মনে হয় নি। আপনার মনে হলো কেন?

রোদ মাথার উপর চিড়বিড় করছে। কলিমউল্লাহ্ মনস্থির করতে পারছে না *দৈনিক পাকিস্তান* অফিসে ঢুকবে কি ঢুকবে না। তার ইচ্ছা কবি শামসুর রাহমানের হাতে একটা কবিতা দিয়ে আসা। ডাকে কবিতা পাঠিয়ে লাভ নেই। পত্রিকা অফিসের লোকজন খাম খুলে কিছু পড়ে না। এত সময় তাদের নেই। টেবিলের পাশে রাখা ঝুড়িতে সরাসরি ফেলে দেয়।

কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে সে কীভাবে কথা বলবে তা নিয়ে অনেক ভেবেছে। মনে মনে রিহার্সেলও দিয়েছে। যদিও সে জানে কোনো রিহার্সেলই কাজে লাগবে না। কবি কোন প্রসঙ্গে কথা বলবেন তা তো জানা নেই। ঘরে ঢোকা মাত্র কবি হয়তো বলবেন, এখন যান। পরে আসবেন। এখন ব্যস্ত আছি।

তবে কবি যদি টুকটাক কথা বলেন এবং যদি বলেন, তুমি কি আমার কোনো কবিতা পড়েছ ?— তাহলে কেল্লা ফতে। কলিমুল্লাহ্ কবির একটা কবিতা— 'আসাদের শার্ট' ঝাড়া মুখস্থ করে এসেছে। গড়গড় করে বলে কবিকে মুগ্ধ করা যাবে। কবি-সাহিত্যিকরা অল্পতেই মুগ্ধ হয়।

তিনবার 'ইয়া মুকাদ্দিমু' পড়ে ডান পা আগে ফেলে কলিমউল্লাহ্ *দৈনিক পাকিস্তান* অফিসে ঢুকে গেল। 'ইয়া মুকাদ্দিমু'র অর্থ 'হে অগ্রসরকারী'। আল্লাহ্‌র পবিত্র নিরানব্বই নামের এক নাম। এই নাম তিনবার পড়ে ডান পা ফেলে যে-কোনো কাজে অগ্রসর হওয়ার অর্থ সাফল্য। বি.কম পরীক্ষা দেবার জন্যে হলে ঢোকার আগে আগে এই নাম সে পড়তে পারে নাই। কিছুতেই নামটা মনে পড়ে না। মনে পড়লে অবশ্যই ঘটনা ভিন্ন হতো।

কবি শামসুর রাহমান বিশাল এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। তাঁর ডান পাশে জমিদারদের নায়েব টাইপ চেহারার ফর্সা এবং লম্বা এক লোক, ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। মাথা দোলাচ্ছে, হাত নাড়ছে। কবি তার দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু সব কথা মনে হয় শুনছেন না। কবিরা ভ্যাড়ভ্যাড়ানি শুনতে ভালোবাসে না।

কলিমউল্লাহ্‌র মনে হলো, কবি সাহেব তাকে দেখে খুশি হয়েছেন। অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও নায়েব সাহেবের ভ্যাড়ভ্যাড়ানি শুনতে হবে না।

শামসুর রাহমান টেবিলে হাত রেখে গালে হাত দিয়ে সুকান্ত-টাইপ ভঙ্গিতে বসেছেন। তিনি কলিমুল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার কাছে কী ?

কলিমউল্লাহ্ বলল, স্যার, আমি একটা কবিতা নিয়ে এসেছি। কবিতাটা আমি ডাকে পাঠাতে পারতাম কিন্তু আমার অনেক দিনের শখ কবিতাটা আমি আপনার হাতে দেই।

কবি কিছু বলার আগেই পাশে বসা নায়েবটা বলল, টেবিলে রেখে চলে যান।

কলিমউল্লাহ্ নায়েবের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, ঐ গাধা, তুই কথা বলছিস কেন ? আমি তো তোর সঙ্গে কথা বলছি না। তোর ভ্যাড়ভ্যাড়ানি শোনার আমার কোনো প্রয়োজন নাই। মনে মনে এই কথা বললেও সে মুখে বলল, আমি কবিতাটা কবির হাতে দিব এই জন্যে এসেছি। টেবিলে রেখে দেবার জন্যে আসি নি।

নায়েব বলল, জিনিস একই। কবি টেবিল থেকে কবিতাটা হাতে নেবেন।

কলিমউল্লাহ্ বলল, জিনিস এক না। আমরা যদি কাউকে ফুল দিতে চাই আমরা তার হাতে দেই। টেবিলের এক কোনায় রেখে দেই না। আমি যে

কবিতাটা লিখেছি সেটা হয়তো খুবই তুচ্ছ, তবে আমার কাছে তা ফুলের মতোই। আমি কবির হাতেই সেই ফুল দিতে চাই।

কলিমউল্লাহ নিজের কথা বলার ক্ষমতায় নিজেই মুগ্ধ হলো। অবশ্যি এই অংশটি সে আগেই রিহার্সেল দিয়ে ঠিক করে রেখেছে। জায়গামতো লাগানো গেছে এতেই সে খুশি।

শামসুর রাহমান হাত বাড়িয়ে কবিতা নিতে নিতে বললেন, আপনি কী করেন ? ছাত্র ?

জি ছাত্র। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় এমএসসি করছি (এই মিথ্যা কথাটা যে সে বলবে তাও আগেই ঠিক করা। বিজ্ঞানের জটিল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে কবিতা লেখার মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে। কবি নিশ্চয়ই ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে গিয়ে খোঁজ নেবেন না।)

আপনার নাম কী ?

স্যার আমার নাম শাহ্ কলিম।

ছদ্মনাম ?

জি-না, আসল নাম। আমরা শাহ্ বংশ।

ও আচ্ছা।

কলিমউল্লাহ ফাঁক খুজছে 'আসাদের শার্ট' কবিতাটা মুখস্থ শুনিয়ে দেয়ার জন্যে। ফাঁক পাওয়া যাচ্ছে না। সে তো নিজ থেকে হড়বড় করে কবিতা আবৃত্তি শুরু করতে পারে না। নায়েব চেহারার লোকটাই সুযোগ তৈরি করে দিল। সে কলিমউল্লাহ্র দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, কবিতা যে লিখছেন ছন্দ জানেন ? চাক্কা ছাড়া যেমন গাড়ি হয় না, ছন্দ ছাড়া কবিতা হয় না। কবিতাকে চলতে হয়। চাক্কাবিহীন গাড়ি হলো গদ্য। চাক্কাওয়ালা চলমান গাড়ি হলো কবিতা। বুঝেছেন ?

কলিমউল্লাহ মুখে বলল (অতি বিনয়ের সঙ্গে), স্যার, বোঝার চেষ্টা করছি। মনে মনে বলল, চুপ থাক ছাগলা। তোকে উপদেশ দিতে হবে না।

নায়েব বলল, (তার উপদেশ দেয়া শেষ হয় নি) কবিতা লেখা শুরুর আগে প্রচুর কবিতা পড়তে হবে। অন্য কবিরা কী লিখছেন, তারা শব্দ নিয়ে, ছন্দ নিয়ে কী experiment করছেন তা জানতে হবে। আপনি যে কবি শামসুর রাহমানের কাছে এসেছেন, তাঁর কোনো কবিতা কি আপনি পড়েছেন ?

কলিমউল্লাহ মনে মনে বলল, এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার জন্যে তোর অতীতের সব অপরাধ এবং ভবিষ্যতের দু'টা অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। মনে মনে কথা বলা শেষ হওয়া মাত্র সে গড়গড় করে কবির 'আসাদের শার্ট'

কবিতাটা মুখস্থ বলে যেতে লাগল। তার উচ্চারণ ভালো, সে আবৃত্তিও ভালো করছে। কবিকে দেখে মনে হচ্ছে না তিনি অভিভূত হয়েছেন। মনে হয় তার আগে আরো অনেকেই এসে কবিকে কবিতা মুখস্থ করে শুনিয়েছে। তাঁর জন্যে এটা নতুন কিছু না।

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।
বোন ভাই-এর অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায়;
বর্ষিয়সী জননী সে শার্ট উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে
ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি চূড়োয়
গমগমে এভিন্যুর আনাচে-কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম।

কবি পুরো কবিতা শেষ করতে দিলেন না, তার আগেই বললেন, আপনি বসুন। চা খাবেন?

কলিমউল্লাহ্ বলল, স্যার, চা খাব না। তবে আপনি বসতে বলেছেন, আমি কিছুক্ষণ বসব। আপনার সামনে কিছুক্ষণ বসে থাকা আমার জন্যে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

কলিমউল্লাহ্ বসল। তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নায়েব ব্যাটা কবির দিকে ফিরে হাত-মাথা নেড়ে গল্প শুরু করল, যেন এই ঘরে তারা দু'জনই আছে আর কেউ নেই।

তারপর শুনুন কবি, কী ঘটনা— আমি নেতার সঙ্গে বরিশাল থেকে স্টিমারে করে ফিরছি। সারাদিন খুব পরিশ্রম গিয়েছে। এখানে মিটিং ওখানে মিটিং। ভেবেছিলাম রাতে স্টিমারে ভালো ঘুম হবে। সেটা হলো না। চাঁদপুরের কাছাকাছি এসে ঘুম ভেঙে গেল। স্টিমারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি, দূরে দেখা যাচ্ছে চাঁদপুর শহর। শহরের বাতি পানিতে পড়েছে। এদিকে আবার ভোর হচ্ছে। ভোরের আলো। মায়াবী একটা পরিবেশ।

কলিমউল্লাহ্ মনে মনে বলল, চুপ থাক ব্যাটা। মায়াবী পরিবেশ! তুই তো মায়াবী বানানই জানস্ না।

আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখেছেন। তাকিয়ে দেখি নেতা, তাঁর হাতে পাইপ। নেতা আমার নাম ধরে বললেন, কী দেখিস, বাংলার শোভা ?

কলিমউল্লাহ্ মনে মনে বলল, নেতা তোর কাঁধে হাত রেখে কথা বলেছে ? তুই কি নেতার ইয়ারবন্ধু ? বাকোয়াজ বন্ধ করবি ?

আমি নেতাকে বললাম, আপনি এত ভোরে উঠেন তা জানতাম না। নেতা বললেন, বাংলার শোভা আমাকে বাদ দিয়ে তোরা দেখে ফেলবি তা তো হতে দেব না। আয় আমার ঘরে আয়। চা খেয়ে যা। আমি নেতার কেবিনে গেলাম। উনি নিজেই চা বানিয়ে আমার হাতে দিলেন।

কলিমউল্লাহ্ মনে মনে বলল, শুধু চা বানিয়ে তোর হাতে দিলেন ? তোর গা হাত পা ম্যাসেজ করে দেন নাই ?

নেতার সঙ্গে তখন আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো। আমি নেতাকে বললাম, আপনি কিছু একটা করেন। মাওলানা ভাসানীকে সামলান। তাঁর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলুন। নেতা বললেন, মাওলানাকে নিয়ে তোদের চিন্তা করতে হবে না। আমি মাওলানাকে চিনি। মাওলানা আমাকে চেনে।

কলিমউল্লাহ্ মনে মনে বলল, তুই তো দেখি আমার চেয়েও বড় মিথ্যাবাদী! তুই হয়ে গেলি শেখ মুজিবের উপদেষ্টা ?

কলিমউল্লাহ্ উঠে পড়ল। এই বকবকানি আর শোনা যায় না। সে ঘর থেকে বের হবার আগে কবি এবং নায়েব সাহেব দু'জনকেই পা ছুঁয়ে সালাম করল। কবি খুবই বিব্রত হলেন, তবে নায়েব সাহেব এমন ভাব করলেন যেন প্রতিদিন পঞ্চাশজনের মতো তরুণ উঠতি কবি তাকে কদমবুসি করে।

পরের সপ্তাহে শাহ্ কলিমের কবিতা 'মেঘবালিকাদের দুপুর' দৈনিক পাকিস্তানের সাহিত্যপাতায় প্রকাশিত হয়। তার পরের সপ্তাহে দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত হয় একটি কাব্য নাটিকা। এর দুটি চরিত্র। একটির নাম পরাধীনতা। সে অন্ধ তরুণী। আরেকটা চরিত্রের নাম স্বাধীনতা। সে অসম্ভব রূপবান একজন যুবা পুরুষ।

শাহ্ কলিম এর পরপরই বাবরি চুল রেখে ফেলল। দাড়ি কাটা বন্ধ করে দিল। আপাতত তার প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ, তাকে যথাসময়ে আবার আনা হবে।

আজ বুধবার।

মোবারক হোসেনের ছুটির দিন। ছুটির দিনেও তিনি কিছু সময় অফিস করেন। সকাল দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত শেখ সাহেবের বাড়িতে থাকেন। সেখান থেকে সরাসরি চলে যান আমিনবাজার। সপ্তাহের বাজার আমিনবাজার থেকে করে চলে আসেন মৌলবীবাজার। সেখানে কুদ্দুস নামের একজন কসাই তাকে গরুর মাংস দেয়। বাজারের সেরা মাংস। তিনি বাসায় ফিরেন দুপুর বারোটার মধ্যে। তখন ইয়াহিয়াকে গোসল দেয়া হয়। গোসলের আগে তার গায়ে খাঁটি সরিষার তেল মাখানো হয়। তেল মাখানোর সময় সে খুব হাত-পা ছুড়ে হাসে। আবার যখন তাকে গামলার পানিতে নামানো হয়, তখন সে হাত-পা ছুড়ে কাঁদে। শিশুপুত্রের হাসি এবং কান্না দুটাই তিনি দেখতে ভালোবাসেন।

মোবারক হোসেন সপ্তাহে একদিন দুপুরে ঘুমান। ঘুম ভাঙার পর মোহাম্মদপুর যাবার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। প্রস্তুতি মানে মানসিক প্রস্তুতি। মোহাম্মদপুরের শের শাহ্ সুরী রোডে যেতে হবে মনে হলেই তিনি এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করেন। বুধবার দুপুরের ঘুমও তাঁর ভালো হয় না। ঘুমের মধ্যে বিকট এবং অর্থহীন স্বপ্ন দেখেন। একবার স্বপ্নে দেখলেন, কর্নেল শাহরুখ খানের কোলে তিনি বসে আছেন। স্বপ্নের মধ্যে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। যেন কর্নেল সাহেবের কোলে বসে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত এবং শোভন। আরেকবার স্বপ্নে দেখলেন— তিনি, কর্নেল সাহেব এবং জোহর সাহেব খেতে বসেছেন। টেবিলে আস্ত খাসির একটা রোস্ট সাজানো। সবাই সেই রোস্ট থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে খাসিটা জীবিত। যখনই তার গা থেকে মাংস ছেঁড়া হচ্ছে তখনই সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে এবং বিড়বিড় করে বলছে— আস্তে, আস্তে।

এরকম কুৎসিত এবং অর্থহীন স্বপ্ন দেখার কোনো মানে হয় না। জোহর সাহেব তার সঙ্গে খুবই সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলেন। মাঝে-মাঝে

হাসি তামাশাও করেন। সন্ধ্যাবেলা চায়ের সঙ্গে কাবাব খেতে দেন। মাঝে-মাঝে থাকে গরুর পায়া। গরম গরম রুমালি রুটি দিয়ে পায়া খেতে অতি সুস্বাদু।

জোহর সাহেব বেশিরভাগ কথাবার্তাই বলেন খাবারদাবার নিয়ে। তিনি কোথায় কখন কোন ভালো খাবারটা খেয়েছেন সেই গল্প। মিঠা কাবাব নামের একটা কাবাবের কথা তার কাছে প্রায়ই শোনা যায়। গাজরের রসে মাংস জ্বাল দেয়া হয়। তারপর সেই মাংস টুকরা টুকরা করে আগুনে ঝলসে খাওয়া। জোহর সাহেবের ধারণা, বেহেশতেও এই খানা পাওয়া যাবে কি-না সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে।

খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতি নিয়েও কথা হয়। রাজনৈতিক আলাপের সময় এই মানুষটা কোনোরকম সংশয় ছাড়া কথা বলেন। তখন তার চোখ বন্ধ থাকে। তাকে দেখে মনে হয়, তিনি যা বলছেন তা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।

বুঝলেন ইন্সপেক্টর সাহেব, একটা দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না তা সেই দেশের মানুষ কিংবা সেই দেশের কোনো বিপ্লবী নেতার উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলার উপর। ভারত চাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হোক, এতে তার সুবিধা। তার চিরশত্রু পাকিস্তানের একটা শিক্ষা হয়। পাকিস্তানের কোমর ভেঙে যায়। আরেক দিকে আছে চীন। ভারতের আরেক শত্রু। কাজেই পাকিস্তানের বন্ধু। বিরাট এক শক্তি। ১৯৬০ সনে ভারতের উপর এমন চড়াও হয়েছিল যে ভারতের বুকের রক্ত জমে পানি হয়ে গিয়েছিল। চীন কিছুতেই চাইবে না পাকিস্তান ভেঙে যাক। যেহেতু চীন চাচ্ছে না, আমেরিকাও চাইবে না। ভারতের পাশে থাকবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এইসব হিসাব-নিকাশে যে পাল্লা ভারী হবে সেই পাল্লাই... বুঝতে পারছেন?

জি পারছি।

শেখ মুজিব যদি বোকামি করেন, কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন, তাহলে কী হবে দেখা যাক। সাতদিনের মাথায় মিলিটারি বিদ্রোহ দমন করবে। ভারত যদি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে, তাহলে পনেরো দিনের মাথায় সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। অনেক বড় বড় বিপ্লবী নেতাকে তখন দেখা যাবে— 'পাক সার যামিন শাদ বাদ' গান করছেন। মানুষ সবসময় শক্তের পূজারী। দুর্বলকে মানুষ কখনো পছন্দ করে না। কেন বলুন তো?

জানি না।

কারণ বেশিরভাগ মানুষই দুর্বল। সে তার নিজের দুর্বলতা জানে। এই দুর্বলতা সে ঘৃণা করে। কাজেই অন্যের দুর্বলতাকেও সে ঘৃণা করে। Mankind abhors timidity because he is timid. এখন ইন্সপেক্টর সাহেব বলুন দেখি, শেখ মুজিব কি ভুল করবেন? স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন? ঢাল-তলোয়ার ছাড়া নিধিরাম সর্দার হতে চাইবেন।

জি করবেন। এটা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো বিকল্প নাই। মানুষ তাঁকে নেতা বানিয়েছে, মানুষের ইচ্ছাকে তাঁর দাম দিতে হবে।

স্বাধীনতার ঘোষণা যদি সত্যি সত্যি দেয়া হয়, তাহলে কী পরিমাণ মানুষ এই দেশে মারা যাবে সেই সম্পর্কে তাঁর কি কোনো ধারণা আছে? শুধুমাত্র ঢাকা শহরের রাস্তাতেই এক হাঁটু রক্ত হবার কথা। বাদ দেন এসব, যা হবার হবে। এখন বলেন আছেন কেমন?

জি ভালো।

ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী সবাই ভালো?

জি।

এদের ঢাকায় রেখে লাভ নাই। এদের কোনো নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেন।

নিরাপদ জায়গা কোনটা?

সেটাই একটা কথা, নিরাপদ জায়গাটা কী? এই বিষয়ে একটা শের আছে। পুরোপুরি মনে নাই, ভুলে গেছি। ভাবার্থ হলো—

আমাকে একটা নিরাপদ জায়গার সন্ধান
হে পারোয়ার দেগার তুমি দাও
যে নিরাপদ স্থানে প্রেম আমাকে স্পর্শ করবে না।

দুপুর বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত মোবারক হোসেন পুত্রের হাসি এবং কান্না দেখলেন। তিনি বড়ই মজা পেলেন। এই সময়টাতে তার একবারও শের শাহ্ সুরী রোডের কথা মনে পড়ল না। আজই যে সেখানে যেতে হবে এবং আজই কর্নেল সাহেব উপস্থিত থাকবেন— এটাও মনে থাকল না। অথচ তিনি খবর দিয়ে রেখেছেন। মুক্তাগাছার মণ্ডা নিয়ে আসরের নামাজের আগেই একজনের আসার কথা। কর্নেল সাহেবকে মণ্ডা খাওয়াতে হবে।

বুধবারে তাঁকে বাসায় পাওয়া যায়— এই খবরটা হয়তো প্রচার হয়ে গেছে। অনেকেই এই দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। বেশিরভাগই আসে দুপুরে

খাওয়ার সময়। আজ এসেছেন মুসলেম উদ্দিন সরকার। মোবারক হোসেনের ছোট মামা। তিনি টুকটাক ব্যবসা করেন। কোনো ব্যবসাই গোছাতে পারেন না। টাকা-পয়সার টানাটানি হলেই ভাগ্নের কাছে টাকা ধার করতে আসেন। মোবারক হোসেন প্রতিবারই বিরক্ত হন, তবে প্রতিবারই কিছু না কিছু সাহায্য করেন।

দুপুরে মোবারক হোসেন একা খেতে পছন্দ করেন। খাবার সময় কেউ সামনে থাকবে না। সবগুলি পদ হাতের কাছে সাজানো থাকবে, তিনি নিজের মতো ধীরে-সুস্থে খাওয়াদাওয়া সারবেন। তাঁর হাত ধোয়ার শব্দ শুনে একজন কেউ পিরিচে দু'টা জর্দা দেয়া পান নিয়ে আসবে।

আজ তাঁকে বাধ্য হয়ে ছোট মামাকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসতে হলো। ছোটমামা মুসলেম উদ্দিন সরকার ভাগ্নের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, তুই এমন বিরক্ত মুখ করে আমার দিকে তাকাচ্ছিস কী জন্যে ? আজ টাকা ধার করতে আসি নাই। গণ্ডগোলের বাজারে আমার ব্যবসা ভালো যাচ্ছে। ভালো পয়সা কামাচ্ছি।

এখন আপনার কিসের ব্যবসা ?

লবণের ব্যবসা আর মোমবাতির ব্যবসা। কেরোসিনের ব্যবসাতেও নামব। কেরোসিনের ব্যবসাতেও রমরমা ভাব। শুধু আল্লা আল্লা করতেছি। গণ্ডগোল আরো কিছুদিন চলুক। দুই মাস চললেই আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর। তুই রাজি থাকলে কেরোসিনের ব্যবসায় তোকে পার্টনার নিতে পারি। ফিফটি ফিফটি শেয়ার। করবি পার্টনারশিপ ব্যবসা ?

না।

আচ্ছা থাক, যে জন্যে এসেছি সেটা শোন। তোর বড় মেয়ের বিয়ে দিবি ? মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট দিবে— এখন বিয়ে দেয়া যায়। হাতে ভালো ছেলে আছে।

মোবারক হোসেন কথা বলছেন না। শুনে যাচ্ছেন। খাওয়ার সময় কথা বলতে তাঁর মোটেই ভালো লাগে না।

ছেলে অত্যন্ত ভালো। এই ছেলে হাতছাড়া করলে আল্লাহ নারাজ হবেন। সুযোগ তো তাঁরই করে দেয়া।

মোবারক হোসেন বললেন, ছেলে কী করে ?

ছেলে কিছু করে না, তবে ভবিষ্যতে বড় কিছু করবে ইনশাল্লাহ।

মোবারক হোসেন বিরক্ত চোখে তাকালেন। কী সুন্দর বিয়ের প্রস্তাব— ছেলে কিছু করে না, তবে ভবিষ্যতে বড় কিছু করবে!

মুসলেম উদ্দিন সরকার আগ্রহ নিয়ে বললেন, ছেলের বাবা-মা নাই। মা জন্মের সময় মারা গেছেন। বাবা মারা গেছেন— ছেলের বয়স যখন এগারো। ছেলে নিজের চেষ্টায়, বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায় লেখাপড়া করেছে।

মোবারক হোসেন কিছু বললেন না। কথা বলার কোনো মানে হয় না। পাত্র কিছু করে না, এতিম— এরপর আর কথা কী ?

তুই ছেলেটাকে একদিন দেখ।

প্রয়োজন দেখি না।

ছেলেটাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে তোর ভালো লাগবে। ছেলে অত্যন্ত রূপবান।

মোবারক হোসেন বললেন, অত্যন্ত রূপবানকে আমার দেখতেও ভালো লাগে না, কথা বলতেও ভালো লাগে না।

আমি তাকে আজ সন্ধ্যায় তোদের বাসায় আসতে বলেছি।

কেন ?

তোদের সঙ্গে চা খাবে।

মোবারক হোসেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, মামা শুনুন, এটা তো আপনার কেরোসিনের ব্যবসা না যে আপনি হঠাৎ কোনো এক ডিলারের কাছ থেকে একশ' টিন কেরোসিন কিনে ফেললেন। আপনি কী মনে করে কারো সঙ্গে আলোচনা না করে ছেলেকে রাতে চা খেতে বলেছেন ?

মুসলেম উদ্দিন সরকার বললেন, কারো সঙ্গে আলোচনা করি নাই— এটা তো ঠিক না। তোর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছি। বৌমা খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছে।

মোবারক হোসেন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আপনি অবশ্যই ছেলেকে না করে আসবেন।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, তুই শান্ত হ। এত রাগ করার কিছু নাই। আমি বিকালের মধ্যেই নিজে গিয়ে না করে আসব। ভালো একটা ছেলে হাতছাড়া হয়ে গেল— এটাই একটা আফসোস। বড়শিতে মাছ মারার সময় মাঝে মাঝে খুব বড় মাছ বড়শি গিলে তারপর সুতা ছিঁড়ে চলে যায়। তখন বর্শেলের আফসোসের সীমা থাকে না। আমার সে-রকম আফসোস হচ্ছে। এই মাছটা ছিল বিরাট কালবোস। কালবোস চিনিস ?

মোবারক হোসেন জবাব দিলেন না। তার খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে পান মুখে দিচ্ছেন।

কালবোস হলো রুই এবং কাতলের শংকর। বাবা হলো রুই মাছ, মা হলো কাতল মাছ। অতি স্বাদু মাছ। একটাই সমস্যা— এরা বংশবিস্তার করতে পারে না। এই জন্যেই কালবোসের সংখ্যা এত কম। হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া যায়।

মামা, আমি কিছুক্ষণ রেস্ট নেব। ফ্যান ছেড়ে শুয়ে থাকব।

আমিও চলে যাব। দেখি ছেলেকে পাই কি-না। সে থাকে পুরান ঢাকায়। গলির ভিতর গলি, তার ভিতরে গলি। বাড়ি খুঁজে পাওয়াই সমস্যা। এক কামরার একটা ঘর ভাড়া করে থাকে। ঘরে ঢুকলে মনে হয়, টিনের ট্রাংকের ভিতর ঢুকে পড়েছি।

মোবারক হোসেন শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, ছেলের সম্পর্কে আসল কথাটাই তো তোকে বলা হয় নি। গল্প-উপন্যাসে এক ধরনের ছেলের কথা থাকে যারা জীবনে কোনো পরীক্ষায় সেকেন্ড হয় না। সে-রকম ছেলে। ফিজিক্স অনার্সে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট, এমএসসি-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট, ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট। শুধু ম্যাট্রিকে সেকেন্ড হয়েছিল। ছেলের কোনো দাবি-দাওয়া নাই, শুধু তাকে ক্যাশ এগারো হাজার টাকা দিতে হবে। তার কিছু ঋণ আছে, সে ঋণ শোধ করবে। ভবিষ্যতে এই ছেলে কী করবে চিন্তা কর। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হয়ে ঢুকবে। কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়ে স্ত্রী নিয়ে চলে যাবে পিএইচডি করতে। ছেলেকে চা খেতে আসতে বলব?

মোবারক হোসেন চুপ করে আছেন।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, বলব চা খেতে আসার জন্য? আসুক না। এসে চা খেয়ে যাক। কত লোকই তো তোর এখানে এসে চা-নাস্তা খেয়ে যায়। তাতে অসুবিধা কী?

সন্ধ্যার সময় আমি থাকব না।

তাহলে একটু রাত করে আসতে বলি। আমাদের সঙ্গে রাতের খানা খাক। বলব? বেচারা দিনের পর দিন হোটেলে খায়, একবার বাড়ির খাওয়া খেয়ে দেখুক খাওয়া কাকে বলে।

মোবারক হোসেন 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বললেন না। ঘুমোতে চলে গেলেন। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। এটা খারাপ লক্ষণ। যখন প্রচণ্ড ঘুম পায় তখন বিছানায় যাওয়া মাত্র ঘুম কেটে যায়।

কর্নেল সাহেবকে আজ আরো সুন্দর লাগছে। তিনি পরেছেন ফুলতোলা হাফ হাওয়াই সার্ট। সাদা রঙের উপর হালকা সবুজ ফুল। মাথায় লাল রঙের কাপড়ের ক্যাপ। চোখ যথারীতি কালো চশমায় ঢাকা। কর্নেল সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি একজন টুরিস্ট। সমুদ্রতীরের কোনো এক শহরে বেড়াতে এসেছেন। স্ত্রীকে হোটেলে রেখে জরুরি একটা মিটিং সারতে এসেছেন। মিটিং শেষ করেই স্ত্রীর কাছে যাবেন। তারা হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের কাছে বেড়াতে যাবে। মিটিং-এ মন বসছে না বলেই তিনি বারবার আঙুল দিয়ে টেবিলে ঠকঠক করছেন।

ইন্সপেক্টর, তোমার এই মাটির হাঁড়িতে কী আছে ?

মুক্তাগাছার মণ্ডা। আপনার জন্য আনিয়েছি।

তোমার দেশের যে জিনিসটা তোমার সবচে' প্রিয় সেটা ?

ইয়েস স্যার।

থ্যাংকয়্যু। এখন বলো, কেমন আছ ?

স্যার, ভালো আছি।

আমি খবর নিয়েছি, তুমি খুব ভালোভাবে তোমার ডিউটি পালন করছ। আমি তোমার উপর খুশি। You are a good Pakistani officer.

থ্যাংকয়্যু স্যার।

তোমার সঙ্গে যে পিস্তলটা আছে, সেটা আমি রেখে দেব।

মোবারক হোসেন চিন্তিত গলায় বললেন, স্যার, আমাকে অফিসে হিসাব দিতে হবে। আপনার কাছে পিস্তল দিয়ে দিলে আমি বিপদে পড়ব।

তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না। তুমি বরং আগামীকাল তোমার অফিসে পিস্তল জমা দিয়ে দিবে।

জি আচ্ছা, স্যার।

তোমাদের এই পিস্তলগুলি পুরনো। ট্রিগার টিপলে দেখা গেল গুলি হলো না। আমি তোমাকে ভালো একটা পিস্তল দিব।

মোবারক হোসেনের পেটে কেমন যেন শব্দ হচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। পায়ের নিচটা অবশ হয়ে যাচ্ছে এরকম অনুভূতি। মনে হচ্ছে তিনি চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ধীরে ধীরে তার শরীর ডেবে যাচ্ছে। আশেপাশে কেউ নেই যে তাকে টেনে তুলবে। জোহর সাহেব অবশ্যি আছেন। তিনি আগের মতো মাথা নিচু করে সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। ক'টা সিগারেট খাওয়া হয়েছে সেই হিসাব রাখা হয় নি। কর্নেল সাহেব হঠাৎ যদি জিজ্ঞেস করেন, তিনি জবাব দিতে পারবেন না। কর্নেল সাহেব নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হবেন।

ইন্সপেক্টর।

ইয়েস স্যার।

তুমি হঠাৎ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছ। কী জন্যে ?

স্যার, আমি চিন্তিত না।

অবশ্যই তুমি চিন্তিত। তোমার কপাল ঘামছে। তুমি মনে মনে কী ধারণা করছ সেটা বলব ? তোমার ধারণা আমি নতুন পিস্তল দিয়ে তোমাকে নির্দেশ দিব— যাও, শেখ মুজিবকে খুব কাছ থেকে গুলি করো। তোমার প্রতি এটাই হাই কমান্ডের নির্দেশ। তাই ভাবছ না ?

মোবারক হোসেন তাকালেন জোহর সাহেবের দিকে। তার ঠোঁটে চাপা হাসি। এই ভদ্রলোক ক'টা সিগারেট খেয়েছেন ? কর্নেল সাহেব যদি সিগারেটের সংখ্যা জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বিপদে পড়ে যেতে হবে। হে আল্লাহপাক, কর্নেল সাহেব আজ যেন সিগারেটের সংখ্যা না জিজ্ঞেস করেন।

ইন্সপেক্টর।

ইয়েস স্যার।

আমরা এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা করলেও করতে পারি। আততায়ীর হাতে শেখ মুজিবের মৃত্যু। দলপতি শেষ মানেই দল শেষ। তবে এ ধরনের পরিকল্পনা করা হলে তার দায়িত্ব আমরা তোমাকে দিব না। তুমি বাঙালি। কোনো বাঙালিকে আমরা বিশ্বাস করি না। তোমার হাতের টিপ কেমন তাও জানি না। ভালো হবার কথা না। আমাদের দরকার সার্প শুটার। বুঝতে পারছ ?

জি স্যার।

কর্নেল সাহেব মাথা ঝাঁকালেন। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বের করে ঠোঁটে দিলেন। সিগারেট ধরালেন না। তবে তিনি সিগারেটে টান দিচ্ছেন এবং ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গি করছেন। এটা যেন এক ধরনের খেলা।

ইন্সপেক্টর।

ইয়েস স্যার।

একটা শক্তিশালী বাঘ চুপচাপ বসে আছে। তোমরা বাঘটাকে খোঁচাচ্ছ। কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছ, গায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছ। বাঘটার কানের কাছে ক্রমাগত চিৎকার করছ— 'জয় বাংলা, জয় বাংলা'। এই বাঘ তো অবশ্যই ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও। জোহর, তুমি তাকে পিস্তল আর ছয় রাউন্ড গুলি দিয়ে দাও। মিষ্টির জন্যে ধন্যবাদ।

মোবারক হোসেন রাতে বাসায় ফিরলেন জ্বর নিয়ে। জ্বর এবং তীব্র মাথার যন্ত্রণা। মুসলেম উদ্দিন ছেলেটিকে নিয়ে এসেছেন। তার নাম নাইমুল। দেখে মনে হচ্ছে ছায়ার কচুগাছ। প্রাণহীন বিবর্ণ। লম্বাতেও বেশি। স্কুলে এই ছেলেকে নিশ্চয়ই তালগাছ ডাকা হতো। মরিয়ম বেঁটে। এই তালগাছের সঙ্গে মরিয়মকে একেবারেই মানাবে না। ছেলের চোখে-মুখে উদ্ধত ভঙ্গি আছে। চোখে চোখ পড়ার পরেও চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। তাকিয়ে থাকছে।

মোবারক হোসেন তাদের সঙ্গে খেতে বসলেন, কিন্তু কিছু খেতে পারলেন না। তার জ্বর বেড়েছে। পেটে মোচড় দিচ্ছে। তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন।

মুসলেম উদ্দিন যখন তার ভাগ্নেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি-রে ছেলেটাকে পছন্দ হয়েছে ? তখন মোবারক হোসেন বললেন, ছেলে পছন্দ হয় নি। কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। ছেলের আত্মীয়স্বজনকে খবর দিন। ওদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে আমাকে এইসবের মধ্যে জড়াবেন না। বিয়ের তারিখ ঠিক করে জানাবেন। আমি খরচ দিব। ছেলে ক্যাশ টাকা যেন কত চায় ?

এগারো হাজার।

মোবারক হোসেন বললেন, এগারো হাজার টাকা দিয়ে দিব। কোনো সমস্যা নাই।

কবিতা একবার পড়লে অনেকক্ষণ মাথায় থাকে। কবিতার শব্দগুলি না থাকলেও ছন্দটা থাকে। ট্রেন চলে যাবার পরেও যেমন ট্রেনের ঝিক ঝিক শব্দ মাথায় বাজতে থাকে সে-রকম। এ ধরনের একটা ব্যাপার শাহেদের হয় তার বড় ভাইয়ের চিঠি পাওয়ার পর। চিঠিটা অনেকক্ষণ মাথায় থাকে।

ইরতাজউদ্দিন চিঠি লেখেন রুলটানা কাগজে। সাদা কাগজে তাঁর লাইন ঠিক থাকে না বলে তিনি সাদা কাগজে লিখতে পারেন না। অক্ষরগুলি বড় বড় এবং স্পষ্ট। অক্ষর যেমন স্পষ্ট চিঠির বক্তব্যও স্পষ্ট। এই মানুষটার ভেতর কোনো অস্পষ্টতা নেই।

শাহেদ তার বড় ভাইয়ের চিঠি গতকাল দুপুরে একবার পড়েছে। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় একবার পড়েছে। এখন আরেক দুপুর। শাহেদ ঠিক করেছে, আজ সারাদিনের জন্যেই সে বের হয়ে যাবে। ফিরবে সন্ধ্যার পর। এর মধ্যে একটা ফাঁক বের করে বড় ভাইজানকে লেখা চিঠিটা পোস্ট করে দেবে।

বড় ভাইজান লিখেছেন—

> প্রিয় শাহেদ, আসমানী ও রুনি, (তিনজনের নামে এক চিঠি। এই অদ্ভুত মানুষ শাহেদের বিয়ের পর কখনো শাহেদকে আলাদা চিঠি লিখেন নি। রুনির জন্মের পর সব চিঠিতেই তারা দুইজন ছাড়াও রুনির নাম আছে।)
>
> তোমাদের জন্যে অতীব দুশ্চিন্তায় আছি। সুদূর পল্লীগ্রামে আছি। শহরের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি না। লোকমুখে নানান খবরাদি পাই। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা আলাদা করিতে পারি না। দুশ্চিন্তায় কালক্ষেপণ করি। প্রতি রাতেই আলাদা করিয়া তোমাদের তিনজনের জন্যে আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোয়া করি। তাহাতেও মন শান্ত হয় না। মন যে শান্ত হয় না তাহার প্রমাণ প্রায় প্রতি রাতেই

তোমাদের নিয়া আজেবাজে স্বপ্ন দেখি। একটি স্বপ্নে দেখিলাম তুমি মা রুনিকে কোলে নিয়া দৌড়াইতেছ। তোমার পাশে রুনির স্নেহময়ী মা আসমানী। তোমাদের পিছনে ভীষণ-দর্শন একজন বলশালী পুরুষ বল্লম হাতে তোমাদের তাড়া করিতেছে। যে-কোনো মুহূর্তে সে বল্লম নিক্ষেপ করিবে এমন অবস্থা।

যদিও জানি স্বপ্ন মানবমনের দুশ্চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই না। তারপরেও চিন্তায় অস্থির হইয়াছি। এমন নজির আছে যে মহান আল্লাহপাক স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের সাবধান করিতেছেন।

ঘটনা যাহাই হউক, পত্রপ্রাপ্তির তিনদিনের মাথায় তুমি অতি অবশ্যই সবাইকে নিয়া চলিয়া আসিবা। ইহা তোমার প্রতি আমার আদেশ।

আল্লাহপাক তোমাদের সর্ব বিপদ হইতে মুক্ত রাখুন। আমিন।

ইতি
ইরতাজউদ্দিন

বড় ভাইয়ের কাছে লেখা শাহেদের চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত। সে শুধু লিখেছে—

ভাইজান, আমরা আসছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আসছি।

আসমানী বলল, এই, কোথায় যাচ্ছ ?

শাহেদ জবাব দিল না। এরকম ভাব করল যেন সে আসমানীর কথা শুনতে পায় নি। আসমানী আবারো বলল, ভরদুপুরে তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

শাহেদ এবারো জবাব দিল না। গত দুদিন ধরে সে আসমানীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। শাহেদ নিঃশব্দে ঝগড়া করার চেষ্টা করছে। সমস্যা হচ্ছে, সে কথা না বলে দীর্ঘ সময় থাকতে পারে না। আসমানী পারে। একনাগাড়ে আঠারো দিন কথা না-বলার রেকর্ড আসমানীর আছে। গিনিজ বুক অফ রেকর্ড স্বামী-স্ত্রীর কথা বলা না-বলা জাতীয় বাঙালি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। মাথা ঘামালে স্বামী-স্ত্রীর একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় কথা না-বলার রেকর্ড ধরে রাখার ব্যবস্থা করত। এবং শাহেদের ধারণা সেখানে অবশ্যই আসমানী নাম থাকত।

কথা না-বলে দিনের পর দিন পাশাপাশি বাস করা আসমানীর কাছে কিছুই না। কথা বলতে না পারলেই সে যেন ভালো থাকে। সমস্যা হয় শুধু শাহেদের। আসমানীর সঙ্গে কথা বলতে না পারলে তার পেট ফুলতে থাকে। সাত-আট ঘণ্টা পার হওয়ার পর দমবন্ধ দমবন্ধ ভাব হয়, তারপর এক সময় খুব অসহায় লাগতে থাকে। মনে হয় তার ভয়ঙ্কর কোনো অসুখ করেছে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হওয়ার অসুখ।

আটচল্লিশ ঘণ্টা হলো শাহেদ কথা না বলে আছে। দমবন্ধ স্টেজ পার করে সে এখন আছে অসহায় স্টেজে। তারপরেও ঠিক করেছে, আসমানী ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত সে কথা শুরু করবে না। আসমানীর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। চক্ষুলজ্জার জন্য পারছে না। আসমানী এখন নিজ থেকে আগ বাড়িয়ে অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলছে। আশেপাশে ঘুরঘুর করছে।

দুদিন আগের ঝগড়ার দায়দায়িত্ব বেশিরভাগই আসমানীর। শাহেদ রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে বলেছে, আসমানী, তুমি এক কাজ করো। নীলগঞ্জে ভাইজানের কাছে চলে যাও।

আসমানী বলল, কেন ?

ঢাকার অবস্থা ভালো না। লক্ষণ খুব খারাপ। কখন কী হয়! কী দরকার রিস্ক নিয়ে ?

তুমি ঢাকায় থাকবে ?

হ্যাঁ।

তুমি ঢাকায় থাকবে আর আমি চলে যাব ? ঢাকার অবস্থা আমার জন্য খারাপ আর তোমার জন্য রসগোল্লা ?

এরকম করে কথা বলছ কেন ?

কী রকম করে কথা বলছি ?

খুবই অশালীন ভঙ্গিতে কথা বলছ। যে মেয়ে ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছে, তার কথাবার্তা কি আরো শালীন হবে না ?

অশালীন কথা কোনটা বললাম ? রসগোল্লা শব্দটা অশালীন ? তাহলে শালীন শব্দ কোনটা ? পান্তুয়া ? নাকি রসমালাই ?

প্লিজ, চুপ করো।

না, আমি চুপ করব না। তুমি আমাকে ব্যাখ্যা করবে কেন ঢাকা আমার জন্যে খারাপ আর তোমার জন্যে পান্তুয়া।

শাহেদ বিরক্ত হয়ে বলেছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি থাকো। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না।

আসমানী গম্ভীর গলায় বলেছে, ঠিক করে বলো তো, কোনো কারণে কি আমাকে তোমার অসহ্য বোধ হচ্ছে ? কথায় কথায় নীলগঞ্জ চলে যাও। যেন আমি নীলগঞ্জ চলে গেলে তুমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচ। আমি একা নীলগঞ্জ গিয়ে কী করব ? তোমার মাওলানা ভাইয়ের সঙ্গে হাদিস-কোরান নিয়ে গল্প করব ?

বললাম তো যেতে হবে না।

আর আমাকে যদি যেতেই হয় আমি নীলগঞ্জ যাব কেন ? আমার কি যাওয়ার জায়গার অভাব আছে ?

সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি বাড়াবাড়ি করছ আসমানী।

শুধু আমি সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করি ? তুমি করো না ? তুমি কি সবসময় অসামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করো ? ঐ দিন চায়ে চিনি বেশি হয়েছিল বলে তুমি কি কাপসুদ্ধ চা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দাও নি ?

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হতে পারত। শেষ হলো না। আসমানী বালিশ নিয়ে উঠে গেল। শাহেদ বলল, কোথায় যাচ্ছ ?

আসমানী বলল, তা দিয়ে তোমার দরকার কী ? তুমি তোমার ঘুম ঘুমাও। আমি পাশে নেই, কাজেই রাতে ভালো ঘুম হওয়ার কথা। কে জানে হয়তো সুন্দর সুন্দর স্বপ্নও দেখবে।

আসমানী ঘুমুতে গেল বসার ঘরের সোফায়। শাহেদ এই সোফার নাম দিয়েছে 'রাগ-সোফা'। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর ঝগড়া হলে একজন কেউ সেই সোফায় গিয়ে শোয়। সেই একজনটা বেশিরভাগ সময়ই আসমানী।

আসমানী সোফায় ঘুমুতে গেছে। শাহেদ আছে বিছানায়। রুনি তার সঙ্গে। আসমানী রাগারাগি যাই করুক রুনিকে সঙ্গে নিয়ে মশার কামড় খাওয়ায় না। শাহেদ মশারির ভেতর বসে আছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, এমন কিছু ঘটে নি যে রাতে আলাদা ঘুমুতে হবে। ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি তো বটেই। আসমানী বেশ কিছুদিন থেকে বাড়াবাড়ি করছে। দেশের অনিশ্চিত অবস্থা মনের উপর চাপ ফেলে, সবাই কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক আচরণ করে। সেই যুক্তিতে আসমানীকে ক্ষমা করা যায়। পরক্ষণেই মনে হলো, প্রতিবার আগ বাড়িয়ে এত ক্ষমার দরকার কী ? সে হবে ক্ষমার সাগর আর আসমানী হবে চৌবাচ্চা। কেন ? দেখি না কথা না-বলে কত দিন থাকা যায়।

শাহেদ প্যান্ট পরতে পরতে ভাবল, কথা বলা শুরু করা যাক। এমনিতেও নিজের কোমর সরু হয়ে গেছে কিংবা প্যান্টের কোমর কোনো এক অস্বাভাবিক কারণে বড় হয়ে গেছে। বেল্ট ছাড়া পরা যাবে না। বেল্ট খুঁজে বের করা যাবে না। আসমানীকে বললে সে নিমেষে বের করে দেবে। জিনিস খুঁজে বের করার অলৌকিক ক্ষমতা আসমানীর আছে।

শাহেদ বলল, (আসমানীর দিকে না তাকিয়ে) বেল্টটা কোথায় দেখ তো।

আসমানী বলল, দেখছি, তুমি যাচ্ছ কোথায় বলো।

কাজ আছে, কাজে যাচ্ছি।

কোনো কাজে যাওয়া-যাওয়ি নেই। রুনিকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। চার দিন ধরে জ্বর চলছে। তুমি তো কপালে হাত দিয়ে মেয়ের জ্বরটা পর্যন্ত দেখ নি।

সন্ধ্যাবেলা নিয়ে যাব।

সন্ধ্যাবেলা না, এখনি নিয়ে যাবে।

এখন ডাক্তার পাব কোথায় ?

তাহলে অপেক্ষা করো, যখন ডাক্তার পাবে তখন নিয়ে যাবে। এর আগে বেরুতে পারবে না।

আসমানী, তোমার কি মনে হয় না তুমি বাড়াবাড়ি করছ ?

বাড়াবাড়ি করলে করছি, তুমি বেরুতে পারবে না। আমি তোমাকে যেতে দেব না।

শাহেদ শান্তমুখে জুতার ফিতা লাগাচ্ছে। জুতার ফিতা লাগানোর সহজ কাজটা সে কখনো ঠিকমতো করতে পারে না। কীভাবে কীভাবে প্যাঁচ লেগে আস্কা গিট্টু হয়ে যায়। এবারো বোধহয় হয়ে গেল।

আসমানী শীতল গলায় বলল, তুমি তাহলে বেরুচ্ছ ?

হুঁ।

বেশ, যাও, বাসায় ফিরে এসে কিন্তু আমাকে দেখবে না।

তুমি যাবে কোথায় ?

যেখানে ইচ্ছা যাব, তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

বেল্ট খুঁজে দিতে বলছি, খুঁজে দাও।

বেল্টটা খুঁজে বের করতে পারব না। তুমি খুঁজে নাও। তুমি অন্ধ না, তোমার চোখ আছে।

শাহেদ ঘর থেকে বের হলো মন খারাপ করে। আসমানী অবুঝের মতো আচরণ করছে। এরকম সে কখনো ছিল না। তার হয়েছেটা কী? না-কি সমস্যা তার? সে এমন কিছু করছে যে আসমানী রেগে যাচ্ছে? দু'জনের কেউ কাউকে বুঝতে পারছে না।

বাসায় ফিরতে ফিরতে শাহেদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে এবং সে নিশ্চিত বাসায় ফিরে দেখবে দরজায় তালা ঝুলছে। আসমানী রুনিকে নিয়ে চলে গেছে। তখন আবার বের হতে হবে তাদের খোঁজে। ঢাকায় মা-বাবা ছাড়াও আসমানীর বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। সে এমন একজনের বাড়িতে উঠবে যার ঠিকানা শাহেদ জানে না। দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ। যে-কোনো সময় শহরে মিলিটারি নেমে যাবে। অতি যে মূর্খ সেও এই সত্যটা খুব ভালো করেই জানে। জানে না শুধু আসমানী। সে ফট করে রিকশা নিয়ে বের হয়ে পড়বে। এই সময়ে আর যাই করা যাক ছেলেমানুষি করা যায় না। আসমানী বেছে বেছে ছেলেমানুষি করার জন্য এই সময়টাই বেছে নিয়েছে। আশ্চর্য এক মেয়ে!

রাস্তায় পা দিয়েই শাহেদের মন ভালো হয়ে গেল। ব্যাপারটা সে আগেও লক্ষ করেছে— ইদানীং উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে তার ভালো লাগে। এর কারণ কী হতে পারে? নগরী কোনো বিশেষ ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই প্রস্তুতি কাছ থেকে দেখার আনন্দ? নগরীর উত্তেজনার সাক্ষী হবার আনন্দ? নগরীর মানুষরা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে, সেই কাছাকাছি আসার আনন্দ?

বড় বড় উৎসবের আগে আগে এই ঘটনাগুলি ঘটে। কোরবানির ঈদে গরু কিনে পথে হাঁটার সময় অপরিচিতজনরা আনন্দের সঙ্গে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কত দিয়ে কিনলেন? দাম শোনার পর খুশি খুশি গলায় বলে, ভাই আপনি জিতেছেন। গরু মাশাল্লাহ্ ভালো হয়েছে।

ঠিক এইরকম ব্যাপার এখন ঘটছে। যে দোকানে চাল-ডাল কিনতে যাচ্ছে তাকে নিতান্ত অপরিচিত মানুষ অন্যদের সঙ্গে উপদেশ দিচ্ছে— কেরোসিন বেশি করে কিনে রাখেন। কেরোসিনের শর্টেজ হবে। কেরোসিন, দেয়াশলাই আর মোমবাতি।

চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে পাশ থেকে কেউ একজন অবধারিতভাবে জিজ্ঞেস করবে, ভাইসাহেব, দেশের অবস্থা কী বুঝেন? দেশ কি স্বাধীন হবে— আপনার কী ধারণা? দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে দীর্ঘ আলোচনা চলে। আশপাশের লোকজনও তাতে অংশ নেয়। এক সময় আলোচনা ঐকমত্যে শেষ হয়। দেশ যে স্বাধীন হবে— এই বিষয়ে সবাই একশ' ভাগ নিশ্চিত হয়। এই উপলক্ষে আরেক দফা চা খাওয়া হয়।

নগরী স্বাধীনতার জন্যে অপেক্ষা করছে। এই অপেক্ষা খুব কাছ থেকে দেখা এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। শাহেদ মনের আনন্দে দুপুর একটা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরল।

রোদ উঠেছে কড়া। ঘামে শরীর ভিজে গেছে। বাসায় গিয়ে সাবান ডলে গোসলটা আরামদায়ক হবে কিন্তু শাহেদের বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। আসমানীর কাছে রাগ দেখাতে ইচ্ছা করছে। সে যদি রাত বারোটা পর্যন্ত বাইরে থাকে তাহলে রাগ দেখানোটা জমবে।

শাহেদ রিকশা নিয়ে নিল। সে যাবে আগামসি লেনে। সেখানে দুটা রুম ভাড়া করে তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাইমুল থাকে। তার সঙ্গে অনেক দিন যোগাযোগ নেই। নাইমুলের সমস্যা হলো, সে নিজ থেকে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। অন্যদের তার কাছে যেতে হবে।

প্রচণ্ড বেগে মধ্যবয়স্ক রিকশাওয়ালা ঝড়ের মতো রিকশা টানছে। শাহেদ বলল, কোনো তাড়াহুড়ো নাইরে ভাই, রিকশা আস্তে চালাও। রিকশার গতি তাতে কমল না। রিকশাওয়ালা দাঁত বের করে বলল, টাইট দিয়া বসেন, উড়াল দিয়া নিয়া যাব।

শাহেদ বলল, উড়াল দেয়ার দরকার নাই। এক্সিডেন্ট করবে। জানে মরব। এখন মরে গেলে স্বাধীন দেশ দেখে যেতে পারব না।

স্বাধীন তাইলে আইতেছে কী কন স্যার ?

আসছে তো বটেই।

আইজ শেখ সাব স্বাধীন ডিক্লার দিব।

কে বলেছে ?

এইটা সবেই জানে।

রিকশাওয়ালা রিকশার গতি কমাল। সম্ভবত স্বাধীনতা নিয়ে যাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগছে।

স্বাধীন হইলে আমরার মতো গরিবের দুঃখ-কষ্ট কিছু থাকব না, কী কন স্যার ?

থাকার তো কথা না।

খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় সব দিব ইসটেট। ঠিক না স্যার ? সবই ফিরি।

শাহেদ চুপ করে রাইল। স্বাধীনতার এই চিত্রটা নিয়ে আলোচনায় না যাওয়াই ভালো।

শেখ সাব একটা বাঘের বাচ্চা। কী কন স্যার ?

অবশ্যই বাঘের বাচ্চা।

খাঁটি মায়ের খাঁটি দুধ খাইয়া বড় হইছে। কী কন স্যার ?

অবশ্যই।

জীবনে একটা শখ ছিল শেখ সাবরে একদিন আমার রিকশায় তুলব। বিষ্যুদবার হাইকোর্টের মাজারে গিয়া দোয়াও করছি। জানি না দোয়া কবুল হইব কি না।

শাহেদ বলল, সৎ দোয়া সৎ ইচ্ছা সব সময় কবুল হয়।

আগামসি লেনে নেমে শাহেদ ভাড়া দিতে গেল। রিকশাওয়ালা ভাড়া নিবে না। শাহেদ বলল, ভাড়া নিবে না কেন ? রিকশাওয়ালা বলল, স্বাধীন হইলে তো সবই ফিরি হইব। ধরেন দেশ স্বাধীন হইছে।

শাহেদ রিকশাওয়ালার দিকে তাকিয়ে আছে। এর চেহারা মনে রাখা দরকার। দেশ যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়, তখন একে খুঁজে বের করতে হবে।

ভোঁতা পাথরের মতো মুখ। মাথার চুল খাবলা-খাবলাভাবে উঠে গেছে। কোনো একজন বিখ্যাত লোকের চেহারার সঙ্গে রিকশাওয়ালার চেহারার মিল আছে। সেই লোকটাকে মনে পড়ছে না। রিকশাওয়ালা হাসিমুখে বলল, এমন নজর কইরা কী দেখেন ?

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শাহেদের বিখ্যাত লোকের নামটা মনে পড়ল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন।

নাইমুলের ঘরের দরজা বন্ধ। কড়ায় ঝাঁকুনি দিতেই নাইমুল বলল, দরজা খোলা আছে। জোরে ধাক্কা দিলেই খুলবে। ভেতরে চলে আয়।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শাহেদ বলল, আমি কড়া নাড়ছি বুঝলি কী করে ? তুই তুই করছিলি। অন্য কেউ তো হতে পারত।

নাইমুল বলল, অনুমানে বলেছি। সাত-আট দিন পর পর তোর দেখা পাওয়া যায়। আজ নাইনথ ডে।

নাইমুল খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বিছানায় শুয়ে আছে। তার মুখের উপর বিশাল সাইজের একটা বই ধরা। সতীনাথ ভাদুড়ির গ্রন্থাবলি। ঘর খুবই ছোট। কোনোমতে একটা খাট এবং একটা চেয়ার-টেবিল এঁটেছে। ঘরে একটা আলনা আছে, সেই আলনা বসানো আছে খাটের মাথায়। সেই কারণে খাট ছোট হয়ে গেছে। নাইমুলের মতো লম্বা মানুষ পা মেলে ঘুমুতে পারে না, তাকে পা

খানিকটা গুটিয়ে রাখতে হয়। তবে ঘরের সিলিং অনেক উঁচুতে। সেই উঁচু সিলিং থেকে লম্বা রডের মাথায় ফ্যান ঘুরছে। নাইমুল বই থেকে চোখ না সরিয়ে বলল— কোনো কথা না। স্ট্রেইট বাথরুমে চলে যা। বালতিতে পানি তোলা আছে। সাবান আছে, গামছা আছে, একটা লুঙ্গিও আছে। আরাম করে গোসল কর। তারপর কথা হবে।

শাহেদ বলল, বাসায় গিয়ে গোসল করব।

যা বলছি শোন। তোর ঘামে ভেজা শরীর দেখে আমারই অস্বস্তি লাগছে।

শাহেদ বাথরুমে ঢুকে পড়ল। গায়ে পানি ঢালার পর তার মনে হলো, দীর্ঘ একত্রিশ বছর জীবনে সে এত আরামের গোসল কোনো দিনও করে নি।

নাইমুল বলল, এই গাধা, গোসল করে আরাম পাচ্ছিস?

শাহেদ বলল, পাচ্ছি।

নাইমুল বলল, দুই বালতি পানি আছে। প্রথম বালতি পানি গায়ে ঢেলে শরীর ঠাণ্ডা কর। শরীর পুরোপুরি ঠাণ্ডা হবার পর গায়ে সাবান মাখবি। তাড়াহুড়ার কিছু নেই, ধীরে সুস্থে সাবান মাখ। তারপর সেকেন্ড বালতি। দুপুরে কি আমার এখানে খাবি?

খেতে পারি।

তাহলে তোকে আজ ইলিশ মাছের ডিম খাওয়াব। এই ডিম খাওয়ার পর পৃথিবীর কোনো খাবার তোর মুখে রুচবে না।

ডিম কে রাঁধছে?

গনি মিয়া বাবুর্চি। হোটেলে বলা আছে। খাওয়া যথাসময়ে চলে আসবে। হড়বড় করে পানি ঢালছিস কেন? আস্তে আস্তে ঢাল। শরীর আরাম পাক।

শাহেদ গায়ে পানি ঢালছে। আরামে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা করছে বাথরুমের ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমায়। সে ঘুমাবে কেউ একজন গায়ে পানি ঢালবে। নাইমুলের গলা শোনা গেল— শাহেদ, তোকে বলা হয় নি। আমি বিয়ে করছি।

শাহেদ বলল, সে কী!

নাইমুল বলল, চমকে উঠলি কেন? আমি চিরকুমার থাকব— এরকম তো কখনো বলি নি।

মেয়ে দেখা হয়েছে?

হুঁ। চাকমা টাইপ চেহারা।

বলিস কী! মেয়েও ঠিক হয়ে গেছে? আমরা কিছুই জানলাম না।

বিয়ে করব আমি, তোদের জানার দরকার কী ?

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে ?

হ্যাঁ।

কবে ?

আজ।

ঠাট্টা করছিস ?

আমি জীবনে কখনো কারো সঙ্গে ঠাট্টা করেছি— এরকম উদাহরণ আছে ?

বিয়ে কখন ?

রাতে। কাজি ডাকিয়ে বিয়ে। কবুল কবুল কবুল— ঝামেলা শেষ।

শাহেদ গায়ে পানি ঢালা বন্ধ করল। তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাইমুল। আজ রাতে তার বিয়ে— এই খবরটা জানানোর প্রয়োজনও সে বোধ করে নি। নাইমুল সবসময় এরকম। সে কি আসলেই এরকম, না-কি এটা তার এক ধরনের 'শো' ? সবাইকে জানানো— তোমরা আমাকে দেখ, আমি নাইমুল, আমি জীবনে কখনো কোনো পরীক্ষায় সেকেন্ড হই নি। আমি তোমাদের মতো না। আমি আলাদা।

শাহেদ!

বল।

মেয়ের নাম মরিয়ম। আমি ঠিক করেছি শর্ট করে তাকে ডাকব মরি।

ভালো তো ।

আমার শ্বশুরসাহেব পুলিশের লোক। তার নাম মোবারক হোসেন।

তুই কি সত্যিই আজ বিয়ে করছিস ?

হ্যাঁ। আজ বিয়ে করাটাই আমার জন্যে সুবিধা। আজ বিশেষ দিন। ৭ই মার্চ। শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। এক সময় এই দিনটি আমাদের জাতীয় দিবস হয়ে যাবে। সরকারি ছুটি থাকবে। আমি আমার ম্যারেজ ডে কখনো ভুলব না। ভালো কথা, তুই কি শেখ সাহেবের ভাষণ শুনতে যাবি ?

হ্যাঁ।

কী দরকার ? রেডিওতে প্রচার হবে, রেডিও শোন। ক্রিকেট খেলা এবং ভাষণ— এইসব রেডিওতে শোনা ভালো।

শাহেদ বাথরুম থেকে বের হলো। নাইমুলের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, গোসল করে আরাম পেয়েছি।

নাইমুল মুখের উপর ধরে রাখা বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, আরাম পাবি জানতাম।

শাহেদ বলল, আমি এখন যাচ্ছি।

নাইমুল বিস্মিত গলায় বলল, যাচ্ছি মানে কী ?

যাচ্ছি মানে যাচ্ছি।

ভাত খাবি না ?

না।

তুই কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস না-কি ?

রাগ করব কেন ? রাগ করার মতো তুই তো কিছু করিস নি।

এই যে তোকে কোনো খবর না দিয়ে বিয়ে করে ফেলছি। আসলে বিয়ের মতো পার্সোনাল কোনো ব্যাপার নিয়ে আমি ঢাক পিটাতে চাই না। এমন তো না যে তুই আমার স্বভাব জানিস না।

শাহেদ কিছু না বলে দরজার দিকে এগুচ্ছে। নাইমুল বলল, সাতটার আগে চলে আসিস, বরযাত্রী যাবি। ধীরেন স্যারের কাছে যাব। উনাকেও বলব, বরযাত্রী যেতে। আমার ধারণা স্যারকে বললেই তিনি যাবেন। তোর কী ধারণা ?

শাহেদ জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সে আহত এবং অপমানিত বোধ করছে। নাইমুল তাকে খবর না দিয়ে বিয়ে করে ফেলছে ? শাহেদের গা জ্বালা করছে।

শাহেদ রেসকোর্সের দিকে এগুচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্সের ময়দানে ভাষণ দেবেন। তিনি কী বলেন তা শোনা অতি জরুরি। ঘরে বসেও শোনা যেত, রেডিওতে ভাষণ প্রচার করা হবে। তবে কিছুই বলা যায় না। হঠাৎ হয়তো ভাষণ বন্ধ করে ইয়াহিয়া খান রাস্তায় মিলিটারি নামিয়ে দেবে। সেই প্রস্তুতি তাদের নেওয়া আছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বদল হয়েছে। ভাইস এডমিরাল এস এম আহসানের বদলে নতুন গভর্নর হয়ে এসেছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। টিক্কা খান, নামটাই তো ভয়াবহ। ইয়াহিয়া তাকে শুধু শুধু নিয়ে আসছে না। তার মাথায় অন্য পরিকল্পনা। যে-কোনো দিন এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হবে। কী ভয়ঙ্কর যে হবে সেই দিন কে জানে! ডুমস ডে। দেশের বেশিরভাগ মানুষ ডুমস ডের ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। তারা কল্পনা করছে স্বাধীন দেশে বাস করছে। স্বাধীনতা এত সস্তা না।

রেসকোর্সের ময়দানে মানুষের স্রোত নেমেছে। তারা চুপচাপ চলে আসছে তা না। স্লোগান দিতে দিতে এগুচ্ছে— 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ

স্বাধীন করো।' 'ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' 'পরিষদ না রাজপথ—রাজপথ, রাজপথ।' 'তোমার আমার ঠিকানা— পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।' ঢাকায় যত মানুষ ছিল সবাই বোধহয় চলে এসেছে। লাখ লাখ মানুষ। যেদিকে চোখ যায় শুধু মানুষের মাথা। অনেকে আবার বাচ্চাকাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ঘোমটা দেওয়া বৌরাও আছে। তারা চোখ বড় বড় করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বাবার ঘাড়ে বসে একটা বাচ্চা মেয়ে ট্যা ট্যা করে কাঁদছে। মেয়েটার মাথায় চুল বেণি করা। বেণির মাথায় লাল ফিতা বাঁধা। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটা মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর তার বেণি নাড়ছে। সুন্দর লাগছে দেখতে। শাহেদ মুগ্ধ চোখে মেয়েটির বেণি নাড়ানো দেখল। তার মনে হলো রুনিকে নিয়ে এলে হতো। তাকে ঘাড়ে বসিয়ে মানুষের সমুদ্রের এই অসাধারণ দৃশ্য দেখানো যেত। এই দৃশ্য দেখাও এক পরম সৌভাগ্য। পৃথিবীর কোথাও কি এত মানুষ কখনো একত্রিত হয়েছে?

ভাষণ শুরু হওয়ার আগে আগে দুটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল। মানুষের সমুদ্রে একটা ঢেউ উঠল। চাপা আতঙ্কের ঢেউ। শাহেদের পাশে বুড়োমতো এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা ছাতা। ছাতাটাকে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরে আছে সে, যেন এক্ষুণি যুদ্ধ শুরু হবে। সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে ছাতা হাতে। বুড়ো শাহেদের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, আইজ শেখসাব স্বাধীন ডিক্লার দিব। বলেই সে থু করে পানের পিক ফেলল। সেই পিক পড়ল শাহেদের প্যান্টে। সাদা প্যান্টে লাল পানের পিক, মনে হচ্ছে রক্ত লেগে গেছে। শাহেদ কঠিন কিছু কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ভাষণ শুরু হয়ে গেল। চারদিকে ভয়াবহ নীরবতা, লাখ লাখ মানুষ নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। তারা তাদের মহান নেতার প্রতিটি শব্দ শুনতে চায়। কোনো কিছুই যেন বাদ না পড়ে।

মাঝে মাঝে শেখ মুজিব দম নেবার জন্যে থামছেন আর তখনই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠছে— 'জয় বাংলা!' 'জয় বাংলা!'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভরাট গলা ভেসে আসছে। মাথার উপরে চিলের মতো উড়ছে হেলিকপ্টার। শাহেদ ভাষণ শুনছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। আজই ঘটে যাবে না তো? হয়তো আজই ফেলে দিল হেলিকপ্টার থেকে কিছু বোমা।

> আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বুঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা আমার ভাইয়ের রক্তে

> রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম ? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলব।...

হেলিকপ্টার বড় যন্ত্রণা করছে। এরা কী চাচ্ছে ? বাচ্চা মেয়েটা কাঁদতে শুরু করেছে। মনে হয় সে ভয় পাচ্ছে।

ভাষণ শেষ হবার পর শাহেদ কি ফিরে যাবে বন্ধুর কাছে ? আজ তার বিয়ে। সেই বিয়েতে শাহেদ অবশ্যই অনুপস্থিত থাকতে পারে না। তার উপর রাগ হচ্ছে। রাগ চাপা থাক। রাগ দেখানোর সময় আরো পাওয়া যাবে। এ-কী, সে ভাষণ না শুনে মনে মনে কী সব ভাবছে ? নেতার প্রতিটি কথা খুব মন দিয়ে শুনতে হবে। এই ভাষণে অনেক সাংকেতিক নির্দেশও থাকতে পারে।

> সৈন্যরা তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

শাহেদ গভীর মনোযোগে বক্তৃতা শোনার চেষ্টা করছে। অতিরিক্ত মনোযোগের কিছু সমস্যা আছে— মাঝে-মাঝে সব আবছা হয়ে যায়। মানুষের মস্তিষ্ক এত মনোযোগ নিতে পারে না। সে কিছু সময়ের জন্যে বিশ্রাম নেয়।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল। কোমরে ধুতি পেঁচানো খালি গায়ের যে মানুষটি দরজা খুললেন— তাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের প্রফেসর এখন অবসর জীবনযাপন করছেন। সময় কাটছে বই পড়ে। সকালে নাশতা খেয়ে তিনি বই পড়া শুরু করেন। দুপুরের খাবারের পর কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমুতে যান। ঘুম ভাঙার পর আবার বই পড়া শুরু হয়। শেষ হয় রাতে ঘুমুতে যাবার সময়। তাঁর অবসর জীবন বড়ই আনন্দে কাটছে।

নাইমুল নিচু হয়ে তার অতি পছন্দের মানুষের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করতে করতে বলল, স্যার কি ঘুমাচ্ছিলেন ? ঘুম থেকে তুললাম ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী আসলেই ঘুমুচ্ছিলেন। এই কথা শুনলে ছাত্র যদি অস্বস্তি বোধ করে সে কারণেই তিনি হাসিমুখে অবলীলায় মিথ্যা বললেন, আরে না। এই সময় কেউ ঘুমায় না-কি ?

নাইমুল বলল, স্যার, আমাকে চিনতে পেরেছেন ?

আরে চিনব না কেন ? অবশ্যই চিনেছি। আসো, ভিতরে আসো। তুমি আছ কেমন, ভালো ?

নাইমুল বলল, স্যার আজও যদি আমাকে চিনতে না পারেন, তাহলে ঘরে ঢুকব না। এর আগে যে কয়বার এসেছি, কোনোবারই আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি অথচ ভাব করেছেন যে চিনে ফেলেছেন।

অবশ্যই চিনেছি।

তাহলে আপনি আমার নাম বলুন।

দাঁড়াও, চশমাটা পরে আসি। চশমা ছাড়া দূরের জিনিস কিছুই দেখি না।

নাইমুল হাসিমুখে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী শোবার ঘর থেকে চশমা পরে এলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ নাইমুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নাম শাহেদ। হয়েছে ?

নাইমুল ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ফিফটি পারসেন্ট কারেক্ট হয়েছে স্যার।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, ফিফটি পারসেন্ট কীভাবে কারেক্ট হবে ?

আমার নাম নাইমুল। আপনি শাহেদের নাম বলেছেন। শাহেদ আমার বন্ধু। তাকে নিয়ে আপনার কাছে তিন-চারবার এসেছি। আপনি শাহেদের নাম মনে রেখেছেন। অথচ সে আপনার ছাত্র না। আমি আপনার ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট।

শাহেদ আছে কেমন ?

ভালো আছে।

তাকে আনলে না কেন ? তোমার একা আসা উচিত হয় নি। তাকে সঙ্গে করে আনা উচিত ছিল।

নাইমুল বলল, তাকে আনা উচিত ছিল কেন স্যার ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তাঁর ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন। ছাত্ররা মাঝে-মাঝে তাকে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে।

নাইমুল, চা খাবে ?

খাব।

যাও, রান্নাঘরে চলে যাও। পানি গরমে দাও। চায়ের সঙ্গে আজ তোমাকে অসাধারণ একটা জিনিস খাওয়াব। তিলের নাড়ু। তুমি কতক্ষণ থাকবে এখানে ?

ঘন্টাখানিক। আমি সাতটার সময় চলে যাব।

ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা নেই।

আমি আপনার কাছে বিশেষ একটা কাজে এসেছি স্যার।

কী কাজ ?

আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। আমার মুরুব্বি কেউ ঢাকায় নেই। আপনি আমার সঙ্গে গার্জিয়ান হিসেবে যাবেন।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বললেন, অবশ্যই অবশ্যই।

অবশ্যই অবশ্যই বলা তাঁর মুদ্রাদোষ। কোনো কথা না শুনেই তিনি বলেন অবশ্যই অবশ্যই। ইউনিভার্সিটিতে তাঁর নাম ছিল 'অবশ্যই স্যার'।

নাইমুল বলল, স্যার, আপনি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনেছেন ?

কোন কথার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছ ?

এই যে আমি বললাম, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, আপনি আমার গার্জিয়ান।

অবশ্যই মন দিয়ে শুনেছি। এবং তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি— এখন তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি যখন বললে নাম নাইমুল, তখনো চিনতে পারি নি। এখন তোমার কথা বলার ধরন থেকে চিনেছি। তুমি তো কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়েছ ?

জি স্যার। এবারডিন ইউনিভার্সিটিতে আমার প্লেসমেন্ট হয়েছে শুধুমাত্র আপনার একটা চিঠির কারণে।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিস্মিত হয়ে বললেন, চিঠি কখন লিখলাম?

চা খেতে খেতে নাইমুল স্যারের সঙ্গে গল্প শুরু করল। গল্প করার সময় সাধারণত মুখোমুখি বসা হয়। ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর বিচিত্র স্বভাবের একটি হচ্ছে, তিনি তার ছাত্রদের সঙ্গে গল্প করার সময় তাদের নিজের বাঁ পাশে বসান। এবং বেশিরভাগ সময় তাঁর বাঁ হাত ছাত্রের পিঠের উপর রাখেন। নাইমুলের ধারণা— স্যার মুখ দেখেন না বলেই ছাত্রদের কখনোই চিনতে পারেন না। তবে যে-কোনো ছাত্রের পিঠে হাত দিয়ে তিনি নাম বলতে পারবেন।

স্যার, আমি একটা বিশেষ দিনে বিয়ে করছি। সেটা কি বুঝতে পারছেন?

বিশেষ দিনটা কী?

আজ সাতই মার্চ।

সাতই মার্চ বিশেষ দিন কেন?

স্যার, আপনি নিজে একটু চিন্তা করে বলুন তো সাতই মার্চ কেন বিশেষ দিন।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় ভুরু কুঁচকে সামান্য চিন্তার ভেতর দিয়ে গেলেন। নাইমুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, সাত হলো একটা প্রাইম নাম্বার। মৌলিক সংখ্যা। মার্চ মানে তিন। তিন আরেকটা প্রাইম নাম্বার। এই জন্যেই দিনটা বিশেষ দিন। হয়েছে?

হয় নি স্যার। আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিবেন। হয়তো ইতিমধ্যে দিয়েও ফেলেছেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা? বলো কী? ইন্টারেস্টিং তো!

যদিও তিনি যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ইন্টারেস্টিং তো, নাইমুল জানে তিনি মোটেই ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন না। এই মানুষটার কাছে পদার্থবিদ্যার যে-কোনো সমস্যা জাগতিক সমস্যার চেয়ে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।

নাইমুল বলল, দেশ, রাজনীতি— এইসব নিয়ে আপনি কি কখনোই কিছু ভাবেন না?

কে বলল ভাবি না? ভাবি তো। প্রায়ই ভাবি।

মোটেও ভাবেন না। আপনার সমস্ত ভুবন জুড়ে আছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। আপনি এর বাইরে কোনো কিছু নিয়েই ভাবেন না।

সেটা কি দোষের ?

জি স্যার দোষের। আপনি দেশ বা রাজনীতির বাইরের কেউ না। আপনি সিস্টেমের ভেতর আছেন।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী শান্ত গলায় বললেন, নাইমুল, তোমার কথার কাউন্টার লজিক কিন্তু আছে। সবার কাজ কিন্তু ভাগ করা। একদল মানুষ যুদ্ধ করবেন, তারা যোদ্ধা। একদল রাজনীতি করবেন। তারা সেটা বুঝেন। অর্থনীতিবিদেরা দেশের অর্থনীতি নিয়ে ভাববেন। আমি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার লোক, আমি সেটা নিয়ে ভাবব। তুমি যে সিস্টেমের কথা বললে— এসো সেই সিস্টেম সম্পর্কে বলি। সিস্টেম কী ? সিস্টেম হলো, Observable part of an experiment. একগ্লাস পানিতে আমি এক চামচ সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে দিলাম। এখন আমার সিস্টেম হলো, গ্লাসে রাখা লবণের দ্রবণ। তর্কের খাতিরে ধরে নেই এটা একটা Closed System.

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রবল আগ্রহে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তৃতার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি একগাদা ছাত্র-ছাত্রীর সামনে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অতি জটিল কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করছেন। নাইমুল এক ফাঁকে ঘড়ি দেখল। হাতে সময় আছে। স্যারকে মনের আনন্দে আরো কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এই মানুষটার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। সবাই হয় ইন্ডিয়া কিংবা আমেরিকায় চলে গেছে। এই মানুষটা ওয়ারির তিন কামরার ছোট্ট বাড়ি কামড়ে পড়ে আছে। তাঁর একটাই কথা— নিজের বাড়ি-ঘর দেশ ছেড়ে আমি যাব কোথায় ? আমি কেন ইন্ডিয়াতে যাব ? আমার জন্ম হয়েছে এই দেশে। দেশ ছেড়ে চলে যাব ? আমি কি দেশের এত বড় কুসন্তান ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত ভোকসওয়াগন গাড়ি বের করলেন। নাইমুল বলল, রিকশায় করে গেলে কেমন হয় স্যার ?

রিকশায় করে যাবে কেন ? আজ তোমার বিয়ে।

আপনার সঙ্গে গাড়িতে করে যেতে ভয় লাগে স্যার। আপনি নিজের মনে গাড়ি চালান। রাস্তার দিকে তাকান না।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিস্মিত হয়ে বললেন, নাইমুল, আমার সম্পর্কে তোমাদের ভুল ধারণা আছে। আমি অত্যন্ত সাবধানী চালক। এখন পর্যন্ত আমি গাড়িতে কোনো একসিডেন্ট করি নি।

গাড়িতে একসিডেন্ট করেন নি, তাঁর কারণ কিন্তু স্যার আপনার ড্রাইভিং না।

তাহলে কী ?

আপনি গাড়ি নিয়ে কখনো বের হন না। ঘরেই থাকেন। আমি নিশ্চিত, আপনি গত তিন মাসে আজ প্রথম গাড়ি বের করেছেন।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি তর্ক-প্রিয় হয়ে যাচ্ছ। তর্ক ভালো জিনিস না।

গাড়িতে উঠেই তাঁর বিরক্তি অতি দ্রুত কেটে গেল। তিনি গভীর আগ্রহে Kaluza-klein theory সম্পর্কে বলতে লাগলেন। নাইমুল, মন দিয়ে শোন কী বলি— Kaluza তাঁর পেপার পাঠালেন আইনস্টাইনের কাছে। তারিখটা মনে রাখ— এপ্রিলের একুশ, সনটা খেয়াল করো— উনিশ শ' উনিশ। Kaluza সেই পেপারে পাঁচটা ডাইমেনশনের কথা প্রথম বললেন। এর আগে আইনস্টাইন চারটা ডাইমেনশনের কথা বলেছিলেন। Kaluza কী করলেন— ডাইমেনশন একটা বাড়ালেন। আইনস্টাইন বলেছিলেন— না, পেপার গ্রহণযোগ্য না।

নাইমুল বলল, স্যার, আপনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন না। আমার দিকে তাকিয়ে চালাচ্ছেন।

আমি ঠিকই গাড়ি চালাচ্ছি— তুমি মন দিয়ে শোন কী বলছি। অক্টোবরের ১৪ তারিখ উনিশ শ' একুশ সনে ঠিক দু'বছর পর আইনস্টাইন তাঁর মত বদলালেন। তিনি Kaluza-র পেপার একসেপ্ট করলেন। অরিজিনাল সেই পেপার আমি জোগাড় করেছি। পেপারটা জার্মান ভাষায়। আমার এখন দরকার ভালো জার্মান জানা লোক। তোমার খোঁজে কি জার্মান জানা লোক আছে?

নাইমুলের মজা লাগছে। কী অদ্ভুত মানুষ! জগতের কোনো কিছুর সঙ্গেই এই মানুষটির যোগ নেই। রাস্তায় জনস্রোত। অদ্ভুত অদ্ভুত স্লোগান হচ্ছে—

> ইয়াহিয়া ভুট্টো দুই ভাই
> এক দড়িতে ফাঁসি চাই॥
>
> ইয়াহিয়ার চামড়া
> তুলে নিব আমরা।
>
> বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
> ইয়াহিয়াকে খতম করো॥

অথচ ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর দৃষ্টি একবারও সেদিকে যাচ্ছে না। তাঁর জগৎ Kaluza-র পঞ্চম ডাইমেনশনে আটকে গেছে।

নাইমুল!

জি স্যার।

তুমি সত্যি সত্যি একা বিয়ে করতে যাচ্ছ— এটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা।

একা তো যাচ্ছি না। আপনিও যাচ্ছেন। আমি আমার দু'জন আত্মীয়কেও খবর দিয়েছি, তারাও চলে আসবেন। সরাসরি মেয়ের বাড়িতে চলে যাবেন।

তাহলে বরযাত্রীর মোট সংখ্যা দাঁড়াল চার। আরেকজন হলে ভালো হতো।

ভালো হতো কেন স্যার? Kaluza সাহেবের থিওরিতে পাঁচটা ডাইমেনশন, আমার বিয়েতেও বরযাত্রী পাঁচজন এই কারণে?

ঠিক ধরেছ। তোমার বুদ্ধি ভালো। আমি তোমার বুদ্ধি দেখে খুশি হয়েছি।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ছাত্রের বুদ্ধিতে এতই খুশি হলেন যে গাড়ি নিয়ে রাস্তার পাশের নর্দমায় পড়ে গেলেন।

অনেক ঠেলাঠেলি করেও গাড়ি সেখান থেকে উঠানো গেল না। তিনি হতাশ গলায় ছাত্রকে বললেন, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটা রিকশা করে চলে যাও। আমাকে ঠিকানা দিয়ে যাও। আমি গাড়ি উঠানোর ব্যবস্থা করে চলে আসব।

নাইমুল বলল, আমি আপনাকে রেখে একা একা চলে যাব?

অবশ্যই যাবে। তুমি হচ্ছ বর। সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমার দেরি হলে সবাই দুশ্চিন্তা করবে। বিশেষ করে মেয়েটি। তুমি যাও তো। এটা তোমার প্রতি আমার আদেশ। ঠিকানাটা বলো, আমি মুখস্থ করে রাখি।

নাইমুল চলে যাবার পরপরই লোকজন মিলে ঠেলে তাঁর গাড়ি তুলে দিল। ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ছাত্রের দেয়া ঠিকানায় রওনা হলেন। তাঁকে নাইমুল বলেছে ১৮নং সোবাহানবাগ। কিন্তু তিনি চলে গেলেন চামেলীবাগে। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি চামেলীবাগের আঠারো নম্বর দোতলা বাড়ি খুঁজতে লাগলেন। যে বাড়ির গেট হলুদ রঙের। বাড়ির সামনে দুটা কাঁঠাল গাছ আছে।

মরিয়ম কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না— তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার যেন কেমন লাগছে। গা হাত পা কাঁপছে। বুকে ধুকধুক শব্দ হচ্ছে। প্রচণ্ড পানির পিপাসা হচ্ছে কিন্তু এক চুমুক পানি খেলেই পিপাসা চলে যাচ্ছে। পানি খেতে আর ভালো লাগছে না। কিছুক্ষণ পর আবার পিপাসা হচ্ছে। সে নিজের কপালে হাত দিল। গায়ে কি জ্বর আছে? জ্বরের সময় এরকম উল্টাপাল্টা লাগে। না জ্বর তো নেই। কপাল ঠাণ্ডা।

কী আশ্চর্য! বসার ঘরে যে লম্বা রোগা ছেলেটি বসে আছে, সে তার স্বামী। যাকে সে আগে কোনোদিন দেখে নি, যার সঙ্গে কোনো কথা হয় নি। মাত্র পনেরো মিনিট আগে থেকে সে তার জীবনের সবচে' ঘনিষ্ঠজন। বিয়ে নামক অদ্ভুত একটা ঘটনায় আজ রাত আটটা সাত মিনিট থেকে দু'জন শুধু দু'জনের।

মরিয়ম তার স্বামীকে এখনো ভালোমতো দেখে নি। দূর থেকে আবছাভাবে দেখেছে। তার খুবই ইচ্ছা করছে কাছ থেকে দেখতে। তার চোখ দু'টা কেমন? বিড়াল-চোখা না তো? বিড়াল-চোখা মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যায় না। কথা বললে মনে হয় বিড়ালের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এই বুঝি মানুষটা মিঁউ করে উঠবে। তার কি জোড়া ভুরু? জোড়া ভুরুর মানুষ মরিয়মের খুব অপছন্দ। যার যা অপছন্দ তাই সে পায়। দেখা যাবে নাইমুল নামের মানুষটার জোড়া ভুরু। আচ্ছা থাকুক জোড়া ভুরু। কপালে যা থাকে তাই তো হবে। বিয়ে হলো কপালের ব্যাপার।

একটু আগে তার সবচে' ছোটবোন মাফরুহা এসে বলল, বুবু, তোমার বর খুব সুন্দর। মরিয়মের ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করে— তোর দুলাভাইয়ের জোড়া ভুরু না-কি? চট করে দেখে আয় তো। লজ্জায় প্রশ্নটা সে করতে পারে নি।

মাফরুহা বলল, দুলাভাই কিন্তু রাতে থাকবে না। এখনই চলে যাবে।

মরিয়মের বুক ধক করে উঠল। সে এখনো দেখলই না, তার আগেই চলে যাবে? এমন ঘটনা কি এর আগে কখনো ঘটেছে— বর এসে বিয়ে করেই উধাও

হয়ে গেছে? মরিয়মের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে অবশ্যি অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, চলে গেলে চলে যাবে। আমার কী? যাবে কখন?

দুলাভাইয়ের ছোট চাচা তো এক্ষুনি চলে যাবেন বলছেন। উনি নারায়ণগঞ্জ থাকেন। অনেক দূর যেতে হবে। তাঁর সঙ্গে দুলাভাইও চলে যাবেন কি-না বুঝতে পারছি না। দুলাভাই কিছু বলছেন না।

মরিয়ম বলল, দুলাভাই দুলাভাই করছিস কেন? শুনতে বিশ্রী লাগছে। চেনা নেই, জানা নেই একটা মানুষ।

কথাটা মরিয়মের মনের কথা না। ছোট বোনের মুখে দুলাভাই ডাকটা শুনতে তার খুবই ভালো লাগছে। কী সুন্দর টেনে টেনে বলছে— 'দু ু ু ু লা ভাই'।

মাফু, দেখ তো আমাকে কি বিয়ের শাড়িতে মানিয়েছে? (ছোট বোনকে মরিয়ম আদর করে মাফু ডাকে)

মাফরুহা বলল, তোমাকে খুবই সুন্দর লাগছে।

খোঁজ নিয়ে আয় তো ওরা সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে কি-না। ওরা চলে গেলে মা যে এত রান্নাবান্না করেছেন সেগুলি কে খাবে? মাসুমা সন্ধ্যা থেকে চুলার পাড়ে বসে আছে। তার কষ্ট হচ্ছে না?

মাফরুহা খোঁজ নিতে গেল। মরিয়ম দাঁড়ালো আয়নার সামনে। সে আগেও কয়েকবার দাঁড়িয়েছে। প্রতিবারই নিজেকে সুন্দর লেগেছে। এখন মনে হয় একটু বেশি সুন্দর লাগছে। অথচ খুবই সাধারণ শাড়ি। 'ওরা' নিয়ে এসেছে। সবুজ রঙের শাড়ি। ভাগ্যিস কড়া সবুজ না। গ্রামের মেয়েরাই শুধু কটকটে কড়া রঙের সবুজ শাড়ি পরে। শাড়ি যত সাধারণই হোক মরিয়ম ঠিক করে রেখেছে, এই শাড়ি সে খুব যত্ন করে রাখবে। প্রতিবছর ৭ মার্চ বিয়ের দিনে এই শাড়ি সে পরবে। তার মেয়েরা বড় হলে মায়ের বিয়ের শাড়ি দেখতে চাইবে। মেয়েদের কেউ একজন হয়তো বলবে, তোমার বিয়ের শাড়ি এত সস্তা কেন মা? এ তো সত্যি ক্ষেত শাড়ি। পরলে মনে হবে ধানক্ষেত।

তখন মরিয়ম বলবে, আমাদের খুব তাড়াহুড়ার বিয়ে হয়েছিল। দেশজুড়ে তখন অশান্তি। তোর বাবার হাতে কোনো টাকা-পয়সা নেই। সে তার দূরসম্পর্কের এক চাচা এবং এক ফুফাকে নিয়ে এসেছিল। সন্ধ্যাবেলা বাসায় এসেছে, তখনো আমি জানি না যে আমার বিয়ে।

মা, তোমার বিয়েতে কোনো উৎসব হয় নি?

না।

গায়েহলুদ-টলুদ কিছুই হয় নি?

না, সে-রকম করে হয় নি। তবে শাড়ি পরার আগে গোসল করলাম, তখন তোর ছোট খালা আমার গালে এক গাদা হলুদ মেখে দিল। মসলা পেষার পাটায় হলুদ পেষা হয়েছিল। শুকনা মরিচের ঝাল চোখে লেগে গেল। কী জ্বলুনি! চোখ দিয়ে সমানে পানি পড়ছে, আর সবাই ভাবছে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এই জন্যে কাঁদছি।

তোমার কান্না পাচ্ছিল না ?

না।

বিয়ের দিন সবারই কান্না পায়। তোমার পাচ্ছিল না কেন মা ?

জানি না। তখন সময়টা তো অন্যরকম ছিল। প্রতিদিন মিটিং মিছিল, পুলিশের গোলাগুলি, কার্ফু— এই জন্যেই বোধহয়।

বাবাকে প্রথম দেখে কি তোমার ভালো লেগেছিল মা ?

না দেখেই ভালো লেগেছিল।

সেটা কেমন কথা! না দেখে ভালো লাগে কীভাবে ?

তুই যা তো। তোকে এত কিছু ব্যাখ্যা করতে পারব না।

মরিয়মের ধারণা তার মেয়ে ধমক খেয়েও যেতে চাইবে না। সে চোখ বড় বড় করে তার বাবা-মা'র বিয়ের গল্প শুনতে চাইবে। সেটাই স্বাভাবিক। মেয়েরা মায়ের বিয়ের গল্প খুব আগ্রহ করে শোনে।

নাইমুলের সঙ্গে বরযাত্রী মাত্র দু'জন। তার দূরসম্পর্কের চাচা হাফিজুদ্দিন এবং তার ফুপা হামিদুল ইসলাম। এরা দু'জনই থাকেন নারায়ণগঞ্জে। কাজি সাহেব বিয়ে পড়ানো শেষ করতেই দু'জনই অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন চলে যাবার জন্যে। লক্ষণ খারাপ। শেখ সাহেবের ভাষণ রেডিওতে প্রচার করে নাই। ভাষণের বদলে অন্য কোনো অনুষ্ঠানও নাই। রেডিও নীরব। মিলিটারিরা হয়তো রেডিও স্টেশনের দখল নিয়ে নিয়েছে। এখন হয়তো রাস্তাঘাটের দখল নিবে। যত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌছানো যায় ততই ভালো।

মুসলেম উদ্দিনও চলে যেতে চাচ্ছেন। ঝামেলার সম্ভাবনা যেহেতু আছে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই তো ভালো। তিনি যাবেন যাত্রাবাড়ি। নারায়ণগঞ্জ যাবার পথেই যাত্রাবাড়ি পড়বে। এক সঙ্গে চলে যাওয়া যায়। এখন সময় এমন যে চলে যাওয়াই ভালো। মুসলেম উদ্দিন বললেন, ঘন্টাখানিক অপেক্ষা করলে খানা দিয়ে দেয়া যাবে। মরিয়মের মা একা মানুষ, সব সামাল দিতে পারছে না। আমি খবর নিয়েছি পোলাও চুলায় বসানো হয়েছে। (কথা সত্যি নয়। পোলাও-এর চাল আনতে দোকানে লোক গেছে। আগে যে কালিজিরা চাল আনা হয়েছিল, সে চাল থেকে পচা গন্ধ বের হচ্ছে।)

হাফিজুদ্দিন বললেন, সম্পর্ক যখন হয়েছে অনেক খাওয়া ইনশাল্লাহ হবে। আজ বিদায় দিয়ে দেন। মেয়ের বাবাকে ডাকেন, উনার কাছ থেকে বিদায় নিই।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, আমার ভাগ্নে তো কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। অফিসের ডাক পড়েছে। বুঝেন না— ডাক পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হয়। বড়ই কঠিন চাকরি।

হামিদুল ইসলাম গম্ভীর গলায় বললেন, বেয়াই সাহেব তো আমাদের কাছ থেকে বিদায়ও নিলেন না। অবশ্য আমরা তুচ্ছ মানুষ। আমরা কোনো কঠিন চাকরি করি না। দুই পয়সার ব্যবসায়ী।

মুসলেম উদ্দিনকে অবস্থা সামলাবার জন্যে হড়বড় করে অনেক কথা বলতে হলো। তাতে তেমন লাভ হলো না। দু'জনই এমন ভাব করতে থাকেন যেন তাদের বিরাট অপমান করা হয়েছে। অপমান যেহেতু করা হয়েছে সেহেতু না খেয়ে উঠে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

মোবারক হোসেন ঘরেই আছেন। তিনি কিছুক্ষণ আগে মুসলেম উদ্দিনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছেন— বিয়ে তো হয়েছে, এখন আর ঘটর ঘটর আমার ভালো লাগছে না। এদের বিদায় করেন। ছেলেকেও চলে যেতে বলেন। পরে একটা তারিখ করে তারা বউ উঠিয়ে নিবে।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, না খাইয়ে তো বিদায় করতে পারি না।

খাওয়ান। আমাকে আর এর মধ্যে ডাকবেন না। আমি আর আসব না। আমার নিজের শরীর ভালো না। ইয়াহিয়ারও এসেছে জ্বর। অসুখ-বিসুখের মধ্যে বিয়ের যন্ত্রণা অসহ্য লাগছে।

বরযাত্রী দু'জনই চলে গেছেন, মুসলেম উদ্দিনও তাদের সঙ্গে গেছেন। কাজি সাহেব আগেই গেছেন। তাঁর না-কি আজ আরেকটা বিয়ে পড়াতে হবে। নাইমুল বসার ঘরে একা বসে আছে। কিছুক্ষণ মাফরুহা ছিল। এখন সেও চলে গেছে। তার দায়িত্ব পড়েছে বাবার মাথার চুল টেনে দেবার। কাজটা সে করছে খুব ভয়ে ভয়ে। একটু জোরে টান লাগলে সে ধমক খাবে, আবার আস্তে টানলেও ধমক খাবে।

মেজ বোন মাসুমা রান্নাঘরে। আজকের রান্নাবান্না সে-ই করছে। সাফিয়া ইয়াহিয়াকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় আছেন। মাঝে-মাঝে রান্নাঘরে ঢুকে মাসুমাকে কী করতে হবে তা বলে দিচ্ছেন। প্রবল জ্বর আসার কারণে ইয়াহিয়া খুবই কান্নাকাটি করছে। মা'র কোল থেকে একেবারেই নামতে চাচ্ছে না।

মাসুমা বলল, মা, তোমার রান্নাঘরে আসার দরকার নাই। আমি পারব। তুমি বাবুর মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করো।

পানি ঢালব ?

জ্বর এত বেশি, পানি ঢালবে না ?

তোর বাবা যদি আবার রাগ করে! আরেকবার জ্বরের সময় পানি দিয়েছিলাম, তোর বাবা খুব রাগ করেছিল। এতে না-কি ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়।

বাবা যাতে জানতে না পারে সেইভাবে পানি ঢাল।

তুই একটু সরে বোস না মা। কাপড়ে আগুন লেগে যাবে তো।

মাসুমা সরে বসল। তার হঠাৎ মনে হলো, তাদের এই সৎমা আসল মায়ের চেয়েও ভালো হয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা তিনবোন খুব বড় ধরনের কোনো পুণ্য করেছে, যে কারণে আল্লাহ্‌ তাদের উপহার হিসেবে এমন একজন মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মা।

হুঁ।

দুলাভাই কি একা বসে আছেন ?

হুঁ। এতক্ষণ মাফরুহা ছিল। এখন সে একা।

আহা বেচারা, বিয়ে করতে এসে কেউ এতক্ষণ একা একা বসে থাকে না। মা, এক কাজ করো, বুবুকে পাঠিয়ে দাও। বুবু গল্প করুক।

তোর বাবা যদি রাগ করে ?

বুবুর সঙ্গে বেচারার ভাব হবে না ?

রান্না হোক, তখন খাবার দিয়ে মরিয়মকে পাঠাব। তাহলে তোর বাবা কিছু বলতে পারবে না।

দুলাভাই দেখতে রাজপুত্রের মতো, তাই না মা ?

হুঁ। মরিয়মের খুব পছন্দ হবে।

বুবুর কথা বাদ দাও মা। রাস্তা থেকে কাল্লু গুণ্ডাকে ধরে এনে যদি বুবুর বিয়ে দাও, বুবু তাকেও অন্তর দিয়ে ভালোবাসবে। মুগ্ধ গলায় বলবে, আমি সারা জীবন এরকম একজন গুণ্ডাই চেয়েছিলাম। ঠিক বলেছি না মা ?

মনে হয় ঠিকই বলেছিস।

আমি কিন্তু বুবুর মতো না। আমার পছন্দ অনেক কঠিন।

একেক বোন একেক রকম হবি— এটাই তো স্বাভাবিক।

আর এরকম আধাখেচড়া বিয়েও আমি করব না। আমার বেনারসি শাড়ি লাগবে। গা ভর্তি গয়না লাগবে। হুট হাটের বিয়ের মধ্যে আমি নাই।

চুলার আগুন কমিয়ে দে। আগুন বেশি।

মাসুমা চুলার আগুন কমাতে কমাতে বলল, আচ্ছা মা, বাবা আমাদের তিনবোনকে সহ্যই করতে পারে না। কেন বলো তো?

সহ্য করতে পারবে না কেন! তোদের জন্যে উনার খুব দরদ। মানুষটা অন্যরকম তো, প্রকাশ পায় না।

খুব দরদ থাকলে কি আর...

মাসুমা কথা শেষ করতে পারল না। বাবু আবারো হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে শুরু করেছে। সাফিয়া তাকে বাথরুমে নিয়ে গেলেন। চুপিচুপি তার মাথায় পানি ঢালবেন।

রাত দশটা বাজে।

নাইমুলকে খেতে দেয়া হয়েছে। খাবার নিয়ে ঢুকেছে মরিয়ম। তার হাত কাঁপছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি হাত ফসকে কোরমার বাটিটা মেঝেতে পড়ে যাবে।

নাইমুল তার দিকে তাকিয়ে বলল, মরিয়ম, কেমন আছ?

মরিয়মের শরীরে ঝিম ধরে গেল। এত সুন্দর গলার স্বর! আর কী আদর করেই না মানুষটা জিজ্ঞেস করেছে— 'মরিয়ম কেমন আছ?' মরিয়মের খুব ইচ্ছা করছে বলে, 'আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?' প্রথম থেকেই তুমি করে বলা। একবার আপনি শুরু করলে তুমিতে আসতে কষ্ট হয়। তার এক বান্ধবী, নাম জসি, বিয়ের পরে প্রথম প্রথম স্বামীকে আপনি বলতে শুরু করেছিল। এখন আর তুমি বলতে পারছে না। এই ভুল মরিয়ম করতে রাজি না। সে শুরু থেকেই তুমি বলবে।

কিন্তু কথা বলবে কী, মরিয়মের গলা দিয়ে কোনো শব্দই বের হচ্ছে না। গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে আছে। নাইমুল বলল, তোমার নামটা এমন যে ছোট করে ডাকব সে উপায় নেই। ছোট করে ডাকলে তোমাকে ডাকতে হয় মরি। সেটা নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে না।

মরিয়ম মনে মনে বলল, যা ইচ্ছা তুমি আমাকে ডাক। তুমি যাই ডাকবে আমার ভালো লাগবে।

নাইমুল বলল, খাবার তুলে দিতে হবে না। আমি নিয়ে নিচ্ছি। তুমি চুপ করে বসো। তোমাকে খুব জরুরি কিছু কথা বলা দরকার। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছ কেন? আমার দিকে তাকিয়ে কথা শোনো। জরুরি কথা শুনতে হলে চোখের উপর চোখ রাখতে হয়।

মরিয়ম চোখের উপর চোখ কীভাবে রাখবে ? তার কেমন জানি লাগছে। মানুষটার কোনো কথাই এখন তার কানে ঢুকছে না।

মরিয়ম শোনো, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে একটা লোভী মানুষ ভাবছ। কারণ তোমার বাবার কাছ থেকে আমি এগারো হাজার টাকা নিয়েছি। আমার কিছু ঋণ আছে যে ঋণ শোধ না করলেই না। তিন হাজার টাকা ঋণ। আর বাকি টাকাটা আমি নিয়েছি আমেরিকার টিকিট কেনার জন্যে। আমি একটা টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপ পেয়েছি। স্টেট ইউনিভার্সিটি অব মোরহেড। নর্থ ডেকোটা। ওরা আমাকে মাসে চারশ' ডলার করে দেবে। তবে আমেরিকা যাবার টিকিটের টাকা দেবে না। টাকাটা এইভাবেই আমার জোগাড় করতে হয়েছে।

কবে যাবেন ?

কথাটা বলেই মরিয়মের ইচ্ছা করল নিজের গালে সে একটা চড় মারে। সে তো জসির মতোই আপনি শুরু করেছে।

নাইমুল বলল, আমার স্টুডেন্ট ভিসা হয়ে গেছে। এখন আমি যে-কোনো দিন যেতে পারি। আমি ব্যাপারটা কাউকে বলি নি, কারণ আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে আমার ভালো লাগে না। মরিয়ম শোনো, আমি অবশ্যই আমেরিকায় পৌঁছেই তোমার বাবার টাকাটা ফেরত পাঠাব। তোমাকে কথাটা বললাম যাতে তোমার মন থেকে মুছে যায় যে আমি একটা খারাপ মানুষ।

মানুষটা কথা বলা বন্ধ করে এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য সময় যে-কোনো পুরুষমানুষ তার দিকে তাকালে গা ঘিনঘিন করত। এখন এত ভালো লাগছে! ইশ, তার গায়ের রঙটা যদি আরেকটু ফরসা হতো!

মরিয়ম!

জি।

রান্না খুব ভালো হয়েছে, আমি খুব আরাম করে খেয়েছি। কে রেঁধেছেন, তোমার মা ?

জি।

আমি এখন চলে যাব। রাত অনেক হয়ে গেছে।

মরিয়ম নাইমুলকে চমকে দিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। যেন ভয়ঙ্কর জরুরি কোনো কাজ তাকে এই মুহূর্তেই করতে হবে।

সাফিয়া বারান্দায় বসে ছিলেন। বাবুকে মাসুমার কোলে দিয়ে এসেছেন। সারাদিনে খুব ধকল গেছে। তার নিজের শরীর এখন প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। সাফিয়াকে চমকে দিয়ে মরিয়ম ঝড়ের মতো বারান্দায় এসে উপস্থিত হয়ে চাপা

গলায় বলল, মা, আমি উনাকে এত রাতে একা ছেড়ে দেব না। কোনো মতেই না।

মরিয়ম এসেছে যেমন ঝড়ের মতো কথাবার্তাও বলছে ঝড়ের মতো। সাফিয়া বুঝতেই পারছেন না প্রসঙ্গটা কী ? মরিয়ম বলল, মা, বাবাকে বলে ব্যবস্থা করো যেন উনি এখানে থাকতে পারেন। আমি অবশ্যই উনাকে একা ছাড়ব না। উনি যদি চলে যান, আমিও উনার সঙ্গে যাব।

এতক্ষণে সাফিয়া বুঝলেন এবং হেসে ফেললেন।

মরিয়ম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি হাসছ কেন মা ? আমি হাসির কোনো কথা বলি নি। তুমি ব্যবস্থা করো। কীভাবে ব্যবস্থা করবে আমি জানি না।

সাফিয়া কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। মোবারক হোসেন মেয়েজামাইকে বিদেয় দিয়ে বারান্দায় এসে দেখলেন, বড় মেয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, কী হয়েছে ? কাঁদছিস কেন ? জামাই পছন্দ হয় নাই ? আমি যা পেরেছি ব্যবস্থা করেছি। চোখ মুছ।

মরিয়ম চোখ মুছল।

যা ঘুমাতে যা। খবরদার চোখে যেন আর পানি না দেখি।

মরিয়ম চোখ মুছে তার ঘরের দিকে রওনা হলো।

মোবারক হোসেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। জোহর সাহেব এখানে কেন? শেখ সাহেবের বাড়িতে এই সকালে তিনি কেন? এখনো ভালোমতো সকাল হয় নি। ঘড়িতে বাজছে ছ'টা পাঁচ। ফজরের নামাজ যারা পড়ে, তারা ছাড়া এত ভোরে কেউ উঠে না। না-কি তিনি ভুল দেখছেন? এই ব্যক্তি জোহর না। এ অন্য কেউ। চেহারায় মিল আছে। সমিল চেহারার মানুষ প্রায়ই পাওয়া যায়। মোবারক হোসেন যতবার জোহর সাহেবকে দেখেছেন ততবার তাঁর মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি দেখেছেন। এই লোকের মুখ ক্লিন শেভড। তাছাড়া জোহর সাহেবের হাতে অবশ্যই জ্বলন্ত সিগারেট থাকত। এই লোকের হাতে সিগারেট নেই। পাতলা ঘিয়া রঙের চাদরে তার শরীর ঢাকা। তার দু'টা হাতই চাদরের নিচে। উনি নিশ্চয়ই চাদরের নিচে সিগারেট ধরান নি। ঘটনা কী? এই গরমে চাদর গায়ে উনি কেন এসেছেন?

এই ভোরবেলাতে শেখ সাহেবের বাড়িতে অনেক লোকজন। টঙ্গি থেকে শ্রমিকদের একটা দল এসেছে মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে। তারা ফজরের ওয়াক্তের আগে এসে 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা' বলে প্রচণ্ড শ্লোগান শুরু করেছিল। মনে হয় তারা তাদের গলার সমস্ত জোর সঞ্চয় করে রেখেছে শেখ সাহেবের বাড়িতে একটা হুলুস্থুল করার জন্যে। শ্লোগান শুনে ভয় পেয়ে কাকের দল উড়াউড়ি শুরু করল। মোবারক হোসেন তাদের দলপতির কাছে গিয়ে বললেন, শেখ সাহেব নামাজ পড়ছেন। এখন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

দলপতি (তার অত্যন্ত বলশালী চেহারা। মুখভর্তি পান। গলায় সোনার চেইন) রাগী গলায় বললেন, আপনি কে?

মোবারক হোসেন বললেন, আমি কেউ না।

'আমি কেউ না' বলাতে একটা রহস্য আছে। বলার ভঙ্গি সামান্য পরিবর্তন করে 'আমি কেউ না' বলেও বুঝিয়ে দেয়া যায়— আমি অনেক কিছু। মোবারক হোসেন সেটা বুঝিয়ে দিলেন।

দলপতি পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, আমি টঙ্গি শ্রমিক লীগের সভাপতি। আমার নাম ইসমাইল মিয়া। শেখ সাহেব আমারে চিনেন। আমার বাড়িতে একবার খানা খেয়েছেন।

মোবারক হোসেন বললেন, শুনে খুশি হলাম।

ইসমাইল মিয়া গলা সামান্য নিচু করে বললেন, টিফিনের কোনো ব্যবস্থা আছে ? আমরা কেউ নাশতা করি নাই।

টিফিনের কোনো ব্যবস্থা নাই।

শেখ সাব নিচে নামবেন কখন ?

সেটা তো ভাই উনি জানেন।

আপনি এখানকার কে ? কোন দায়িত্বে আছেন ?

আমি কোনো দায়িত্বে নাই। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি— আমি কেউ না।

জোহরকে দেখা যাচ্ছে এই দলটির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে। সে দু'বার তাকাল মোবারক হোসেনের দিকে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে মোবারক হোসেনকে চিনতে পারছে। তাহলে এমন কি হতে পারে যে, এই লোক জোহর না ? তার মতো চেহারার অন্য কেউ ?

মোবারক হোসেন এগিয়ে গেলেন। যা সন্দেহ করা হয়েছিল তাই। এই লোক জোহর। মোবারক হোসেনকে দেখে হাসল। পরিচিতের হাসি এবং আনন্দের হাসি। যেন হঠাৎ দেখা হওয়ায় খুশি হয়েছে।

মোবারক হোসেন বললেন, কেমন আছেন ?

জোহর বলল, ভালো।

এখানে কী জন্যে এসেছেন ?

দেখতে আসছি। কোনো বিহারি শেখ সাহেবকে দেখতে আসতে পারবে না, এমন আইন কি শেখ সাহেব পাশ করেছেন ?

এতক্ষণ হয়ে গেছে আপনাকে তো সিগারেট ধরাতে দেখলাম না।

শেখ সাহেবের বাড়িতে সিগারেট খাব! এত বড় বেয়াদবি তো করতে পারি না। আমি আর যাই হই বেয়াদব না।

গরমের সময় চাদর গায়ে দিয়ে এসেছেন কেন ?

জোহর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যখন বের হয়েছিলাম তখন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব ছিল। তবে আপনি যা ভাবছেন তা-না। চাদরের নিচে কিছু নাই। চাদর খুলে দেখাতে হবে ?

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। মোবারক হোসেন বললেন, গরম বেশি, চাদর খুলে ফেললে ভালো হয়।

জোহরের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। হাসি ফুটল না। তার আগেই নিভে গেল। তাকে দেখে মনে হলো, সে মোবারক হোসেনের কথায় খুব মজা পাচ্ছে।

যদি চাদর না খুলি তাহলে কি আমাকে চলে যেতে হবে?

জি।

তাহলে চলেই যাই। চা খেতে ইচ্ছা করছে। আশেপাশে চায়ের দোকান আছে?

আছে।

আমাকে নিয়ে চলেন, দু'জনে মিলে চা খাই। কোনো নেশাই একা একা করা যায় না। চা তো একরকম নেশাই, তাই না?

চলেন যাই।

বত্রিশ নম্বর থেকে বের হয়ে দু'জন মিরপুর রোড পার হলো। ওপাশেই একটা নাপিতের দোকান। দোকানটা সবার চোখে পড়ে, কারণ সেখানে মজার একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে—

'মুজিবের বাড়ি যেই পথে
আমার দোকান সেই পথে।'

নাপিতের দোকানটা এখনো খোলে নি। তবে চায়ের দোকান খুলেছে। দশ-বারো বছরের একটা ছেলে পরোটা বেলছে। দুখু মিয়া টাইপ চেহারা। বড় বড় চোখ।

জোহর চায়ের দোকানে ঢুকেই গায়ের চাদর খুলে ফেলল, ভাঁজ করে কাঁধে রেখে মোবারক হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাসল। শান্ত গলায় বলল, চাদরের নিচে যে কিছু নাই কথাটা কি বিশ্বাস হয়েছে?

মোবারক হোসেন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

জোহর বলল, তার পরেও যদি বিশ্বাস না হয় গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পারেন।

দেখতে হবে না।

আসুন চা নিয়ে রাস্তার পাশে বসে খাই। আপত্তি আছে?

না, আপত্তি নাই।

রাস্তার পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। জোহর সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেট ধরানোর কারণেই হয়তো তার চেহারায় উৎফুল্ল ভাব।

ইন্সপেক্টর সাহেব।

জি।

আপনাকে আগে একবার যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান কখনো স্বাধীন হবে না। মনে আছে?

মনে আছে।

আমার যুক্তি কি আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল?

জি, মনে হয়েছে।

এখন আমি বুঝতে পারছি আমার যুক্তি ঠিক না। শেখ মুজিব যদি চান দেশ স্বাধীন হবে। কীভাবে বুঝলাম জানেন?

না।

আপনাকে দেখে বুঝলাম। কোনো বাঙালির পক্ষে শেখ মুজিবের কোনো অনিষ্ট করা সম্ভব না। অনিষ্ট অনেক দূরের ব্যাপার, তাঁর কোনো ক্ষতির চিন্তা করার ক্ষমতাও বাঙালির নেই। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে স্বাধীনতা ছাড়া উপায় কী? একজন মানুষ কত দ্রুত এই অবস্থায় চলে গেছেন ভাবতেই বিস্মিত হতে হয়।

মোবারক হোসেন কিছু বললেন না। তাঁর চায়ের নেশা নেই, কিন্তু সকালের এই চা-টা তাঁর খেতে ভালো লাগছে।

ইন্সপেক্টর সাহেব!

জি।

আমি এখনো পাকিস্তানি শাসকদের চিন্তিত হবার মতো কিছু ঘটেছে বলে মনে করি না। শেখ মুজিব মধ্যবিত্তের নেতা, বুর্জোয়া নেতা। এ ধরনের নেতারা সরাসরি যুদ্ধের কথা ভাবেন না। এরা ঝামেলামুক্ত সমাধান চান। যেমন ধরেন ভারতের জওহরলাল নেহরু কিংবা মহাত্মা গান্ধী। এরা দেশ স্বাধীন করেছেন জেল খেটে। অসহযোগ আন্দোলন করে। কারণ এই দু'জনও বুর্জোয়া নেতা। সরাসরি যুদ্ধ এরা সমর্থন করেন নি। আপনাদের শেখ মুজিবও করবেন না। বুঝতে পারছেন কী বলছি?

বোঝার চেষ্টা করছি। আমার বুদ্ধি কম। সহজে কিছু বুঝি না।

আমার ধারণা আপনাদের শেখ মুজিবের মাথায়ও গান্ধী-টাইপ চিন্তা-ভাবনা আছে। অসহযোগ আন্দোলন করে জেল টেল খেটে দেশ স্বাধীন করে ফেলা। পুরোপুরি স্বাধীন করা যদি সম্ভব নাও হয়, তাতেও আপাতত চলবে। কনফেডারেশন, ইউনাইটেড স্টেটস। পাকিস্তানের যে এই অবস্থা হবে, সেটা

কিন্তু তখনকার নেতারা ঠিকই বুঝেছিলেন। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ তো দুই পাকিস্তান হচ্ছে জেনে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন— 'পোকায় কাটা পাকিস্তান দিয়ে আমি কী করব ?'*

মোবারক হোসেন বললেন, মানুষ তো বদলায়।

জোহর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অবশ্যই বদলায়। পরিস্থিতি মানুষকে বদলায়। ভয়াবহ ডাকাত হয়ে যায় নিজাম আউলিয়া। বিরাট সাধু সন্ত হয়ে যায় ভয়াবহ খুনি। সমস্যাটা এইখানেই। আপনার চা খাওয়া দেখে মনে হয়েছে আপনি খুবই আরাম করে চা খেয়েছেন। আরেক কাপ খাবেন ?

জি খাব।

বক্তৃতা শুনতে যাবেন না ?

কী বক্তৃতা ?

পল্টনে আজ মাওলানা ভাসানীর বক্তৃতা আছে। আমার ধারণা এটা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা। শোনা দরকার।

মোবারক হোসেন বললেন, আমি বক্তৃতা শুনি না। বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগে না। তাছাড়া আমার ডিউটি শেখ সাহেবের বাড়িতে। ডিউটির জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না।

জোহর দ্বিতীয় সিগারেট ফেলে দিয়ে তৃতীয়টি ধরাতে ধরাতে বলল, আপনি আসলে কার ডিউটি করছেন বলুন তো ?

মোবারক হোসেন জবাব দিতে পারলেন না।

জোহর হালকা গলায় বলল, আপনি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। কারণ জবাব আপনার নিজেরই জানা নেই। আমার জানা আছে। পুরো বাঙালি জাতি এখন একজনের ডিউটি করছে। সেই একজনের নাম শেখ মুজিব। আমি বিহারি না হয়ে বাঙালি হলে বিষয়টা এনজয় করতাম।

মোবারক হোসেন বত্রিশ নম্বর বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আজ এই বাড়িতে অন্যদিনের চেয়েও অনেক ভিড়। লোক আসছেই। বাড়ির সামনের রাস্তাটা যেন নদী হয়ে গেছে। নদীতে মানুষের স্রোত। নদীতে যেমন ঢেউ উঠে এখানেও উঠছে। কখনো মানুষ বাড়ছে কখনো কমছে। মোবারক হোসেনের মানুষের এই প্রবল বেগবান স্রোত দেখতে ভালো লাগছে। হঠাৎ তাঁর মনে হলো তার তিন মেয়েকে নিয়ে এলে ভালো হতো। এরা হয়তোবা মজা পেত। এরা

***** *অর্ধেক জীবন*। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

কখনো ঘর থেকে বের হয় না। এ ধরনের দৃশ্য কখনো দেখে না। এত কাছে বাড়ি। একবার নিয়ে এলে হয়।

এই তুই কী করছিস? আছিস কেমন?

মোবারক হোসেন চমকে উঠলেন। শেখ মুজিব দল বল নিয়ে বের হচ্ছেন। বাড়ির সামনের রাস্তায় কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে উঠবেন। মোবারক হোসেনকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি।

স্যার, ভালো আছি।

তোর মেয়ে তিনটা ভালো আছে? কী যেন তাদের নাম— মরিয়ম, মাসুমা, মাফরুহা? নাম ঠিক হয়েছে?

জি স্যার, ঠিক হয়েছে।

আজ মাওলানা ভাসানী পল্টনে বক্তৃতা করবেন। শুনতে যাবি না? শুধু আমার কথা শুনলে হবে? অন্যদের কথাও শুনতে হবে।

শেখ মুজিব এগিয়ে গেলেন। মোবারক হোসেন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর তিন মেয়ের নাম এই মানুষটা একবার মাত্র শুনেছেন। এখনো নাম মনে আছে। এই ক্ষমতাকে শুধু বিস্ময়কর বললেও কম বলা হয়।

মাওলানা ভাসানীর বক্তৃতা শোনার কোনো আগ্রহ মোবারক হোসেন বোধ করছেন না। তারপরেও তিনি বক্তৃতা শুনতে গেলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, তিনি তাঁর দুই মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তিনজনকেই নেবার শখ ছিল। বড়টিকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। সে কাউকে কিছু না বলে কোথায় না-কি গেছে। মোবারক হোসেন ঠিক করে রেখেছেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের উচিত শাস্তি সে পাবে। যথাসময়ে পাবে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তাতে কী? মেয়ে তো এখনো তাঁর সঙ্গে থাকে। যতদিন মেয়ে তাঁর বাড়িতে থাকবে, ততদিন তাকে বাড়ির নিয়মকানুন মানতে হবে।

মাসুমা এবং মাফরুহা দু'জনেই ভয়ে অস্থির। বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ায় কোনো আনন্দ নেই। 'আমরা কোথাও যাব না' বলাও সম্ভব না। দু'জনেই খুব মন খারাপ করে বাড়ি থেকে বের হলো। তারা খানিকটা ভয়ও পাচ্ছে। বাবা বলেন নি তাদের কোথায় নেয়া হচ্ছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানবে সেই সাহসও তাদের নেই।

মোবারক হোসেন রিকশা নিলেন। ছোট মেয়েটিকে বসালেন নিজের কোলে। মাফরুহাকে দেখে মনে হচ্ছে সে লজ্জায় মরে যাচ্ছে। কেঁদেই ফেলত, অনেক কষ্টে সে চোখের জল আটকে রাখছে।

মোবারক হোসেন বললেন, হাতে এখনো সময় আছে, তোরা আইসক্রিম খাবি ?

দু'জনই চাপা গলায় বলল, না।

খাবি না কেন ? আয় আইসক্রিম কিনে দেই।

মোবারক হোসেন বেবি আইসক্রিমের দোকানে গিয়ে দু'মেয়েকে আইসক্রিম কিনে দিলেন। দু'জনই খুবই আগ্রহের সঙ্গে আইসক্রিম খাচ্ছে। দেখতে ভালো লাগছে। মোবারক হোসেন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, শেখ সাহেব তোদের তিন বোনেরই নাম জানেন। আজকেও তোদের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। তোরা কেমন আছিস জানতে চাইলেন।

মাসুমা ভয়ে ভয়ে বলল, আমাদেরকে উনি কীভাবে চেনেন ?

মোবারক হোসেন বললেন, সে বিরাট ইতিহাস। জানার দরকার নাই। তাড়াতাড়ি আইসক্রিম শেষ কর। বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে।

মাসুমা অবাক হয়ে বলল, কিসের বক্তৃতা ?

মোবারক হোসেন জবাব দিলেন না। মেয়েদের সঙ্গে এত কথা বলতে তাঁর ভালো লাগে না।

পল্টনের মাঠের জনসমুদ্রে মাওলানা বললেন—

> তের বছর আগে কাগমারী সম্মেলনে আমি আসসালামু আলাইকুম বলেছিলাম। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও সেদিন আমার কথা অনুধাবন করতে পারেন নাই। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে দুই অংশ যদি একত্রে থাকে তাহলে কালব্যাধি যক্ষ্মার জীবাণু যেমন দেহের হৃৎপিণ্ডের দুই অংশকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনি পাকিস্তানের দুই অংশই বিনষ্ট হবে। তাই বলছিলাম যে তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করো এবং আমরা আমাদের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করি। 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।' শেখ মুজিবর রহমান আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। আমি সাত কোটি বাঙালিকে আজ মোবারকবাদ জানাই এ জন্যে যে তারা এই বৃদ্ধের তের বছর আগের কথা এতদিন পর অনুধাবন করতে পেরেছে।*

---

* *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়।

মাওলানা ভাসানী যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন মরিয়ম পুরনো ঢাকায়। সে আগামসি লেনের একটা ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই পাচ্ছে না। ভয়ে সে অস্থির। একা একা এর আগে সে কখনো কোথাও যায় নি। অচেনা একটা জায়গায় ঠিকানা খুঁজে বেড়ানোর তো প্রশ্নই আসে না। সে খুঁজছে নাইমুলের বাসা। বিয়ের পর এই যে সে চলে গেল আর তার কোনো খোঁজ নেই। বাসার মানুষগুলিও যেন কেমন! তারাও তো খোঁজখবর করবে। এখন সময় ভালো না, চারদিকে আন্দোলন হচ্ছে। তার কিছু হয়েছে কি-না কে জানে।

মরিয়ম ঠিক করে রেখেছে, আজ সে মানুষটাকে সাথে করে নিয়ে যাবে। বাসার মানুষজন যার যা ইচ্ছা বলুক কিছুই যায় আসে না। বাবা যদি পিস্তল বের করে তাকে গুলি করে দেন তাহলে দেবেন, কিন্তু মানুষটাকে সে এখানে ফেলে রেখে যাবে না।

বেচারা একা একা থাকে। হোটেলে খায়। কেন সে হোটেলে খাবে ? দিনের পর দিন হোটেলের খাবার খেলে কি শরীর ঠিক থাকবে ? শরীর যদি খারাপ হয় তাহলে তো মরিয়মকেই সেটা দেখতে হবে। আর কে দেখবে ?

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে গুণ্ডাটাইপ একটা গোঁফওয়ালা ছেলে সঙ্গে এসে বাসা দেখিয়ে দিল। ঢাকাইয়া ভাষায় বলল, নাইমুল ছাব এই চিপায় থাকে। ডাক দেন— আওয়াজ দিব।

মরিয়ম নিশ্চিত যে সে একটা ফাঁদে পড়েছে। এরকম একটা জঘন্য জায়গায় নাইমুল থাকতেই পারে না। এই গুণ্ডাটা ভুলিয়ে ভালিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। এক্ষুনি সে ধাক্কা দিয়ে মরিয়মকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে। মরিয়ম কাঁপতে কাঁপতে দরজার কড়া নাড়ল। তার এক চোখ গুণ্ডাটার দিকে। গুণ্ডাটা চলে যায় নি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

দু'বার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে নাইমুলের গম্ভীর গলা শোনা গেল— মরিয়ম চলে এসো, দরজা খোলা।

শুধু কড়া নাড়ার শব্দ শুনে একটা লোক কী করে বুঝল কে এসেছে— এই রহস্য মরিয়ম কখনো ভেদ করতে পারে নি। নাইমুল কখনো বলে নি।

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে আসমানী হাসিমুখে বলল, এই শোনো, তোমাকে একটু দোকানে যেতে হবে।

আসমানী তার স্বভাবমতো ভোরবেলা গোসল করেছে। ধোয়া একটা শাড়ি পরেছে। কপালে টিপ। খুব সম্ভব চোখে হালকা করে কাজলও দিয়েছে। সুন্দর লাগছে তাকে। আসমানী বলল, এই, কথা বলছ না কেন?

শাহেদ ভুরু কুঁচকে চায়ের কাপে চুমুক দিল। তার সামনে দুটা পত্রিকা— দৈনিক পাকিস্তান, ইত্তেফাক। দৈনিক পাকিস্তানের ভাঁজ এখনো খোলা হয় নি। পত্রিকার পাতায় পাতায় আগুনগরম সব খবর। এখন স্ত্রীর কথা শোনা তেমন জরুরি না। দোকানে যাওয়াটাও জরুরি না। কাগজ পড়া শেষ হোক, তারপর দেখা যাবে।

আসমানী শাহেদের পাশে বসতে বসতে বলল, চট করে চা-টা খেয়ে নাও।

আসমানীকে আজ অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি হাসিখুশি লাগছে। তার কারণ স্পষ্ট নয়।

শাহেদ চায়ের কাপে চুমুক দিল। মিষ্টি কম হয়েছে। আরেকটু চিনি দাও— এই কথাটা বলতেও আলসেমি লাগছে। মনে হচ্ছে চিনির কথাটা বললেও সময় নষ্ট হবে। *দৈনিক পাকিস্তান*-এর প্রথম পাতায় সুন্দর একটা ছবি ছাপা হয়েছে। কালো পতাকা উড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমান যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ভবনে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক। বৈঠকে কী হলো না হলো পত্রিকায় নিশ্চয়ই তার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

তুমি এখন পত্রিকায় হাত দিও না। পড়তে শুরু করলে তুমি এক ঘণ্টার আগে উঠবে না। চা-টা শেষ করে তোমাকে একটু দোকানে যেতে হবে। শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার বৈঠকের চেয়েও এটা অনেক বেশি জরুরি।

তাই না-কি?

হ্যাঁ তাই। শেখ মুজিব ভাববেন তাঁর দেশ নিয়ে, আমি ভাবব আমার সংসারের তেল-চিনি নিয়ে।

দেশটা তোমার না ?

আমার কাছে আগে আমার সংসার। তারপর দেশ।

কঠিন কিছু কথা শাহেদের মুখে এসে গিয়েছিল। সে নিজেকে সামলালো। সকালবেলাটা তিক্ততার জন্যে ভালো না। সে পত্রিকায় মন দিল।

আসমানী হাত বাড়িয়ে পত্রিকা দুটা নিয়ে নিল। শাহেদের মাথায় চট করে রক্ত উঠে গেল। সে নিজেকে সামলে সিগারেট ধরাল। এখন সে একটা ঝগড়া শুরু করতে চায় না। ঝগড়া করার সময় অনেক পাওয়া যাবে। আপাতত যা করতে হবে তা হচ্ছে, কায়দা করে পত্রিকা দুটা নিয়ে নিতে হবে। এমনভাবে নিতে হবে যেন আসমানী টের না পায়। এই মুহূর্তে পত্রিকা পড়ার প্রতিই তার আগ্রহটা অনেক বেশি। স্ত্রীরা স্বামীর যে-কোনো বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহকেই সন্দেহের চোখে দেখে।

আসমানী শাহেদের পিঠে হাত রেখে বলল, দোকানে যাওয়া ছাড়াও তোমাকে কাঁচাবাজারেও যেতে হবে, ঘরে কোনো বাজার নেই। চাল-ডাল সব কিনতে হবে। সবাই খাবার কিনে ঘরে জমা করে রাখছে। শুধু আমাদের ঘরে কিছু নেই।

শাহেদ অনাগ্রহের মতো ভঙ্গি করে বলল, দেখি কাগজটা ?

আসমানী বলল, এখন কাগজ পাবে না। দোকানে যাবে, কাঁচাবাজারে যাবে; তারপর কাগজ। কাগজ পালিয়ে যাচ্ছে না।

শাহেদ রাগ চাপতে চাপতে বলল, দোকান এবং কাঁচাবাজারও পালিয়ে যাচ্ছে না।

আসমানী বলল, আচ্ছা, তোমার প্রতি সামান্য দয়া করলাম। কাঁচাবাজারে পরে যাবে। দোকান থেকে ঘুরে আসো। রুনির জন্য দুনম্বরি খাতা কিনতে হবে। সে ছবি আঁকবে, তারপর নাশতা খাবে। নাশতা না খেয়ে বসে আছে। তোমার মেয়ে যে কী পরিমাণ মেজাজি হয়েছে! আমার ধারণা, সে মেজাজ পেয়েছে তোমার কাছ থেকে। যা বলবে তাই করবে। তোমার চা খাওয়া শেষ হয়েছে না ? এখন ওঠো। মেয়ে ঘুম থেকে উঠেছে সাতটার সময়, এখন বাজছে দশটা। কিছু মুখে দেয় নি।

শাহেদ ঝামেলা করল না। উঠে দাঁড়াল, শার্ট গায়ে দিল। আসমানী বলল, তোমাকে কাগজ পড়তে না দেওয়ার জন্য আমার নিজেরই খারাপ লাগছে, তবে দোকান থেকে ফিরেই দেখবে গরম চা এবং চায়ের কাপের পাশে ভাঁজ করা পত্রিকা। ভালো কথা, খাতা যে আনবে খাতার কভারে হাতির ছবি থাকতে হবে। হাতির ছবি ছাড়া খাতা আনলে চলবে না। তোমার মেয়ে কী চিজ হয়েছে, তুমি তো জানো না। হাতির ছবির কথা মনে থাকে যেন।

মনে থাকবে।

মুখটা এমন প্যাঁচার মুখের মতো করে রেখেছ কেন ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। পাকিস্তানের সমস্যায় হতাশ, বিরক্ত ও ক্লান্ত। আমি লক্ষ করেছি ভোরবেলাতেই তোমার মেজাজ থাকে বেশি খারাপ। ইয়াহিয়া সাহেব! হিজ এক্সিলেন্সি! আজ কি অফিসে যাবে ?

না।

ভালো হয়েছে। আজ তাহলে তুমি রুনির মাথা কামিয়ে দেবে। ছোটবেলায় কয়েকবার মাথা না কামালে চুল ঘন হয় না। একটা রেজার ব্লেড এনো তো। এক বোতল ডেটল। মাথা কেটে গেলে দিতে হবে।

আর কী কী লাগবে একসঙ্গে বলো।

আর কিছু লাগবে না। দোকানে ভালোবাসা কিনতে পেলে তোমাকে সের খানেক ভালোবাসা কিনতে বলতাম। ইদানীং তোমার মধ্যে এই জিনিসের সাংঘাতিক অভাব দেখছি। ভালো কথা, চা পাতা নেই, চা পাতা আনতে হবে। প্লাস চিনি। এই দুটা যদি না আন তাহলে চা পাতা এবং চিনি ছাড়া চা খেতে হবে।

কিছু বাকি পড়ল কি-না আবার মনে করে দেখ। তাঁতের মাকুর মতো আমি দোকান-বাসা, দোকান-বাসা করতে পারব না।

আর কিছু লাগবে না। ভালো কথা, তুমি যখন খুব রেগে যাও তখন তোমার চেহারা কিন্তু খানিকটা ইয়াহিয়া খানের মতো হয়ে যায়। ঠাট্টা করছি না। অনেস্ট। যে জায়গায় তোমরা গোঁফ রাখ, তোমার সেই জায়গাটা ইয়াহিয়া খানের মতোই বড়। আচ্ছা গোঁফ রাখার জায়গাটার নাম যেন কী ?

জানি না।

কী আশ্চর্য, যেখানে তোমরা এত কায়দা করে গোঁফ রাখ তার নামও জানো না।

শাহেদ বিরক্ত গলায় বলল, অকারণে এত কথা বলছ কেন ? তুমি তো মাথা ধরিয়ে দিচ্ছ।

খাতা, চা, চিনি, রেজার ব্লেড নিয়ে শাহেদ মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এলো। আসমানী বলল, তোমাকে না বললাম হাতির ছবি মার্কা খাতা কিনতে। এই খাতা দেখেই তো তোমার মেয়ে কাঁদতে শুরু করবে।

হাতিমার্কা খাতা ছিল না।

থাকবে না কেন ? ছিল তো বটেই। তুমি বলতে ভুলে গেছ। যা দিয়েছে তাই নিয়ে চলে এসেছ। প্লিজ, খাতাটা বদলে আন।

শাহেদ সার্ট খুলতে খুলতে বলল, বদলাতে পারব না। যা এনেছি তাই তোমার মেয়েকে দাও। আদর দিয়ে দিয়ে তুমি মেয়েটাকে নষ্ট করছ। জগতের নিয়ম হচ্ছে, কোনো জিনিস চাইলেই পাওয়া যায় না। অথচ তোমার মেয়ের ধারণা হয়েছে, যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। হাতি মার্কা খাতা চেয়েছে, হাতি মার্কা খাতা দিতে হবে। বাঘ মার্কা চাইলে বাঘ মার্কা। এসব কী ?

তুমি এমন চোখ বড় বড় করে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন ?

জন্ম থেকেই আমার চোখ বড়। এই জন্য চোখ বড় বড় করে কথা বলছি। তুমিই বা সরু চোখে তাকিয়ে আছ কেন ? সরু চোখে তাকিয়ে থাকার মতো অপরাধ কি করেছি ?

মেয়ে যখন কেঁদে বাসা মাথায় তুলবে, তখন কী করবে ?

ওকে বুঝিয়ে বলো। বুঝিয়ে বললেই কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলবে না। শিশুরা লজিক বুঝতে পারে। সমস্যা বড়দের নিয়ে। বড়রা লজিক বুঝতে চায় না।

তাহলে দয়া করে তোমার বিখ্যাত লজিক দিয়ে ওকে বোঝাও।

শাহেদ খবরের কাগজ নিয়ে বসল। আসমানী কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে রুনির কাছে গেল। এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রুনীর আকাশ ফাটানো চিৎকার শোনা যেতে লাগল। ভয়াবহ চিৎকার। মনে হচ্ছে বাড়িঘর ভেঙে পড়বে। চিৎকার অগ্রাহ্য করে কাগজে মন দেয়া যাচ্ছে না। শাহেদের মেজাজ দ্রুত খারাপ হচ্ছে। ইচ্ছা করছে উঠে গিয়ে মেয়েটার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। এটাও করা যাবে না। তাহলে সারাদিন আসমানী মুখ ভোঁতা করে রাখবে। সন্ধ্যাবেলা দেখা যাবে মেয়েকে নিয়ে মা'র বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। শাহেদ ডাকল, রুনি মা, শুনে যাও তো। রুনি সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল।

কেন কাঁদছ গো মা ?

বাবা, ছবি আঁকব।

ছবি আঁকবে সেটা তো খুবই ভালো কথা। আঁকো। তোমার জন্য তো খাতা কিনে এনেছি। একটা কেনার কথা ছিল, দুটা কিনেছি।

হাতির ছবির খাতা লাগবে। এই খাতায় আঁকব না। এই খাতা পচা।

হাতির ছবির খাতা দোকানে ছিল না, তাই আনা হয় নি। আমি আবার যখন বের হবো তখন নিয়ে আসব।

না, আমার এখনি লাগবে।

চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না মা।

পাওয়া যায়।

না, পাওয়া যায় না।

পাওয়া যায়।

এরকম করে কথা বলবে না রুনি। এরকম করে কথা বললে আমার মেজাজ খুব খারাপ হবে। হঠাৎ দেখা যাবে তোমার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছি।

না তুমি চড় বসাবে না।

তুমি কিন্তু আমার মেজাজ খুব খারাপ করছ রুনি। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো যাও, ছবি আঁকো, আমি কাগজ পড়ি।

না, তুমি কাগজ পড়বে না।

রুনি হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজ টেনে নিল এবং শাহেদের কিছু বলার আগেই ছিঁড়তে শুরু করল। রুনির মুখ গম্ভীর। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কাগজ ছেঁড়ার এই কাজটি সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করছে। শাহেদের অধিক শোকে পাথর হওয়ার মতো ব্যাপার হলো। সে মেয়ের কাগজ ছেঁড়া দেখল। শোকের প্রবল ধাক্কাটা কমে যাওয়ার পরপরই মেয়ের গালে চড় বসিয়ে দিল, রুনি সারা বাড়ি কাঁপিয়ে চিৎকার করতে লাগল। আসমানী ছুটে এসে মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। শাহেদের মনটা হলো খারাপ। ইচ্ছে করলে ছেঁড়া কাগজগুলো হাতে নিয়ে পড়া যায়। ইচ্ছা করছে না। মেয়েটার গালে আরেকটা চড় দিতে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে আগেরবারেরটা তেমন জোরালো হয় নি।

রুনির কান্না থেমে গেছে। জোরালো চড় হলে এত সহজে কান্না থামত না। বাসা থেকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে। কাঁচাবাজারে যাওয়া যেতে পারে। চাল-ডাল-তেল-নুন আসলেই কিনে রাখা দরকার। সবাই কিনেছে। সে কেন কিনবে না? কয়েক কার্টুন সিগারেট। যুদ্ধের সময় সবচে' দুষ্প্রাপ্য হয় সিগারেট।

আসমানী রুনিকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ভীত গলায় বলল, দেখ তো দেখ তো ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। রুনি, হা করো তো মা। হা করো।

রুনি হা করল। আসলেই মুখভর্তি রক্ত। আসমানী হতভম্ব গলায় বলল, কী করেছ তুমি মেয়ের?

শাহেদ অপ্রস্তুত গলায় বলল, গালটাল কোথায়ও কেটে গেছে। এত অস্থির হওয়ার মতো কিছু হয় নি। দেখি, ওকে আমার কোলে দাও।

না, আমি আমার মেয়েকে তোমার কোলে দেব না। তুমি কোন সাহসে আমার মেয়েকে কোলে নিতে চাও?

আসমানী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। রুনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাবার কোলে যাবার জন্য। শিশুরা অতি সহজে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করতে পারে।

শাহেদ বলল, কোথায় কেটেছে একটু দেখি। দরকার হলে একজন ডাক্তার দেখিয়ে আনি।

তোমাকে কিছুই করতে হবে না। খবরদার, তুমি আমার মেয়েকে কোলে নেবে না। খবরদার তুমি আমার মেয়েকে ছোঁবে না।

তুমি এমন ভেউ ভেউ করে কাঁদছ কেন ? তোমার মেয়ে তো কাঁদছে না। এই দেখ, রক্ত পড়াও বন্ধ হয়েছে। আর রক্ত পড়ছে না।

আসমানী কাঁদতে কাঁদতেই মেয়ে কোলে নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল। শাহেদের মন এমনই খারাপ হলো যে তার নিজেরও কাঁদতে ইচ্ছা করল। দিনটা সুন্দরভাবে শুরু হয়ে হঠাৎ কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। তার আর ঘরে চুপচাপ বসে থাকার কোনো মানে হয় না। সবচেয়ে ভালো হয় কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে এলে। অফিসে যাওয়া যেতে পারে। অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে আনলে আসমানীর রাগ হয়তো কিছু কমবে। মেয়েটার জন্য গাদাখানিক হাতির ছবি আঁকা খাতা আনতে হবে। আর একটা ঘুড়ি কিনতে হবে। কবে যেন ঘুড়ির কথা বলছিল।

অফিসে শাহেদের সময়টা খুব খারাপ কাটল। খাঁ-খাঁ করছে অফিস। বলতে গেলে কেউ আসে নি।

অফিসের পিওন রুস্তম টুলে বসে ঝিমুচ্ছে। চোখ মেলে একবার সে শাহেদকে দেখল। উঠে দাঁড়াচ্ছে— এমন ভঙ্গি করে আবারো চোখ বন্ধ করে ঝিমাতে লাগল।

ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। একসময় লোকজন গমগম করত। আজ মাছি উড়ছে। যে-সব কোম্পানির মালিক অবাঙালি তার সবগুলোরই এই অবস্থা। মালিকরা অফিসে আসা বন্ধ করেছেন। অফিসে মাছি উড়া শুরু হয়েছে।

ক্যাশিয়ার নিবারণ বাবু বললেন, আজ অফিসে এসেছেন কেন ? আজ জোর গুজব শহরে আর্মি নামবে। শেখ সাহেব আর ইয়াহিয়ার বৈঠক বানচাল হয়ে গেছে। সবাই এখন ঘর সামলাতে ব্যস্ত, আপনি কেন অফিসে ?

শাহেদ বলল, আপনিও তো অফিসে।

আমার ঘরে কিছু করার নেই। ফ্যামিলি দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাজেই চলে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে গল্পগুজব করব।

বেশ তো করুন গল্পগুজব।

নিবারণ সাহেব অনেক ধরনের মজার মজার গল্প করলেন। এর মধ্যে ভৌতিক গল্পও আছে। তার কাকার শ্রাদ্ধের দিন না-কি সবাই দেখেছে অবিকল

তার কাকার মতো দেখতে এক লোক শোবার ঘরের খাটে বসে আছে। লোকটা সম্পূর্ণ নগ্ন। শুধু গলায় পৈতা। শাহেদের কোনো গল্পই তেমন মজা লাগল না। নিবারণ বাবু ঝুঁকে এসে বললেন, আপনাকে খুব চিন্তিত লাগছে। ভাবিকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তাহলে দেখবেন আমার মতো হয়ে যাবেন। চিন্তাভাবনাহীন লাট্টু মিয়া। যখন ইচ্ছে বনবন করে ঘুরবো।

শাহেদ বলল, উঠি।

আরো কিছুক্ষণ বসুন, গল্প করি। চা খাবেন ? চা আনিয়ে দেই।

না, চা খাব না।

কেন খাবেন না! চা খান। বি হ্যাপী।

শাহেদ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনি অফিসে কতক্ষণ থাকবেন ?

নিবারণ বাবু আনন্দিত গলায় বললেন, আমি তো অফিসেই থাকি। বিছানা বালিশ নিয়ে চলে এসেছি। অফিস হলো এখন সবচে' নিরাপদ জায়গা।

একটার দিকে শাহেদ অফিস থেকে বের হলো।

মনে হচ্ছে শহর কোনো উৎসবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া হচ্ছে। শাহেদের সামনেই হাজার হাজার মানুষ মহা-উৎসাহে পুরনো একটা বাস ঠেলতে ঠেলতে এনে রাস্তায় শুইয়ে দিল। এরা কার বাস নিয়ে এসেছে কে জানে! শেখ সাহেব কি রাস্তা ব্যারিকেড দেওয়ার কোনো নির্দেশ দিয়েছেন ? তাঁর নির্দেশ ছাড়া তো এখন কিছুই হয় না। অফিস চলছে তাঁর নির্দেশে। ব্যাংক চলছে তাঁর নির্দেশে।

২৩ মার্চ, পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে কোথাও পাকিস্তানি পতাকা উড়ে নি। শুধু তিনটা জায়গায় পতাকা উড়েছে— প্রেসিডেন্ট ভবনে যেখানে ইয়াহিয়া থাকেন, গভর্নর ভবনে এবং এয়ারপোর্টে। ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশন এবং সোভিয়েত কনস্যুলেটে উড়েছে বাংলাদেশী পতাকা। চীন, ইরান, ইন্দোনেশিয়া এবং নেপাল পাকিস্তানি পতাকা তুললেও জনতার চাপে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছে। আমেরিকান দূতাবাস অবশ্যি কোনো ঝামেলায় যায় নি। তারা কোনো পতাকাই উড়ায় নি। ভয়াবহ কাণ্ডটা করেছে ইপিআর। তারা যশোহর সদর দপ্তরে উড়িয়েছে বাংলাদেশী পতাকা।*

সে-রাতে টিভি অনুষ্ঠান শেষ হবার পর পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত 'পাক সার যামিন শাদ বাদ' ঠিকই বাজানো হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানি পতাকা দেখানো হয় নি।

---

* *বাংলাদেশের তারিখ*, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।
৭১-এর দশমাস, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী।

লক্ষণ ভালো না। লক্ষণ খুবই খারাপ। পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী এত কিছু দেখার পরেও চুপ করে থাকবে, কিছু বলবে না— তা হতেই পারে না। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে তো বটেই। সেটা কবে ঘটবে ?

বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। কী করা যায় ? কী করা যায় ? নাইমুলের কাছে গেলে কিছুটা সময় কাটে। সে বিয়ে করেছে— এই খবরটা পেয়েছে। বিয়ের পর তার সাথে দেখা হয় নি। নাইমুলকে যে মেয়ে বিয়ে করেছে, সে খুবই ভাগ্যবতী। এই খবরটা মেয়েকে দিতে ইচ্ছা করছে। শাহেদ ঠিক করল, নাইমুলকে পেলে তাকে নিয়ে সে তার শ্বশুরবাড়ি যাবে। নাইমুলের স্ত্রীকে বলবে, ভাবি, কী অসাধারণ একটি ছেলেকে আপনি স্বামী হিসেবে পেয়েছেন জানেন না। আমি জানি। নাইমুল অনেক তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আপনার সঙ্গে রাগারাগি করবে। আপনাকে বিরক্ত করবে। সব আপনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেবেন। কারণ এই ছেলে খাঁটি হীরা। তার মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। আপনি যদি চান, আপনাকে লিখিতভাবে দিতে পারি।

নাইমুলকে পাওয়া গেল না। ঘর তালাবন্ধ। তবে তালার সঙ্গে সেঁটে দেয়া একটা ছোট্ট চিরকুটে লেখা—

যার জন্যে প্রযোজ্য

> কিছুদিন ঘরজামাই জীবনযাপন করছি। আমার নতুন ঠিকানা— ১৮নং সোবাহানবাগ (দোতলা), মিরপুর রোড। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন আমার কাছে না আসে।

শাহেদ নোট পড়ে হাসল। মনে মনে ঠিক করল, আসমানীর রাগ ভাঙিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার পর উপস্থিত হবে নাইমুলের শ্বশুরবাড়িতে।

শাহেদ বাসায় ফিরল দুটার দিকে। কাঁচাবাজার ছাড়াই ফিরল। কী কী লাগবে তার লিস্ট আসমানীর কাছ থেকে নেয়া হয় নি। তবে সে ছটা হাতিমার্কা খাতা কিনল। একবাক্স রঙ-পেনসিল কিনল। আসমানীর রাগ ভাঙানোর জন্যে সে কিনল একটা রাগভাঙানি-শাড়ি। শাড়ির রঙ অবশ্যই আসমানী। রাজশাহী সিল্কের শাড়ি। শাড়ি হাতে নিলেই আসমানীর রাগ অনেকখানি কমবে। শাড়ির সঙ্গে লেখা নোটটা পড়লে এতটুকু রাগও থাকবে না। নোটে লেখা— 'জান গো! কেন এমন করো ?'

বাসায় তালা দেওয়া। শাহেদ এতে তেমন বিস্মিত হলো না। তার মনে ক্ষীণ আশঙ্কা ছিল, বাসায় ফিরে এরকম কিছু সে দেখবে। ঘরে তালা দিয়ে আসমানী রাগ করে চলে যাবে কলাবাগানে তার মা'র কাছে।

আসমানী কলাবাগানে ছিল না। শাহেদের শাশুড়ি বিরক্ত গলায় বললেন, শহরের অবস্থা এত খারাপ, এর মধ্যে আসমানী বের হলো কেন? রোজ রোজ কী নিয়ে তোমাদের এত ঝগড়া? আমি আমার মেয়ের উপর যেমন রাগ করছি, তোমার উপরও রাগ করছি। এখন যাও তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করো ও কোথায়। তুমি তো বাবা আমাকে মহা-দুশ্চিন্তায় ফেললে। শহরের অবস্থা এত খারাপ, এর মধ্যে এই খবর...

শাহেদ নানান জায়গায় ওদের খুঁজল। কোনোরকম সন্ধান পাওয়া গেল না। শাড়িটা সে রেখে এসেছে তার শাশুড়ির কাছে। এটা নিয়েও সে দুশ্চিন্তা করছে। শাশুড়ি যদি নোটটা পড়ে ফেলেন, তাহলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। রাত অনেক হয়েছে। ঘড়ি নেই বলে কত রাত তা বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটে লোক-চলাচল একেবারেই বন্ধ। রিকশাও চলছে না। কিছুদূর পরপরই রাস্তায় এমন ব্যারিকেড দেওয়া, রিকশা চলার প্রশ্নও আসে না।

শাহেদ হেঁটে হেঁটে ফিরছে, এই সময় শহরে মিলিটারি নামল। রাতটা হলো ২৫ মার্চ, ১৯৭১।

আকাশে ট্রেসার উড়ছে। আকাশ আলো হয়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে আলোর নকশা। যেন বারবার কালো আকাশে ঝলমলিয়ে উঠছে উৎসবের হাউই বাতি। তারাবাতির মতো আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে মেশিনগানের মুখ থেকে। বাজির শব্দের মতো গুলি। উৎসব। অন্য ধরনের উৎসব। হত্যা ও ধ্বংসের উৎসব। এই উৎসবের জন্যে কেউ কি তৈরি ছিল ? ঢাকার ঘুমন্ত মানুষ ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে জেগে উঠল। কী হচ্ছে ? কী হচ্ছে ?

সবাই জানে কী হচ্ছে। তারপরেও যেন কেউ কিছু জানে না। ভারী মিলিটারি ট্রাক, মিলিটারি জিপ অবলীলায় রাস্তায় চলাচল করছে। সবকটি রাস্তায় না বেরিকেড ছিল ? এরা এত দ্রুত বেরিকেড সরালো কীভাবে ? অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে রাস্তায়। ট্যাংক নেমেছে নাকি ? ট্যাংক চললে রাস্তায় এমন অদ্ভুত শব্দ হয় ? একটানা যে ট্যা ট্যা শব্দ হচ্ছে সেই শব্দ কিসের ? তার চেয়েও বিচিত্র আরেক ধরনের শব্দ হচ্ছে— শোঁ শোঁ হুস হুইইই।

ভয় এবং কৌতূহল বোধহয় পাশাপাশি চলে। প্রচণ্ড ভীত মানুষের কৌতূহলও হয় প্রচণ্ড। এরা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছে। দেখতে চেষ্টা করছে কী হচ্ছে বাইরে। কেউ কেউ চলে এসেছে বারান্দায়। চোখের সামনে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ দেখার আলাদা মাদকতা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ধরনের ঘোর তৈরি হয়। মাথার ভেতরে জগাখিচুড়ির মতো কিছু হয়। তখন মানুষ যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এমনসব কাণ্ড করে।

এই জাতীয় কাণ্ড কিছু শুরু হলো। কিছু কিছু নিতান্তই নিরীহ ছাপোষা ধরনের মানুষ 'জয় বাংলা, জয় বাংলা' বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল। দীর্ঘ আন্দোলনে এদের কেউ হয়তো কোনোদিন রাজপথে নামে নি। কোনো স্লোগান দেয় নি। অফিসে গিয়েছে, অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে এসেছে। চটের ব্যাগের ভেতর থেকে উঁকি দিয়েছে একটা লাউ, ইলিশ মাছের লেজ। আজ হঠাৎ তাদের কী হয়ে গেল ?

ভীত মানুষের কান্না ও চিৎকার শোনা যেতে শুরু করল তারও কিছু পরে। আকাশে তখন ট্রেসারের সংখ্যা কমে এসেছে। কারণ তার প্রয়োজন নেই। সারা

ঢাকা শহর আলোকিত। অসংখ্য জায়গায় আগুন জ্বলছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। আগে সারা শহরে একসঙ্গে গুলি হচ্ছিল, এখন তা হচ্ছে না। গুলি হচ্ছে অঞ্চল বিশেষে। টেলিফোন কাজ করছে না। রাস্তা শুধু যে জনশূন্য তাই নয়, প্রথমবারের মতো কুকুরশূন্য। কোথায় কী হচ্ছে কেউ জানতে পারছে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কী হলো ? তাঁর আঙুলের ইশারায় দেশ চলছিল। এখন তিনি কিছু বলছেন না কেন ? ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেষ বৈঠকের আগে, সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ভালো কিছু আশা করছি। খারাপ কিছুর জন্যেও প্রস্তুত আছি। কোথায় তাঁর প্রস্তুতি ? নাকি যুদ্ধ শুরু হয়েছে, কেউ কিছু জানে না।

একদল মিলিটারি ঢুকে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। তাদের হাতে শিক্ষকদের তালিকা। তারা মানুষ না, তারা সাক্ষাৎ আজরাইল। মানুষের বেশে জান কবজ করতে এসেছে।

এটা কার বাড়ি ? জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ? হিন্দু মালাউন ? বদমাশটার নাম কী ? জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ?[১]

মিলিটারি লেফটেনেন্ট বাড়িতে ঢুকে পড়ল। জোয়ানরা বাড়ি ঘিরে আছে। হতভম্ব জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন।

আপ প্রফেসর সাব হ্যায় ?

Yes.

আপকো লে যায়গা।

Why ?

হোয়াই প্রশ্নের জবাব দেবার সময় নেই। তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা, তাঁর অতি আদরের কন্যা দোলা তখনো বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। এর বেশি কী হবে ? খালি পায়ে স্বামীকে নিয়ে যাবে ? বাসন্তী গুহঠাকুরতা দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন স্যান্ডেল আনতে। এর মধ্যেই জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে বাইরে নিয়ে গুলি করা হয়েছে।

তাদের বসার ঘরের সঙ্গেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে ড. মনিরুজ্জামানের মৃতদেহ। একটু দূরে আরো তিনজন। একজন ক্ষীণস্বরে বলছে, পানি পানি।

মারা গেলেন দার্শনিক আত্মভোলা অধ্যাপক ড. জি. সি. দেব। জি. সি. দেব মৃত্যুর আগে প্রায় হাসিমুখে বললেন, আমি হিন্দু। আমার বাড়িতে যারা আছে সবাই হিন্দু।[২]

---

[১] *একাত্তরের স্মৃতি*। বাসন্তী গুহঠাকুরতা

[২] *অন্তরাগে স্মৃতিসমুজ্জ্বল, বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও আমি*। মমিনুল হক খোকা।

তিনি হয়তো ভাবলেন, সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি কোনো অত্যাচার করা হবে না। কিংবা অন্য কিছু তখন তাঁর মাথায় খেলা করছিল।

মারা গেলেন মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ফজলুর রহমান, ফলিত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান ড. মনিরুজ্জামান, ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল মুকতাদির, অংক বিভাগের অধ্যাপক শরাফত আলী, পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এম. আর. খান খাদিম, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সিটিউটের শিক্ষক মুহম্মদ সাদিক ও ড. মুহম্মদ সাদত আলী।

মিলিটারিরা ঢুকে পড়ল ইকবাল হল এবং জগন্নাথ হলে। তাদের পরিকল্পনা একটি ছাত্রও যেন জীবিত বের হয়ে যেতে না পারে। তোমাদের 'জয় বাংলা' অনেক সহ্য করেছি। আর না।

রোকেয়া হল এবং শামসুন্নাহার হল। মেয়েদের দু'টি হল। হলের মেয়েরা আতঙ্কে অস্থির হয়ে দেখল, গেট ভেঙে মিলিটারিরা ঢুকছে। 'আমাদের বাঁচাও' বলে চিৎকার করার মতো মানসিক শক্তিও তাদের রইল না। তারা দেখল, পাকিস্তানি জোয়ানরা মার্চ করে হলের দিকে এগুচ্ছে।

সেনাবাহিনী আগুন জ্বালিয়ে দেয় *ইত্তেফাক* অফিসে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে *দি পিপলস, গণবাংলা* এবং *সংবাদ* অফিসে। আত্মনিমগ্ন কবি শহীদ সাবের *সংবাদ* অফিসেই ঘুমাতেন। *সংবাদ* অফিসই ছিল তাঁর ঘর-বাড়ি। তিনি জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেলেন *সংবাদ* অফিসেই।

পাকিস্তান মিলিটারি রাত একটায় যে অপারেশন শুরু করে তার নাম 'অপারেশন সার্চ লাইট'।* ব্রিগেডিয়ার আবরারের ৫৭ ব্রিগেড ছিল অপারেশনের দায়িত্বে। অধিনায়ক মেজর জেনারেল ফরমান আলি। তিনি শায়েস্তা করবেন ঢাকা নগরী। মেজর জেনারেল খাদেমের উপর দায়িত্ব পড়ল ঢাকা ছাড়া বাকি দেশ শায়েস্তা করার।

ব্রিগেডিয়ার আরবার ১৮ পাঞ্জাব, ২২ বেলুচ এবং ৩২ পাঞ্জাবের যৌথ দলকে লেলিয়ে দিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে পাঠাল রাজারবাগের এক হাজার পুলিশকে জন্মের শিক্ষা দেবার জন্যে।

পুরনো ঢাকার গাদ্দারদের শায়েস্তা করবে ১৮ পাঞ্জাব ফোর্স।

বালুচ রেজিমেন্টের দায়িত্ব পড়ল পিলখানা ইপিআর'দের ঠাণ্ডা করা।

---

* *উইটনেস টু সারেন্ডার।* সিদ্দিক সালেক।

১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে কোনো কাজে লাগানো হলো না। রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে তাদের ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতে রেখে দেয়া হলো।

৪৩ হালকা বিমান বিধ্বংসী রেজিমেন্টকে পাঠানো হলো তেজগাঁও বিমানবন্দরের দায়িত্ব দিয়ে।

এক প্লাটুন কমান্ডো পাঠানো হলো ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর থেকে শেখ মুজিবকে ধরে আনতে।

রাত একটায় ওয়্যারলেসে ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জাফরের উৎফুল্ল কণ্ঠ ভেসে এলো— Big Bird in the cage... others not in the nests. ... over.

সামরিক বাহিনীর জিপে করে তাঁকে নিয়ে আসা হলো ক্যান্টনমেন্টে। মেজর জাফর জানতে চাইল জেনারেল টিক্কা কি তাঁকে চোখের দেখা দেখতে চান ? টিক্কা উত্তর দিল— I don't want to see his face.*

জেনারেল টিক্কা ২৫ মার্চ রাত ন'টায় ঢাকা অঞ্চল কমান্ডার মেজর জেনারেল ফরমান আলীর স্টাফ অফিসে ঢাকা অপারেশনের দায়িত্বে নিযুক্ত অফিসারদের হাসতে হাসতে বলেছিলেন— ঢাকা শহরে এমন তাণ্ডব তৈরি করতে হবে যেন আতঙ্কে দুগ্ধবতী মাতার বুকের দুধ জমে দই হয়ে যায়। বাংলাদেশ ছোট্ট একটি দুষ্ট প্রাণী। ঢাকা হলো সেই প্রাণীর মাথা। আমরা শুধু মাথাটা ভেঙে গুঁড়ো করে দেব। আমাদের আর কিছু করতে হবে না। ২৭ মার্চ ভোরবেলা আমি কারফিউ তুলে দেব। দেখা যাবে ২৭ মার্চেই ইনশাল্লাহ দেশ ঠিক হয়ে গেছে।

জেনারেল টিক্কা পরম সৌজন্যে টিপট থেকে নিজেই সবার জন্য চা ঢেলে দিলেন। হাসিমুখে বললেন, শেকসপিয়র তার হ্যামলেটে বলেছিলেন, I have to be cruel only to be kind. আমার ক্রুয়েলটি হবে এক ধরনের দয়াপ্রদর্শন। বাঙালিদের প্রতি দয়া। গ্যাংগ্রীনে আক্রান্ত অংশ শল্যচিকিৎসক কেটে বাদ দেন। তিনি তা করেন রোগীর মঙ্গলের জন্য, রোগী তা বুঝতে পারে না। রোগগ্রস্ত বাঙালিকে আমরা বাঁচাব না তো কে বাঁচাবে ? মিটিং-এর শেষ পর্যায়ে তিনি পাঞ্জাবি সৈন্যদের বুদ্ধি-সুদ্ধি নিয়ে একটা রসিকতা করলেন। সেই রসিকতায় এক একজন হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল। সেনাপ্রধানের সামনে এভাবে হাসা বড় ধরনের বেয়াদবি, কিন্তু না হেসে পারা যাচ্ছিল না। রসিকতাটা ছিল বড়ই মজার।

জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে ভুট্টোর সাক্ষাৎ হলো গভর্নর হাউসে। ততক্ষণে অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়ে গেছে। ভুট্টো খানিকটা উত্তেজিত। অস্থির। তার

---

* *উইটনেস টু সারেন্ডার*। সিদ্দিক সালেক।

জানার আগ্রহ, কী হচ্ছে ? অপারেশন কোন পর্যায়ে ? জেনারেল টিক্কা খান তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। মিলিটারি অপারেশন কী হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে তা সিভিলিয়ানদের জানানোর কিছু নেই। উত্তেজিত ভুট্টো রাতেই মিলিটারি কনভয়ের সঙ্গে বের হয়ে শহরের অবস্থা দেখতে আগ্রহী। জেনারেল টিক্কা হাসি হাসি মুখে বলল, No. ভুট্টো মেঝেতে জুতা ঠুকে বলল, Why no ? জেনারেল টিক্কা বলল, Because I said no.

ভুট্টো বলল, আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

টিক্কা বলল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেছেন। তিনি এখন পাকিস্তানের পথে।

ভুট্টো আবারো মেঝেতে জুতা ঠুকে বলল, এই তথ্যটা আমি কেন জানলাম না ? আমিও তো তাঁর সঙ্গে চলে যেতে পারতাম।

আপনাকে রেখে যাওয়া হয়েছে বিদ্রোহী পূর্ব পাকিস্তানের শান্ত রূপ দেখে যাবার জন্যে। অখণ্ড পাকিস্তানের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী, কফি খাবেন ?

'সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী' সম্বোধনে ভুট্টোকে খানিকটা তুষ্ট মনে হলো।

লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টার সিমন ড্রিং-এর পাঠানো প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য ঢাকা থেকে পাঠানো প্রথম বিদেশী প্রতিবেদন। তিনি তার দীর্ঘ প্রতিবেদনের এক অংশে লিখলেন—

City lies silent

Shortly before dawn most firing had stopped, and as the sun came up an eerie silence settled over the city, deserted and completely dead except for the noise of the crows and occasional convoy of troops or two or three tanks rumbling by mopping up.

At noon again without warning, columns of troops poured into the old section of the city where more than one million lived in a sprawling maze of narrow, winding streets. For the next 11 hours they devasted the 'old town' as it is called.

The lead unit was followed by soldiers carrying cans of gasoline. Those who tried to escape was shot. Those who stayed were burnt alive.

নগরী নীরব

> সকাল হবার কিছুক্ষণ আগে গোলাবর্ষণ থেমে গেল, সূর্য উঠল, এক ভৌতিক নীরবতা নগরীকে গ্রাস করল, পরিত্যক্ত ও মৃত এই নগরীতে শুধু শোনা যাচ্ছে কাকের ডাক, মিলিটারি কনভয় ও চলমান ট্যাংকের ঘর্ঘর শব্দ।
>
> দুপুরে আচমকা সৈন্যদলের গাড়ি পুরনো ঢাকায় ঢুকে পড়ল, যার গোলকধাঁধার মতো গলিঘুঁজিতে দশ লাখ মানুষ বাস করেন। পরের এগারোটা ঘণ্টা ধরে চলল ধ্বংসযজ্ঞ।
>
> অগ্রবর্তী দলের পেছনে পেছনে সৈন্যরা পেট্রোলের টিন হাতে করে যাচ্ছিল। যারা পালাতে চেষ্টা করছিল তাদের গুলি করা হলো। যারা পালালো না তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো।

শাহেদ নিতান্ত অজানা অচেনা এক বাড়িতে আটকা পড়ে আছে। ২৫ মার্চের মধ্যরাতে সে উপায় না দেখে বিজয়নগরের এই গলিতে ঢুকে পড়েছিল। একতলা একটা বাড়ির বন্ধ গেট টপকে সে প্রাণপণ শক্তিতে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিল। জানালার পর্দা সরিয়ে বাচ্চা একটা মেয়ে উঁকি দিল। ভীত গলায় বলল, কে, কে ?

শাহেদ বলল, খুকি, তুমি আমাকে চিনবে না। দরজা খোলো।

দরজা খুলছে না। রাস্তায় গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। শাহেদ বলল, খুকি দরজা খোলো।

খুকির মা দরজা খুললেন। তিনি তার মেয়ের মতোই ভয় পেয়েছেন। তার চোখ-মুখ সাদা। তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন। খুকির মা বললেন, বাইরে কী হচ্ছে ?

শাহেদ বলল, শহরে মিলিটারি নেমে গেছে। সব জানালা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিন। বাতি জ্বেলে রেখেছেন কেন ? বাড়ির ভেতর থেকে এক বৃদ্ধর শ্লেষ্মাজড়ানো গলা ভেসে এলো, বউমা, দরজা কেন খুললা ? তুমি কার সাথে কথা বলো ?

শাহেদ বৃদ্ধের কথার জবাব দিতে পারে নি। তার আগেই খুব কাছে কোথাও মর্টারের গোলা পড়ল। প্রথম গোলার পর দ্বিতীয় গোলা পড়ল। এবারেরটা যেন আরো কাছে। পুরো বাড়ি কেঁপে উঠল। বসার ঘরের দেয়ালে ঝুলানো বাঁধানো সবক'টা ছবি খুলে পড়ে গেল। ঝনঝন শব্দ হতেই থাকল। কারেন্ট চলে গিয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। বৃদ্ধ ভয় পেয়ে শিশুর মতো চেঁচাতে লাগলেন, ও বউমা। বউমা। ও বউমা। তুমি কার সঙ্গে কথা বলো ?

বাচ্চামেয়েটা চিৎকার করে কাঁদছে। গুলির চেয়েও সে অন্ধকারকে ভয় পাচ্ছে। শাহেদ বলল, খুকি, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক। নড়বে না। ঘরভর্তি কাচের টুকরা।

দুঃসময় মানুষকে অতিদ্রুত দলবদ্ধ করে। অরণ্যচারী মানুষ হিংস্র শ্বাপদের ইশারা পেলেই যূথবদ্ধ হতো। সভ্য মানুষের ভেতরেও হয়তো সেই স্মৃতি রয়ে গেছে। আজ এই ভয়াবহ সময়ে তারা চলে এসেছে কাছাকাছি।

মাত্র তিন ঘণ্টা পার হয়েছে— শাহেদ এই পরিবারটির সঙ্গে আছে। এই তিন ঘণ্টায় নিজেকে সে এই পরিবারের একজন সদস্য বলেই মনে করছে। ঢাকা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক সানাউল্লাহ সাহেবের স্ত্রীকে তার নিজের ছোটবোনের মতোই মনে হচ্ছে। সানাউল্লাহ সাহেবের বাবাকে সে ডাকছে চাচাজান। সানাউল্লাহ সাহেবের মেয়েটি সারাক্ষণ তার আঙুল ধরে আছে। মেয়েটির নাম কংকন। সে 'কংকন' বলতে পারে না, নাম জিজ্ঞেস করলে বলে 'ককন'। মেয়েটির বয়স পাঁচের কাছাকাছি। এই বয়সে অনুস্বারের উচ্চারণ আয়ত্তে এসে যাওয়া উচিত। মেয়েটি মনে হয় কথা বলায় পিছিয়ে আছে। শাহেদ নিতান্তই অপরিচিত একজন, তারপরেও সে সানাউল্লাহ সাহেবের শোবার ঘরের খাটে অন্য সবার সঙ্গে বসে আছে।

কংকনের মায়ের নাম এখনো জানা যায় নি। তার শ্বশুর তাকে 'মানু' ডাকছেন। মানু নিশ্চয়ই তার নাম না। বড় নাম ভেঙে আদর করে তিনি হয়তো পুত্রবধূকে ছোট নামে ডাকেন। বৃদ্ধ যে তার পুত্রবধূকে অত্যন্ত পছন্দ করেন তা তার কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে। তবে তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে ধমক দিচ্ছেন। কংকনের মা তাতে বিচলিত হচ্ছেন না। কথায় কথায় শ্বশুরের ধমক খেয়ে তার হয়তো অভ্যাস আছে।

ঘরে হারিকেন জ্বালানো হয়েছে। কংকন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাকি তিনজন তাকিয়ে আছে হারিকেনের দিকে। অন্ধকারে মানুষ সবসময় আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। শুধু ইলেকট্রিক বাতির দিকে তাকায় না। ইলেকট্রিকের আলো চোখে লাগে।

কংকনের মা শাহেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাই, আপনি কি রাতে খেয়েছেন ?

শাহেদ বলল, জি না। তবে আমি কিছু খাব না। এই সময় খাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ঘরে খাবার কিছু নেই। গরম ভাত দেই আর একটা ডিম ভেজে দেই ?

আমার ক্ষিধে নেই।

বৃদ্ধ খুবই বিরক্ত গলায় বললেন, বৌমা, আমি তোমার কথাবার্তা, কার্যকলাপে যারপরনাই বিরক্ত। ভাত দেই, ডিম ভেজে দেই— এইসব কী ধরনের কথা ? শুনেছ একটা লোক খায় নাই। তুমি ভাত রেঁধে, ডিম ভেজে তাকে খেতে ডাকবে। বাড়ির বৌ যদি সভ্যতা-ভব্যতা না জানে কে জানবে ? বস্তির মাতারি জানবে ?

শাহেদ লজ্জিত গলায় বলল, চাচাজান, আমার একেবারেই ক্ষিধে নেই।

তুমি চুপ কর। গোলাগুলির মধ্যে ক্ষিধা আছে কি নাই বোঝা যায় না। হঠাৎ দেখবে ক্ষিধায় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে। বৌমা, তুমি হারিকেন নিয়ে যাও, ভাত চড়াও। একমুঠ চাল বেশি দিও, আমিও চারটা খাব।

কংকনের মা হারিকেন হাতে রান্নাঘরে চলে গেল। শাহেদ বলল, কংকনের বাবা কোথায় ?

বৃদ্ধ বিরক্ত গলায় বলল, ঐ গাধাটার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। গাধাটার কথা জিজ্ঞেস করলেই চড়াৎ করে রক্ত মাথায় উঠে যাবে। গাধা গেছে বরিশাল। আমি তাকে বললাম, দেশের অবস্থা ভালো না। এই সময় কোথাও যাবার দরকার নেই। তবু সে গেল।

কোনো জরুরি কাজে গেছেন ?

অত্যন্ত জরুরি কাজে গেছে। বন্ধুর বিয়েতে গেছে। আরে গাধা, তোর নিজের পরিবারের নিরাপত্তার চেয়ে বন্ধুর বিয়ে বড় হয়ে গেল ? তোর বউ, মেয়ে, বৃদ্ধ বাবা এইগুলা কিছু না ? বউমা বলতে গেলে বাচ্চা একটা মেয়ে। আমি প্রায় পঙ্গু। তুই বসে বসে কোর্মা-কালিয়া খাচ্ছিস আর আমরা খাচ্ছি গুলি। কাণ্ডজ্ঞানহীন শাখামৃগ। তাকে বললাম ট্রানজিস্টারের ব্যাটারি শেষ। ব্যাটারি কিনে দিয়ে যা। সে বলল, জি আচ্ছা বাবা। কিনে দিয়ে গেছে ব্যাটারি ? না। উনি ভুলে গেছেন। উনি সবকিছু ভুলে যান, শুধু বন্ধুর বিয়ে মনে থাকে। খা ব্যাটা বিয়ে খা।

বৃদ্ধ হঠাৎ চুপ করে গেলেন। খুব কাছেই গুলির শব্দ হচ্ছে। মানুষের চিৎকার হৈচৈও শোনা যাচ্ছে। বৃদ্ধ আতঙ্কিত গলায় বললেন, বৌমা, হারিকেন নিভিয়ে দাও। হারিকেন নিভিয়ে দাও।

কংকনের ঘুম ভেঙে গেছে। সে ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। বৃদ্ধ বললেন, শাহেদ, মেয়েটার কান্না থামাও। কান্নার শব্দ শুনে মিলিটারি এদিকে চলে আসতে পারে। ওর মুখটা চেপে ধরো।

রাত বাজছে তিনটা পঁচিশ।

কিছুক্ষণের জন্যে গোলাগুলি বন্ধ ছিল। আবারো শুরু হয়েছে। প্রবলভাবেই শুরু হয়েছে। মরিয়মের ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলোয় খেতে বসেছে নাইমুল। সে খুব আগ্রহ করে খাচ্ছে। তারচে' অনেক আগ্রহ করে তার খাওয়া দেখছে মরিয়ম। তার শুধু একটাই কষ্ট, নাইমুল খেতে বসে কাঁচামরিচ চেয়েছিল। মরিয়ম কাঁচামরিচ দিতে পারে নি। ঘরে ছিল না। সে ঠিক করে রেখেছে এরপর থেকে সে নিজের দায়িত্বে কাঁচামরিচ কিনে রাখবে। নাইমুল খেতে বসে কাঁচামরিচ চায়।

মরিয়ম বলল, খেতে ভালো হয়েছে?

নাইমুল জবাব দিল না। হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। এই মাথা নাড়া দেখতে মরিয়মের ভালো লাগে। সবাই মাথা নাড়ে দু'বার। মরিয়মের সম্পূর্ণ নিজের এই মানুষটা তিনবার নাড়ে। মরিয়ম ঠিক করেছে এখন থেকে সে নিজেও মাথা নাড়লে তিনবার নাড়বে। তার সব কিছুই হবে তার নিজের মানুষটার মতো। নাইমুল হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, মরি, বলো তো ঢাকায় সবচে' ভালো মোরগপোলাও কোথায় পাওয়া যায়?

মরিয়ম বলল, জানি না।

নাইম বলল, পুরনো ঢাকায় সাইনি পালোয়ানের মোরগপোলাও। তোমাকে একদিন খাওয়াব।

মরিয়ম আদুরে গলায় বলল, কবে?

নাইমুল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসি এত সুন্দর! হাসার সময় তার নিজের মানুষটার ঠোঁট কী সুন্দর বাঁকে। তখন ইচ্ছা করে ঠোঁটে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে। এই কাজটা মরিয়ম কোনোদিন করে নি। তবে কোনো একদিন করবে। যদি সে দেখে এতে নাইমুল রাগ করছে না, তা হলে সব সময় করবে। নাইমুল হাসলেই সে ঠোঁট ছুঁয়ে দেবে।

বাইরে গুলির শব্দ হচ্ছে। মরিয়মদের বাড়ি বড় রাস্তার পাশে। রাস্তায় ঘড়ঘড় শব্দে ট্যাংক চলছে। আর তারা কী সুন্দর টুকটাক গল্প করছে! হাসছে। যেন এই পৃথিবীতে তারা দুইজন এবং দু'জনের সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি ছাড়া আর কিছু নেই।

মরি!

উঁ।

মোরগপোলাওটা যে খাচ্ছি এটা কে রেঁধেছে?

মা।

খুব ভালো হয়েছে। তুমি মোরগপোলাও রাঁধা শিখে নিও।

আমি কালই শিখব।

নাইমুলের খাওয়া শেষ হয়েছে। সে প্লেটের উপর হাত ধুচ্ছে। মরিয়মের ইচ্ছা করছে হাত ধুইয়ে দিতে। তার লজ্জা এখনো কাটে নি বলে যা যা করতে ইচ্ছা করে তার কোনোটাই করতে পারে না। লজ্জাটা কাটা উচিত।

মরি!

উঁ।

তোমাদের এখানে একটা পাগলা কোকিল আছে। দিনে রাতে সবসময় ডাকে। এখনো ডাকছে।

মনে হয় ভয় পেয়ে ডাকছে, বাইরে গুলি হচ্ছে তো।

ভয় পেয়ে ডাকলে তো কাকদেরও ডাকার কথা। কোনো কাক কিন্তু ডাকছে না।

তাই তো!

পাখিদের মধ্যে সবচে' সুন্দর কোন পাখি ডাকে বলো তো?

জানি না। কোন পাখি?

'চোখ গেল' পাখি। তুমি চোখ গেল পাখির ডাক শুনেছ?

শুনেছি।

'চোখ গেল' পাখির হিন্দি নাম কী বলো তো?

জানি না।

পিঁউ কাহা।

পিঁউ কাহা তো শুনেছি। এটা যে 'চোখ গেল' পাখি তা জানতাম না।

ইংরেজিতে এই পাখিকে কী বলে জানো?

না।

ইংরেজিতে বলে 'ব্রেইন ফিভার'।

এত কুৎসিত নাম?

কুৎসিত তো বটেই। মরি, তোমার গরম লাগছে না?

লাগছে।

একটা কাজ করলে কিন্তু গরমটা কম লাগবে।

কী কাজ?

শাড়ি খুলে ফেলো।

মরিয়ম লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল। নাইমুল বলল, আমার সামনে লজ্জা কিসের ?

মরিয়ম অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আগে মোমবাতি নেভাও।

নাইমুল বলল, তা হবে না। মোমবাতি জ্বালানো থাকবে। একেক আলোয় মানুষের শরীর একেক রকম দেখায়। ইলেকট্রিকের আলোয় এক রকম, মোমবাতির আলোয় আরেক রকম, আবার মশালের আলোয় সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি দেখতে চাচ্ছি মোমবাতির আলোয় নগ্ন মরিয়মকে কেমন দেখায়।

আমি পারব না। আগে মোমবাতি নেভাও।

নাইমুল মোমবাতি নেভাল না। মরিয়মের শরীর ঝনঝন করছে। শরীরের প্রতিটি কোষে সাড়া পড়ে গেছে। তারা জেনে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ঙ্কর আনন্দের ঘটনা ঘটবে। মরিয়ম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাতি নেভাও, তোমার দোহাই লাগে। নাইমুল বলল, না। বলেই হাসল। মরিয়মের মনে হলো বাতি না নিভিয়ে ভালোই হয়েছে। বাতি নিভিয়ে ফেললে এত সুন্দর হাসি দেখা যেত না। মরিয়ম হাত বাড়িয়ে নাইমুলের ঠোঁট স্পর্শ করল।

২৬ মার্চ ভোর আটটায় আগুপিছু জিপ ও ট্রাকে মোতায়েন সশস্ত্র প্রহরায় একটি ১৯৬১ মডেলের শেভ্রলেট গাড়ি হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে এসে থামে। এই গাড়িবহর জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং তার সঙ্গীদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে।

তাঁকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আমার মন্তব্য করার কিছু নেই।

পশ্চিম পাকিস্তানে পা দিয়ে তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, আল্লাহর রহমতে পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।*

---

*রিপোর্ট : শিডনি শনবার্গ।

রোনাল্ড জোফে পরিচালিত 'দা কিলিং ফিল্ডস' ছবিটি অস্কার বিজয় করে। এই সত্য কাহিনীর নায়ক যে সাংবাদিক তিনিই শিডনি শনবার্গ। —*লেখক*

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : অষ্টম খণ্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্যমন্ত্রণালয়
পৃষ্ঠা : ৫০

পরদেশী

পিতা : ছোটন ডোম
সুইপার, সরকারী পশু হাসপাতাল
ঢাকা।

১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ সকালে রাজধানী ঢাকায় পাকসেনাদের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলি খান শূরের প্রশাসনিক অফিসার মি. ইদ্রিস পৌরসভার আরও কয়েকজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে একটি মিউনিসিপ্যাল ট্রাকে পশু হাসপাতালের গেটে এসে বাঘের মতো 'পরদেশী পরদেশী' বলে গর্জন করতে থাকলে আমি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আমার কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসি। ইদ্রিস সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কর্কশ স্বরে বলতে থাকেন, 'তোমরা সব সুইপার ডোম বের হও, যদি বাঁচতে চাও অবিলম্বে সবাই মিলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় স্তূপীকৃত লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলে দাও। নইলে কাউকে বাঁচানো হবে না, কেউ বাঁচতে পারবে না।' পৌরসভার সেই ট্রাকে নিম্নবর্ণিত সুইপাররা বসা ছিল— ১. ভারত, ২. লাড়ু, ৩. কিষন।

আমি তার নির্দেশ অমান্য করার কোনো উপায় না দেখে ট্রাকে উঠে বসলাম। সেই ট্রাকে করে ঢাকা পৌরসভা অফিসে আমাদের প্রায় আঠারজন সুইপার ও ডোমকে একত্রিত করে প্রতি ছয়জনের সাথে দুইজন করে সুইপার ইন্সপেক্টর আমাদের সুপারভাইজার নিয়োজিত করে তিন ট্রাকে তিনদলকে বাংলাবাজার, মিটফোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রেরণ করা

হয়। আমি মিটফোর্ডের ট্রাকে ছিলাম। সকাল নয়টার সময় আমাদের ট্রাক মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘরের সম্মুখে উপস্থিত হলে আমরা ট্রাক থেকে নেমে লাশঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বুকে এবং পিঠে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁজড়া করা প্রায় একশত যুবক বাঙালির বীভৎস লাশ দেখলাম। আমি আমার সুপারভাইজারের নির্দেশে লাশঘরের ভিতরে প্রবেশ করে প্রতিটি লাশের পায়ে ধরে টেনে বের করে বাইরে দাঁড়ানো অন্যান্য সুইপারের হাতে তুলে দিয়েছি ট্রাকে উঠাবার জন্য। আমি দেখেছি প্রতিটি লাশের বুক ও পিঠ মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁজড়া। সব লাশ তুলে দিয়ে একপাশে একটা লম্বা টেবিলের উপর চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া একটি লাশের উপর থেকে চাদর টেনে উঠিয়ে দেখলাম একটি রূপসী ষোড়শী যুবতীর উলঙ্গ লাশ— লাশের বক্ষ যোনিপথ ক্ষতবিক্ষত, কোমরের পিছনের মাংস কেটে তুলে নেওয়া হয়েছে, বুকের স্তন থেতলে গেছে, কোমর পর্যন্ত লম্বা কালো চুল, হরিণের মতো মায়াময় চোখ দেখে আমার চোখ বেয়ে পানি পড়তে থাকল, আমি কিছুতেই চোখের পানি রাখতে পারলাম না। আমি আমার সুপারভাইজারের ভয়াল এবং ভয়ঙ্কর কর্কশ গর্জনের মুখে সেই সুন্দরীর পবিত্র দেহ অত্যন্ত যত্ন সম্ভ্রমের সাথে ট্রাকে উঠিয়ে দিলাম। মিটফোর্ডের লাশঘরের সকল লাশ ট্রাকে উঠিয়ে আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে নিয়ে গিয়ে বিরাট গর্তের মধ্যে ঢেলে দিলাম। দেখলাম বিরাট বিরাট গর্তের মধ্যে সুইপার ও ডোমেরা রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে আসা লাশ ট্রাক থেকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। আমি অধিকাংশ লাশের দেহে কোনো কাপড় দেখি নাই, যে সমস্ত যুবতী মেয়ে ও রমণীদের লাশ গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো তার কোনো লাশের দেহেই আমি কোনো আবরণ দেখি নাই। তাদের পবিত্র দেহ দেখেছি ক্ষতবিক্ষত, তাদের যোনিপথ পিছন দিকসহ আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে। দুপুর প্রায় দু'টার সময় আমরা রমনা কালিবাড়ীতে চলে আসি পৌরসভার ট্রাক নিয়ে। লাশ উঠাবার জন্য ট্রাক রমনা কালিবাড়ীর দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে, দুজন ট্রাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা চারজন কালিবাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখি সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে আছে। কালিবাড়ীর ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো ৪১টি পোড়া লাশ আমি ট্রাকে তুলেছি। কালিবাড়ীর এ সকল লাশ আমরা ধলপুরের ময়লার ডিপোতে গর্তের মধ্যে ফেলেছি। লাশ তুলে তুলে মানুষের পচা চর্বির গন্ধে আমার পাকস্থলি বের হতে চাচ্ছিল। পরের দিন আমি আর লাশ তুলতে যাই নাই, যেতে পারি নাই,

সারাদিন ভাত খেতে পারি নাই, ঘৃণায় কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারি নাই। পরের দিন ২৯শে মার্চ সকালে আমি আবার ঢাকা পৌরসভা অফিসে হাজির হলে আমাকে ট্রাক দিয়ে লাশ তোলার জন্য আরও কয়েকজন সুইপারের সাথে ঢাকা শাখারীবাজারে যেতে বলা হয়। জজ কোর্টের সম্মুখে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও জ্বলছিল, আর পাকসেনারা টহলে মোতায়েন ছিল বলে আমরা ট্রাক নিয়ে সে পথ দিয়ে শাখারীবাজারে প্রবেশ করতে পারি নাই। পাটুয়াটুলি ঘুরে আমরা শাখারীবাজারের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে পাটুয়াটুলি ফাঁড়ি পার হয়ে আমাদের ট্রাক শাখারীবাজারের মধ্যে প্রবেশ করল। ট্রাক থেকে নেমে আমরা শাখারীবাজারের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করলাম— দেখলাম মানুষের লাশ, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশুর বীভৎস পচা লাশ, চারদিকে ইমরাতসমূহ ভেঙ্গে পড়ে আছে, মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলাম, দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারও কারও যোনিপথে লাঠি ঢুকানো আছে। বহু পোড়া, ভস্ম লাশ দেখেছি। পাঞ্জাবী সেনারা পাষণ্ডের মতো লাফাতে লাফাতে গুলি বর্ষণ করছিল, বিহারী জনতা শাখারীবাজারের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনাদানা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে প্রাণের ভয়ে দুই ট্রাক লাশ তুলে লাশ তোলার জন্য সেদিন আর শাখারীবাজারে প্রবেশ করার সাহস পাই নাই। ৩০শে মার্চ সকালে আমার দলকে মিলব্যারাক থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি মিলব্যারাক ঘাটে পৌরসভার ট্রাক নিয়ে গিয়ে দেখলাম নদীর ঘাটে অসংখ্য মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বহু লাশ রশি দিয়ে বাঁধা দেখলাম, প্রতিটি রশির বন্ধন খুলে প্রতি দলে দশজন পনের জনের লাশ বের করলাম, সব যুবক ছেলে ও স্বাস্থ্যবান বালকদের লাশ দেখলাম। প্রতিটি লাশের চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা, শক্ত করে পিছন দিক থেকে। প্রতিটি লাশের মুখমণ্ডল কালো দেখলাম, এসিডে জ্বলে বিকৃত ও বিকট হয়ে আছে। লাশের সামনে গিয়ে ঔষধের অসহ্য গন্ধ পেলাম। লাশের কোন দলকে দেখলাম মেশিনগানের গুলিতে বুক ও পিঠ ঝাঁজড়া হয়ে আছে, অনেক লাশ দেখলাম বেটন ও বেয়নেটের আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে, কারো মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে আছে, কারো কাটা হৃদপিণ্ড বের হয়ে আছে। নদীর পাড়ে ছয়জন রূপসী যুবতীর বীভৎস ক্ষতবিক্ষত, উলঙ্গ লাশ দেখলাম। চোখ বাঁধা, হাত-পা শক্ত করে বাঁধা প্রতিটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া, মুখমণ্ডল,

বক্ষ ও যোনিপথ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ও বীভৎস দেখলাম। দুইবারে দুই ট্রাকে আমি সত্তরটি লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। এরপর আমাকে সদরঘাট, শ্যামবাজার, বাদামতলী ঘাট থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি উপরোক্ত এলাকার নদীর ঘাট থেকে পচা লাশ তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। আমি যেদিন কালিবাড়ী লাশ তুলেছি সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের পিছনে স্টাফ কোয়ার্টার, রোকেয়া হলের পশ্চিম দিকে জনৈক অধ্যাপকের বাসা থেকে আমি লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলের পিছনের স্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর থেকে আমি যেয়ে পুরুষ ও শিশু সমেত নয়টি লাশ তুলেছি। আর অধ্যাপকের বাসা থেকে সিঁড়ির সামনে লেপের ভিতর পেঁচানো জনৈক অধ্যাপকের লাশ আমি তুলে নিয়ে গেছি।

স্বাক্ষর
পরদেশী
২১। ৩। ৭৪

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : অষ্টম খণ্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্যমন্ত্রণালয়
পৃষ্ঠা : ৪৪

চুন্নু ডোম
ঢাকা পৌরসভা
রেলওয়ে সুইপার কলোনী
২২৩ নং ব্লক, ৩ নং রেলগেট
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।

১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ সকালে আমাদের পৌরসভার সুইপার ইন্সপেক্টর ইদ্রিস সাহেব আমাকে লাশ উঠাবার জন্য ডেকে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে নিয়ে যান। সেখান থেকে আমাকে, বদলু ডোম, রঞ্জিত লাল বাহাদুর, গণেশ ডোম ও কানাইকে একটি ট্রাকে করে প্রথম শাখারীবাজারের কোর্টের প্রবেশপথের সম্মুখে নামিয়ে দেয়। আমরা উক্ত পাঁচজন দেখলাম ঢাকা জজ কোর্টের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের যে রাজপথ শাখারীবাজারের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার দু'ধারে ড্রেনের পাশে যুবক-যুবতীর, নারী-পুরুষের, কিশোর-শিশুর বহু পচা লাশ। দেখতে পেলাম, বহু লাশ পচে ফুলে বীভৎস হয়ে আছে, দেখলাম শাখারীবাজারের

দুদিকের ঘরবাড়িতে আগুন জ্বলছে, অনেক লোকের অর্দ্ধপোড়া লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম, দুই পার্শ্বে অদূরে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সৈন্যদের প্রহরায় মোতায়েন দেখলাম। প্রতিটি ঘরে দেখলাম মানুষ, আসবাবপত্র জ্বলছে। একটি ঘরে প্রবেশ করে একজন মেয়ে, একজন শিশুসহ বারজন যুবকের দগ্ধ লাশ উঠিয়েছি। শাখারীবাজারের প্রতিটি ঘর থেকে যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশু ও বৃদ্ধের লাশ তুলেছি। পাঞ্জাবীরা প্রহরায় থাকাকালে সেই মানুষের অসংখ্য লাশের উপর বিহারীদের উশৃংখল উল্লাসে ফেটে পড়ে লুট করতে দেখলাম। প্রতিটি ঘর থেকে বিহারী জনতাকে মূল্যবান সামগ্রী, দরজা, জানালা, সোনাদানা সবকিছু লুটে নিয়ে যেতে দেখলাম। লাশ উঠাতে উঠাতে এক ঘরে প্রবেশ করে এক অসহায়া বৃদ্ধাকে দেখলাম—বৃদ্ধা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পানি পানি বলে চীৎকার করছিল, তাকে আমি পানি দিতে পারি নাই ভয়ে, বৃদ্ধাকে দেখে আমি আরও ভীত হয়ে পালিয়ে এসেছি। আমি পানি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের পিছনে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনা প্রহরায় থাকায় আমি সেই বৃদ্ধাকে পানি দিয়ে সাহায্য করতে পারি নাই। আমরা ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ শাখারীবাজার থেকে প্রতিবারে একশত লাশ উঠিয়ে তৃতীয়বার ট্রাক বোঝাই করে তিনশত লাশ ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ১৯৭১ সনের ২৯শে মার্চ সকাল থেকে আমরা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘর ও প্রবেশপথের দুপার্শ্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিববাড়ী, রমনা কালিবাড়ী, রোকেয়া হল, মুসলিম হল, ঢাকা হল থেকে লাশ উঠিয়েছি। ২৯শে মার্চ আমাদের ট্রাক প্রথম ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রবেশপথে যায়। আমরা উক্ত পাঁচজন ডোম হাসপাতালের প্রবেশপথে নেমে একটি বাঙ্গালী যুবকের পচা, ফুলা, বিকৃত লাশ দেখতে পেলাম। লাশ গলে যাওয়ায় লোহার কাটার সাথে গেঁথে লাশ ট্রাকে তুলেছি। আমাদের ইন্সপেক্টর পঞ্চম আমাদের সাথে ছিলেন। এরপর আমরা লাশঘরে প্রবেশ করে বহু যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-কিশোর ও শিশুর স্তূপীকৃত লাশ দেখলাম। আমি এবং বদলু ডোম লাশঘর থেকে লাশের পা ধরে টেনে ট্রাকের সামনে জমা করেছি, আর গণেশ, রঞ্জিত (লাল বাহাদুর) এবং কানাই লোহার কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে পচা, গলিত লাশ ট্রাকে তুলেছে। প্রতিটি লাশ গুলিতে ঝাঁজড়া দেখেছি, মেয়েদের লাশের কারো স্তন পাই নাই, যোনিপথ ক্ষত-বিক্ষত এবং পিছনের মাংস কাটা দেখেছি। মেয়েদের লাশ দেখে মনে হয়েছে, তাদের হত্যা করার পূর্বে

তাদের স্তন সজোরে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, যোনিপথে লোহার রড কিংবা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুবতী মেয়েদের যোনিপথের এবং পিছনের মাংস যেন ধারাল চাকু দিয়ে কেটে এসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি যুবতী মেয়ের মাথায় খোঁপা খোঁপা চুল দেখলাম। মিটফোর্ড থেকে আমরা প্রতিবারে একশত লাশ নিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি।

১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ আমাদের উক্ত পাঁচজনের সাথে দক্ষিণা ডোমকে সাহায্য করতে দেওয়া হয়। আমাদের ট্রাক সেদিন সাত মসজিদে যায়। আমি সাত মসজিদের সম্মুখ থেকে যখন বাঙ্গালী লাশ উঠাচ্ছিলাম তখন অসংখ্য বিহারী জনতা আমাদের চারদিকে দাঁড়িয়ে হাসছিল, বাঙ্গালীদের পরিণতি দেখে উপহাস করছিল। আমরা সাত মসজিদের সম্মুখ থেকে আটটি বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছি, কতিপয় লাশ দেখলাম উপুড় হয়ে আছে, সবার পিঠ গুলির অসংখ্য আঘাতে ঝাঁজড়া হয়ে আছে। পচা, ফুলা লাশ তুলতে যেয়ে দেখলাম কারও লুঙ্গি পরা, কারও পাজামা পরা। আবার কারও দেহে হাওয়াই শার্ট এবং টেট্রনের দামি প্যান্ট। পানি থেকে বারটি লাশ তুলেছি; প্রতিটি লাশের চোখ এবং হাত পিছন দিকে বাঁধা ছিল। নদীর পাড় থেকে বারটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া দেখেছি। লাশ দেখে মনে হলো, ভদ্রঘরের অভিজাত বাঙ্গালী যুবকদের লাশ। সাত মসজিদের সকল লাশ তুলে আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ফিরে এসে ট্রাক নিয়ে আমরা মিন্টু রোডে লাশ তুলতে গিয়েছি। মিন্টু রোডের রাস্তার পাশ থেকে প্যান্ট পরা দু'টি পচা ফুলা লাশ তুলেছি। ধলপুর যাওয়ার পথে ঢাকা স্টেডিয়ামের মসজিদের সম্মুখ থেকে এক বৃদ্ধ ফকিরের সদ্য গুলিবিদ্ধ লাশ তুলেছি, দেখলাম লাশের পাশেই ভিক্ষার ঝুলি, টিনের ডিবা ও লাঠি পড়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিববাড়ীর সম্মুখ থেকে দুজন রূপসী যুবতী মেয়ে এবং তিনজন যুবকের ক্ষত-বিক্ষত লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলে একটি অর্দ্ধ দগ্ধ যুবতীর লাশ তুলেছি, মুসলিম হলে প্রবেশ করে একটি পচা লাশ পেয়েছি, ঢাকা হলের ভিতর থেকে চারজন ছাত্রের লাশ তুলেছি। পরের দিন ৩১শে মার্চ বাসাবো খাল থেকে তিনটি পচা লাশ তুলেছি। সেদিন অসুস্থ থাকায় আমি আর লাশ তুলতে যেতে পারি নাই।

টিপসহি
ছুন্নু ডোম
৭। ৪। ৭৪

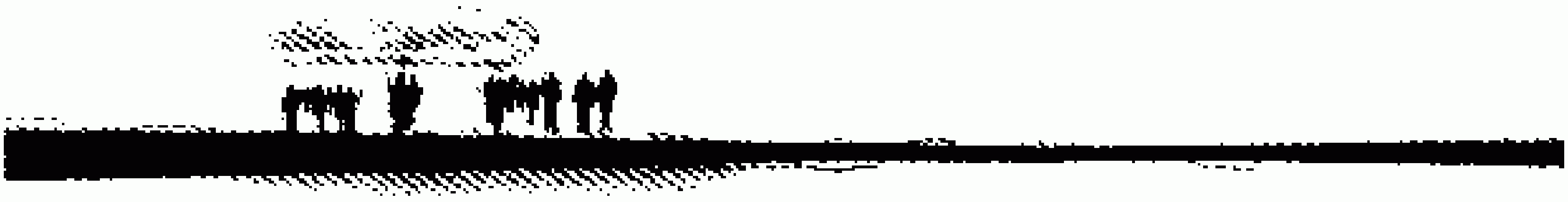

ভয়ঙ্কর রাতের পরের যে ভোর, সেখানে কিছু আশা থাকে, কিছু আনন্দ থাকে। দিনের আলো মানুষকে আর কিছু দিক না-দিক ভরসা দেয়। মঙ্গল-সঙ্গীতের মতো পাখি ডাকতে শুরু করে। এমনকি ভোরবেলার কাকের কা-কা ধ্বনিকেও শুভ মনে হয়। তারাও আলোর বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

পঁচিশে মার্চের ভয়ঙ্কর রাত কেটে গেছে। ভোর হয়েছে। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, অথচ কোনোরকম ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে একটা দীর্ঘ রজনী পার করার পর শুরু হয়েছে আরেকটি দীর্ঘ রজনী। রাতের পর দিন আসে নি। রাতের পর এসেছে রাত।

শাহেদ বসে আছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই পরিবারের প্রধান বৃদ্ধ সোবাহান সাহেবের শোবার ঘরের একটা চেয়ারে। সারারাত এক পলকের জন্যেও সে চোখ বন্ধ করে নি। এখন তার চোখ জ্বালা করছে। মাঝে মাঝে চোখকে আরাম দেয়ার জন্যে সে কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বন্ধ করছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ খুলে ফেলছে। মনে হচ্ছে এখন চোখ বন্ধ করে থাকার সময় না।

সোবাহান সাহেব তাঁর বিছানায় জায়নামাজ পেতে নামাজে বসেছেন। তিনি শেষরাতে কিছু সময়ের জন্যে ঘুমিয়েছিলেন। ঘুমের মধ্যে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটা এরকম— তার ছেলে বরিশাল থেকে লঞ্চে করে ফিরছে। ছেলের বন্ধু সঙ্গে আছে। বন্ধুর নব-পরিণীতা স্ত্রী আছে। তাদের আত্মীয়স্বজনও আছে। তারা লঞ্চের একটা কেবিনের দরজা-জানালা বন্ধ করে গানবাজনা করছে। জমিয়ে গল্প করছে। এই সময় লঞ্চের তলা খুলে গেল। লঞ্চে হুড়মুড় করে পানি ঢুকতে লাগল। লঞ্চ ধীরে ধীরে পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। অন্য যাত্রীরা প্রাণে বাঁচার জন্যে ছোটাছুটি করছে। কেউ কেউ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতরাবার চেষ্টা করছে। দূরে উদ্ধারকারী কিছু পাল তোলা নৌকাও দেখা যাচ্ছে। অথচ সোবাহান সাহেবের ছেলে সালুর (সালাউদ্দিন) এই দিকে কোনো নজরই নেই। সে এখন তাস খেলছে। নববধূও তাস নিয়ে বসেছে। সবাই খুব মজা পাচ্ছে। লঞ্চ যে তলিয়ে যাচ্ছে সেদিকে কারো হুঁশ নেই। সবাই এত মত্ত।

সোবাহান সাহেব ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করতে লাগলেন, এই গাধা, এই বেকুব, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখ কী হচ্ছে। গাধারবাচ্চা গাধা, তাস পরে খেলবি দরজা খোল। দরজা খোল। দরজা খোল।

চিৎকারের এই পর্যায়ে শাহেদ তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙায়। ঘুম ভাঙার পর ঘোরলাগা গলায় তিনি শাহেদকে যে প্রশ্নটা করেন তা হলো— দরজা খুলেছে ? খুলেছে দরজা ?

দুঃস্বপ্ন দেখার পর থেকে সোবাহান সাহেব ছেলের জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন। একটা মুরগি সদগা মানত করেছেন। সেই সঙ্গে একশ রাকাত নফল নামাজ। ফজরের নামাজের পর থেকে তার নফল নামাজ চলছে। আটটা বাজে। মাত্র চল্লিশ রাকাত পড়া হয়েছে। শুরুর দিকে দাঁড়িয়েই পড়ছিলেন। হাঁটুতে আর্থরাইটিসে তীব্র ব্যথা শুরু হওয়ায় এখন আর দাঁড়িয়ে পড়তে পারছেন না। মাথাও বেশি নিচু করতে পারছেন না, কোমরে ব্যথা করছে। জায়নামাজের সামনে দু'টা বালিশ রেখে সেজদার সময় কোনোমতে বালিশে মাথা ছোঁয়াচ্ছেন।

কংকন দাদুভাইয়ের এই অদ্ভুত ভঙ্গির নামাজ পড়া দেখে খুব মজা পাচ্ছে। সোবাহান সাহেব যতবার বালিশে মাথা ছোঁয়াচ্ছেন ততবারই সে ফিক করে হেসে ফেলছে। আঙুল উঁচিয়ে শাহেদকেও এই মজার দৃশ্য দেখাচ্ছে। শাহেদের সঙ্গে এক রাতেই তার খুব ভাব হয়েছে। শাহেদকে সে ডাকছে 'বাবু'। কেন 'বাবু' ডাকছে সে-ই জানে। শিশুদের সব কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করা কঠিন।

রাতে গোলাগুলির ভয়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকার জন্যে কংকনের গলা ব্যথা করছে। টনসিল ফুলে গেছে। তার মা মনোয়ারা গরম পানি দিয়ে মেয়েকে গার্গল করানোর চেষ্টা করেছেন। সে গার্গল করতে পারছে না। মুখে পানি দিতেই সে পানি গিলে ফেলছে।

শাহেদ এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারছে না। তার সময় কাটছে হাঁটাহাঁটি করে। হাঁটাহাঁটি করার মতো বেশি জায়গা এ বাড়িতে নেই। সোবাহান সাহেবের ঘর থেকে বসার ঘর, সেখান থেকে বারান্দা। বারান্দা থেকে বসার ঘর, বসার ঘর থেকে আবার সোবাহান সাহেবের ঘর। তাঁতের মাকু চলছেই। বারান্দায় যেতে ভয় ভয় লাগে, কারণ বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে কোনো মিলিটারি যদি যায় তারা বারান্দায় একজন কেউ হাঁটছে দেখতে পাবে। কিছুই বলা যায় না— গুলিও করে বসতে পারে।

কংকন বলল, তুমি শুধু হাঁট কেন ?

শাহেদ জবাব দিল না। কী জবাব দেবে ? সে কেন হাঁটছে সে নিজেই জানে না।

কংকন বলল, বাবু তোমার হাঁটতে ভালো লাগে, এই জন্যে তুমি হাঁট ?

হ্যাঁ।

হাঁটতে ভালো লাগে কেন ?

জানি না।

কেন জানো না ?

মনোয়ারা রান্নাঘর থেকে বললেন, কংকন, বিরক্ত করবে না।

কংকন বলল, কেন বিরক্ত করব না ?

তার প্রশ্ন করা খেলা শুরু হয়েছে। অবিকল রুনির স্বভাব। একবার প্রশ্ন করা শুরু করলে করতেই থাকবে। বিরক্ত করে মারবে। একবার তো চড় দিয়ে প্রশ্ন প্রশ্ন খেলা বন্ধ করতে হলো। টনসিলে গলাব্যথা রোগও রুনির আছে। একটু ঠাণ্ডা ল্যাগল তো গলায় ব্যথা। কিছুই গিলতে পারবে না। কাঁদো কাঁদো গলায় মাকে বলবে, ব্যথা কমিয়ে দাও।

শাহেদ রুনির কথা বা রুনির মা'র কথা ভাবতে চাচ্ছে না। কিন্তু বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। এই দুঃসময়ে তারা কোথায় আছে ? কীভাবে আছে ? আসমানী সারারাত জেগেছিল তা অনুমান করা যায়। রুনি কি ঘুমিয়েছিল ? গোলাগুলির শব্দে নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে। ভয় পেলে রুনির জ্বর এসে যায়। জ্বর হলে সমস্যা— সে বাবার কোল ছাড়া কারো কোলেই যাবে না। মেয়ে জ্বরে পড়লে আসমানী খুবই বিপদে পড়বে।

শাহেদ হাঁটাহাঁটি বন্ধ করে এখন বসার ঘরের বেতের চেয়ারে বসে আছে। ব্যাটারি না থাকার কারণে ট্রানজিস্ট্রার চলছে না। বাইরে কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। একতলা এই বাড়িটা অন্য বাড়ি থেকে আলাদা। প্রতিবেশীর কাছ থেকে খবর নেবার উপায় নেই। এই বাড়িটার উত্তর দিকে আরেকটা একতলা বাড়ি আছে যেটা কাছাকাছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলে ঐ বাড়ির লোকজন শুনতে পাবে। কিন্তু ঐ বাড়িতে কেউ নেই। তালা বন্ধ। শাহেদের আবারো চোখ জ্বালা করছে। বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে চোখ বন্ধ করল। মনোয়ারা এসে পাশে দাঁড়াল। তার হাতে চায়ের কাপ।

ভাই, একটু চা খান।

শাহেদ হাত বাড়িয়ে চা নিল। মনোয়ারা বলল, খিচুড়ি বসিয়েছি। আজকের নাশতা খিচুড়ি। ঘরে আটা-ময়দা কিছুই নাই।

শাহেদ বলল, বাজার আছে ? চাল, ডাল, কেরোসিন ?

মনোয়ারা বলল, এক দুই দিন চলবে। ও এসে বাজার করে দিবে বলেছিল। এখন তো তারই খোঁজ নেই।

শাহেদ বলল, কারফিউ তুললেই আমি বাজার করে দিয়ে যাব। নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্যে হলেও কারফিউ তুলবে। সমস্যা হচ্ছে, কারফিউ কখন তুলবে কতক্ষণের জন্যে তুলবে এটা বুঝব কী করে? একটা রেডিওর খুব দরকার ছিল।

মনোয়ারা বলল, ভাই, আপনার কি সিগারেট খাবার অভ্যাস আছে? কংকনের বাবা তার সিগারেটের প্যাকেট ফেলে গেছে। সিগারেট খাবার অভ্যাস থাকলে প্যাকেটটা আপনাকে দিতে পারি।

দিন সিগারেট।

মনোয়ারা আঁচলের ভেতর থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। সে সিগারেট-দেয়াশলাই সঙ্গে নিয়েই এসেছিল। শাহেদ বলল, ভাবি, থ্যাংক য়্যু। সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে পেয়ে কী যে ভালো লাগছে, আপনি বুঝতেও পারবেন না।

মনোয়ারা বলল, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার মেয়ে আপনার স্ত্রী ভালো আছে। কারফিউ তুলে নিলেই ওদের সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

শাহেদ বলল, কীভাবে জানেন?

আমার মন বলছে। কাল রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে কংকনের বাবার জন্যে যেমন দোয়া করেছি, আপনার স্ত্রী এবং মেয়ের জন্যেও দোয়া করেছি। দোয়া শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা শান্তি শান্তি ভাব হলো। তখনই বুঝলাম, আল্লাহপাক আমার দোয়া কবুল করেছেন। আমার কোনো দোয়া যখন কবুল হয় আমি বুঝতে পারি।

শাহেদের চোখে সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে গেল। নিতান্তই অপরিচিতা এই মেয়েটির সামনে চোখ মুছতে তার মোটেও লজ্জা লাগল না।

রুনি সকালবেলা হড়হড় করে বমি করল। রাতে গুলির শব্দে ভয় পেয়ে দু'বার বমি করেছে। এখন বেলা প্রায় এগারটা। সকালে কিছু খায় নি। বমি হওয়ার জন্যে পেটে তো কিছু থাকতে হবে। বমি হচ্ছে কেন? আসমানী দু'হাতে মেয়ের মাথা ধরে আছে। ভয়ে তার হাত-পা কাঁপছে। মেয়ের গা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। এর মানে কী? জ্বর এসে গা গরম হতে পারে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কেন? ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে না তো! বাচ্চাদের ভয়ঙ্কর কোনো অসুখ করলে আগেভাগে কিছু বোঝা যায় না। এরা হেসে-খেলে বেড়ায়, তারপর হঠাৎ এক সময় নেতিয়ে পড়ে। ডাক্তারের কাছে নেওয়ার সময়ও পাওয়া যায় না। এরকম কিছু হচ্ছে না তো? এরকম কিছু যদি হয়, সে ডাক্তারের কাছে কীভাবে নেবে?

বাইরে কারফিউ। কখন কারফিউ তুলবে কিছুই বলছে না। রেডিওতে সারাক্ষণ হামদ আর নাত হচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে জরুরি নির্দেশ। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলছে— রাস্তায় কাউকে দেখা মাত্র গুলি করা হইবে।

আসমানী বলল, কেমন লাগছে রে মা ?

রুনি বলল, ভালো।

আর বমি হবে ?

না।

তাহলে আয়, মুখ ধুইয়ে দি।

না।

মুখ ধুবি না ? মুখ ধুয়ে কুলি কর।

কুলি করব না।

মুখে না বললেও রুনি কুলি করল। আসমানী মেয়ের মুখ ধুইয়ে দিল।

শরীরটা এখন ভালো লাগছে মা ?

লাগছে। বাবা কোথায় মা ?

তোর বাবা আছে, ভালোই আছে।

কোথায় আছে ?

বাসায় আছে। আর কোথায় থাকবে ?

রুনি চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, আমি বাবার কাছে যাব।

যাবে বললেই তো যেতে পারবে না। বাইরে কারফিউ, মিলিটারি রাস্তায় কাউকে দেখলে গুলি করে দেবে।

আমি বাবার কাছে যাব।

কারফিউ তুললেই আমরা তোমার বাবার কাছে যাব।

আমি এখন যাব।

মা গো, অবুঝ হইও না। এখন অবুঝ হবার সময় না।

আমি বাবার কাছে যাব। অবশ্যই যাব। যাবই যাব।

আসমানী মেয়ের গায়ে চড় বসিয়ে দিল। রুনি কাঁদল না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যতই দিন যাচ্ছে মেয়েটা ততই অবাধ্য হচ্ছে। এতটুকু একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলতে হচ্ছে। অসুস্থ মেয়ে, শরীরে কিছু নেই— হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। আসমানীর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কী করবে সে ? মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করবে ? এখন তাও করা যাবে না। রুনি শক্ত হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেক সময় লাগবে তার রাগ কমতে। আসমানী বলল, রুনি, মা, কথা শোন...।

রুনি বলল, আমি কথা শুনব না। আমি বাবার কাছে যাব। যাবই যাব।

আসমানী মেয়েকে বাথরুমে রেখেই বসার ঘরে চলে এলো। দুঃখ-কষ্টে তার প্রায় কান্না এসে যাচ্ছে। কী ভয়াবহ সমস্যায় যে পড়েছে! রাগ করে চলে এসেছিল কুমকুমদের বাড়িতে। তার স্কুল এবং কলেজ জীবনের সবচে' প্রিয় বান্ধবী কুমকুম। রাগ করে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করলে সে এ-বাড়িতে এসে উঠে। কুমকুমের মা তাকে নিজের মেয়ের মতোই দেখেন। গত দু'দিন ধরে সে এ-বাড়িতে আছে। তার আদর-যত্নের কোনো অভাব হচ্ছে না। মেয়েকে নিয়ে থাকার জন্য তাকে আলাদা একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। কুমকুমের মা তাকে দিনের মধ্যে প্রায় একশ'বার বলছেন, মা, তুমি কোনোরকম ভয় করবে না। শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ করো। কারফিউ তোলা মাত্র শাহেদকে খুঁজে এনে সবাই একসঙ্গে গ্রামে চলে যাব।

কুমকুমদের বাড়ির সবাই স্যুটকেশ ট্র্যাটকেস গুছিয়ে অপেক্ষা করছে। কারফিউ শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আসমানীর খুব অস্বস্তি লাগছে। তাছাড়া বড় কথা, কুমকুম এ-বাড়িতে নেই। সে কুমিল্লায় তার শ্বশুরবড়িতে। আসমানী যে কারো সঙ্গে গল্প করবে, কথা বলবে, সে উপায় নেই। কুমকুমের বাবা মোতালেব সাহেব আছেন। তিনি অবশ্যি সারাক্ষণই কথা বলেন। সেইসব কথা শুনতে আসমানীর ভালো লাগে না। কথা বলার সময় ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে থুথু ছিটে বের হয়। দেখতে এত খারাপ লাগে— গা ঘিনঘিন করে।

বসার ঘরে মোতালেব সাহেব বসেছিলেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি। দেখে মনে হয় তিনি বেশ আনন্দে আছেন। কিছু কিছু মানুষ দুঃসময়ে ভালো থাকে। দুঃসময়ের গল্পে আনন্দ পায়। ইনি বোধহয় সে-রকম একজন। আসমানীকে দেখে মোতালেব সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, লেটেস্ট খবর কি জানো নাকি মা ?

আসমানী শুকনো গলায় বলল, জানি না চাচা।

বাঙালি জাতির হাগা বের করে দিয়েছে। এখন তো যাকে বলে বেড়াছেড়া অবস্থা।

আসমানী বলল, জি।

এখন ধরে নিতে পার বাঙালি জাতি খতম। আর পাঁচ বছর পরে দেখবে সবাই উর্দুতে বাতচিৎ করছে। চারদিকে হাম করেঙ্গা, তুম করেঙ্গা।

আসমানী আবারও বলল, জি। তার এখন কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না। শেখ সাহেব ধরা পড়লে ধরা পড়ুক, বাঙালি জাতি উর্দুতে কথা বললে বলুক— তার এখন দরকার তার স্বামীকে। আর কিছু দরকার নেই। সে প্রতিজ্ঞা করল, বাকি জীবনে সে আর কখনোই রাগ করে শাহেদকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। ভয়ঙ্কর রাগারাগি হোক, শাহেদ তার গায়ে থুথু দিক— তারপরেও না।

আসমানী!

জি।

একটা স্ট্রং রিউমার হচ্ছে, মিলিটারি সেকেন্ড অফেনসিভে যাবে। আরো ম্যাসিভ স্কেলে। গতরাতে যেটা হয়েছে সেটা হলো তবলার ঠুকঠাক। আসল বাজনা এখনো শুরু হয় নাই। তবে ওদের মূল টার্গেট শহর। আপাতত গ্রামে তারা হাত দেবে না। শহর পুরোপুরি শেষ করার পর ধরবে গ্রাম। কাজেই আমাদের গ্রামে চলে যেতে হবে।

আসমানী আবারও কিছু না বুঝেই বলল, জি। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না ভয়ঙ্কর কথাগুলি বলে এই বুড়ো মানুষটা অত আনন্দিত হচ্ছে কেন?

শাহেদের আমরা যদি ট্রেস করতে না পারি, তাহলে ওকে ছাড়াই যেতে হবে। এখন অবস্থাটা হচ্ছে 'ইয়া নফসি' অবস্থা। বুঝতে পারছ? শুধু নিজে বেঁচে থাক।

জি।

কাজেই তৈরি হয়ে নাও। বুড়িগঙ্গা দিয়ে নৌকা করে যাব। নদীপথ এখনো সেফ। ওরা পানি ভয় পায়।

বাথরুম থেকে হড়হড় শব্দ আসছে। রুনি আবারও বমি করছে। আসমানী ছুটে গেল বাথরুমের দিকে। তার মনেই ছিল না মেয়েকে সে রাগ করে বাথরুমে রেখে এসেছে।

কারফিউ উঠল পরদিন ২৭ মার্চ শনিবার ভোর ন'টায়। তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ তোলা হয়েছে।

রাস্তায় প্রচুর লোকজন। ভূমিকম্প হলে বাড়িঘরের ভেতর থেকে সব মানুষ বের হয়ে আসে কিন্তু তাদের মনটা থাকে বাড়ির ভেতরে। শহরের মানুষের অবস্থাটা সে-রকম। তারা রাস্তায় এসেছে ঠিকই কিন্তু মনেপ্রাণে চাইছে আবার ঘরে ঢুকে যেতে। সবার চোখেমুখে অনিদ্রাজনিত গভীর ক্লান্তি। এরা কেউ গত দু'রাত ঘুমোয় নি। মানুষের তৈরি দুর্যোগে একটা শহরের সব মানুষ দু'রাত জেগে কাটিয়েছে এমন নজির বোধহয় নেই।

শাহেদ রিকশা নিল। মাত্র তিনঘণ্টার জন্যে কারফিউ তোলা হয়েছে, তার হাতে একেবারেই সময় নেই। কংকনদের বাসা থেকে বের হতে অনেক সময় লেগেছে। সোবাহান সাহেব কিছুতেই তাকে যেতে দেবেন না। কংকনও তার হাত ধরে রেখেছে। সেও তাকে যেতে দেবে না। কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে, বাবু তুমি থাক। বাবু তুমি থাক।

রিকশাওয়ালা বুড়ো ধরনের। সে রিকশা টানতে পারছে না। বুড়োদের কৌতূহল থাকে কম। তার কৌতূহলও বেশি। জায়গায় জায়গায় থামছে। অবাক হয়ে দেখছে— যেখানে বস্তি ছিল এখন নেই, কিছু কালো অঙ্গার পড়ে আছে। শাহেদের ইচ্ছা করছে রিকশাওয়ালাকে বলে, অবাক হয়ে দেখার সময় এটা না। এখন মাথা নিচু করে প্রিয়জনদের সন্ধানে যাবার সময়। সে কিছু বলল না। রিকশাওয়ালা নিজের মনে বলল, ইকবাল হলের বেবাক ছাত্র মাইরা ফেলছে।

বিশ্বাসযোগ্য কথা না। তবে সময়টা এমন যে কোনটা বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটা না বোঝা যায় না। মেরে ফেলতেও পারে। ঢাকা শহরের সব মানুষ মেরে ফেললেও বা কী আর করা যাবে!

শাহেদ বলল, ইকবাল হলের সব ছাত্র মেরে ফেলেছে?

হ।

তুমি দেখেছ?

হ। দেখছি।

আর কী দেখেছ?

গজব দেখছি। গজব। রোজ-হাসরের কিয়ামত দেখছি।

গজব তো বটেই। এই গজবের শেষ কোথায় কে বলবে। ঢাকা কলেজের সামনে একটা মিলিটারি জিপ থেমে আছে। একজন অফিসার এবং দুজন জোয়ান জিপের কাছেই দাঁড়িয়ে। অফিসারটি হাসিমুখে গল্প করছে। জোয়ান দুজন এটেনশান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও আগ্রহ নিয়ে গল্প শুনছে। শাহেদ মাথা নিচু করে ফেলল যেন এদের সঙ্গে চোখাচোখি না হয়। শাহেদের হাতে সিগারেট, তার জন্যই কেমন ভয় ভয় লাগছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট দেখলে এরা রাগ করবে না তো? সিগারেটটা কি ফেলে দেওয়া উচিত? মুখে কী কারণে যেন থুথু জমছে। থুথু ফেলা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। এরা অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। এরা গল্প করুক এদের মতো। আমরা তাদের সামনে দিয়ে মাথা নিচু করে চলে যাব।

শাহেদ আসমানীর খোঁজে প্রথম গেল তার শ্বশুরবাড়িতে। সেই বাড়ি তালাবদ্ধ। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বললেন, আধঘণ্টা আগে একটা গাড়িতে করে সবাই চলে গেছে। গাড়িতে কে কে ছিল তা তিনি বলতে পারলেন না। বাড়ি ছেড়ে কেন গেল তাও তিনি জানেন না। শাহেদের সঙ্গে কথা বলতে তার বোধহয় বিরক্তি লাগছিল। তিনি একটু পরপর ভুরু কোঁচকাচ্ছিলেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করা অর্থহীন, তবু শাহেদের নড়তে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে তার হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। আবার যে হেঁটে গিয়ে রিকশায় উঠবে সেই শক্তি নেই। এখন সে যাবে কোথায় ? তার নিজের বাসায় ? আগে সেখানেই যাওয়া উচিত ছিল। আসমানী নিশ্চয়ই সেই বাসাতেই তার খোঁজে লোক পাঠিয়েছে। শাশুড়িও গাড়ি নিয়ে নিশ্চয়ই সেখানে গেছেন। শাহেদ ঘড়ি দেখল। তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ তোলা হয়েছে— এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, আর মাত্র দুই ঘণ্টা বাকি। এর মধ্যেই নিজের আস্তানায় ফিরে যেতে হবে, দেরি করা যাবে না। সময় এত দ্রুত যাচ্ছে কেন ?

দোকানপাট কিছু কিছু খুলছে। লোকজন ব্যস্ত হয়ে কেনাকাটা করছে। কাঁচাবাজারে খুব ভিড়। চাল, ডাল কিনে জমিয়ে রাখতে হবে। আবার কতদিনের জন্য কারফিউ দিয়ে দেয় কে জানে। লোকজনের কেনাকাটা, ব্যস্ততা দেখে মনে হয় শহরের অবস্থা স্বাভাবিক।

রিকশাওয়ালা আবারো নিজের মনে বলল, শেখ সাবরে মাইরা ফেলছে।

শাহেদ হতভম্ব হয়ে বলল, বলো কী ? সত্যি ?

হ সত্যি। শেখ সাব নাই বইল্যা আইজ এই অবস্থা। থাকলে ঘটনা হইত ভিন্ন।

শাহেদ সিগারেট ধরালো। প্যাকেটের শেষ সিগারেট। সিগারেট কিনতে হবে। রিকশা থামিয়ে রাস্তার কোনো দোকান থেকে কয়েক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে নেবে। খুব কড়া রোদ উঠেছে, চিড়চিড় করে মাথা ঘুরছে। রিকশার হুড কি সে তুলে দেবে ? না থাক, হুড তুলে দেওয়া মানে কিছু গোপন করার চেষ্টা। শাহেদ আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ ঘন নীল। এমন নীল আকাশ বোধহয় অনেক দিন দেখা যায় নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে শাহেদের মনে হলো, আসমানী ফিরে এসেছে। ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে। রুনি মনের আনন্দে খেলছে। বাবাকে দেখে সে দৌড়ে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গালের সঙ্গে মাথা ঘষবে। একেকটা শিশু একেকরকম বিচিত্র অভ্যাস নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। রুনি পেয়েছে গালে মাথা ঘষার অভ্যাস। কী জন্য এই জাতীয় অভ্যাস তৈরি হয়েছে কে জানে। সাইকিয়াট্রিস্টরা নিশ্চয়ই জানেন।

রিকশায় এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন। পাশে খুব সম্ভব তার স্ত্রী। তিনি স্ত্রীকে জড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলা শব্দ করে কাঁদছেন। ভদ্রলোক তাতে খুব বিরক্ত বোধ করছেন। তিনি হতাশ বোধে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। সে সময়মতো ফিরতে না পারলে আসমানীও নিশ্চয়ই এভাবে কাঁদবে।

শাহেদের বাড়ির দরজা তালাবদ্ধ। আসমানী ফেরে নি।

সে এখন কী করবে ? এখানেই থাকবে না-কি ফিরে যাবে কংকনদের বাড়িতে ? সে কথা দিয়ে এসেছিল ফিরে যাবে। তার যাওয়া উচিত। ওদের বাড়িতে চাল-ডাল নেই। চাল-ডাল কিনে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বাচ্চাটার জন্যে এন্টিবায়োটিক কিনতে হবে। তার গলা ফুলে গেছে। অবিকল রুনির মতো অবস্থা। গার্গল ফার্গলে কোনো কাজ করে না। এন্টিবায়োটিক নিতে হয়। এন্টিবায়োটিকের নামটা মনে আছে— 'ওরাসিন কে।' কোনো ফার্মেসি কি খুলেছে ?

শাহেদ রাস্তায় নামল। হাতে সময় কতটা আছে সে বুঝতে পারছে না। ঘড়ি দেখলেই মনে হবে হাতে সময় নেই। লোকজন যেহেতু চলছে— কারফিউ শুরু হয় নি। একটা খোলা ফার্মেসি দেখা যাচ্ছে। সেখানেও ভিড়। শাহেদ ওরাসিন কে সিরাপ কিনল। দোকানদার এমনভাবে ওষুধ দিচ্ছে টাকা নিচ্ছে যেন সব আগের মতোই চলছে। সব ঠিক আছে।

কোনো রিকশা চোখে পড়ছে না। সে রিকশার খোঁজে হেঁটে হেঁটে রেলগেট পর্যন্ত আসার পর চোখে পড়ল তিনজন মিলিটারির একটা দল। এদের মধ্যে একজনের পোশাক আবার অন্যরকম। কালো পোশাক। কালো পোশাকের মিলিটারি সে আগে দেখে নি। তাদের একজন হাত ইশারায় তাকে ডাকছে। কেন তাকে ডাকছে ? সে চোখে ভুল দেখছে না তো ?

না, তাকে ডাকছে না। তার কী করা উচিত ? সে কি মিলিটারিটার দিকে তাকিয়ে ভদ্রতার হাসি হাসবে ? সেটাও মনে হয় ঠিক হবে না। হাসির অন্য অর্থ করে ফেলতে পারে। তার উচিত এই জায়গা থেকে অতি দ্রুত সরে পড়া। অতি দ্রুত সরাটাও ঠিক হবে না। মিলিটারিরা ভাবতে পারে লোকটা এত দ্রুত যাচ্ছে কেন ? নিশ্চয়ই খারাপ লোক।

সোবাহান সাহেব শাহেদকে দেখে আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। রান্নাঘরের দিকে মুখ করে পুত্রবধূকে ডাকলেন। বৌমা, তাড়াতাড়ি আসো। শাহেদ চলে এসেছে।

কংকন মা'র ঘরে শুয়েছিল। সোবাহান সাহেব তার কাছেও গেলেন, হড়বড় করে বললেন, শুয়ে আছিস কেন ? উঠে আয়, শাহেদ এসেছে। তোর বাবু এসেছে।

সোবাহান সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে, এখন আর তাঁর মনে কোনো ভয়-ভীতি নেই। তিনি নিশ্চিন্ত একজন কেউ এসেছে। মহাসঙ্কটের দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনীর দায়-দায়িত্ব এখন তার।

শাহেদের আনা জিনিসপত্র দেখে মনোয়ারা বিস্মিত হলো। সবই এনেছে। চাল-ডাল-তেল, কেরোসিন, ময়দা, ব্যাটারি। সবচে' আশ্চর্যের ব্যাপার, কংকনের জন্যে ওষুধও এসেছে। মনোয়ারা বললেন, ভাই, আপনি খুব গোছানো মানুষ।

শাহেদ বলল, বিপদের সময় সব মানুষ বদলায়। আমি কোনোকালেই গোছানো ছিলাম না।

মনোয়ারা বললেন, পৃথিবীর সবচে' অগোছালো মানুষ কংকনের বাবা। একবার কী হলো শুনুন। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরা। মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে এরকম অবস্থা। কংকনের বাবাকে ফার্মেসিতে পাঠালাম মাথা ধরার ট্যাবলেট আনতে। সে দু'ঘণ্টা পরে ফিরল। রাজ্যের বাজার করে এনেছে। কাঁচাবাজার থেকে মাছ-মাংস কিনেছে, শাক-সবজি কিনেছে, পেয়ারা কিনেছে, কলা কিনেছে— মাথাব্যথার ট্যাবলেট শুধু কিনে নি। ভুলে গেছে। ভুলো মন মানুষের সঙ্গে সংসার করা খুবই কষ্ট।

শাহেদ বলল, ভুলো মন মানুষের সঙ্গে সংসার করার অন্য ধরনের আনন্দও আছে।

মনোয়ারা বললেন, ঠিক বলেছেন। আনন্দও আছে। একবার কী হয়েছে শুনুন। কংকনের তখনো জন্ম হয় নি— রাতে আমাদের এক বিয়ের দাওয়াতে যাবার কথা। ও করল কী...।

মনোয়ারা হঠাৎ গল্পটা থামিয়ে দিল। তার সামনে যে মানুষটা বসে আছে সে অপরিচিত একজন মানুষ। এই মানুষটির সঙ্গে নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় না।

শাহেদ বলল, ভাবি, গল্পটা শেষ করবেন না?

মনোয়ারা বললেন, আরেকদিন শেষ করব। আপনাকে আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয় নি। আপনার স্ত্রীর খোঁজ পেয়েছেন?

শাহেদ বলল, না। ওর মা'র বাসায় গিয়েছিলাম। বাসা তালাবন্ধ। আশেপাশে কেউ কিছু জানে না।

মনোয়ারা বললেন, ভাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। তারা নিরাপদে আছে এবং ভালো আছে।

কীভাবে বলছেন ?

আমার মন বলছে। আমার মন যা বলে তা ঠিক হয়।

সোবাহান সাহেব ব্যাটারি লাগিয়ে ট্রানজিস্টার চালু করেছেন। নিচু ভলিউমে ক্রমাগত রেডিও শুনে যাচ্ছেন। সামরিক নির্দেশাবলি প্রচারিত হচ্ছে। তিনি প্রতিটি নির্দেশ মন দিয়ে শুনছেন। অবাঙালি একজন কেউ বাংলায় বলছে। অদ্ভুত বাংলা— সময়কে বলছে 'সুময়'। গুজবকে বলছে 'গজব'। 'গজবে কান ডিবেন না।' সোবাহান সাহেবের মনে হলো— এরা কি রেডিওর সব বাঙালিদের মেরে ফেলেছে ? নির্দেশগুলি পড়ার মতো বাঙালি নেই।

সামরিক নির্দেশাবলির পর প্রচারিত হলো যন্ত্রসঙ্গীত। যন্ত্রসঙ্গীতের পর স্বাস্থ্যবিষয়ক কথিকা। বিষয় জলবসন্ত। সোবাহান সাহেব জলবসন্ত বিষয়ক কথিকাও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। জলবসন্তে এন্টিবায়োটিক কোনো কাজে আসে না— এই তথ্য তাঁর কাছে হঠাৎ করেই খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। এখন তাঁকে দেখে গত রাতের সোবাহান সাহেব বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে মোটামুটিভাবে আনন্দে আছেন এমন একজন মানুষ। যে মানুষটি কানের কাছে ট্রানজিস্টার রেডিও ধরে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেয়েছেন। রেডিওতে পাওয়া খবর অন্যদের জানানোর বিষয়েও তাঁকে উৎসাহী মনে হচ্ছে। শাহেদকে বললেন, ভালো খবর আছে, আগামীকালও দু'ঘণ্টার জন্যে কার্ফু তোলা হবে। এমনিতে দু'ঘণ্টা কম সময় মনে হয়, আসলে কিন্তু অনেক সময়। দুই ঘণ্টায় দুনিয়ার কাজ করে ফেলা যায়। কাল মনে করে আরো ব্যাটারি কিনবে।

মনোয়ারাকে রাতে কী রান্না হবে সেই বিষয়ে বললেন, বৌমা খিচুড়ি রান্না করো। বর্ষা বাদলায় আনন্দের দিনে খিচুড়ি খেতে হয়, আবার বিপদে-আপদেও খিচুড়ি খেতে হয়। পাতলা খিচুড়ি সঙ্গে ডিমভুনা।

খিচুড়ি ডিমভুনা খেতে খেতে রাত দশটা বেজে গেল। তার পরপরই উত্তর দিক থেকে প্রবল গোলাগুলির শব্দ আসতে লাগল। গতকালের মতোই অবস্থা। রাস্তায় ভারী মিলিটারি গাড়ির চলার শব্দ কিছুক্ষণ পরপরই শোনা যাচ্ছে। গোলাগুলির সঙ্গে বুম বুম শব্দের বিকট আওয়াজও কানে আসছে। এই শব্দ কিসের তা সোবাহান সাহেব বুঝতে পারছেন না। তিনি চিন্তিত গলায় শাহেদকে বললেন, বুম বুম শব্দটা কিসের ?

শাহেদ বলল, জানি না চাচা।

কামান দাগছে না-কি ? কামান দাগছে কী জন্যে ?

রাত বারটার দিকে শব্দ আসতে শুরু করল পশ্চিম দিক থেকে। এই শব্দ অনেক কাছ থেকে আসছে। গুলি মনে হচ্ছে শাঁ শাঁ শব্দ করে এই বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। সোবাহান সাহেব ভীত গলায় বললেন, সবাই মেঝেতে শুয়ে থাকো। সবাই একঘরে শোও। মহাআজাবের সময় আত্মীয়-অনাত্মীয় নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নাই। শাহেদ, তুমিও আমাদের সঙ্গে শুয়ে থাকো।

বসার ঘরের মেঝেতে সবাই শুয়ে আছে। কংকন শুয়েছে শাহেদের পাশে। সে একটা পা শাহেদের গায়ে তুলে দিয়েছে। রুনি এইভাবে ঘুমায় না। সে হাত-পা গুটিয়ে পুটলির মতো শুয়ে থাকে। একটা আঙুল থাকে তার মুখে। ঘুমের মধ্যে সে আঙুল চুষতে থাকে। খুবই খারাপ অভ্যাস।

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন। ভয়ের কারণে হঠাৎ তাঁর কথা জড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। তিনি বললেন, সবাই একমনে আল্লাহপাকের নাম নাও— আমাদের বড়পীর সাহেব আবদুল কাদের জিলানি সব সময় যে জপ করতেন। ঐটা করো। এক মনে বলো— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

কংকন বলল, বাতি জ্বালাও, আমার ভয় লাগে। সোবাহান সাহেব বললেন, বাতি জ্বালানো যাবে না।

গুলির শব্দ আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। মানুষজনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সোবাহান সাহেব শব্দ করেই জিগির করছেন— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে কারফিউ-বিরতি।

এই দু'ঘণ্টায় শাহেদকে অনেক কাজ করতে হবে। যেভাবেই হোক আসমানীর খোঁজ বের করতে হবে। সে নিশ্চিত আজ খোঁজ পাওয়া যাবে। সে যেমন আসমানীর খোঁজ বের করার চেষ্টা করছে, আসমানীও নিশ্চয়ই করছে। প্রথমবার কারফিউ তোলা ছিল আকস্মিক। হঠাৎ করে আসমানীরা খবর পেয়েছে দু'ঘণ্টার জন্যে কারফিউ নেই। তৎক্ষণাৎ কোনো ব্যবস্থা করতে পারে নি। আজকেরটা আগেভাগেই জানা। কাজেই আসমানী নিশ্চয়ই প্ল্যান করে রেখেছে। শাহেদ ঠিক করেছে সে প্রথমে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে কোনো খোঁজ না বের করতে পারলে নিজের বাসায় এসে বসে থাকবে। তবে আজ খবর পাওয়া যাবেই। গতরাতে সে একটা ভালো স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্নের একটাই অর্থ। আসমানীর সঙ্গে দেখা হবে। স্বপ্নে সে নিজের ঘরের বারান্দায় বসে হাউমাউ করে কাঁদছে, এমন সময় তার বড় ভাই ইরতাজউদ্দিন বারান্দায় এসে বিরক্ত গলায় বললেন, কাঁদছিস কেনরে গাধা ? সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আসমানীর খোঁজ পাচ্ছি না। ইরতাজউদ্দিন বললেন, ঘরে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদলে খোঁজ পাবি কী করে ? আয় আমার সঙ্গে। দু'জন রাস্তায় নামল। রাস্তায় প্রচুর লোকজন। তাদের মধ্যেই দেখা গেল, একটা ঠেলাগাড়িতে আসমানী বসে আছে। সে খুব সুন্দর করে সেজেছে। তার গা ভর্তি গয়না। মুখে চন্দনের ফোঁটা দেয়া। পরনের শাড়িটাও মনে হচ্ছে বিয়ের শাড়ি। শাহেদ ঠেলাগাড়ির দিকে অতি দ্রুত যাবার চেষ্টা করছে। এত লোকজন যে যাওয়া যাচ্ছে না। তবে আসমানী তাকে দেখতে পেয়েছে। সে হাসছে।

ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। এই স্বপ্ন অবশ্যই সত্যি হবে। শাহেদ অতি দ্রুত হাঁটছে। স্বপ্নে যেমন দেখেছিল রাস্তায় প্রচুর মানুষ, বাস্তবেও তাই দেখা যাচ্ছে। প্রচুর লোক। মনে হয় শহরের সমস্ত লোকজন এক সঙ্গে পথে নেমেছে। রিকশাও নেমেছে, তবে সংখ্যায় কম। খালি রিকশা দেখা মাত্র শাহেদ ছুটে যাচ্ছে। রিকশা কি কলাবাগান যাবে ? প্রতিটি রিকশাওয়ালাই এই প্রশ্নের জবাব

দিতে অনেক সময় নিচ্ছে। চট করে বলে দিলেই হয় যাবে না। তা না করে একেকজন আকাশ-পাতাল ভাবছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। রাস্তায় থুথু ফেলছে। কপালের ঘাম মুছছে। তারপর বিড়বিড় করে বলছে— ঐ দিকে যামু না। রিকশা ঠিক করতে যাওয়া মানে সময় নষ্ট। এখন প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান। মূল্যবান সেকেন্ডের একটিও নষ্ট করা ঠিক না।

সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে এসে শাহেদ রিকশা পেল। এই রিকশা পাওয়া না-পাওয়া একই। জোয়ান রিকশাওয়ালা অথচ সে রিকশা টানতেই পারছে না। পায়ে হেঁটে এরচে' দ্রুত যাওয়া যায়। শাহেদ বলল, ভাই একটু তাড়াতাড়ি যান। রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে শাহেদের কথা শুনল। তার রিকশার গতি আরো শ্লথ হয়ে গেল। শাহেদের ইচ্ছা করছে, লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে হাঁটা শুরু করে।

কলাবাগানের কাছাকাছি এসে সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো একটা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়িতে পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। গাড়ির ভেতর বার-তের বছর বয়েসী একটা কিশোরী। তার পরনে ঘাঘড়া। চুল লাল। কিশোরীকে ঘিরে চারজন যুবক। সবাই পান খাচ্ছে। তাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। তারা কি কোনো উৎসবে যাচ্ছে ? বিয়ের উৎসব নিশ্চয়ই না। অন্য কোনো উৎসব। এরা বিহারি। বিহারিরা উৎসব করতে পছন্দ করে। আজকের এই দুঃসময় তাদের জন্যে না। এরা দুঃসময়ের বাইরে।

শাহেদ শ্বশুরবাড়িতে কাউকে পেল না। বাড়ির সামনের চায়ের দোকানটা খুলেছে। দোকানদার কিছু বলতে পারল না। আশেপাশে চার-পাঁচটা বাড়িতে সে গেল। তারাও কিছু জানে না। একজন শুধু বলল, কালো রঙের একটা প্রাইভেট গাড়িতে করে সবাই চলে গেছে। কখন গেছে, কবে গেছে সেটা আবার বলতে পারছে না।

শাহেদ নিজের বাড়িতে ফিরল কারফিউর মেয়াদ শেষ হবার আধঘণ্টা আগে। গেট খুলে ভেতরে ঢোকার সময় হঠাৎ মনে হলো, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে— এক্ষুনি বোধহয় সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। বাসার সদর দরজায় তালা নেই। বাড়িতে লোক আছে। অবশ্যই আসমানী ফিরেছে। চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলেছে। বাড়ির অন্য দরজা-জানালা সবই বন্ধ। এটাই স্বাভাবিক। এই সময়ে কেউ দরজা-জানালা খোলে না। শাহেদ দ্রুত চিন্তা করছে— চাল-ডাল কি আছে ? আসমানী খুব গোছানো মেয়ে। সবকিছুই থাকার কথা। কেরোসিন আছে কি-না কে জানে। যদি না থাকে এক্ষুণি নিয়ে আসতে হবে। আধঘণ্টা

সময় এখনো হাতে আছে। সে দেখে এসেছে রাস্তার মোড়ের বড় দোকানটা খোলা। কেরোসিন চা-পাতা চিনি। আসমানী একটু পর পর চা খায়। কড়া মিষ্টির ঘন চা। শাহেদ ঠিক করতে পারছে না— সে কি বাসায় না ঢুকে আগে বাজারটা করে নিয়ে আসবে ? না-কি আগে আসমানীর সঙ্গে দেখা করে বলবে— ভয় নাই আমি আছি। তাকে না দেখে আসমানী নিশ্চয়ই ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। তবে আসমানীর সঙ্গে দেখা হলে একটা বিপদ হবে। রুনি তাকে দেখা মাত্র ঝাঁপ দিয়ে কোলে উঠে পড়বে। তাকে তখন কোল থেকে নামানো যাবে না। দোকানে যেতে হলে তাকে কোলে নিয়েই যেতে হবে।

সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। শাহেদ অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাবার পর ভেতর থেকে ভীত পুরুষগলা শোনা গেল— কে ?

শাহেদ বলল, আমি শাহেদ। দরজা খুলেন।

দরজা খুলল। শাহেদ অবাক হয়ে দেখে, দরজার ওপাশে গৌরাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ হলুদ। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে বিরাট কোনো অসুখ থেকে উঠেছে।

শাহেদ বলল, তুমি কোত্থেকে ?

গৌরাঙ্গ জবাব দিল না। শাহেদ আবার বলল, তুমি কোত্থেকে ? গৌরাঙ্গ এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে শাহেদের কথা বুঝতেই পারছে না। শাহেদ বলল, বাসায় আর কেউ আছে ?

গৌরাঙ্গ বলল, না।

শাহেদ বলল, তুমি বাসায় ঢুকলে কীভাবে ?

গৌরাঙ্গ বিড়বিড় করে বলল, তালা ভেঙে ঢুকেছি। মিতা, আমার কোনোখানে যাবার জায়গা নাই। তুমি যদি বের করে দাও, মিলিটারিরা আমাকে মেরে ফেলবে।

শাহেদ বলল, আমি বের করে দেব কেন ?

গৌরাঙ্গ জবাব দিচ্ছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শাহেদের দিকে। শাহেদ বলল, তোমার বৌ-মেয়ে ওরা কোথায় ?

শাহেদ বিড়বিড় করে বলল, ওরা ভালো আছে।

তারা কোথায় ?

আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

শাহেদ বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে কেন ?

গৌরাঙ্গ আগের মতোই অস্পষ্ট গলায় বলল, মিতা, আমি তোমার সঙ্গে থাকব। আমার সঙ্গে টাকা আছে। শ্বশুরমশাই যে টাকাটা দিয়েছেন, সবটা আমার সঙ্গে আছে। তুমি টাকাটা নাও। খরচ করো। শুধু আমাকে থাকতে দাও।

শাহেদ হতভম্ব গলায় বলল, ঠিক করে বলো তো— ভাবি, বাচ্চা ওরা কোথায় ?

গৌরাঙ্গ বলল, বলেছি তো ওরা ভালো আছে। দু'জনই ভালো আছে। মেয়েটার জ্বর এসেছিল, এখন মনে হয় জ্বর কমেছে। আমার নিজের শরীরও ভালো না। আমি তোমার এখানে বিশ্রাম নিতে এসেছি। সারাক্ষণ আমার মাথা ঘোরে। মিতা, আমার ক্ষিধাও লেগেছে। তুমি আমাকে কিছু খাওয়াও। টাকা নিয়ে চিন্তা করবে না। আমার কাছে টাকা আছে। মিতা, আমি এখন শুয়ে থাকব। খাবার জোগাড় হলে আমাকে ডেকে তুলবে।

গৌরাঙ্গ সন্ধ্যা পর্যন্ত মরার মতো ঘুমাল। কয়েকবার চেষ্টা করেও শাহেদ তাকে তুলতে পারল না। সন্ধ্যার পর পর সে নিজেই জেগে উঠল। শাহেদ বলল, এখন শরীর কেমন ? মাথা ঘোরা কমেছে ?

গৌরাঙ্গ বলল, শরীর ভালো আছে। আমার বাচ্চাটাকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে— এই জন্যে মনটা সামান্য খারাপ।

ভাবি ? ভাবি কোথায় ?

ওরা তাকে তুলে নিয়ে গেছে। বাঁচিয়ে রেখেছে কি-না আমি জানি না। মেরে ফেললে তার জন্যেও ভালো, সবার জন্যেই ভালো। আমার শ্বশুরসাহেবও মারা গেছেন। মিতা, তোমাকে যা বলেছি সব গোপন রাখবে। মিলিটারি যদি শুনে তাদের নামে আজেবাজে কথা বলছি, তাহলে তারা রাগ করবে। আমাকেও ধরে নিয়ে যাবে। মিলিটারিদের দোষ কী! ওরা হুকুমের চাকর। ওদের যেভাবে হুকুম দিয়েছে, ওরা সেইভাবে কাজ করেছে। তাই না ?

শাহেদ বলল, ভাবিকে যখন ওরা নিয়ে যাচ্ছিল তুমি কোথায় ছিলে ?

আমি দরজার আড়ালে বসে ছিলাম। ওরা সব ওলট পালট করে দেখেছে, শুধু দরজার আড়ালটা দেখে নাই। সবই ভগবানের লীলা। মিতা, তোমাকে যা বললাম সব গোপন রাখবে। কোনো কিছুই যেন প্রকাশ না হয়। মিলিটারির কানে গেলে তোমার বিপদ। আমারও বিপদ।

শাহেদ বলল, ভাত-ডাল রান্না করেছি, খেতে আসো।

গৌরাঙ্গ বলল, ঠিক আছে। খুবই ক্ষুধা লেগেছে। ইলিশ মাছের পাতুরি খেতে ইচ্ছা করছে। গরম ধোঁয়া উঠা ভাত, ইলিশ মাছের পাতুরি।

কথা শেষ করেই গৌরাঙ্গ বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। শাহেদ তার পাশেই বসে আছে। মানুষটা ঘুমের মধ্যে কাঁদছে। ঘুমের মধ্যে কাঁদার দৃশ্যটা যে দেখতে এত ভয়ঙ্কর তা শাহেদ আগে কখনো বুঝতে পারে নি।

রাত বাড়ছে। ইলেকট্রিসিটি সন্ধ্যা থেকেই নেই। ঘর অন্ধকার না। শাহেদ টেবিলের উপর পাশাপাশি দু'টা মোমবাতি জ্বালিয়েছে। মোমবাতি পাওয়া গেছে রান্নাঘরের তাকে। আসমানী রান্নাঘরের দরজায় লিস্ট টানিয়ে রেখেছে। কোন জিনিসটি কোথায় তার তালিকা। প্রায়ই সে বাবার বাড়ি চলে যায়, তালিকাটা সে জন্যেই। আজ এই তালিকা পড়তে গিয়ে শাহেদের চোখে পানি এসে গেছে।

চাল, ডাল, মুড়ি— টিনে ভরা। রুনির ঘরে। চৌকির নিচে।

কাপড় ধোবার সাবান, মোমবাতি, দেয়াশলাই— রান্নাঘরের তাকে। সর্ববামে।

মশলা, লবণ— রান্নাঘরের তাকে। সর্ব ডানে। কৌটার গায়ে কী মসলা নাম লেখা আছে।

চা, চিনি— মিটসেফের উপরে।

পেঁয়াজ, রসুন, আদা— মিটসেফের পাশের খলুইয়ে।

সরিষার তেল— চুলার পাশে।

ভালোবাসা— আমার কাছে। আমি যেখানে থাকি সেখানে।

আসমানীর পক্ষেই সম্ভব কাজের কথা লিখতে লিখতে হঠাৎ মজার কিছু লিখে ফেলা। তেল, মসলার কথা লিখতে লিখতে লেখা 'ভালোবাসা— আমার কাছে। আমি যেখানে থাকি সেখানে।'

বিয়ের রাতেও সে এরকম মজা করল। বাসর হচ্ছে আসমানীদের কলাবাগানের বাড়িতে। দোতলার বড় একটা ঘর। ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। ঘরে পা দিয়েই শাহেদের মনে হলো— আসমানী কি এত সুন্দর! সে আগেও তো কয়েকবার দেখেছে। এত সুন্দর তো তাকে কখনো মনে হয় নি? শাহেদ খাটে বসতে বসতে বলল, আজ কী রকম গরম পড়েছে দেখেছ? (সে ঠিক করে রেখেছিল প্রথম যে বাক্যটি বলবে তা হচ্ছে— আসমানী কেমন আছ? বলার সময় সম্পূর্ণ অন্য কথা বের হয়ে এলো। বলার সময় বলে বসল— আজ কী গরম পড়েছে দেখেছ? যেন সে দেশের আবহাওয়া নিয়ে খুবই চিন্তিত।)

শাহেদের কথার উত্তরে আসমানী মুখ তুলে তাকাল। শান্তগলায় স্পষ্টভাবে বলল, গরমের সময় গরম তো পড়বেই। গরমকালে গরম পড়বে, ঠাণ্ডাকালে ঠাণ্ডা। আপনার জন্যে তো আল্লাহ্ আবহাওয়া বদলে দেবেন না।

শাহেদ হতভম্ব। হড়বড় করে এইসব কী বলছে ? বিয়ের টেনশনে, অত্যধিক গরমে কি তার মাথা আউলায়ে যাচ্ছে ?

আসমানী বলল, চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ? কোনো পুরুষমানুষ এইভাবে তাকিয়ে থাকলে আমার রাগ লাগে। আমি কিন্তু চোখ গেলে দেব।

আতঙ্কে অস্থির হয়ে শাহেদ খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই আসমানী হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, সরি। কিছু মনে করো না। আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছি। আমি আমার দুই খালাতো বোনের সঙ্গে বাজি ধরেছি। বাসর রাতে আমি যদি তোমাকে ভয় দেখাতে পারি, তাহলে তারা আমাকে একশ' টাকা দেবে। ওরা দু'জনেই জানালার ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখছে। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বসো।

শাহেদ বসল। সে তখনো পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে অদ্ভুত সুন্দর এই মেয়েটি আবারও উদ্ভট কিছু করবে। আসমানী বলল, তুমি কি রাগ করেছ ?

শাহেদ ভীত গলায় বলল, না।

আসমানী বলল, প্রথম রাতেই তোমাকে ভয় দেখিয়ে দিলাম। কাজটা খুব খারাপ করেছি। এতে কী হবে জানো— সারাজীবন তুমি আমাকে ভয় করে চলবে।

শাহেদ এসে বারান্দায় বসেছে। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। গুমোট গরম কমতে শুরু করেছে। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে গৌরাঙ্গ গোঙানির মতো শব্দ করছে। যেন কেউ তার গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে চিৎকার করতে গিয়েও করতে পারছে না। একটা ব্যাপার দেখে শাহেদ খুবই অবাক হচ্ছে— গৌরাঙ্গের ভয়াবহ দুঃসময় তাকে তেমন স্পর্শ করছে না। যেন গৌরাঙ্গের এই সমস্যায় তার কিছু যায় আসে না। ভয়াবহ দুর্যোগের সময় মানুষ কি বদলে যায় ? তখন নিজের সুখ নিজের দুঃখই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় ? দেশের সব মানুষই কি বদলাতে শুরু করেছে ? আসমানী বদলে যাচ্ছে ? রুনি বদলে যাচ্ছে ?

শাহেদ আসমানীর কথা ভাবতে চাচ্ছে না। আসমানীর কথা মনে করলেই বুকের ভেতর কেমন জানি করছে। কী একটা দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। আসমানী এখন আছে কোথায় ? কী করছে ? সেও কি তার মতো জেগে আছে। গল্পের বই পড়ছে না-কি ? নিশিরাতে গল্পের বই পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠা তার

পুরনো রোগ। একবার তো আসমানীর কান্নার শব্দে সে ঘুম ভেঙে উঠে বসে ভীত গলায় বলল, কী হয়েছে? আসমানী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কিছু হয় নাই। ঘুমাও। গল্পের বই পড়ে কাঁদছি।

কী বই?

তারাশংকর লেখা একটা বই, নাম— বিপাশা।

বই পড়ে কাঁদার কী আছে?

আমার স্বভাবই এরকম। নিজের দুঃখে আমি কাঁদি না। গল্প-উপন্যাসের চরিত্রদের দুঃখে আমি কাঁদি।

তোমার মাথা কিন্তু সামান্য খারাপ আছে।

তা তো আছেই। পুরোপুরি সুস্থ মাথার একটা মেয়েকে বিয়ে করো। তোমরা সুখে সংসার করো। আমি দূর থেকে দেখে খুব মজা পাব।

শাহেদ বিরক্ত হয়ে বলল, এইসব কী ধরনের কথা?

আসমানী বলল, খুবই ভালো কথা। আমি নিজে এসে তোমাদের সংসার সাজিয়ে দিয়ে যাব। বিয়ে করবে? প্লিজ প্লিজ।

বাতি নেভাও। বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে আসো।

না, ঘুমাব না। বইটা আমি আবার পড়ব।

এখন?

হ্যাঁ এখন। গল্পের শেষ না জেনে পড়ার এক ধরনের আনন্দ। আবার শেষ জেনে পড়ার অন্য ধরনের আনন্দ। বাতি জ্বালিয়ে রাখলে তোমার যদি অসুবিধা হয়, তাহলে আমি বরং অন্য ঘরে যাই।

যা ইচ্ছা করো।

বৃষ্টি বাড়ছে। সঙ্গে সামান্য বাতাসও আছে। বাতাসে ছাতিম গাছের পাতা নড়ছে। বারান্দা থেকে গাছটাকে এখন জানি কেমন ভৌতিক লাগছে। এই গাছ দেখে একবার আসমানী খুব ভয় পেয়েছিল। রাতেরবেলা তার ঘুম ভেঙেছে, সে এক গ্লাস পানি হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বসেছে। কিছুক্ষণ পরই বিকট চিৎকার। ঘুম ভেঙে শাহেদ ছুটে এসে দেখে, আসমানী থরথর করে কাঁপছে। তার হাত থেকে পানির গ্লাস পড়ে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়েছে। শাহেদ বলল, কী হয়েছে? আসমানী বিড়বিড় করে বলল, গাছটা মানুষের মতো হাত নেড়ে ডেকেছে।

শাহেদ বলল, বাতাসে পাতা নড়েছে, তোমার কাছে মনে হয়েছে অন্য কিছু।

আসমানী কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি ছোট বাচ্চা না, আমি জানি কী হয়েছে।

ভয়ে সেই রাতেই আসমানীর জ্বর উঠে গেল।

না, সে এখন আসমানীর কথা ভাববে না। সে নিশ্চয়ই ভালো আছে। সে আছে তার বাবা-মা'র সঙ্গে। একজন সন্তান সবচে' নিরাপদে থাকে যখন সে বাবা-মা'র সঙ্গে থাকে। তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না— কাল অবশ্যই দেখা হবে। আগামীকাল কারফিউ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সে যাবে মিরপুর দশ নম্বরে। সেখানে আসমানীর এক খালা থাকেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনো খবর দিতে পারবেন। আসমানীর সরাসরি কোনো খবর না পেলেও তার অন্য আত্মীয়দের ঠিকানা তার কাছ থেকে নেবে।

মিরপুর যাবার পথে সোবাহান সাহেবদের খোঁজ নিয়ে যেতে হবে। তারা নিশ্চয়ই আজও অপেক্ষা করে বসেছিলেন। সোবাহান সাহেবদের নিরাপদ কোনো জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

গৌরাঙ্গ! তার ব্যাপারটা কী? গৌরাঙ্গ কি তার কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাবে? না-কি এখানে থাকবে? এখানে থাকতে কোনো সমস্যা নেই। যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারবে। আসমানী যদি এর মধ্যে চলে আসে, তাহলে কোনো অসুবিধাই হবে না। আসমানীর মেজাজ যখন ঠিক থাকে, তখন সে অসাধারণ একটি মেয়ে। গৌরাঙ্গের ভয়াবহ কষ্ট অনেকখানি কমিয়ে দেয়া কোনো ব্যাপারই না।

মিতা! মিতা!

ভারী গলায় গৌরাঙ্গ ডাকছে। শাহেদ ভেতরে গেল। গৌরাঙ্গ খাটে বসে আছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। তার মুখও হা হয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। শাহেদ বলল, ভাত-ডাল রান্না করেছি। কিছু খাবে?

গৌরাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বলল, হুঁ।

নামো বিছানা থেকে। দাঁড়াও আমি ধরছি।

শাহেদ ধরাধরি করে গৌরাঙ্গকে নামাল। গৌরাঙ্গ বলল, মিতা, আমার স্নান করতে হবে। আমি তিনদিন স্নান করি নাই।

শাহেদ বলল, বাথরুমে পানি আছে, সাবান আছে। গরম পানি করে দেব?

দাও। মিতা শোন, আমি কিন্তু তোমার এখানে থাকব। আমি অন্য কোনোখানে যাব না।

কোনো অসুবিধা নেই। থাকবে।

আগারগাঁও-এ আমার এক মামা থাকেন। ওয়্যারলেস অফিসার না-কি কী যেন। আমি উনার কাছেও যাব না।

তোমার যত দিন ইচ্ছা তুমি থাকবে।

মিতা আমার বুকে ব্যথা করছে। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

গরম পানি দিয়ে গোসল করো। গোসল করলে আরাম পাবে।

গৌরাঙ্গ ক্ষীণ গলায় বলল, আচ্ছা। মিতা আমার হাত-পা কেমন শক্ত হয়ে গেছে। হাত-পা নাড়তে পারছি না। এই দেখ, আঙুল বাঁকা করতে পারছি না।

গৌরাঙ্গ হাত উঁচু করে দেখাল। তার আঙুল ঠিকই বাঁকা হচ্ছে।

মিতা দেখেছ আঙুল বাঁকছে না।

শাহেদ বলল, ঠিক হয়ে যাবে।

গৌরাঙ্গ বলল, কখন ঠিক হবে?

শাহেদ বলল, ভোর হোক।

গৌরাঙ্গ বলল, আচ্ছা।

আরেকটি ভোর হয়েছে। আগে একটি ভোরের সঙ্গে আরেকটি ভোর আলাদা করা যেত না। এখন আলাদা করা যায়। এখন মনে হয় প্রতিটি ভোর আলাদা।

কারফিউ উঠেছে। লোকজন রাস্তায় নেমেছে। শাহেদ বের হয়েছে গৌরাঙ্গকে নিয়ে। গৌরাঙ্গের শরীরের অবস্থা ভালো না। তার গায়ে জ্বর। কিন্তু সে একা কিছুতেই বাসায় থাকবে না। একা বাসায় বসে থাকলে সে না-কি ভয়েই মরে যাবে। রাস্তায় নেমেও আরেক বিপদ, সে একটু পর পর বলছে— মিতা ফিরে চল। মিতা ভয় লাগছে, ফিরে চল। শাহেদের খুবই বিরক্ত লাগছে। ফিরে যাবার প্রশ্নই উঠে না। যে করেই হোক আসমানীদের খোঁজ বের করতে হবে। প্রথমে যেতে হবে মিরপুর দশ নম্বর, তার খালার বাড়িতে। বাড়ির নাম্বার সে জানে না। আগে দু'বার এসেছে, কাজেই তার ধারণা সে বাড়ি চিনবে। তবে মিরপুর যাবার আগে তাকে সোবাহান সাহেবের খোঁজে যেতে হবে। এরা নিশ্চয়ই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করছে। গতকাল শাহেদ যায় নি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করছেন।

সোবাহান সাহেবদের বাড়ির সদর দরজায় তালা ঝুলছে। বেশ বড় তালা। মনে হচ্ছে তারা গতকাল বাসা ছেড়ে নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে গেছে। ঢাকা শহরের মানুষ কোনোখানেই এখন নিশ্চিন্ত বোধ করছে না। তারা শুধুই জায়গা বদল করছে। দরজায় তালাবন্ধ, তারপরেও শাহেদ অনেকক্ষণ কড়া

নাড়ল। ঢাকা শহরে আরেকটি নিয়ম এখন চালু হয়েছে। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ির ভেতরে বসে থাকা। মিলিটারি যদি আসে তাহলে যেন তালা দেখে মনে করে এই বাড়িতে লোকজন নেই।

গৌরাঙ্গ বলল, মিতা চল, বাসায় ফিরে যাই। কেউ তো নাই।

শাহেদ বলল, আমাকে মিরপুর যেতেই হবে।

গৌরাঙ্গ বলল, মিতা, আমার খুব ভয় লাগছে।

ভয় লাগলে তুমি বাসায় চলে যাও। আমাকে যেতেই হবে। যে করেই হোক আমাকে আসমানীর খোঁজ বের করতে হবে।

মিতা, আমি একা বাসায় থাকব না। আমি ভয়েই মরে যাব। আমি খুবই ভীতু।

শাহেদ জবাব দিল না। কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় তার হাতে নেই। তাকে এখন কোনো বেবিট্যাক্সি খুঁজে বের করতে হবে। বেবিট্যাক্সি না পাওয়া গেলে শক্ত-সমর্থ শরীরের কোনো রিকশাওয়ালা, যে তাকে অতি দ্রুত মিরপুর পৌঁছে দেবে। হাতে সময় অল্প। বারোটা থেকে আবার কারফিউ শুরু হবে।

মিরপুর দশ নম্বরের মাথায় তারা রিকশা ছেড়ে দিল। বাড়ি খুঁজতে শুরু করতে হবে এখান থেকেই। শাহেদের অস্পষ্টভাবে মনে আছে, বাড়ির সামনের গেটের কাছে একটা জবা গাছ আছে। বাড়ির একটা ইংরেজি নামও আছে। নামটা মনে পড়ছে না। তবে শুরুটা 'S' দিয়ে।

গৌরাঙ্গ চাপা গলায় বলল, মিতা মিলিটারি। ডানদিকে চায়ের দোকানের সামনে মিলিটারি। মিতা, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

শাহেদ থমকে দাঁড়াল। চায়ের দোকানের নাম 'রহমানিয়া টি স্টল'। পাঁচজন মিলিটারির একটা দল দোকানের সামনে। একজন পিরিচে চা ঢেলে খাচ্ছে। বাকিরা শক্ত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের আশেপাশে কোনো লোকজন নেই। শুধু শাদা গেঞ্জি পরা চায়ের দোকানদার মাথা নিচু করে বসে আছে। দোকানদারকে দেখে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। দূর থেকে মনে হচ্ছে হার্ডবোর্ডে দোকানদারের ছবি এঁকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

গৌরাঙ্গ চাপা গলায় বলল, মিতা, আমাদেরকে ডাকে। এখন কী করব?

পিরিচে ঢেলে যে চা খাচ্ছিল সে-ই ডাকছে। তার মুখ হাসি হাসি। গৌরাঙ্গ বিড়বিড় করে বলল, মিতা, এখন কী করব? দৌড় দিব?

শাহেদ বলল, যেভাবে দাঁড়িয়ে আছ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। খবরদার দৌড় দেবে না। আমি শুনে আসি।

মিতা, ওদের কাছে যাবার দরকার নাই।

শাহেদ এগুচ্ছে। মিলিটারি দলটির দু'জন বন্দুক উঁচিয়ে ধরল তার দিকে। কেন ধরল শাহেদ বুঝতে পারছে না। হয়তো এটাই তাদের নিয়ম। কোনো বাঙালি তাদের দিকে আসতে থাকলে বন্দুক উঁচিয়ে নিশানা করতে হয়। তাকে ডাকছেই বা কেন ? যে চা খাচ্ছিল, সে চা খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে আছে। তার মুখ এখনো হাসি হাসি। এটা একটা ভরসার কথা। কিংবা তার মুখ হয়তো হাসি হাসি না। অনেকে এরকম থাকে। খুব রাগ করে তাকালেও মনে হয় হাসছে। আচমকা খুব কাছেই কোথাও গুলি হলো। শাহেদ অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। গুলি কি তাকে করা হলো ? মনে হয় না। তাকে গুলি করা হলে ব্যথা বোধ হতো। রক্তে সার্ট ভিজে যেত। সে-রকম কিছু তো হয় নি।

গৌরাঙ্গ তাকিয়ে আছে। শাহেদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে মিলিটারিদের দিকে তাকাল। যে মিলিটারি চা খাচ্ছিল, তার চা খাওয়া শেষ হয়েছে। সে হাতের ইশারায় গৌরাঙ্গকে চলে যেতে বলল। গৌরাঙ্গ চলে যাচ্ছে।

শাহেদ মিলিটারিদের দিকে এগুচ্ছে। সে হাঁটতে পারছে, এর অর্থ তাকে গুলি করা হয় নি। শরীরে বুলেট নিয়ে কেউ হাঁটতে পারে না। মিলিট্যারিদের ছয়-সাত হাত কাছাকাছি গিয়ে শাহেদ থমকে দাঁড়াল।

নাম কেয়া ? তেরা নাম কিয়া ?

মিলিটারিরা তার নাম জানতে চাচ্ছে। নাম দিয়ে তারা কী করবে। তার নাম শাহেদ হলেও যা ফখরুদ্দিন হলেও তা। শাহেদ নাম বলল। যে মিলিটারি চা খাচ্ছিল, সে চায়ের কাপের কিছু চা মাটিতে ফেলে দিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। শাহেদ একদৃষ্টিতে মিলিটারিটার দিকে তাকিয়ে আছে।

কান পাকাড়ো।

এর মানে কী ? মিলিটারিটা তাকে কানে ধরতে বলছে ? অপরাধটা কী ? শাহেদ কানে ধরল। মিলিটারি ইশারা করল উঠবোস করতে। শাহেদ উঠবোস করছে। মিলিটারিরা মনে হয় ব্যাপারটায় মজা পাচ্ছে। সবার মুখ হাসি হাসি।

মরিয়ম খুব ভালো করেই জানে ভয়ঙ্কর দিন যাচ্ছে। যে-কোনো সময় যে-কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। তারপরেও তার মনে চাপা আনন্দ। এই আনন্দের জন্যে নিজেকে তার খুবই ছোট লাগছে, মনে হচ্ছে সে বাথরুমের তেলাপোকার চেয়ে জঘন্য কোনো প্রাণী। কিন্তু সে কী করবে? জোর করে তার আনন্দ চেপে রেখে দুঃখ দুঃখ মুখ করে ঘুরবে?

তার আনন্দের প্রধান কারণ হলো, কারফিউ ভাঙার পরপর নাইমুল বলেছে, 'আমি একটু বাইরে যাব, শহরের অবস্থা দেখব।' মরিয়ম সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, 'আমি তোমাকে ছাড়ব না। তুমি যেতে পারবে না।'

নাইমুল বলল, আচ্ছা। তুমি অনুমতি না দিলে যাব না।

কী সুন্দর কথা! তুমি অনুমতি না দিলে যাব না। চোখে পানি চলে আসার মতো কথা। মরিয়ম বলল, দুপুরে কী খাবে বলো। আজ দুপুরে আমি রান্না করব। মা'র শরীর খারাপ।

নাইমুল বলল, তুমি যা রান্না করবে আমি তাই খাব। তবে...

তবে কী?

সবচে' ভালো হয় রান্নাবান্নার ঝামেলায় না গিয়ে তুমি যদি আমার সামনে বসে থাকো। দুঃসময়ে প্রিয়জনদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এখন আমাদের দুঃসময়।

নাইমুলের কথা শুনে আনন্দে মরিয়মের চোখে পানি চলে এলো। তার কাছে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের সব মানুষের জন্যে দুঃসময় হলেও আজ তার জন্যে দুঃসময় নয়। কোনো দুঃসময় তাদের দু'জনের মাঝখানে ঢুকতে পারবে না।

নাইমুল ট্রানজিস্টারের নব ঘোরাচ্ছে। তার মধ্যে কোনো অস্থিরতা নেই। বাইরে এত ঝামেলা অথচ মানুষটা শান্ত-সহজ ভঙ্গিতে ট্রানজিস্টারের নব ঘোরাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে কোনো গানের অনুরোধের আসরের অনুষ্ঠান ধরতে চাচ্ছে। মরিয়ম বলল, এই, তোমার কি সত্যি সত্যি বাইরে যেতে ইচ্ছা করছে?

নাইমুল বলল, ইচ্ছা করছে কিন্তু আজ আমি তোমার ইচ্ছাটাকেই গুরুত্ব দেব। তুমি যদি বলো Yes তা হলে Yes, তুমি যদি বলো No তা হলে No।

আচ্ছা যাও, ঘুরে আসো। এক ঘণ্টার জন্যে যাবে।

থ্যাংক য়্যু।

তুমি যতক্ষণ বাইরে থাকবে ততক্ষণ আমি জায়নামাজে বসে থাকব।

আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরব।

রাস্তায় যতক্ষণ থাকবে দোয়া ইউনুস পড়বে। দোয়া ইউনুস জানো তো ? না জানলে একটা কাগজে লিখে দেই।

লিখে দিতে হবে না। জানি।

তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।

নাইমুল বলল, এখন বাজছে ন'টা পঁচিশ, আমি অবশ্যই দশটা পঁচিশে ফিরব।

ইনশাল্লাহ বলো। ইনশাল্লাহ ছাড়া কথা বলছ কেন ?

ইনশাল্লাহ। তুমি চায়ের পানি গরম রেখ। এসেই লেবু চা খাব।

মরিয়ম জায়নামাজে বসে আছে। যে কটা সূরা সে জানে সে কটা তিনবার তিনবার করে পড়ে নফল নামাজ পড়তে শুরু করবে। নাইমুল ঘর ছেড়ে যাবার পরই মরিয়মের মনে হলো, মস্ত ভুল করা হয়েছে, তাকে যেতে দেয়া ঠিক হয় নি। সে সূরা পড়া বন্ধ রেখে ক্রমাগত বলতে লাগল— আল্লাহ, তুমি তাকে ভালো রাখ। আল্লাহ তুমি তাকে ভালো রাখ। মরিয়মের একবারও তার বাবার কথা মনে পড়ল না। পঁচিশে মার্চের পর থেকে তাঁর কোনো খবর নেই। হয়তো মরিয়মের মনে হয়েছে তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। পুলিশের চাকরিতে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকা কোনো ব্যাপার না।

সাফিয়ার মুখ ভয়ে-আতঙ্কে ছোট হয়ে আছে। তাঁর ভীতির কারণ সম্পূর্ণ অন্য। পঁচিশে মার্চ রাতে তিনি একটি ভয়াবহ সত্য আবিষ্কার করেছেন। টুনটুনি (ইয়াহিয়াকে এখন টুনটুনি ডাকা হচ্ছে। একমাত্র মোবারক হোসেনই ছেলেকে ইয়াহিয়া নামে ডাকেন।) কানে শোনে না। এই যে এত গোলাগুলি, কামানের শব্দ তাতে তার কিছুই হচ্ছে না। সে জেগেই আছে কিন্তু একবারও চমকে উঠছে না। তখন তার সন্দেহ হলো, ছেলে হয়তো চোখেও দেখে না। তিনি তার সামনে রঙিন ফিতা ধরলেন। টুনটুনি হাত বাড়াল না। চোখের সামনে ঝুমঝুমি বাজালেন। সে ঝুমঝুমির দিকে তাকাল না। সম্পূর্ণ অন্যদিকে তাকিয়ে আনন্দে

হাসতে লাগল। তিনি বুঝতেই পারছেন না এই ভয়ঙ্কর খবরটা তিনি মরিয়মের বাবাকে কীভাবে দেবেন। মরিয়মের বাবা কি খবরটা সহ্য করতে পারবেন ? তিনি যদি বলেন, এই ব্যাপারটা ধরতে তোমার এত দিন লাগল ? তখন তিনি কী জবাব দেবেন ? সাফিয়ার একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছা হচ্ছে। ছেলেকে কোলে নিয়ে ছাদে চলে যেতে ইচ্ছা করছে। ছাদ থেকে ছেলে কোলে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়ে যাওয়া। চোখ-কান আছে এমন শিশুই এদেশে টিকে থাকতে পারে না, এ কীভাবে টিকবে ? তিনিইবা ছেলের বাবার রাগ কীভাবে সামাল দেবেন ?

নাইমুলের দশটা পঁচিশে ফেরার কথা। সে ঠিক দশটা পঁচিশেই ফিরল। মরিয়ম তখনো জায়নামাজ ছেড়ে ওঠে নি। নাইমুল বলল, মরি! আমার লেবু চা কই ?

মরিয়ম লজ্জায় মরে যাচ্ছে। নাইমুল তার কথা রেখেছে। সে কাঁটায় কাঁটায় দশটা পঁচিশে ফিরেছে। সে তার কথা রাখতে পারে নি। চুলায় চায়ের পানিই দেয়া হয় নি।

নাইমুল বলল, চা লাগবে না, তুমি বসো।

মরিয়ম বলল, কী দেখলে ?

নাইমুল বলল, ওরা যা দেখাতে চেয়েছিল তাই দেখলাম।

মরিয়ম বলল, ওরা কী দেখাতে চেয়েছিল ?

ওরা ওদের হাতের সূক্ষ্ম কাজ দেখানোর জন্যেই তিন ঘন্টার জন্যে কারফিউ তুলেছে। যেন ওদের কর্মকাণ্ড দেখে আমরা জেলি ফিসের মতো হয়ে যাই।

কী বলছ বুঝতে পারছি না।

নাইমুল হাসল। তার অদ্ভুত হাসি। সে হাসি দেখলেই মরিয়মের শরীর কেমন করতে থাকে।

মরিয়ম বলল, আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

নাইমুল বলল, চা আনতে হবে না। চুপ করে বসে থাকো। আমি একটা মজার জিনিসও দেখে এসেছি।

এর মধ্যে মজার জিনিস কী দেখলে ?

ওরা শহীদ মিনার ভেঙে গুঁড়া করে দিয়েছে। সেখানে একটা সাইনবোর্ড টানিয়ে দিয়েছে। সাইনবোর্ডে লেখা—

'মসজিদ, নামাজ পড়িবার স্থান।'*

---

* *অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জ্বল।* মমিনুল হক খোকা।

নাইমুল হাসছে। তবে এই হাসি কেমন যেন অন্যরকম। হাসির শব্দ ভোঁতা। শুনতে ভালো লাগে না।

মরিয়ম এখন তোমাকে খুব জরুরি একটা কথা বলব। মন দিয়ে শোনো। পাকিস্তানি মিলিটারিদের সঙ্গে সত্যিকার যুদ্ধ এখন শুরু হবে। কী ভয়াবহ যুদ্ধ যে হবে ওরা বুঝতেও পারছে না। আমি কিন্তু যুদ্ধে যাব।

মরিয়ম হতভম্ব গলায় বলল, কী বললে ?

নাইমুল সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমি যুদ্ধ করব। কীভাবে করব, অস্ত্র কোথায় পাব— কিছুই জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে ব্যবস্থা হবে।

যুদ্ধে যাবে ? তুমি যুদ্ধ করবে ?

হ্যাঁ। তবে তোমার ভয়ের কিছু নাই। আমি মরব না। আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমি খুবই সাবধান থাকব। বুদ্ধিমান মানুষ সবার আগে নিজেকে রক্ষা করে। আমি তাই করব।

মরিয়ম বিড়বিড় করে বলল, তুমি আমকে ছেড়ে চলে যাবে ?

নাইমুল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে— স্বাধীন বাংলাদেশে।

মরিয়ম আর্তনাদের মতো করে বলল, তুমি কি এখন চলে যাচ্ছ ?

নাইমুল বলল, না। আজ দিনটা আমি তোমার সঙ্গে থাকব। আমি যাব আগামীকাল। কারফিউ লিফট হওয়া মাত্র। বিদায়। আজকের দিনটা শুধুই আমাদের দু'জনের—

> She was a child and I was a child,
> In this kingdom by the sea,
> But we loved with a love that was more than love
> I and my Annabel Lee—

মরিয়ম হাউমাউ করে কাঁদছে। নাইমুল হাসিমুখে স্ত্রীর কান্না দেখছে।

২৭ মার্চ শনিবার রাত আটটায় রেডিওর নব ঘুরাতে ঘুরাতে এই দেশের বেশ কিছু মানুষ অদ্ভুত একটা ঘোষণা শুনতে পায়। মেজর জিয়া নামের কেউ একজন নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।' তিনি সর্বাত্মক যুদ্ধের ডাক দেন।*

---

* *একাত্তরের রণাঙ্গন* / শামসুল হুদা চৌধুরী
একাত্তরের দশমাস / রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী
আমার একাত্তর / আনিসুজ্জামান

দেশের মানুষদের ভেতর দিয়ে তীব্র ভোল্টেজের বিদ্যুতের শক প্রবাহিত হয়। তাদের নেতিয়ে পড়া মেরুদণ্ড একটি ঘোষণায় ঋজু হয়ে যায়। তাদের চোখ ঝলমল করতে থাকে। একজন অচেনা অজানা লোকের কণ্ঠস্বর এতটা উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে ভাবাই যায় না।

পিরোজপুর মহকুমার সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার এই ঘোষণা শুনে আনন্দে ছেলেমানুষের মতো চিৎকার শুরু করতে থাকেন— 'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমরা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি। আর ভয় নাই।' তিনি পিরোজপুরের পুলিশদের অস্ত্রভাণ্ডার থেকে দুইশ রাইফেল স্থানীয় জনগণকে দিয়ে দেন। যুদ্ধ শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে। পাকিস্তান মিলিটারি তাঁকে হত্যা করে ৫ মে। এই ঘটনার বত্রিশ বছর পরে তাঁর বড় ছেলে 'জোছনা ও জননী' নামের একটা উপন্যাস লেখায় হাত দেয়।

কালুরঘাট রেডিওস্টেশন থেকে প্রচারিত মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে পরে নানান বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তিনি মোট ক'বার ঘোষণা পাঠ করেছেন? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বাংলাদেশের একচ্ছত্র নায়ক এবং তার পক্ষেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হচ্ছে।— এই বিবৃতি কত তারিখে পড়া হলো, ক'বার পড়া হলো? এই নিয়ে বিভ্রান্তি। জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের আগেই স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের প্রসঙ্গ বইপত্রে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আব্দুল হান্নান দুপুর দু'টায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ প্রচার করেন। ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ দ্বিতীয়বার পড়া হয়। পাঠ করেন হাটহাজারী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব আবুল কাশেম সন্দীপ।

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে মেজর জিয়া নিজে তাঁর ডায়েরিতে যা লিখেছেন তা হলো— '২৭শে মার্চ শহরের চারদিকে তখন বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রেডিওস্টেশনে এলাম। এক টুকরা কাগজ খুঁজছিলাম। হাতের কাছে একটা এক্সারসাইজ খাতা পাওয়া গেল। তার একটি পৃষ্ঠায় দ্রুত হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণার কথা লিখলাম। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বভার নিয়েছি, সে কথাও লেখা হলো সেই প্রথম ঘোষণায়... কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘোষণা বেতারে প্রচার করলাম। ২৮ মার্চ সকাল থেকে পনেরো মিনিট পর পর ঘোষণাটি প্রচার করা হলো কালুরঘাট রেডিওস্টেশন থেকে। ৩০ মার্চ দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচার করা হলো রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধক্রমে।'

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে কোনোরকম বিভ্রান্তি থাকতে পারে না। এই একটি বিষয়ে দল মতের উর্ধ্বে আমাদেরকে উঠতেই হবে। 'সত্যেন ধার্যতে পৃথ্বি, সত্যেন তাপতে রবি, সত্যেন বাতি বায়ুশ্চ, সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম।' সত্যই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, সত্যের দ্বারাই সূর্য তাপ বিকিরণ করছে, সত্যের জন্যেই বাতাস বইছে, সত্যেই সবকিছু প্রতিষ্ঠিত। —লেখক

পিরোজপুর মহকুমার পুলিশপ্রধান ফয়জুর রহমান সাহেবের মন আজ অত্যন্ত ভালো। মন ভালো থাকার অস্বাভাবিক ঘটনার জন্যে তিনি খানিকটা লজ্জিত বোধ করছেন। দেশ ডুবে গেছে ভয়াবহ অনিশ্চয়তায়। এখন চরম দুঃসময়। এই অবস্থায় কোনো সুস্থ মানুষের মন ভালো থাকতে পারে না। তাহলে তিনি কি মানসিকভাবে খানিকটা অসুস্থ ?

তিনি মানসিকভাবে খানিকটা অসুস্থ— এই ধারণা তাঁকে কিছুক্ষণ পীড়িত করল। সেই কিছুক্ষণ তিনি একমনে সূরা আর-রাহমান পড়লেন। একটু পরপর 'ফাবিআয়্যি আ-লা ই রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান।' 'তোমরা আমার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?' আহারে, কী সুন্দর আয়াত!

তিনি বসে আছেন নামাজের পাটিতে। ফজরের নামাজ পড়া হয়েছে। নামাজের পাটি ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। ফজরের নামাজ নিয়মিত পড়া তাঁর কখনো হয় না। অনেক রাতে ঘুমুতে যান বলে সকালে ঘুম ভাঙে না। আজ অসম্ভব সুন্দর স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙেছে। স্বপ্নে তিনি বিরাট এক বরযাত্রী দল নিয়ে যাচ্ছেন। দলের সঙ্গে নানান ধরনের বাদ্যবাজনার লোক আছে। তারা বাদ্যবাজনা করছে। বিয়েটা কার তা স্বপ্নে বুঝতে পারছেন না, তবে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ কোনো একজনের, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। স্বপ্নের মধ্যে তাঁর মনে হলো, বিয়ে সম্ভবত তাঁর বড় মেয়ে শেফুর। কিন্তু মেয়ের বিয়েতে তো বরযাত্রী যায় না। তাহলে ঘটনাটা কী ? ঘটনাটা জানার জন্যে তিনি মনের ভেতর অস্থিরতা বোধ করলেন। এই অস্থিরতাতেই ঘুম ভাঙল। তিনি টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন, ভোর চারটা পঁচিশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আযান হবে। তিনি নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামলেন। অজু করে আযানের অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ অনুভব করলেন— তিনি সুখী একজন মানুষ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখী পরিতৃপ্ত একজন। আল্লাহপাক তাঁর প্রতি অসীম দয়া করেছেন।

তিনি দু'রাকাত শোকরানা নামাজ পড়লেন। অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, পরম করুণাময়, আমাকে তুমি অনেক করুণা করেছ। আমি তার শোকরানা

আদায় করি। দেশের আজ চরম দুঃসময়। আমার ছেলেমেয়েরা কেউ আমার পাশে ছিল না। তিনজন ছিল ঢাকায়, একজন কুমিল্লায়। তাদের তুমি নিরাপদে আমার কাছে এনে দিয়েছ। আল্লাহ, আমি তোমার শোকরগুজার করি।

তাঁর আরো কিছুক্ষণ নামাজের পাটিতে বসে থাকার ইচ্ছা ছিল। সেটা সম্ভব হলো না, তাঁর অতি আদরের পোষা হরিণ ইরা লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে নানানভাবে তাঁকে যন্ত্রণা করতে লাগল। শিং-এর গুঁতা, সার্ট কামড়ে ধরে পেছন দিকে টানার মতো কর্মকাণ্ড চলতে লাগল। বাধ্য হয়ে তিনি হরিণের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। যখন আশেপাশে কেউ থাকে না, তখন তিনি গলা নিচু করে হরিণের সঙ্গে গল্প করেন। আড়াল থেকে হরিণের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন শুনলে যে কেউ ভাববে, তিনি তাঁর ছয় ছেলেমেয়ের যে-কোনো একজনের সঙ্গে গল্প করছেন।

কিরে তুই চাস কী? সার্ট ছেড়ার মতলব করেছিস? ফোঁস ফোঁস করছিস কেন? তুই কি সাপ যে ফোঁস ফোঁস করবি? শান্ত হয়ে বোস আমার পাশে। গলা লম্বা কর। গলা চুলকে দেব। খবরদার চাটাচাটি করবি না। অজু ভেঙে যাবে।

হরিণের সঙ্গে গল্পগুজব শেষ করে তিনি খুরপি হাতে বাগানে কাজ করতে গেলেন। হরিণ ইরা গেল তাঁর সঙ্গে। বাগানে নানান ধরনের শীতের সবজি তিনি লাগিয়েছেন। তাদের পেছনে যত্নও কম করা হয় না। কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। অল্প কিছু টমেটো এবং কিছু ঢেঁরস হয়েছে। তিনি কয়েকটা টমেটো ছিঁড়ে হরিণকে খেতে দিলেন। হরিণ খাচ্ছে না। তাকে মনে হয় খেলার নেশায় পেয়েছে। সে নানান ভঙ্গিমায় লাফঝাঁপ করছে।

ভোর হয়েছে। ঘুম ভেঙে সবাই একে একে উঠতে শুরু করেছে। তিনি লক্ষ করলেন— তাঁর বড় ছেলে বাচ্চু টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে বারান্দার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। ছেলেটার এই অদ্ভুত স্বভাব— সবসময় হাঁটাহাঁটি। সে কি কোনো চিন্তার মধ্যে থাকে? তাঁর এই পুত্রের জন্ম এবং ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স চার্লসের জন্ম একই সময়ে একই দিনে। নিশ্চয়ই শুভক্ষণ। প্রিন্স চার্লসের জীবন এবং তার পুত্রের জীবন মিলিয়ে দেখতে হবে।

ছেলেকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। সে বাবাকে দেখে আড়ালে চলে গেছে। তিনি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। কোনো এক অজানা কারণে তাঁর সব পুত্রকন্যাই তাঁকে অসম্ভব ভয় পায়। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি হয় নি। ষোড়শ বর্ষেতু পুত্র মিত্র বদাচারেৎ। তাঁর পুত্র

মিত্র হয় নি। হলে ভালো হতো। দেশের অবস্থা নিয়ে পিতা-পুত্রের মিটিং হতো। ছেলের কাছে শুনতেন সে ঢাকায় কী দেখে এসেছে। তিনি বলতেন, পিরোজপুরে কী হচ্ছে। এই ছোট্ট মফস্বল শহরে অনেক কিছুই হচ্ছে। ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা এখানেও ঘটতে পারে। ট্রেজারিতে এক কোটি টাকার মতো আছে। পনেরোজন আর্মড ব্যাটালিয়ন পুলিশের একটা দল ট্রেজারি পাহারা দেয়। পুলিশের এই দল আসে বরিশাল থেকে। এক মাস থাকে। অন্য এক দল আসে, পুরনো দল ফিরে যায়। দীর্ঘদিনের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। আইনশৃঙ্খলা যে-দিন ভাঙবে সেদিন সবকিছু ভাঙবে। ট্রেজারি লুট হয়ে যাবে।

পিরোজপুর মহকুমার প্রধান ব্যক্তি সিএসপি মুহিবুল্লাহ। সাব ডিভিশনাল অফিসার। সিন্ধু প্রদেশের মানুষ। তার স্থান হবে কোথায়? যদি শত শত মানুষ এসে এসডিও'র বাংলো ঘেরাও করে বলে, এই পশ্চিম পাকিস্তানিটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও, তখন তিনি কী করবেন? তাঁর পুলিশ বাহিনী দিয়ে এসডিও মুহিবুল্লাহ সাহেবকে রক্ষা করবেন? না-কি একপাশে দাঁড়িয়ে দেখবেন কী করে অসহায় একজন মানুষকে ধরে নিয়ে যায়? তাঁর ভূমিকা কী হবে? পুলিশ বাহিনী কি তখন তাঁর কথা শুনবে? রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা যখন ভেঙে পড়ে, তখন তার প্রথম ধাক্কা এসে লাগে পুলিশ বাহিনীতে। কর্তৃত্ব ভেঙে পড়ে। তখন আর হুকুম চলে না। হুকুমবিহীন পুলিশ বাহিনী কোনো বাহিনী না।

এই অঞ্চলে অন্য এক ধরনের উপদ্রবও আছে। এই উপদ্রবের নাম নকশাল উপদ্রব। একদল ছেলে নকশাল নাম নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ডাকাতি করে বেড়ায়। এই দলের প্রধান ছেলেটির নাম ফজলু। সে তার দলবল নিয়ে গা ঢাকা দিয়েই ছিল। সুযোগ বুঝে সে দর্শন দিয়েছে। বিশেষ ভঙ্গিমায় প্রকাশ্যে হাঁটাহাঁটি করছে। তিনি গোপন খবর পেয়েছেন তার লক্ষ্য ট্রেজারির দিকে।

ফয়জুর রহমান সাহেব ক্ষেতের কাজ বন্ধ করলেন। হঠাৎ তাঁর খানিকটা অস্থির লাগছে। দিনের আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা বাড়তে শুরু করেছে। গত কয়েকদিন হলো এই সমস্যা তাঁর হয়েছে— বেলা বাড়তে থাকে, তাঁর অস্থিরতা বাড়তে থাকে। অস্থিরতা তীব্র হয় সন্ধ্যাবেলা। সন্ধ্যার পর থেকে অস্থিরতা আবার কমতে থাকে। এটা কি কোনো শারীরিক অসুখ? না-কি মনের সমস্যা? সরকারি হাসপাতালের সিভিল সার্জন সিরাজ সাহেবের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করলে হয়। তিনি প্রতিদিনই আসেন। যখন আসেন তখন আর অস্থিরতার বিষয়টা নিয়ে আলাপ করার কথা মনে থাকে না।

সিরাজ সাহেব অতি ভদ্রলোক, অতি সরল। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলেই এই ধরনের ভরসা পাওয়া যায়। মনে হয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মতো কিছু

ঘটে নি। ভদ্রলোকের শরীর যেমন ভারী গলার স্বরও ভারী। তিনি কথা বলেন গলা নামিয়ে। প্রতিটি শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করেন যে মনে গেঁথে যায়।

এসডিপিও সাহেব শোনেন, আপনি আমি অর্থাৎ আমরা যারা পিরোজপুরে মোটামুটি আন্দামানটাইপ জায়গায় পড়ে আছি তাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন? তারা আছে আল্লাহর খাস রহমতের তালিকায়। বুঝিয়ে বলি, পাকিস্তানি মিলিটারি মারামারি কাটাকাটি করতে থাকবে বড় বড় শহরে। তারা বিগ সিটি সামলাতেই এখন ব্যস্ত। তারপর যাবে ডিসট্রিক্ট লেভেলে, তারপর সাবডিভিশন। তার আগেই খেল খতম।

কীভাবে খেল খতম?

যা ঘটার ঘটে যাবে। হয় পাকিস্তান, না হয় বাংলাদেশ। মাঝামাঝি ধরনের কিছু হবার সম্ভাবনাও আছে। লুজ ফেডারেশন টাইপ। কিংবা ধরেন আমেরিকার মতো United States of Pakistan. সেখানে বাংলাদেশ একটা রাষ্ট্র, পাঞ্জাব একটা, সিন্ধু, বেলুচিস্তান... বুঝেছেন?

বোঝার চেষ্টা করছি।

পাকিস্তানিরা খুব মারামারি কাটাকাটি যে করতে পারবে তাও না। জাতিসংঘ আছে না? বড় বড় রাষ্ট্র আছে। রাশিয়ার পদগোর্নি যদি এক ধমক দেয় ইয়াহিয়ার পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যাবে। সেই পায়খানা বন্ধ করা ডাক্তারের সাধ্য না। বোতলের ছিপি ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নাই। আচ্ছা, মনে করেন কেউ কোনো ধমক ধামক দিল না, তারপরেও এক হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে এসে যুদ্ধ করা? যুদ্ধ এত সোজা? যুদ্ধ কি মামার বাড়ির উঠানে ডাংগুলি খেলা?

যত সহজ সমাধানের কথা আপনি বলছেন, তত সহজ আমার কাছে মনে হচ্ছে না।

আপনার কাছে জটিল মনে হচ্ছে?

জি।

আপনি তো ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ। কোরআন শরীফ বিশ্বাস করেন?

কী বলেন, কোরআন শরীফ বিশ্বাস করব না মানে?

পাক কোরআনে সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহপাক বলেছেন, 'আমি তোমাদের ভাগ্য তোমাদের গলায় হারের মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি।' কাজেই আমাদের কী হবে না হবে সব আগে থেকেই ঠিক করা। যা আগে থেকে ঠিক করা তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ আছে?

না, লাভ নেই। যা হবার তা হবে। তারপরেও আমরা নিশ্চয়ই হাত-পা কোলে নিয়ে বসে থাকব না।

কী করবেন ?

বিপদের জন্যে তৈরি হবো।

কীভাবে ? মিলিটারি আসবে মেশিনগান, রকেট লাঞ্চার নিয়ে, আর আপনারা যুদ্ধ করবেন একশ' বছরের পুরনো থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে ? ওদের আছে যুদ্ধের ট্রেনিং, আর আপনাদের ট্রেনিং হলো চোরের পিছনে দৌড় দেয়া। মাথা থেকে সব চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলুন। ভাবিকে ভালো করে চা বানাতে বলুন। চা খেতে খেতে গল্প করব। খামাখা দুশ্চিন্তা করে ব্লাড প্রেসার বাড়াবেন না। Do ফুর্তি।

ফয়জুর রহমান সাহেব বাগানে রাখা বালতিতে হাত ধুলেন। ইরা পেছনে পেছনে আসছে। পানি খেতে চায় হয়তো। তিনি বালতি নিচু করে ধরলেন। বালতিতে মুখ ঢুকিয়ে চুমুক দিয়ে পানি খাচ্ছে ইরা। গরু ভেড়া ছাগল সবাই চুমুক দিয়ে পানি খায়। অথচ কুকুর শ্রেণী পানি খায় জিভ ডুবিয়ে। এর মানে কী ? বড় ছেলেকে কি ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবেন ? সে দিনরাত বই পড়ে। এই প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই সে জানে। তাছাড়া এ ধরনের টুকটাক কথাবার্তা দিয়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবার পথ হয়তো তৈরি হবে। তিনি লক্ষ করলেন, বড় ছেলের হাতে চায়ের কাপ। সে চোখ বন্ধ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। এই অবস্থাতেই চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। এর মানে কী ? তিনি ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে গলাখাকাড়ি দিলেন। ছেলে চমকে তার দিকে তাকাল। ছেলের চোখ দেখেই মনে হচ্ছে সে ভয় পাচ্ছে। জড়সড় হয়ে গেছে। ভয় পাবার কী আছে ? তিনি বললেন, কী করছিস ?

কিছু না।

চোখ বন্ধ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছিস কেন ?

ছেলে জবাব দিল না। বিব্রত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বাবার সামনে থেকে চলে যেতে পারলে সে বাঁচে। অথচ তাঁর কিছুক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি বললেন, স্বরূপকাঠির একটা লোক আছে, তার না-কি জ্বীন সাধনা। সে ঘরের ভেতর জ্বীন নামাতে পারে। সেই জ্বীন কথা বলে। মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে। ভাবছি লোকটাকে আনাই। দেখি ঘটনা কী। আনাব ?

ছেলে আগ্রহের সঙ্গে বলল, জি আনান। কবে আনাবেন ?

ইচ্ছা করলে আজকেই আনা যায়। দেখি।

তিনি লক্ষ করলেন, উৎসাহ এবং উত্তেজনায় ছেলের চোখ চকচক করছে। ছেলে খুবই মজা পাচ্ছে। তিনি পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। তিনি বললেন, চোখ বন্ধ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ছিলি কেন ?

তাঁর ধারণা এইবার ছেলে প্রশ্নের জবাব দেবে। তাকে কিছুটা হলেও সহজ করা হয়েছে। তার ধারণা ঠিক হলো, ছেলে কথা বলতে শুরু করল। তিনি আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। ছেলের কথা বলার মধ্যে মাস্টার মাস্টার ভাব আছে। যেন সে ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছে। তাঁর এই ছেলে কি ভবিষ্যতে মাস্টার হবে ?

সূর্যরশ্মি মানুষের শরীরে ভিটামিন ডি তৈরি করে। চোখ বন্ধ করে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকলে চোখে ভিটামিন ডি তৈরি হয়। চোখ খোলা রাখা যাবে না, কারণ সূর্যরশ্মিতে আলট্রাভায়োলেট আছে। সেটা চোখের ক্ষতি করে।

আলট্রাভায়োলেট কী ?

ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো। হাই এনার্জি।

আমি গ্রামে দেখেছি, হিন্দু ব্রাহ্মণরা পুকুরে গোসলের সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পড়ে।

তারা সূর্যমন্ত্র পাঠ করে। সূর্যের উপাসনা। আমি মন্ত্রটা জানি।

তিনি বিস্মিত হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই সূর্যমন্ত্র জানিস ?

জানি। অং জবাকুসুম শংকাসং কাস্যপেয়ং মহা দ্যুতিং। ধ্বন্তারিং সর্ব পাপগনং প্রণত হোসমি দিবাকরম ॥

তিনি অবাক হয়ে বললেন, সূর্যমন্ত্র মুখস্থ করে বসে আছিস কেন ? তুই মুসলমানের ছেলে।

ছেলে লজ্জা পাচ্ছে। এই লজ্জা দেখতে ভালো লাগছে। আজ একদিনে অনেক কথা হয়ে গেছে। আরেকদিন জিজ্ঞেস করতে হবে, ছেলে এই মন্ত্র কেন শিখেছে ?

ফয়জুর রহমান সাহেব সকালের নাশতা শেষ করে পুলিশের পোশাক পরতে বসলেন। গত দু'দিন তিনি পোশাক পরেন নি। আজ পোশাক পরার বিশেষ কারণ আছে। কারণটা গোপন। কাউকেই এই বিষয়ে কিছু বলেন নি।

তাঁর অফিস নিজের বাসাতেই। এসডিপিও'র বাংলোর একটা কামরায় অফিস। খুবই পুরনো ব্যবস্থা। সিলিং-এ বিশাল এক টানা পাখা। সরকারি খরচে একজন পাংখাপুলার আছে। তার নাম রশীদ। ফয়জুর রহমান সাহেব চেয়ারে বসা মাত্র পাংখাপুলার রশীদ দড়ি ধরে টানতে শুরু করে। তিনি অবশ্যি বলে

দিয়েছেন পাখা টানতে হবে না। টেবিলফ্যান আছে। তারপরেও রশীদ নিয়মমতো কিছুক্ষণ পাংখা টানে। এই পাংখার বিষয়ে তাঁর ছেলেমেয়েদের খুব আগ্রহ আছে। একদিন দেখেছেন, তার মেজ মেয়ে শিখু পাংখার দড়ি ধরে ঝুলছে। হাতে টানা পাংখার ব্রিটিশ আমলের নিয়ম এখনো কেন এই জায়গায় চালু আছে ভেবে তিনি বিস্ময় বোধ করেন।

রশীদ!

জি স্যার।

দেশের অবস্থা কেমন ?

অবস্থা ভালো স্যার। চারদিকে 'জয় বাংলা'।

'জয় বাংলা'র বাইরে কিছু আছে ?

রশীদ চুপ করে আছে। 'জয় বাংলা'র বাইরে কিছু নিশ্চয়ই আছে। সেই কিছুটা সে এখন বলবে না। সময়মতো বলবে। রশীদ মাঝে-মাঝে তাঁকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর দেয়।

ঘাটে নৌকা আছে রশীদ ?

জি স্যার।

নৌকায় সুন্দর করে বিছানা করে রাখবে। কলসিতে পানি ভরে রাখবে। আমার ছেলেমেয়েরা যদি নৌকায় করে কোথাও যেতে চায়, তাদের নিয়ে যাবে।

জি স্যার।

মহকুমার পুলিশ প্রধান একটা সরকারি নৌকা পান। বড় নৌকা। নৌকার মাঝিরাও সরকারি কর্মচারী। ফয়জুর রহমান সাহেবের ছেলেমেয়েদের এই নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর খুব শখ। এই কাজটা তিনি কখনোই করতে দেন না। আজ নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন।

ফয়জুর রহমান সাহেব ঘড়ির দিকে তাকালেন। সকাল দশটা পঁচিশ। তিনি সাড়ে এগারোটা বাজার অপেক্ষা করছেন। সময় কাটছে না। টেবিলে অনেক ফাইল আছে। ফাইল দেখতে ইচ্ছা করছে না। টিএ বিল করা যায়। গত মাসের টিএ বিল করা হয় নি। তবে এখন টিএ বিল করা অর্থহীন। কে দেবে বিল ? তিনি ড্রয়ার খুলে দুশ' পৃষ্ঠার বাঁধানো খাতা বের করলেন। তিনি বেশ কিছুদিন হলো একটা রেডিও নাটক লেখার চেষ্টার করছেন। নাটকের নাম 'কত তারা আকাশে'। এই নামকরণের একটা ইতিহাস আছে। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শাহীন এক রাতে উঠানে বসেছিল। হঠাৎ সে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বলল, কত তারা আকাশে! তিনি ছেলের মুখে শুদ্ধ বাংলায় এই বাক্য শুনে মোহিত হলেন এবং ততক্ষণাৎ ঠিক করলেন, এই নামে একটা গল্প লিখবেন।

গল্প না লিখে রেডিও নাটক লেখারও ইতিহাস আছে। রেডিও পাকিস্তান ঢাকার সহকারী প্রোগ্রাম প্রডিউসার বাহারুল হক সাহেবের বাড়ি পিরোজপুর। তাঁর সঙ্গে ফয়জুর রহমান সাহেবের পরিচয় হয়েছে। বাহারুল হক সাহেব আশা দিয়েছেন, নাটক ভালো হলে রেডিওতে প্রচারের চেষ্টা করবেন।

ফয়জুর রহমান সাহেব গভীর মনোযোগে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত নাটক লিখলেন। কয়েকটা দৃশ্য বাদ দিলেন। নতুন যে দৃশ্যটি লিখলেন সেটি এতই আবেগময় যে লিখে শেষ করে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি চোখের পানি মুছে উঠে দাঁড়ালেন। রশীদ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। নতুন এসডিপিও সাহেবের অনেক ব্যাপারই তার কাছে অদ্ভুত মনে হয়। এই এসডিপিও সাহেব প্রায়ই কী যেন লেখেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো ঘটনা আছে। এই ঘটনা তার জানতে ইচ্ছা করে। জানতে চাইলেই তো আর জানা যায় না। সে সামান্য পাংখাপুলার। পুলিশের কর্তার মনের রহস্য জানার তার সুযোগ কোথায়?

এসডিও মুহিবুল্লাহ তাঁর বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেছিলেন। ফয়জুর রহমানকে আসতে দেখে তিনি ভুরু কুঁচকে তাকালেন। মহকুমা পুলিশ প্রধানের তাঁর কাছে আসার একটাই অর্থ— আইন-শৃঙ্খলাঘটিত কোনো সমস্যা হয়েছে। সমস্যা হবেই। সমস্যার সমাধান দেয়ার ক্ষমতা এখন তাঁর নেই। এসডিপিও'কে ফুল পুলিশ ইউনিফর্মে দেখেও তিনি খানিকটা বিস্মিত।

ফয়জুর রহমান সাহেব স্যালুট করলেন। মহিবুল্লাহ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত গলায় বললেন, Is anything wrong?

ফয়জুর রহমান বললেন, স্যার, আপনাকে পিরোজপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মহিবুল্লাহ চুপ করে রইলেন।

স্যার, আমি হুলারহাটে লঞ্চ রেডি করে রেখেছি। লঞ্চ আপনাকে বরিশালে নিয়ে যাবে। বরিশালে আপনি নিরাপদে থাকবেন। চেষ্টা করবেন বরিশাল থেকে ঢাকা চলে যেতে। সেখান থেকে নিজের দেশে।

বরিশাল যাবার পথেও তো আমাকে মেরে ফেলতে পারে।

ট্রেজারির পনেরোজন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন সেই লঞ্চে যাচ্ছে। তাদের আমি আপনার নিরাপত্তার বিষয়টি বলে দিয়েছি।

তারা আপনার কথা শুনবে?

জি স্যার, শুনবে।

কখন যাব ?

এখন।

আপনি এই চেয়ারটায় বসুন। আমি তৈরি হয়ে আসছি। আপনাকে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করব, জবাব ভেবে চিন্তে দেবেন।

স্যার, প্রশ্ন করুন।

আপনার লয়েলটি কোন দিকে ? পাকিস্তানের দিকে, না-কি বিদ্রোহীদের দিকে ?

অবশ্যই বিদ্রোহীদের দিকে!

তাহলে আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করছেন কেন ? আচ্ছা থাক, এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না।

হুলারহাট লঞ্চ টার্মিনালে ফয়জুর রহমান সাহেব মহকুমা প্রধানকে বিদায় দিলেন। মুহিবুল্লাহ লঞ্চে উঠার আগে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, You are a brother that I never had.

রাত নটা। কিছুক্ষণ আগে ফয়জুর রহমান সাহেব খবর পেয়েছেন মুহিবুল্লাহ ঠিকমতো বরিশাল পৌঁছেছেন। আজ রাতেই রকেট স্টিমারে তাঁর বরিশাল থেকে ঢাকায় রওনা দেবার কথা।

পিরোজপুরের রাস্তায় রাস্তায় জঙ্গি মিছিল। মিছিলের শ্লোগান— 'ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে আমরাও প্রস্তুত'। 'বিরুদ্ধে' শব্দটা বরিশালের বিশেষ উচ্চারণে হয়েছে 'ব্রুদ্ধে'। শুনতে অদ্ভুত লাগছে। মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অল্পবয়েসী নেতা আলি হায়দার খান। ফয়জুর রহমান সাহেবের সঙ্গে এই মানুষটির বিশেষ সখ্য আছে। প্রায় রাতেই মিছিল শুরুর আগে আগে তিনি এসডিপিওর বাংলোয় চা খেতে আসেন। সেখান থেকে যখন মিছিলে যান, তখন তাঁর সঙ্গে এসডিপিও সাহেবের দুই ছেলেও থাকে। তারাও মহাউৎসাহে 'ইয়াহিয়ার ব্রুদ্ধে আমরাও প্রস্তুত' শ্লোগান দেয়। তাদের হাতে থাকে বাবার ব্যক্তিগত পয়েন্ট টু টু বোরের একটা রাইফেল। একটাই রাইফেল দু'জন হাত বদল করে। রাইফেল হাতে ছেলেদের দেখে তাঁর মনে একই সঙ্গে আনন্দ হয় এবং শঙ্কাও হয়।

আজ এসডিপিও সাহেবের দুই ছেলে মিছিলে যাচ্ছে না। কারণ আজ তাদের বাসায় জ্বীন নামানো হবে। তাদের উৎসাহের কোনো সীমা নেই।

যে ব্যক্তি জ্বীন আনবেন তাঁর নাম কফিলুদ্দি। মধ্যবয়স্ক বলশালী একজন লোক। মুখভর্তি দাড়িগোঁফের জঙ্গল। ঘোলাটে চোখ। তার পরনে লুঙ্গি, গায়ে গাঢ় সবুজ রঙের পাঞ্জাবি।

কফিলুদ্দি একটা ঘরে সবাইকে নিয়ে বসাল। সেখানে জায়নামাজ পাতা। সে জায়নামাজে বসে বিভিন্ন সূরা বিশেষ করে সূরায়ে জ্বীন পাঠ করে জ্বীন সশরীরে উপস্থিত করবে। যখন জ্বীন আসবে তখন জ্বীনের সঙ্গে বেয়াদবিমূলক কোনো কথাবার্তা বলা যাবে না। জ্বীনকে প্রশ্ন করলেও করতে হবে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে। জ্বীনের উপস্থিতি অনুভব করা যাবে, তবে তাকে দেখা যাবে না। কারণ ঘর থাকবে অন্ধকার। ঘরে কোনো আলো জ্বালা যাবে না।

সবাই অজু করে অপেক্ষা করছে। ঘর অন্ধকার। কেউ তার নিজের হাতই দেখতে পাচ্ছে না এমন অবস্থা। কফিলুদ্দি একমনে সূরা পড়ে যাচ্ছে। তার গলার স্বর ভারী। সে কেরাত পড়ছে বিশেষ ভঙ্গিমায়। হঠাৎ কী যেন হলো, ঘরের মাঝখানে থপ করে শব্দ। যেন ছাদ থেকে কেউ লাফিয়ে মেঝেতে নামল। মেঝেতে সে ব্যাঙের মতো থপথপ শব্দ করে হাঁটছে। কফিলুদ্দি তখনো কেরাত পড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় জ্বীন বলল, আসসালামু আলায়কুম। আমি আসছি।

ভয়াবহ অবস্থা। বসার ঘরে বাইরের লোক বলতে কফিলুদ্দি একা। জ্বীন সেজে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশের প্রশ্নই ওঠে না। অথচ কফিলুদ্দিনের কোরআন পাঠ এবং জ্বীনের কথাবার্তা একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে। সে যে থপথপ করে ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যাচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে সাপের শিসের মতো তীব্র শিসের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

এসডিপিও সাহেবের মেজ ছেলে জাফর ইকবাল ভয়ে ভয়ে বলল, আপনি কোথায় থাকেন?

জ্বীন বলল, আমি থাকি কোহ্‌কাফ নগরে।

বাংলাদেশ কি স্বাধীন হবে?

কোনোদিন হবে না।

স্বাধীন কেন হবে না?

আমরা সব জ্বীন একত্র হয়ে পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

জ্বীন আরো কিছু প্রশ্নের জবাব দিল। সবার মাথায় হাত রেখে দোয়া করল এবং বলল, সে আর বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারবে না। কারণ তার চলে যাবার সময় এসেছে। পাকিস্তানের তরক্কির জন্যে জ্বীন সমাজে আজ বিশেষ দোয়া হবে। তাকে সেই দোয়ায় সামিল হতে হবে।

ফয়জুর রহমান সাহেব এবং তার স্ত্রী দু'জনই জ্বীন যে সত্যি এসেছিল— এই বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন। কফিলুদ্দিকে ভালো বখশিশ দিয়ে বিদায় করা হলো। জ্বীন নামানোর এই অদ্ভুত কর্মকাণ্ড তাঁরা কেউই আগে দেখেন নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না— এই ভয়ঙ্কর কথা যদি জ্বীন না বলত, তাহলে জ্বীন অনুভবের আনন্দ ষোল আনা হতো। জাফর ইকবাল বলল, দেশ স্বাধীন অবশ্যই হবে। কারণ জ্বীন আসে নাই। জ্বীনের সব কথাবার্তা আমি টেপ রেকর্ডারে টেপ করেছি। জ্বীন যদি সত্যি আসত, সে দেখত যে আমি এই কাণ্ড করছি। তখনই সে রেগে যেত। সমস্তই কফিলুদ্দির কারসাজি।

ফয়জুর রহমান সাহেব তাঁর মেজ ছেলের সাহস দেখে চমৎকৃত হলেন। সে এক ফাঁকে জ্বীনের কথাবার্তা রেকর্ড করে ফেলেছে। এই চিন্তা তো তার নিজের মাথায় আসে নি। তাঁর জন্যে আরো বড় চমক অপেক্ষা করছিল। তাঁর বড় ছেলে জ্বীনের কথাবার্তার রেকর্ড বাজিয়ে পুরোটা শুনে জ্বীন যে আসে নাই সে বিষয়ে কঠিন প্রমাণ উপস্থিত করল। জ্বীন কথাবার্তার এক পর্যায়ে পুরোপুরি বরিশালের ভাষায় বলেছে 'পরথম'। তার যুক্তি হচ্ছে, যে জ্বীন থাকে কোহকাফ নগরে সে বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় 'প্রথম'কে 'পরথম' বলবে না।

'দেশ স্বাধীন হবে না' জ্বীনের এই কথায় মন খারাপ করার কোনোই কারণ নেই। কারণ জ্বীন আর কেউ না, কফিলুদ্দি নিজে।

ফয়জুর রহমান সাহেব তাঁর ছেলেদের সাহস এবং বুদ্ধিতে অত্যন্ত প্রীত হয়ে সেই রাতে ঘুমুতে গেলেন। তাঁর মনে হলো এরকম ছেলেমেয়ে যার আছে তার চিন্তিত হবার কিছু নেই। যে-কোনো বিপদ এরা সামাল দিতে পারবে। তিনি ঘুমুবার জন্যে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন। কী মনে করে বিছানা থেকে উঠলেন। অজু করে তাহাজ্জুতের নামাজ পড়তে গেলেন।

নামাজে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কড়া নড়ল। অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে কেউ একজন কড়া নাড়ছে। কড়া নাড়ার ভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে। ভয়ঙ্কর কিছু না ঘটলে রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে এসডিপিওর বাংলোর কড়া কেউ এইভাবে নাড়বে না।

তিনি এখন কী করবেন ? নামাজ শেষ করবেন ? না-কি কে কড়া নাড়ছে সেই খোঁজ করবেন ? তাঁর উচিত আগে নামাজ শেষ করা। যে কড়া নাড়ছে তার তর সইছে না। সে কড়া নেড়েই যাচ্ছে। কড়া নাড়ার শব্দে ফয়জুর রহমান সাহেবের স্ত্রী আয়েশার ঘুম ভেঙেছে। তাঁর বড় মেয়ে সুফিয়ার ঘুম ভেঙেছে। দু'জনই ভীত মুখে বিছানা থেকে নেমেছে।

তিনি নামাজের পাটি থেকে নেমে পড়লেন। অসম্ভব খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে সবাই যাচ্ছে। কখন কী ঘটে যায় কিছুই বলা যায় না। আগে খোঁজ নেয়া দরকার।

কড়া নাড়ছেন পিরোজপুর সদর থানার ওসি। তার সঙ্গে আছেন সেকেন্ড অফিসার। ফয়জুর রহমান সাহেব দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওসি নিচু গলায় বলল, স্যার, থানায় যেতে হবে।

কী হয়েছে ?

ওয়্যারলেসে জরুরি ম্যাসেজ দেবে। আপনার সঙ্গে কথা বলবে।

কে দিচ্ছে জরুরি ম্যাসেজ ?

সেটা কিছু বলে নাই, তবে মনে হয় মিলিটারি হাইকমান্ড। তবে পুলিশ হেড কোয়ার্টারও হতে পারে।

ফয়জুর রহমান সাহেব অতি দ্রুত লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরলেন। শার্ট গায়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী ভীত মুখে বললেন, কোথায় যাচ্ছ ?

থানায় যাচ্ছি।

কেন ?

পরে বলব। পরে।

ছেলেদের কাউকে সাথে নিয়ে যাও। ওদের ডেকে তুলি ?

কাউকে ডাকতে হবে না। খামাখা ভয় পেও না। ভয় পাবার মতো কিছু হয় নাই।

ওয়্যারলেস ম্যাসেজ এসেছে ঢাকার পুলিশ সদরদপ্তর থেকে। আইজির বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে। ঢাকার অবাঙালি ওয়্যারলেস অপারেটর জানাল— 'দেশের সব জেলা মিলিটারির দখলে আছে। সাবডিভিশন এবং থানা লেভেলেও মিলিটারি অতি দ্রুত অভিযান শুরু করবে। পুলিশ বাহিনীকে জানানো যাচ্ছে, তারা যেন সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা করে। তারা দেশের আইনশৃঙ্খলা দেখবে এবং দেশের মঙ্গলের জন্যে সামরিক বাহিনীর নির্দেশ পালন করবে।'

ফয়জুর রহমান ম্যাসেজ নিলেন। ওসি সাহেব বললেন, স্যার আমরা কী করব ? ওসি সাহেবের মুখ দুশ্চিন্তায় ছোট হয়ে গেছে। তিনি রীতিমতো ঘামছেন।

ফয়জুর রহমান বললেন, পুলিশ সবসময় থেকেছে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে। এখানো আমরা তাই করব। দেশের মানুষের সঙ্গে থাকব।

যারা থাকতে চায় না, তারা কী করবে ?

তাদেরটা তারা জানে।

আপনি কোনো নির্দেশ দেবেন না?

না। পুলিশের কমান্ড ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় নির্দেশ চলে না।

পুলিশ বাহিনীর কেউ যদি দেশে চলে যেতে চায়, তাহলে কি চলে যাবে?

হ্যাঁ যাবে।

ফয়জুর রহমান সাহেব হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছেন। এই শহরে কোনো স্ট্রীট লাইট নেই। কোনো বাড়িতেও আলো জ্বলছে না। তবে আকাশে চাঁদ আছে। চাঁদের আলোয় পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছে না। হঠাৎ তাঁর কাছে মনে হলো, জোছনার গ্রামের চেয়ে জোছনার শহর অনেক সুন্দর।

তিনি থমকে দাঁড়ালেন। বেশ কিছু সময় জোছনা অনুভব করলেন। আবার যখন হাঁটতে শুরু করলেন, তখন লক্ষ করলেন দূর থেকে কেউ একজন তাকে অনুসরণ করছে। তিনি যখন দাঁড়িয়ে যান, সেও দাঁড়ায়। তিনি হাঁটতে শুরু করলে সেও হাঁটে। ব্যাপারটা কী?

কে ওখানে, কে?

যে অনুসরণ করছিল সে থেমে গেল। ফয়জুর রহমান সাহেব পুলিশি গলায় ডাকলেন, কাছে আসো।

ভীত পায়ে মাথা নিচু করে কেউ একজন আসছে। কাছাকাছি এসে দাঁড়াবার পর তাকে চেনা গেল। পাংখাপুলার রশিদ।

ফয়জুর রহমান সাহেব হাঁটতে শুরু করলেন। রশিদ পেছনে পেছনে মাথা নিচু করে আসছে। রশিদের এই এক অভ্যাস— তিনি যেখানে যান রশিদ তাকে অনুসরণ করে, যত রাতই হোক। এর কোনো ব্যতিক্রম হয় না।

অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা ফয়জুর রহমান সাহেবের হঠাৎ মনে পড়ল। স্বপ্নে তিনি বরযাত্রী যাচ্ছিলেন। সেখানেও তাঁর পেছনে ছিল রশিদ। বাস্তবের অনুসরণকারী স্বপ্নেও ছিল।

রশিদ!

জি স্যার।

বিয়ে করেছ?

জি-না স্যার।

পরিপূর্ণ জোছনায় দু'জন হাঁটছে। ফয়জুর রহমান সাহেবের হঠাৎ মনে হলো— স্বপ্নদৃশ্যেও আকাশে জোছনা ছিল। বরযাত্রী চাঁদের আলো গায়ে মাখতে মাখতে এগুচ্ছিল।

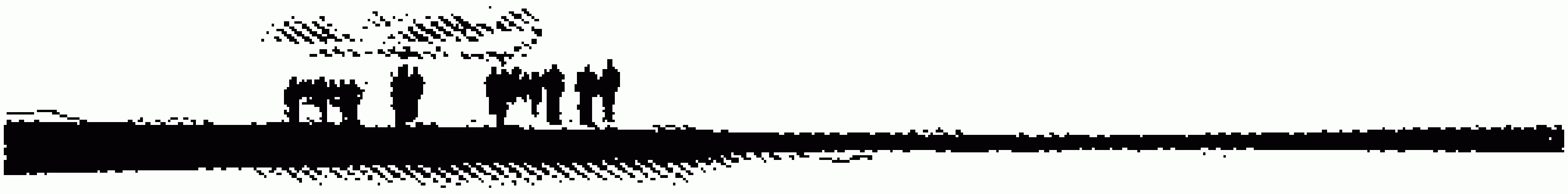

জেনারেল টিক্কা খান আজ চোস্ত পায়জামার সঙ্গে মিলিয়ে হালকা ঘি কালারের পাঞ্জাবি পরেছেন। পায়ে পরেছেন কাবুলি চপ্পল। পাঞ্জাবির উপর নকশাদার কাশ্মিরী কটি পরেছিলেন। কটির লাল, হলুদ এবং কড়া সবুজ রঙ বেশি কটকট করছিল বলে কটি খুলে ফেলেছেন। কানের লতিতে সামান্য আতর দিয়েছেন। আতরের নাম মেশকাতে আম্বর। তাঁর ফুপাতো ভাই এই আতর সৌদিআরব থেকে পাঠান। আতরের কড়া গন্ধ তাঁর ভালো লাগে না। তবে আজ খারাপ লাগছে না। মেজাজে সামান্য ফুরফুরে ভাব চলে এসেছে। আগামী দু'ঘণ্টা তাঁকে এই ফুরফুরে ভাব ধরে রাখতে হবে।

আজ তাঁর জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে দুটি কেক আনা হয়েছে। দুটি কেকের উপর উর্দুতে লেখা 'জিন্দা পাকিস্তান'। অর্ডার দিয়ে বানানো এই দু'টা কেক আজ রাতে দুই দফায় কাটা হবে। প্রথম দফায় কাটবেন ঢাকা শহরের কিছু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আছেন, কবি-সাহিত্যিক আছেন, শিল্পী আছেন, ফিল্ম লাইনের কিছু লোকজন আছেন। তাদের সময় দেয়া হয়েছে সন্ধ্যা সাতটা। গাড়ি যাবে, তাদের নিয়ে আসবে। অনুষ্ঠান শেষে গাড়ি তাদের পৌঁছে দেবে।

অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা যখন করা হয়, তখন তার এডিসি ইসমত খান বলেছিল, কেউ আসবে না। টিক্কা খান বলেছেন, যাদের দাওয়াত করা হবে, তারা সবাই আসবে। কেউ বাদ যাবে না।

ইসমত খান তারপরেও বলল, স্যার, মনে হয় না কেউ আসবে।

টিক্কা খান বললেন, বাজি ধরতে চাও? এসো তোমার সঙ্গে ছোট একটা বাজি হয়ে যাক।

এডিসি বলল, বাজি রাখলে আপনি হেরে যাবেন। কারণ আমার বাজির ভাগ্য খুব ভালো। আমি সবসময় বাজিতে জিতি।

চলো দেখা যাক। If you win you get a big fruit basket. কেন তুমি উইন করবে না শুনতে চাও?

If you please.

ইন্টেলেকচুয়ালস আর কাউয়ার্ডস। শেকসপিয়ার বলে গিয়েছেন, cowards die many times before their death. তারা সবাই মৃত। মৃতদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই। বুঝেছ?

চেষ্টা করছি।

জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তারা মাটি চাটবে। দু'একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যে-কোনো নিয়মেই কিছু ব্যতিক্রম থাকে। ভালো কথা, আমি গায়ে যে আতর দিয়েছি, তার গন্ধ তোমার কাছে কেমন লাগছে?

কড়া।

ওয়াটার কালারের মতো হালকা টান না। তেলরঙের কঠিন ব্রাসের টান। ঠিক বলেছি?

ইয়েস স্যার।

যুদ্ধাবস্থায় ওয়াটার কালার থাকে না। তখন সবই তেলরঙ। সেই অর্থে আতরটা মানিয়ে যাচ্ছে।

ইয়েস স্যার।

অতিথিরা সময়মতো এসে পড়লেন। তারা ভীত। তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গি, বসার ভঙ্গি— সব কিছুর মধ্যেই জবুথবু ভাব। তাদের নিঃশ্বাস ফেলার ভঙ্গিও বলে দিচ্ছে তারা ঠিকমতো নিঃশ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছেন। সবাই মেরুদণ্ড সোজা করে বসেছেন। ভীত মানুষ মেরুদণ্ড সোজা করে বসে। তখন তাদের স্নায়ু টানটান হয়ে থাকে।

জেনারেল টিক্কা বললেন, আপনারা আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্যে কষ্ট করে এসেছেন, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনাদের কাউকে কাউকে আমি চিনি, সবাইকে চিনি না। আপনারা যদি নিজের পরিচয় দেন, তাহলে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করব। না না, উঠে দাঁড়াতে হবে না। বসে বসে বলুন। Please.

আমি ডঃ ...। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক।

Thank you sir, thank you for coming.

আমি ডঃ ...। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।

Thank you sir, thank you for coming.

আমি ... । আমি একজন কবি।

I am honoured to meet a poet.

পরিচয়পর্ব শেষ হতে সময় লাগল, কারণ জেনারেল টিক্কা সবার সামনেই কিছুক্ষণ দাঁড়াচ্ছেন। ভদ্রতার হাসি হাসছেন। কারো কারো সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। একজনের সঙ্গে কোলাকুলিও করলেন। পরিচয়পর্ব শেষ হবার পর জেনারেল সুন্দর একটা ভাষণ দিলেন। ভাষণটা পুরোপুরি ইংরেজিতে দেয়া হলো।

> আমার মতো সামান্য একজন সৈনিকের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আপনাদের মতো গুণী-জ্ঞানীরা যে এসেছেন তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার জন্যে আজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন। এই দিনে পাঞ্জাবের এক অখ্যাত দুর্গম গ্রামে আমার জন্ম হয়। জন্মদিন পালন করার মতো হাস্যকর ছেলেমানুষি করা কোনো সৈনিকের শোভা পায় না। আমি এই ছেলেমানুষিটা করছি মূলত আপনাদের কাছে পাওয়ার একটি অজুহাত হিসেবে।
>
> আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, দুষ্কৃতকারীদের সব চক্রান্ত আমরা গুড়িয়ে দিয়েছি। দুষ্কৃতকারীদের পেছনে আছে বেঈমান আওয়ামী লীগ। এক বেঈমানকে সাহায্য করবে অন্য বেঈমান। আওয়ামী লীগকে সাহায্য করছে বেঈমান হিন্দুস্তান। আমরা এখন প্রস্তুত হচ্ছি বেঈমান হিন্দুস্তানকে শায়েস্তা করার জন্যে। আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যেই শায়েস্তা হয়েছে। বড় শয়তান খাঁচায় ঢুকে গেছে। আমরা আমাদের সুবিধামতো সময়ে বড় শয়তানটাকে খাঁচা থেকে বের করব। তাকে নিয়ে আমাদের ইন্টারেস্টিং পরিকল্পনা আছে।
>
> স্বাধীন বাংলা বেতার নামে হিন্দুস্তানের আকাশবাণীর একটি শাখা এতদিন প্রচার করছিল— শেখ মুজিব বিদ্রোহীদের সঙ্গে থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আশা করি, আমার ভাষণের পর এই বিষয়ে আপনাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না। আগামীকালের সংবাদপত্রে করাচি এয়ারপোর্টে বসে থাকা শেখ মুজিবের একটি ছবি ছাপা হবার কথা।

আমি আমার বক্তৃতার শেষপর্যায়ে চলে এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেক কাটা হবে। তারপর আপনারা আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাবেন। আপনাদের সবার জন্যে সামান্য কিছু উপহারও আছে। Fruit basket. ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে Say it with flowers. আমি প্রবচনটা সামান্য বদলেছি। আমি বলছি Say it with fruits.

আপনারা সবাই পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করবেন। বেঈমানদের কথায় প্রতারিত হবেন না। দেশে যুদ্ধাবস্থা চলছে। যুদ্ধাবস্থায় আমাদের কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে আমাদের কঠিন অবস্থা নিতে বাধ্য করা হয়।

কেক কাটা হলো। কেকের এক কোনায় সবুজ রঙের বড় সাইজের একটা মোমবাতি। জেনারেল টিক্কা বললেন, I am making a wish. বলেই চোখ বন্ধ করলেন। চোখ বন্ধ অবস্থায় ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে বললেন, আমার wish ছিল শান্তি ও ফ্রেন্ডশিপের। আসুন কেক খাওয়া যাক। উনি নিজেই সবার হাতে কেক তুলে দিলেন। উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা জেনারেলের ভদ্রতায় মোহিত হলেন।

পরবর্তী আধঘণ্টা জেনারেল নানান গল্পগুজব করলেন। কচ্ছের রান এলাকায় তিনি জেভলিন দিয়ে একটা বন্য শূকরী মেরেছিলেন সেই গল্প। অতিথিদের একজন কচ্ছের রান মরুভূমিতে বন্য শূকর আছে কিনা সেই সন্দেহ প্রকাশ করায় তাৎক্ষণিকভাবে ফটো অ্যালবাম এনে বন্য শূকরীসহ তার ছবি দেখালেন।

যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে কিছু কথাও হলো। তিনি ইতিহাসের অধ্যাপককে বললেন, পৃথিবীর প্রধান যুদ্ধবিশারদ হলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। পবিত্র কোরআন শরিফে যে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের নাম আছে, তা কি আপনি জানেন?

ইতিহাসের অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে বললেন, জানি না স্যার।

আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের নাম আছে। তাঁকে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে জুলকারনাইন নামে।

জেনারেলের কথাবার্তায় সবাই চমৎকৃত এবং বিস্মিত। তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতায়ও মুগ্ধ। ইনি যে মোটামুটি ভয়াবহ একজন মানুষ এবং 'বালুচিস্তানের জল্লাদ' নামে খ্যাত— সেটা কারোর মনেই রইল না। জেনারেল সবাইকে নিজে উপস্থিত থেকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় দফা মিটিং শুরু হলো পুলিশের উপরের দিকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে। আইজি ছিলেন না। তিনজন ডিআইজি এবং দু'জন এআইজি। এদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই বাঙালি। জেনারেল তাদের জন্যে দ্বিতীয় কেকটি কাটলেন। প্রথম দফায় তিনি যা যা করেছেন এবং বলেছেন তার সবই আবারো করলেন। কোনো কিছুই বাদ পড়ল না। কচ্ছের রানে বন্য শূকরী শিকারের গল্পটাও করলেন। এইবার অবশ্যি মরুভূমিতে বন্য শূকরী পাওয়া যায় কি যায় না— এই নিয়ে কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ করল না। তারপরেও তিনি মৃত শূকরীর পাশে বর্শা হাতে তার দাঁড়িয়ে থাকার ছবি দেখালেন। বাঙালি পুলিশকর্তাদের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা হলো অল্প।

> কাজের কথা আমি সংক্ষেপে বলতে পছন্দ করি। আপনারা মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। আমি বাঙালি পুলিশের কাছ থেকে ৯৫ ভাগ লয়েলটি আশা করছি। তারা পাঁচ ভাগ লয়েলটি তাদের বাঙালি ভাইদের জন্যে রাখুক। এই পাঁচ ভাগ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আপনাদের কাজে সাহায্য করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশ কিছু পুলিশ অফিসার আসছেন। প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনীও আপনাদের সঙ্গে থাকবে। আপনাদের কিছু বলার আছে?

স্পেশাল ব্রাঞ্চের এআইজি বললেন, আমাদের কিছু বলার নেই স্যার।

জেনারেল বিরক্ত গলায় বললেন, সবার হয়ে আপনি কথা বলছেন কেন? আপনার কিছু বলার নেই, সেটা আপনি বলবেন। অন্যদেরও যে কিছু বলার নেই তা আপনি জানেন কীভাবে?

এআইজির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জেনারেল টিক্কা বললেন, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কথা আলাদাভাবে বলবে।

সবাই জানালেন, তাদের বলার কিছু নেই।

জেনারেল বললেন, আপনাদের সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়েছে। আপনারা যেতে পারেন। আপনাদের প্রতি আমার নির্দেশ— আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনারা পুলিশের শাসন কাঠামো ঠিকঠাক করবেন। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ পুলিশ বাহিনীর কর্মকাণ্ডের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখছে— এই তথ্যটা আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। আপনাদের প্রত্যেকের জন্যে একটা ফ্রুট বাসকেট রাখা হয়েছে। দয়া করে নিয়ে যাবেন। Good day officers.

জেনারেল ডিনার করতে গেলেন আর্মি অফিসার্স মেসে। তিনি সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ডিনার করবেন— এই খবর আগেই দেয়া ছিল। ডিনারের আয়োজন ব্যাপক। নৌ-বাহিনীর বাবুর্চি আব্দুল খালেককে এই উদ্দেশ্যেই আজকের রাতের খাবার তৈরির জন্যে কমিশন করা হয়েছে। 'জাফরান-মুরগি' নামের একটি আইটেম রান্নার ব্যাপারে তার খ্যাতি প্রবাদের মতো। বিশেষ আইটেমটি রান্না হয়েছে। গরুর মাংসের কাবাব রান্নার জন্যে মিরপুর এলাকা থেকে এক বিহারিকে আনা হয়েছে। সে মেসের বাইরে আগুন করে কাবাব তৈরি করছে। যারা কাবাব খেতে ইচ্ছুক, তাদের প্লেট হাতে কাবাবওয়ালার কাছে আসতে হচ্ছে। কাবাবওয়ালা আগুনগরম কাবাব তাদের প্লেটে তুলে দিচ্ছে।

মেসের বাইরে খোলা মাঠেও কিছু চেয়ার-টেবিল রাখা হয়েছে। অনেকে সেখানেও বসেছেন।

উত্তম খাদ্যের সঙ্গে পানের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান রেড ওয়াইন, রাশিয়ান ভদকা এবং ব্ল্যাক লেভেল হুইস্কি। কয়েক ধরনের বিয়ার আছে, তবে সবচেয়ে বেশি চলছে ভদকা। বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ কোনো একটা ড্রিংক ক্লিক করে। আজ ক্লিক করেছে ভদকা। সবাই দামি ব্ল্যাক লেভেল বাদ দিয়ে ভদকা টানছেন। শুধু জেনারেল টিক্কার হাতে রেড ওয়াইনের একটা গ্লাস। তিনি প্রথম গ্লাস রেডওয়াইন শেষ করেছেন। এখন আছেন দ্বিতীয় গ্লাসের মাঝামাঝি। আবহাওয়া মনোরম। গুমোট গরমের পর ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

বৃষ্টির কথা মনে আসায় জেনারেলের ভ্রু কুঞ্চিত হলো। বৃষ্টি ভালো জিনিস না। মনসুন এসে পড়ার অর্থ আর্মি চলাচলের সমস্যা। বিচিত্র এক দেশ— নদী, খাল, বিল, পানি। তিনি শুনেছেন সিলেটের দিকের বিশাল এক অঞ্চল নাকি বৃষ্টি নামলেই অতলে তলিয়ে যায়। যখন বাতাস বয়, তখন নাকি সেখানে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ঢেউ ওঠে। এসব এলাকা কব্জা করা সেনাবাহিনীর কর্ম না। নৌ-বাহিনীর ব্যাপার। জেনারেল এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে আবার গ্লাস ভর্তি করলেন। ওয়াইন খাবার নিয়ম এরকম না। ওয়াইন খেতে হয় হালকা চুমুকে। ঠোঁট ভিজল কি ভিজল না— এই ভঙ্গিতে। ভদকা-হুইস্কি এসব হলো ঢোল, খোল-করতাল, আর ওয়াইন হলো কোমল বাঁশি।

ব্রিগেডিয়ার শামস হঠাৎ লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভদকার গ্লাস উঁচু করে বললেন, জেনারেলের জন্মদিন উপলক্ষে চিয়ার্স। যারা বসেছিল তারা উঠে দাঁড়াল। একের পর এক টোস্ট হতে থাকল।

টোস্ট ফর পাকিস্তান।

টোস্ট ফর দ্য গ্রেট পিপল অব পাকিস্তান।

টোস্ট ফর দ্য লস্ট সোলজার্স।

আর্মি অফিসারদের পার্টি সাধারণত দ্রুত জমে যায়। এতকিছুর পরেও আজ পার্টি জমছে না। ক্যাটালিস্টের অভাবই কি এর মূল কারণ? আর্মি অফিসারদের রূপবতী বধূরা এইসব পার্টিতে থাকেন। তারাই ক্যাটালিস্ট। তারা পার্টি জমাবার অনেক কায়দা জানেন। অনেক ঢং করতে পারেন। আজকের পার্টি নারী বিবর্জিত।

কর্নেল জামশেদকে সবাই ধরে বসল ম্যাজিক দেখানোর জন্যে। ম্যাজিকের কিছু কলাকৌশল সবসময় তাঁর পকেটে থাকে। কিছু মুদ্রা, দড়ি কাটার খেলা দেখানোর জন্যে দড়ি এবং কাঁচি, এক প্যাকেট তাস, পিংপং বল। দেখা গেল আজ তিনি কিছুই আনেন নি। একজনের কাছ থেকে এক টাকার একটা মুদ্রা নিয়ে তিনি কয়েন ভ্যানিসিং দেখালেন। হাতের মুঠোয় কয়েন রাখা হচ্ছে। মুঠো খুলতে দেখা যাচ্ছে কয়েন নেই। কয়েন রাখা হলো ডান হাতের মুঠোয়, পাওয়া গেল বাম হাতের মুঠোয়।

কর্নেল জামশেদের হাত সাফাইর খেলাও জমছে না। পার্টি শেষ করা উচিত। যে পার্টি জমে না, তাকে দীর্ঘসময় চলতে দিলে শেষে নানান সমস্যা হয়। জেনারেল টিক্কা পার্টির সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। ছোট্ট একটা সমাপনী ভাষণও দিলেন। এই ভাষণটি দিলেন উর্দুতে।

> বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর অন্যতম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। এই বাহিনী দেশরক্ষার যে পবিত্র কর্তব্য নিয়ে নেমেছে, সে-কর্তব্য তারা এমনভাবে পালন করবে যে জাতির ইতিহাসে তা লেখা থাকবে। মূর্খ পূর্ব পাকিস্তানিদের আমরা বুদ্ধিমান বানিয়ে ছাড়ব। বুদ্ধিমান বানানোর এই প্রক্রিয়া এমনই কঠিন হবে যে কাঠিন্য সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। আমরা যুদ্ধাবস্থায় আছি। যুদ্ধাবস্থায় দয়া, মায়া, করুণা নামক মানবিক গুণগুলি মাটির নিচে তিন হাত গর্ত করে পুতে রাখতে হয়। আমরা সাত হাত গর্ত করে পুতে রাখব। মানবিক গুণাবলি মানুষদের জন্যে। পূর্ব পাকিস্তানিদের মতো সুবিধাবাদী, হিন্দুর পাছা চাটা 'বাহেনচোদ'দের জন্যে না।
>
> আমি ডেজার্ট ফক্স ট্যাংক সেনাপতি রোমেলের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এবং আপনাদের সবাইকে আগাম অভিনন্দন

> জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করছি। জেনারেল রোমেল মিশর এক্সপিডিসনের সময় বলেছেন— 'তুমি যখন শত্রুকে দয়া দেখাবে, তখন বুঝবে তুমি সৈনিক নও। তুমি শত্রুর বুকের উপর বেয়োনেট উঁচু করে ধরেছ। হঠাৎ শত্রুর করুণ মুখ দেখে তোমার মায়া হলো। তুমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বেয়োনেট নামিয়ে নিলে। শত্রু তখন তোমার করণীয় কাজটি নিজে সুন্দরভাবে সমাধা করবে। তার বেয়োনেট তোমার হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে দেবে।'

জেনারেল আর্মি মেস থেকে ফিরেছেন। ড্রাইভারকে সরিয়ে তিনি নিজেই স্টিয়ারিং হুইল ধরলেন। চমৎকার লাগছে গাড়ি চালাতে। ঢাকা শহর স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ভালো, খুব ভালো। পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভিতে এই স্বাভাবিকতার খবর পৌঁছে দিতে হবে। বিদেশী সাংবাদিকদের ডাকা হবে। তারা দেখবে একটি পরিচ্ছন্ন নগরী।

ঢাকার খবরের কাগজগুলি দু'পৃষ্ঠা করে বের হচ্ছে। এটা কাজের কথা না। পত্রিকা বের হবে পত্রিকার মতো। মেজর সিদ্দিক সালেককে বলতে হবে। এই দায়িত্ব ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স অফিসারের।

দৈনিক পাকিস্তান-এর সাহিত্যপাতায় শাহ্ কলিম-এর একটি গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে। রচনার শিরোনাম— 'শুদ্ধ প্রাণ পাকিস্তান'। পঁচিশে মার্চের পর সে নতুন একটা নামে লেখালেখি শুরু করেছে। তার বর্তমান নাম গোলাম কলন্দর। চেহারাও কিছু পাল্টেছে। দাড়ি, চুল দু'টাই বড় হয়েছে। বাবরি চুল মিলিটারিরা সন্দেহের চোখে দেখে বলে রাস্তায় বের হবার সময় সে মাথায় সুচের কাজ করা একটা রঙিন টুপি পরে। চোখে থাকে সানগ্লাস। সানগ্লাসটা তাকে এক পাকিস্তানি মেজর সাহেব (সিদ্দিক মালেক) উপহার দিয়েছেন। এই মেজর সাহেব প্রেস সেকশনের দায়িত্বে আছেন। তিনি মাঝে-মাঝেই পত্রিকা অফিসে উপস্থিত হন। কলিমউল্লাহর সঙ্গে মেজর সাহেবের ভালো খাতির হয়েছে। তার জিপে কলিমউল্লাহকে মাঝে-মাঝে দেখা যায়। মেজর সাহেব একদিন তাকে আর্মি মেসে দুপুরের খানা খেতে দাওয়াত করেছিলেন।

দুপুরের খানা খাবার পর কলিমউল্লাহ্ মেজর সাহেবকে বলেছে, পাকিস্তান রক্ষার জন্যে শরীরের শেষ রক্তের ফোঁটাটাও সে দেবে। যে রাতে পাকিস্তান রক্ষা পেল, সেই রাতে সে বিশ রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেছে। কিছু প্রাণহানী হয়েছে। কিছু নিরীহ মানুষও মৃত্যুবরণ করেছে। এটা হবেই। কিছু করার নাই। যে-কোনো মহৎ কাজের ধর্ম হলো, মহৎ কাজের সঙ্গে দু'একটা নোংরা কাজও হয়। আমরা দেখব মহৎ কাজটা।

মেজর সিদ্দিক সালেক কলিমউল্লাহকে একটা পাস দিয়েছেন। পাসটা কলিমউল্লাহর খুব কাজে লাগছে। কারফিউ চলার সময় পাস দেখিয়ে সে রাস্তায় নামতে পারে।

কলিমউল্লাহ মিরপুর এলাকায় তিন রুমের একটি বাসা ভাড়া করেছে। ভাড়া বলা ঠিক হবে না, সে বিনা ভাড়াতেই থাকছে। বাড়িওয়ালা ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেশের বাড়িতে চলে গেছেন। কলিমউল্লাহকে বলেছেন, কোনো ভাড়া দিতে হবে না। আপনি বাড়িটা দেখেশুনে রাখবেন। অনেক কষ্টে বাড়ি করেছি, হাতছাড়া যেন না হয়। গরিবমানুষ বড় কষ্টের পয়সায় বাড়ি। শুনেছি বিহারিরা বাড়িঘর নিয়ে নিচ্ছে।

কলিমউল্লাহ বলেছে, আপনি যে ফিকির থাকেন (তার কথাবার্তায় কিছু কিছু উর্দু শব্দ এখন ঢুকে পড়ছে।) এই বাড়ি কেউ নিতে পারবে না। আমি বিহারির বাবা। তাছাড়া বাড়ির গায়ে উর্দুতে লেখা থাকবে— ইহা মুসলমানের বাড়ি। কালো একটা তারা চিহ্নও থাকবে। এই চিহ্নটাই আসল। চিহ্ন দেখলে বিহারি মিলিটারি সবাই বুঝবে— সাচ্চা মুকাম। (আবার উর্দু। শুনতে খারাপ লাগে না।)

মিরপুরের এই বাড়িতে কলিমউল্লাহর দিনকাল খারাপ কাটছে না। বাচ্চু মিয়া নামে সে একজন বাবুর্চি রেখেছে। বাবুর্চির বয়স সতেরো-আঠারো। বাড়ি নেত্রকোনার রুয়াইলে। চাকরি নেবার সময় সে বলেছিল সব রান্না জানে— দেশী, মোগলাই, ইংলিশ। সে আগে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে কিছুদিন কাজ করেছিল বলে টুকটাক চাইনিজও জানে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, সে কোনো রান্নাই জানে না। তার সব তরকারির চেহারা রোগীর পথ্যের মতো। খেতেও রোগীর পথ্যের মতো। তবে তার সবচে' বড় গুণ হলো সেই খাবার মুখে দিয়ে সে-ই প্রথম চিৎকার করবে— আস্তাগফিরুল্লাহ, তরকারির কী অবস্থা! ভাইজান মুখে দেওন যায়? হলুদ খারাপ কিনেছি। হলুদের জন্যে এই অবস্থা। নতুন হলুদ কিনতে হবে।

নতুন হলুদ কেনার পরেও স্বাদ বা বর্ণের কোনো তারতম্য হয় না।

কলিমউল্লাহ আর কাউকে পাচ্ছে না বলে বাচ্চু মিয়াকে হজম করছে। শহরে লোক পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহর ফাঁকা। ২৭/২৮ তারিখের দিকে যারা পালিয়েছিল তারা ফেরে নি, বরং দফায় দফায় আরো লোকজন চলে যাচ্ছে। রেডিওতে অবশ্যি বলা হচ্ছে শহরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শীঘ্রই খুলে দেয়া হবে। ব্যাংকের কাজকর্ম চলছে। সরকারি অফিস-আদালত চলছে।

যারা দুষ্টলোকের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারা কাজে যোগদান করলে তাদের সাময়িক কর্মবিরতি ক্ষমা করা হবে।

লোকজন মনে হয় রেডিওর খবরে বিশ্বাস করছে না। তারা বিশ্বাস করছে গুজবে। কত ধরনের গুজব যে ছড়াচ্ছে তার কোনো মা-বাপ নেই। বাচ্চু মিয়া গুজব সংগ্রহ করে আনার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ। বাতাসে কোনো গুজব ভাসছে, বাচ্চু মিয়া সেই গুজব সংগ্রহ করে আনে নি এটি কখনো হবে না। একদিন ভোরবেলা সে উধাও হয়ে গেল। সারাদিন তার কোনো খোঁজ নেই। ফিরল রাত আটটায়। তার মুখভর্তি হাসি।

ভাইজান, বলেন দেহি ঘটনা কী হইছে? দুই 'মিলিট' সময়, দুই মিলিটের মধ্যে বলেন।

কলিমউল্লাহ বলল, তোকে আমি আর রাখব না। তুই চলে যা।

বাক্কু মিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল, না রাখলে নাই। কপালে যা আছে তাই ঘটব। কিন্তু আপনে কন দেখি আইজের ঘটনা। এক 'মিলিট' সময়। (বাক্কু মিয়ার 'ন' উচ্চারণে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মিনিট-কে সে বলবে মিলিট।)

কথা বলিস না, চুপ করে থাক।

ভাইজান, টিক্কা তো শেষ। শে-এ-এ-এ-এ-ষ।

কে শেষ?

টিক্কা। জেনারেল টিক্কা। চাইর গুলি খাইয়া উল্টাইয়া পড়ছে। বুনকা বুনকা রক্ত। মিলিটারির অবস্থা ছেড়াবেড়া। তারার কমান্ডারই নাই।

তোকে কে বলেছে?

বেবাক শহরের লোক জানে। যদি মিথ্যা বইল্যা থাকি, তাইলে আমি বাপের ঘরের না। আমি জারজ সন্তান। স্বাধীন বাংলা খুইল্যা শুনেন কী ডিক্লার দিছে।

সন্ধ্যার পর স্বাধীনবাংলা বেতার থেকেও এই খবর বলা হলো। জেনারেল টিক্কা নিহত। অসমর্থিত খবরে বলা হয়েছে, পূর্বপাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত। ঢাকা শহরে তুমুল উত্তেজনা। মিলিটারি সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায়।

বাক্কু মিয়া বলল, ভাইজান, এখন কী কন? গরিবের কথা বাসি হইছে বইল্যা ফলছে। আল্লাহ গরিব নাম দিয়া কী অদ্ভুত জাত বানাইছে। গরিবের টাটকা কথার উপরে বিশ্বাস নাই। বাসি কথার উপরে বিশ্বাস। এখন দেন দুইটা টেকা।

দু'টাকা দিয়ে কী করবি?

পোলাও-এর চাল কিনব, ঘি কিনব। আইজ মোরগপোলাও করব। আমি মোরগপোলাও রান্ধন শিখেছি মনা বাবুর্চির কাছে। একবার খাইয়া দেখেন। উস্তাদ আমায় বিরাট স্নেহ করতেন।

মনা বাবুর্চির স্নেহের শিষ্যের অতি অখাদ্য মোরগপোলাও খাবার সময়ই রেডিও ও টিভিতে জেনারেল টিক্কার ভাষণ প্রচারিত হলো। জেনারেল টিক্কা সশরীরে উপস্থিত হয়ে নতুন কিছু সামরিক নির্দেশ দিলেন। টিভিতে তাঁর মুখ হাস্যময়। যেন সামরিক নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি বড়ই আনন্দ পাচ্ছেন।

কলিমউল্লাহ বাক্কু মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কী হলো?

বাক্কু মিয়া বলল, ভাইজান এইটা আসল টিক্কা না। এইটা নকল। মিলিটারিরে বুঝ দেওনের জন্যে আনছে। আসলটা শেষ। এইটা মনে হয় তার

কোনো ভাই। ভাইয়ে ভাইয়ে চেহারায় মিল থাকে। আমার কথা যদি সত্যি না হয় তাইলে আমি বাপের ঘরের না, আমি জারজ সন্তান। মোরগপোলাও কেমন হয়েছে বলেন।

তুই বল কেমন হয়েছে।

অতি জঘন্য হয়েছে। ঘি ভালো ছিল না। ডালডার ভেজাল। ভেজাল ঘি দিয়া মোরগপোলাও আমার উস্তাদ মনা বাবুর্চিও পাকাবে না। লাখ টেকা দিলেও না।

চুপ থাক।

আচ্ছা যান। চুপ থাকলাম।

তুই তো রান্নার কিছুই জানিস না।

এইটা কী কইলেন ভাইজান! আমি ছিলাম মনা বাবুর্চির এক নম্বর এসিসটেন। ওস্তাদ আমারে নিজের সন্তানের চেয়ে অধিক স্নেহ করতেন। এখন যুদ্ধের সময় রান্ধনে মন বসে না বইল্যা কিছু হয় না।

যুদ্ধ তুই কই দেখলি?

আরে কী কন? ঢাকার বাইরে ধুরুম ধারুম, গুরুম গারুম সমানে চলতাছে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট খাবলা দিয়া ধরছে। মেজর জিয়া পাকিস্তান আর্মিরে কামড় দিয়া ধরছে। কচ্ছপের কামড়। জীবন যাবে কিন্তু কামড় ছাড়বে না।

চুপ থাক গাধা। কিছুই হচ্ছে না। যুদ্ধ যা হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতারে হচ্ছে, সবই ভুয়া যুদ্ধ।

বাচ্চু মিয়া আহত গলায় বলল, ভুয়া যুদ্ধ!

কলিমউল্লাহ পাইপ ধরাতে ধরাতে বলল (এই পাইপটাও সে মেজর সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। অবসর সময়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে পাইপ ধরাতে তার ভালো লাগে), শোন মন দিয়ে, যুদ্ধ হচ্ছে বেতারে। এই যুদ্ধে গোলাবারুদ লাগে না, শুধু লাগে গলার জোর। স্বাধীন বাংলা বেতার ভুয়া। তার সব খবর ভুয়া।

এইটা কী কন?

তারা খবর দিল শেখ সাহেব মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আছেন। আদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন। পরে পত্রিকার ছবি দেখলাম উনি করাচি এয়ারপোর্টে। তারা খবর দিল, সুফিয়া কামাল, ড. নীলিমা ইব্রাহিম মারা গেছেন। আমরা পত্রিকায় উনাদের ছবি দেখলাম। মাশাল্লাহ দু'জনেই ভালো আছেন। তারপর শুনলাম টিক্কা খান মারা গেছে। এখন তুই বল মারা গেছে?

অবশ্যই। যে টিক্কারে আপনে দেখছেন বিশ্বাস করেন ভাইজান, আপনের আল্লাহর দোহাই লাগে, এইটা নকল। আসলটা শেষ। আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, আমার মাথায় যেন ঠাডা পড়ে।

তুই যা আমার সামনে থেকে।

বর্তমান জীবনটা কলিমউল্লাহর বেশ ভালো লাগছে। থাকার জায়গার কোনো অসুবিধা নেই। এই বাড়ি তো আছেই, এ ছাড়াও থাকার মতো বাড়ি আছে। ঝিকাতলার যে বাড়িতে কলিমুল্লাহ প্রাইভেট টিউশনি করত, সেই ভদ্রলোক দেশে চলে যাচ্ছেন। তিনিও কলিমউল্লাহকে তার বাড়ি দেখাশোনা করতে বলেছেন। একটা চাবিও দিয়ে গেছেন। ঝিকাতলার বাড়িটা বড়। জিনিসপত্রে ঠাসা। কলিমউল্লাহ ঠিক করেছে, কোনো এক সময় ঐ বাড়িতে উঠবে। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে নেই। তাতে শিকড় গজিয়ে যায়। যারা গদ্য লেখে শিকড় গজানো তাদের সমস্যা হয় না। কবিদের জন্যে হয় সমস্যা। কবিদের শিকড় থাকতে হয় না। চলমান ছন্দের মতো কবিদেরও হতে হয় চলমান।

তাছাড়া অবসর সময়ে অন্যের বাড়ির জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে দেখতে তার ভালো লাগে। এখন যে বাড়িতে আছে সেই বাড়ির মূল শোবার ঘরের খাটের নিচে রাখা একটা ট্রাঙ্কের তালা খুলে সে খুবই আরাম পেয়েছে। অনেক টুকিটাকি জিনিস, চিঠিপত্র। ছবি। এর মধ্যে নায়লা নামের এক মেয়েকে লেখা কয়েকটা চিঠি আছে চূড়ান্ত অশ্লীল। নায়লার স্বামী নায়লাকে লিখেছে। এত অশ্লীল কোনো লেখা কলিমউল্লাহ আগে পড়ে নি। চিঠিগুলি সে নিজের সংগ্রহে রেখে দিয়েছে। ট্রাঙ্কের ভেতর দু'শ একুশ টাকা পাওয়া গেছে (হরলিকসের কৌটাতে মুখবন্ধ করে রাখা)। এরা টাকা ফেলে চলে গেল কেন কে বলবে? হরলিকসের কৌটাসহ টাকাটা কলিমউল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। এখান থেকে সে টুকটাক খরচ করছে। তার তেমন খারাপ লাগছে না।

ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে কলিমউল্লাহ হাঁটছে। হাইকোর্টের সামনের রাস্তা ধরে হাঁটা। সে যাবে *দৈনিক পাকিস্তান* অফিসে। তার পকেটে নতুন আরেকটি গদ্যরচনা। শিরোনাম—

মহাকবি ইকবাল

একুশে এপ্রিল ইকবাল দিবস। সেই দিবসে রচনাটা প্রকাশিত হবে। বিশেষ বিশেষ দিবসের জন্যে লেখা পাওয়া দুষ্কর। এই লেখাও যাচ্ছে গোলাম কলন্দর নামে। গোলাম কলন্দর নামটা ভালো পরিচিতি পাচ্ছে। ইংরেজি পত্রিকাগুলিতে

কিছু লেখা দিতে পারলে ভালো হতো। কলিমউল্লাহর ইংরেজি একেবারেই আসে না। পেসিভ ভয়েস, একটিভ ভয়েস, টেন্স বড়ই ঝামেলার জিনিস।

হাঁটতে কলিমউল্লাহর ভালো লাগছে। প্রায় ফাঁকা রাস্তা। যারা হাঁটছে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাঁটছে।

আগে রিকশাওয়ালারা রিকশা চালাবার সময় প্রয়োজন না থাকলেও টুং টাং করত। এখন টুং টাং বন্ধ। বেশিরভাগ রিকশাই খালি। যাত্রী নেই। আগে কাজ না থাকলেও লোকজন রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করত, এখন তা না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কেউ পথে নামছে না।

দেয়াল, বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোথাও চিকা মারা নেই। সামরিক নির্দেশে সব তুলে ফেলা হয়েছে। গভীর রাতে চিকামারা পার্টি এসে চিকা মেরে যাবে সেই উপায় নেই। রাত ন'টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ। পথে কাউকে দেখা গেলেই গুলি।

কলিমউল্লাহ সিগারেট ধরাল। হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর। এত স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করলে স্বাস্থ্য থাকে না। কোনো কিছু নিয়েই বাড়াবাড়ি করতে হয় না। হাইকোর্টের বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী সাহেবের কথাই ধরা যাক। উনি এমনই কঠিন লোক যে জেনারেল টিক্কাকে গভর্নর হিসাবে শপথ নেওয়াতে রাজি হলেন না। 'জয় বাংলা, জয় সিদ্দিকী' স্লোগান পর্যন্ত হয়ে গেল। সেই তিনি এখন সোনামুখ করে জেনারেল টিক্কাকে শপথ পাঠ করিয়েছেন।* বল হরি হরি বল। আয় বাবা দেখে যা, দু'টি সাপ রেখে যা।

ঢাকা এখন ঠিক আছে। ঢাকায় কোনো সমস্যা নেই। কোথাও প্যাঁ পোঁর ভাব হলেই হেলিকপ্টার বোমা ফেলে আসছে। বোমারু বিমানও আছে। কোদাল খুন্তি নিয়ে যে বাঙালি দেশ স্বাধীন করে ফেলবে বলে ঠিক করেছিল, সেই বাঙালি আসমানী বালা মসিবতের কথা ভাবে নি। তাদের ফ্যাড়ফ্যাড়ানি বন্ধ। এখন বসে বসে আরবি হরফে বাংলা লেখা শিখ। ইয়াহিয়ার বিশেষজ্ঞ কমিটি সুপারিশ দিয়েছে— আরবি হরফে বাংলা লেখার। কী মজা! কী মজা! বে জবর বা, নুন লাম আলিফ জবর লা। বানলা। মজা হচ্ছে না?

দৈনিক পাকিস্তান-এর সামনে এসে কলিমউল্লাহ শান্তি মিছিলের সামনে পড়ল। শান্তি মিছিল চলে ট্রাকে। তাদের শহরের নানান জায়গায় ঘুরতে হয়। হেঁটে এত জায়গা কাভার করা যাবে না। শান্তির দূতদের দিকে কলিমউল্লাহ আগ্রহ করে তাকাচ্ছে। এদের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভালো। বিপদে কাজে আসবে। সবাইকে চেনা যাচ্ছে না। খান-এ-সবুর আছেন, খাজা খয়েরউদ্দিন,

* শুধু জেনারেল টিক্কা না। গভর্নর মালেক এবং তার মন্ত্রীসভার শপথবাক্যও তিনিই পাঠ করান। —লেখক

গোলাম আযম, বেনজির আহমদ। কলিমউল্লাহর মনে হলো— বাংলাদেশ যদি কোনোদিন (সম্ভাবনা নেই, তবু কথার কথা) স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে এদের কী হবে? শান্তির এই কপোতরা কি তখনো শান্তির বকম বকম করবেন?

কলিমউল্লাহকে দেখে *দৈনিক পাকিস্তান* অফিসে প্রায় অস্পষ্ট এক ধরনের উত্তেজনা দেখা গেল। দারোয়ান টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিল। অফিসে ঢোকার মুখে ছাপাখানার একজন বললেন, কলিম ভাই, কেমন আছেন? গতকাল আপনাকে দেখি নাই। শরীর খারাপ ছিল? আমাদের এখান থেকে এক কাপ চা খেয়ে যান।

এই খাতিরের কারণ মেজর সাহেবের সঙ্গে ঘোরাঘুরি। সূর্যের কাছাকাছি যারা থাকে তারাও আলো বিচ্ছুরণ করে। কলিমুল্লাহ ইকবাল-বিষয়ক রচনাটা জমা দিয়ে চা নিয়ে বসল। পত্রিকা অফিসের চা সবসময় ভালো হয়। প্রথম কাপ শেষ করার পর দ্বিতীয় কাপ খেতে ইচ্ছা করে।

কলিম ভাই, কেমন আছেন?

ক্যাশিয়ার সাহেব মনে হয় কোনো কাজে ঢুকেছিলেন। কলিমউল্লাহকে দেখে থতমত খেয়ে গেলেন। তাঁর চোখে স্পষ্ট ভীতি। ভয়ের চোখে তাকে কেউ দেখছে— বাহ, ভালো তো! কলিমউল্লাহর মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। তার জীবনটা মোটামুটি ভয়ের মধ্যেই কেটেছে। আজ পাশার দান পাল্টেছে। তাকেও লোকজন ভয় পাচ্ছে। কলিমউল্লাহ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আপনি ভালো আছেন?

জি আপনার দোয়া।

আমার আবার দোয়ার টাইম কোথায়?

ঠিকই বলেছেন দোয়ার টাইম নাই। ইয়া নফসি, ইয়া নফসি।

ইয়া নফসি ইয়া নফসি হবে কী জন্যে?

কলিমউল্লাহ খুবই আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করল ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেছে। বেফাস কথাটা বলে তিনি এখন আতঙ্কে অস্থির। কলিমউল্লাহ ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনার সঙ্গে আমার কিছু প্রাইভেট কথা আছে।

অবশ্যই অবশ্যই।

আপনি আপনার ঘরে যান। আমি চা-টা শেষ করে আসি।

অবশ্যই অবশ্যই।

ঘরে যেন আর কেউ না থাকে।

জি জি জি।

আপনার নাম হেলাল না?

জি জি জি।

আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

হেলাল সাহেব জড়ানো পায়ে তার ঘরের দিকে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের 'কলিজা' শুকিয়ে গেছে। এখন চলছে কলিজা শুকাবার কাল। ড্রাই লিভার ওয়েদার।

কলিমউল্লাহ চা শেষ করে আরেক কাপ চা নিল। হেলাল সাহেবের কাছে যত দেরি করে যাওয়া যায় ততই ভালো। টেনশনে ব্যাটার ঘাম বের হয়ে যাক। আমি আমার এক জীবনে অনেক টেনশন নিয়েছি। এখন তোরা খানিকটা নে।

কেমন আছেন হেলাল সাহেব ?

জি ভালো আছি।

চোখমুখ শুকনা, ভালো তো মনে হয় না। রাতে ঘুম ভালো হচ্ছে না ?

জি ঘুম হচ্ছে। কলিম ভাই, চা খাবেন ?

না, চা দু'কাপ খেয়েছি।

অন্য কিছু খাবেন ? আনায়ে দেই।

না, কিছু খাব না। আচ্ছা শুনেন, কবি শামসুর রাহমান সাহেব অফিসে আসতেছেন না, ব্যাপারটা কী ? যুদ্ধে চলে গেছেন না-কি ?

জি-না। জি-না।

উনি আছেন কোথায় ?

তা তো জানি না।

ঢাকা শহরে কি আছেন ?

জি-না।

কোথায় আছেন ?

আমি উনার কোনো খোঁজ জানি না।

ঢাকা শহরে যে উনি নাই সেটা তো আপনি জানেন। তাহলে আপনি কেন বলছেন তার খোঁজ জানেন না ? কবির গ্রামের বাড়ি কোথায় ? ঠিকানাটা দেন। আমি দেখা করে আসব। ইদানীং কী লেখালেখি করছেন— দেখব।

উনি কোথায় আছেন আমি কিছুই জানি না।

জেনে তারপর আমাকে জানান।

হেলাল সাহেব চুপ করে আছেন। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কলিমউল্লাহ বলল, একটা জর্দা দিয়ে পান আনার ব্যবস্থা করেন। চা খেয়ে মুখ মিষ্টি হয়ে গেছে।

অবশ্যই অবশ্যই।

আমাকে কাগজ আর কলম দেন। নিরিবিলি একটা ঘর দেন। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। শুধু মেজর সাহেব এলে খবর দিবেন।

অবশ্যই অবশ্যই।

দুপুরে আমার জন্যে কোনো খাবারের ব্যবস্থা করবেন না। মেজর সাহেবের সঙ্গে তাঁর মেসে খাবার কথা। (সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই জাতীয় মিথ্যা বলতে কলিমউল্লাহর সবসময় ভালো লাগে।)

কলিমউল্লাহ্ ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। তার মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে। সে কবিতা লেখার চেষ্টা করছে। প্রথম লাইনটা চট করে মাথায় এসে গেছে। লাইনটা খারাপ না—

একটি ধবল বক একা একা উড়িতেছিল বাংলার করুণ আকাশে।

সে 'করুণ' শব্দটা কাটল। 'করুণ আকাশ' মানেই জীবনানন্দ। করুণের জায়গায় বসালো মেঘলা। এই শব্দটা ভালো লাগছে না। মেঘলা আকাশ, মেঘলা আকাশ লিখে লিখে মেঘলা শব্দটাকে সবাই পচিয়ে ফেলেছে। মেঘলা কেটে সে লিখল রূপালি। কবিতার বাকি কয়েক পঙ্‌ক্তি সে দ্রুত লিখে ফেলল।

একটি ধবল বক একাকী উড়িতেছিল বাংলার রূপালি আকাশে
সঙ্গিনী তার, মরিয়া গেছে বহুকাল বহুকাল আগে।
সঙ্গিনীর দীর্ঘশ্বাস বার মাস বকের পাখায় লাগে
উড়িতে পারে না সে, সঙ্গিনীর নিঃশ্বাসের ভারে,
সে বড় ক্লান্ত হয়
খুঁজে ফিরে ডানা দু'টি মেলিবার নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কবিতা লেখার খুব আবেগ এসে গেছে। বাকি লাইনগুলি কিউ-এর মতো একজনের পিছনে একজন দাঁড়িয়ে আছে। তারা ঠেলাঠেলিও করছে। এমন সময় হেলাল সাহেব ঘরে ঢুকে বললেন, মেজর সাহেব এসেছেন, আপনাকে ডাকেন।

সঙ্গে সঙ্গে কবিতা লেখা বন্ধ করে উঠে চলে গেলে মনে হবে সেও মিলিটারির ভয়ে আধমরা। এটা করা যাবে না। কলিমউল্লাহ্ হাতের ইশারা করল যাতে মনে হয় সে বলছে, এখন লেখালেখি করছি। এই সময় বিরক্ত করা যাবে না। পরে আসুন।

ইশারার পরেও হেলাল সাহেব আবারো বললেন, স্যার আপনাকে ডাকেন।

কলিমউল্লাহ্ এমন ভাব করে উঠল যেন সে খুবই বিরক্ত হচ্ছে লেখার মাঝখানে উঠতে হয়েছে বলে।

মেজর সাহেব তাকে দেখেই বললেন, Hello poet!

কলিমউল্লাহ বিনয় এবং লজ্জায় (লজ্জাটা অভিনয়) নিচু হয়ে গেল।

মেজর সাহেব বললেন, কী করছিলে ? (কথাবার্তা হচ্ছে উর্দুতে। কাজ চালাবার মতো উর্দু এখন কলিমউল্লাহ বলতে পারে।)

পাকিস্তানকে নিয়ে একটা কবিতা লিখছিলাম স্যার।

ভালো। খুব ভালো। A poet in action.

স্যারের শরীরটা কি খারাপ ?

আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে শরীর খারাপ ?

ইয়েস স্যার। (মেজর সাহেবের চেহারা দেখে শরীর খারাপ মোটেই মনে হচ্ছে না। তারপরেও কলিমউল্লাহ এই ধরনের কথা বলে, যাতে উনি মনে করেন মানুষটা তাঁর শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত।)

আমার শরীর ঠিকই আছে। মন সামান্য অস্থির। যুদ্ধাবস্থায় মন অস্থির থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

যুদ্ধ কোথায় দেখলেন স্যার ? পাটকাঠি দিয়ে যুদ্ধ হয় না। স্যারকে চা দিতে বলি ?

না, চা খাব না। তুমি কি কিছু বাড়তি পয়সা রোজগার করতে চাও ? তোমাকে আমি কাজ দিতে পারি।

স্যার, আপনার কোনো কাজের জন্যে অন্যরা পয়সা নিলে নিতে পারে। আমি কীভাবে নিব ?

মেজর সাহেব বললেন, কাজ করে পয়সা নিবে। এমন এক কাজ যাতে দেশের সেবা হয়। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

কলিমউল্লাহর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ব্যাটা বলে কী ? যুদ্ধে যাব মানে ? ছোটবেলায় গুলতি দিয়ে এক ছেলের মাথায় টং করে মার্বেল মেরেছিল। তার যুদ্ধ এই পর্যন্তই। বন্দুক দূর থেকে দেখেছে, হাত দিয়ে এখনো ছুঁয়ে দেখে নি। কলিমউল্লাহ ভাবল বলে— সব পারব স্যার, শুধু যুদ্ধটা পারব না। আমরা শাহ্ বংশ। শাহ্ বংশে মানুষ মারা নিষেধ। যা ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত তা বলল না। মেজর সাহেব বললেই তো বন্দুক কাঁধে নিয়ে রওনা হতে হবে না। হাতে সময় আছে। সে বলল, জনাব আপনি যা করতে বলবেন, আমি তাই করব। যুদ্ধ কী আমি জানি না। বন্দুক হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি নাই। কিন্তু আপনি বললে বন্দুক নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করব। আল্লাহর কীরা, আমাদের নবিজীর কীরা।

মেজর সাহেব বললেন, যুদ্ধ মানেই যে বন্দুক নিয়ে গোলাগুলি তা তো না। যুদ্ধের অনেক ধরন আছে। এই যে আমি পত্রিকা অফিস, রেডিও-টেলিভিশন অফিসে ছোটাছুটি করছি এইটাও যুদ্ধ। তোমাকে আমি একজনের ঠিকানা দেব। তাকে আমি তোমার কথা বলেছি, সে তোমাকে কাজ দিবে।

আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ঠিকানা লিখে দেন। আমি আজই উনার কাছে যাব। উনার নাম কী?

তার নাম জোহর। পূর্ণিয়া জেলায় বাড়ি। খুব পড়াশোনা জানা লোক। তুমি যেমন কবিতা লেখ, সেও কবিতা লেখে।

বলেন কী? স্যার, আপনি আমাকে একটা চিঠি লিখে দেন। চিঠি নিয়ে উনার সঙ্গে দেখা করব।

চিঠি ফিটি কিছুই লাগবে না। তুমি তোমার নাম বলবে তাতেই হবে।

আপনার নাম কি স্যার বলব? আপনি পাঠিয়েছেন এটা বলব?

কিছু বলতে হবে না।

মেজর সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। অন্য কোথাও যাবেন। কলিমউল্লাহ বলল, স্যার, এক কাপ চা খেয়ে যান। আপনার সঙ্গে চা খাব বলে আমি এখনো চা খাই নাই।

মেজর সাহেব আবারো বসলেন। কলিমউল্লাহ ছুটে গেল চা আনতে।

জোহর সাহেবকে দেখে কলিমউল্লাহর আশাভঙ্গ হলো। সে ভেবেছিল জোহর সাহেব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। তার চালচলন হাবভাব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মতো হবে। চেহারা ও কাজের গুরুত্বের সঙ্গে মানানসই হবে। কথায় আছে— পহেলা দর্শনধারি।

বাস্তবের জোহর সাহেব আধবুড়া একজন মানুষ। মাথার চুল কালো ঠিক আছে, মুখভর্তি সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের নিচে কালি। চোখ গর্তে ঢুকে আছে। সেই চোখ আবার গাঁজাখোরদের চোখের মতো লাল। এই গরমেও তার গায়ে চাদর। চাদরটা আধময়লা। লোকটা চেয়ারে পা তুলে বসে আছে। যে-কোনো কাবাবের দোকানের এসিসটেন্ট হলে তাকে মানাত। কাবাবের মতোই আগুনে ঝলসানো চেহারা।

কলিমউল্লাহ বলল, মেজর সিদ্দিক সাহেব আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।

জোহর সাহেব তার দিকে না তাকিয়ে শুদ্ধ বাংলায় বলল, আচ্ছা।

কলিমউল্লাহ বুঝতে পারল না এখন সে কী করবে। জোহর সাহেবের সামনের কাঠের চেয়ারটা টেনে বসবে ? না-কি দাঁড়িয়েই থাকবে ? জানালা বন্ধ ছোট্ট একটা ঘর। খালি চেয়ার বলতে একটাই, সেটাও অনেকটা দূরে। দু'জন লোক বসলে বসবে মুখোমুখি। একজন এক কোনায় অন্য আরেকজন আরেক কোনায় বসবে না-কি! কে জানে হয়তো জোহর সাহেবের সঙ্গে কথা বলার নিয়মই এই। ঘরে সিগারেটের কটু গন্ধ। কলিমউল্লাহ নিজে সিগারেট খায়। তারপরেও সিগারেটের গন্ধে তার বমি এসে যাচ্ছে।

কলিমউল্লাহ বলল, মেজর সাহেব বলেছেন, আপনি একজন কবি। আপনাকে দেখার শখ ছিল।

জোহর বলল, আপনার ডানদিকে সুইচ আছে। সুইচটা জ্বেলে দেন। ঘর আলো হোক। তারপর আমাকে ভালোমতো দেখেন।

কলিমউল্লাহ মনে মনে বলল, তুমি তো বাবাজি ত্যান্দর আছ। নিজেরে কি ভাবতেছ, টিক্কা খান ?

মনের কথা কেউ শুনতে পায় না— এটা বিরাট সুবিধার একটা বিষয়। কলিমউল্লাহ বাতি জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, স্যার, আমি কি চেয়ারটা এনে আপনার সামনে বসব ?

জোহর বলল, আচ্ছা বসুন।

স্যার, আমি নিজেও একজন কবি। টুকটাক কবিতা লেখি। ইদানীং গদ্য লেখার চেষ্টা করছি।

ভালো। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। যুদ্ধের রাজ্যে পৃথিবী কী ?

কলিমউল্লাহর মুখে চট করে কোনো উত্তর এলো না। এই বিহারি কাবাবওয়ালা সুকান্তের কবিতা জানে— খুবই আশ্চর্যের কথা। মেজর সাহেব অবশ্যি বলেছিলেন পড়াশোনা জানা লোক। সে চেয়ার টেনে জোহর সাহেবের সামনে বসতেই জোহর সাহেব বললেন, আপনি আরেকদিন আসুন। আজ আমার শরীরটা ভালো না।

কলিমউল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বলল, জি আচ্ছা। স্যার, কবে আসব ?

যে-কোনো দিন আসতে পারেন। আমি এই ঘরেই বেশিরভাগ থাকি। গর্তজীবী হয়ে গেছি।

স্যার তাহলে যাই। স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। আপনার সঙ্গে কাগজ-কলম আছে ?

কলিমউল্লাহ উৎসাহের স্বরে বলল, জি স্যার আছে, আমি সবসময় সঙ্গে কাগজ-কলম রাখি।

একটা ঠিকানা লেখেন।

কলিমউল্লাহ ঠিকানা লিখল। জোহর সাহেব বললেন, ঠিকানাটা একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের বাসার, নাম মোবারক হোসেন।

স্যার, আমি কি উনার সঙ্গে দেখা করব ?

উনার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না। উনি পঁচিশে মার্চের রাতে মারা গেছেন। আপনি উনার পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করবেন। ইন্সপেক্টর সাহেব যে মারা গেছেন— এই সংবাদ সম্ভবত তাঁর পরিবারের লোকজন জানে না।

স্যার, আমি কি সংবাদটা তাদের দিব ?

আপনাকে কোনো সংবাদ দিতে হবে না। ইন্সপেক্টর সাহেবের ফ্যামিলি কেমন আছে, তাদের কোনো সমস্যা আছে কি-না— এটা জেনে আসবেন। আমি এই পরিবারের জন্যে কিছু করতে চাই। ইন্সপেক্টর সাহেব একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। ভেজাল মানুষের যুগে খাঁটি মানুষ পাওয়া মুশকিল। দু'একটা খাঁটি মানুষ যখন দেখি, তখন ভালো লাগে।

স্যার, আপনার কথা কি উনাদের বলব ?

আমার কথা বলার কোনো দরকার নাই। কলিমউল্লাহ সাহেব ?

জি স্যার ?

আপনি কেমন মানুষ ? খাঁটি মানুষ, না ভেজাল মানুষ ?

আমি স্যার ভেজাল।

ঠিক আছে আমাদের ভেজাল মানুষই দরকার। এখন যান।

স্যার স্লামালিকুম।

জোহর সাহেব সালামের জবাব না দিয়ে সিগারেট ধরালেন।

কলিমউল্লাহ মনে মনে বলল, শালা কাবাবওয়ালা!

হ্যালো কবি, মনে মনে কী ভাবছ ?

কলিমউল্লাহ চমকে উঠল। এই শালা কি মনের কথা বুঝতে পারে ? বিচিত্র কিছু না। পৃথিবীতে নানান কিসিমের মানুষ আছে। কলিমউল্লাহ বিনীত ভঙ্গিতে বলল, স্যার আমি কিছু ভাবছি না। কবিতার একটা লাইন মাথায় এসেছে। ঐটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি।

বেশি নাড়াচাড়া করবেন না। ভেঙে যেতে পারে।

জি আচ্ছা স্যার।

বিদায় হন। ক্লিয়ার আউট।

জি আচ্ছা স্যার।

শিউলি গাছে আশ্বিন কার্তিক মাসে ফুল ফুটবে। এইটাই নিয়ম। কদম গাছে ফুল ফুটবে আষাঢ়ের পূর্ণিমায়, শিমুল ফুটবে চৈত্র দিনের উত্তাপে। অথচ মরিয়মদের বাড়ির সামনের শিউলি গাছে চৈত্র মাসে ফুল ফুটেছে। গাছের একটা ডাল দোতলার বারান্দায় এসেছে। ডাল-ভর্তি ধবধবে সাদা ফুল। গাছটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? মানুষের মাথা খারাপ হতে পারলে গাছের হবে না কেন ? গাছেরও তো জীবন আছে।

চৈত্র মাসে শিউলি গাছে ফুল— এই খবরটা মাসুমাকে দিতেই সে বলল, ফুটুক। মরিয়ম বলল, আয় দেখে যা। মাসুমা বলল, বুবু, আমার ফুল দেখার শখ নাই।

সাফিয়াকে এই খবরটা দিতেই তিনি অনাগ্রহের সঙ্গে বললেন, আচ্ছা। মরিয়ম বলল, মা, চল তোমাকে দেখাই। সাফিয়া বললেন, পরে দেখব। হাতের কাজটা সারি। অথচ তাঁর হাতে কোনো কাজ নাই। তিনি বাবুর পাশে ঝিম ধরে বসে আছেন। মরিয়ম আরেকবার বারান্দায় গেল ফুল দেখতে। ডালটা উঁচুতে। হাতের কাছে থাকলে কয়েকটা ফুল পাড়ত। শিউলি ফুলের বোঁটা দিয়ে সুন্দর হলুদ রঙ হয়। এই হলুদ রঙ দিয়ে পায়েস রান্না করলে পায়েসে ফুল ফুল গন্ধ চলে আসে।

মরিয়ম মুগ্ধ চোখে আরো কিছুক্ষণ ফুলের দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। এই খবরটা একজনকে দিতে হবে। সেই একজন কোথায় আছে, সে জানে না। তার কাছে খবর কীভাবে পৌঁছানো যাবে তাও জানে না। তারপরেও সে প্রায় রোজই একটা করে চিঠি লিখে খাতা ভর্তি করে ফেলছে। কোনো এক সময় চিঠিগুলি নিশ্চয়ই পৌঁছানো যাবে। মরিয়ম দরজা বন্ধ করে দিল। চিঠি লেখার সময় হুট করে কেউ ঘরে ঢুকলে তার বড় বিরক্তি লাগে। চিঠি লেখার সময়টা সম্পূর্ণ তার একার। তখন আশেপাশে কেউ থাকবে না।

চিঠির সম্বোধন নিয়ে মরিয়মের খুব সমস্যা হয়। কোনো সম্বোধনই তার পছন্দ হয় না। তার খুব ইচ্ছা করে নাইমুলকে সংক্ষেপ করে 'নাই' লিখতে। সে

যদি মরিয়মকে সংক্ষেপ করে 'মরি' ডাকতে পারে তাহলে মরিয়ম কেন নাইমুলকে সংক্ষেপ করে 'নাই' ডাকতে পারবে না। সমস্যা অবশ্যি আছে— 'প্রিয় নাই' লিখতে যেন কেমন লাগছে। মনে হয় যাকে লেখা হচ্ছে সে নাই।

মরিয়ম লিখল—

এই যে,

তুমি কেমন আছ? জানো কী হয়েছে? আমাদের বাড়ির সামনের শিউলি গাছে ফুল ফুটেছে। এটা অনেক বড় ঘটনা, কারণ শিউলি গাছে চৈত্র মাসে ফুল ফুটে না। আমার ধারণা গাছটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মানুষের যদি মাথা খারাপ হয়, গাছের কেন হবে না? গাছের জীবন আছে— জগদীশ বসু আবিষ্কার করেছেন।

তুমি কি জানো আমারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে? রাতে আমি এক ফোটা ঘুমাই না। জেগে বসে থাকি। আমার ঘুম আসে ফজরের নামাজের পর। আযান শুনে নামাজ পড়বার বদলে ঘুমিয়ে পড়ি। দশটা সাড়ে দশটায় ঘুম ভাঙে। দুপুরবেলা খেয়ে আবার ঘুমুতে যাই। ঘুম থেকে উঠি ঠিক সন্ধ্যায়। উঠি বলা ঠিক হবে না। আমাকে উঠিয়ে দেয়া হয়। কারণ সন্ধ্যাবেলা ঘুমানো খুবই অলক্ষণ। পৃথিবীর কোনো পশুপাখি না-কি সন্ধ্যাবেলা ঘুমায় না। তারা তখন অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকে। আচ্ছা এটা কি সত্যি?

এখন তোমাকে জরুরি কিছু খবর দেই। এক নম্বর খবর— বাবার কোনো খোঁজ এখনো পাই নাই। উনি কোথায় কেউ বলতে পারছে না। বাবা বাড়িতে না থাকায় সবচে' বড় সমস্যা হয়েছে মা'র। উনি সংসার চালাতে পারছেন না। বাবা তো মা'র হাতে বাড়তি কোনো টাকা দিতেন না। যা টাকা ছিল সব শেষ। চাল-ডাল-তেল কেনা ছিল বলে কিছুদিন চলেছে। এখন তাও শেষ। মা তার তিন মেয়ের যাকেই দেখেন তাকেই জিজ্ঞেস করেন, এখন কী করি বল তো?

ব্যাংকে বাবার টাকা আছে। সেই টাকা আমরা তুলতে পারছি না। তবে তুমি এইসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না। কারণ ঢাকা শহরে আমাদের আত্মীয়স্বজন আছেন, তারা

কেউ-না-কেউ আমাদের খোঁজ করতে আসবে। দেশের বাড়ি থেকে দাদাজানও নিশ্চয় কাউকে-না-কাউকে আমাদের খোঁজে পাঠাবেন। যাত্রাবাড়িতে আমার ছোট নানার (যিনি আমাদের বিয়ে দিয়েছেন) নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হয়েছে। উনি যদি একবার আসতেন, তাহলেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হতো।

মা'র এবং আমাদের তিন বোনেরই কিছু গয়না আছে। প্রয়োজনে গয়না বিক্রি করা হবে। তুমি এইসব নিয়ে মোটেই চিন্তা করবে না। আমাদের সামনের বাড়ির বাড়িওয়ালা সবাইকে নিয়ে দেশে চলে গেছেন। বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে তাঁর শালাকে রেখে গেছেন। তার নাম রতন। আমরা তাকে ডাকি 'বগা ভাই' (দেখতে বকের মতো, এই জন্যে বগা ভাই)। মা ঠিক করেছে বগা ভাইকে দিয়ে গয়না বিক্রি করাবে। আমরা তিন বোন চাচ্ছি না বগা ভাই আমাদের বাড়িতে আসুক। তার ভাব-ভঙ্গি ভালো না। তার কিছু বিহারি বন্ধু-বান্ধব আছে। তাদের নিয়ে সে প্রায়ই তাদের বাড়িতে আড্ডা বসায়। সে নিজেও বিহারিদের মতো ঘাড়ে রঙিন রুমাল বাঁধে।

তুমি কি জানো বিহারিদের ভয়ে আমরা সবাই আতঙ্কে থাকি? রাত ন'টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ থাকে, এই সময় বিহারিরা না-কি মানুষের বাড়িতে ঢোকে। বিশেষ করে সেইসব বাড়িতে যেখানে অল্পবয়েসী মেয়েরা আছে। কী যে ভয়ঙ্কর অবস্থা!

রাতে আমরা সবাই একই ঘরে ঘুমাই। মা হাতের কাছে একটা বটি রাখেন। এখন তুমিই বলো— ওরা যদি দল বেঁধে আসে, মা বটি দিয়ে কী করবে?

যাই হোক, তুমি এইসব নিয়ে চিন্তা করবে না। আমরা ঠিক করে রেখেছি, পরিচিত কাউকে পেলেই আমরা দেশের বাড়িতে চলে যাব। একবার দেশের বাড়িতে পৌছতে পারলে আমাদের আর কোনো ভয় নেই।

তুমি ভালো থেকো। শরীরের যত্ন নিও। বেশি সাহস দেখানোর দরকার নেই। অন্যরা সাহস দেখাক, তোমাকে সাহস দেখাতে হবে না।

খুবই অন্যরকম একটা খবর তোমাকে দেই। মা'র ধারণা আমার সন্তান হবে। আমার চেহারায় না-কি মা মা ভাব চলে এসেছে। ঘটনা তা না। তবে আমি এমন ভাব করছি যে ঘটনা তাই। দেখেছ আমি কেমন মজা করতে পারি ?

আজ এই পর্যন্ত। কাল আবার চিঠি লিখব। আচ্ছা শোন, রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আয়াতুল কুরশি পড়ে তিনবার হাততালি দিয়ে ঘুমুতে যাবে। তালির শব্দ যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত কোনো বালামুসিবত আসতে পারে না। আমরা সবসময় তাই করি।

ইতি
তোমার মরি

চিঠি শেষ করে মরিয়ম আবার বারান্দায় গেল। অসময়ের ফুল আবার দেখতে ইচ্ছা করছে। ফুল পাড়তে পারলে চিঠিতে ফুলের বোঁটার হলুদ রঙ লাগিয়ে দেয়া যেত। বারান্দা থেকে বগা ভাইকে দেখা যাচ্ছে। বগা ভাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার সঙ্গে আরো তিনজন আছে। প্রত্যেকেরই পান খাওয়া লাল ঠোঁট। কাঁধে রুমাল বাঁধা। তারাও তাকিয়ে আছে বারান্দার দিকে। তাদের একজন হঠাৎ হাততালি দিতে শুরু করল। তার দেখাদেখি অন্য দু'জনও হাততালি দিচ্ছে। শুধু বগা ভাই দিচ্ছে না। মরিয়ম ছুটে বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে গেল।

সাফিয়া বললেন, কী হয়েছে ?

মরিয়ম বলল, কিছু হয় নাই। কেন জানি ভয় লাগছে।

ভয় লাগছে কেন ?

বারান্দা থেকে দেখেছি, বগা ভাই কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তাকিয়ে আছে। তাকানোটা ভালো না। মা চল আমরা দেশের বাড়িতে চলে যাই।

কীভাবে যাবে ? কে নিয়ে যাবে ?

বোরকা পরে আমরা আমরা চলে যাব। ট্রেনে উঠব। ট্রেন থেকে নামব।

সাফিয়া কিছু বললেন না। ছেলে কাঁদছে, তিনি ছেলে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মেয়ে তিনটিকে তাঁর খুবই পছন্দ। ভালো মেয়ে, বুদ্ধিমতী কিন্তু বেশি সরল। মনে কোনো প্যাঁচগোছ নাই। তারপরেও তিন মেয়ের একটা ব্যবহারে তিনি মনে খুবই কষ্ট পেয়েছেন। তাদের বাবার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না— এটা নিয়ে তাদের মনে কোনোরকম দুশ্চিন্তা নেই। যেন তাদের বাবা মফস্বলে

ইন্সপেকশনে গিয়েছে, কয়েক দিন পরে ফিরে আসবে। বাবার প্রতি মেয়েদের সামান্য মমতা থাকবে না? এই দুঃসময়ে একটা মানুষ নিখোঁজ হওয়া যে কত ভয়াবহ ব্যাপার— এটা কি এরা জানে না? ধরে নেয়া গেল মানুষটা খারাপ। খুবই খারাপ। সবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। সবসময় ধমকা-ধমকি। সবসময় মেজাজ খারাপ। তারপরেও তো বাবা।

একজনের বিয়ে হয়েছে। স্বামীর চিন্তা তার মাথায়। অন্য কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। তার কথা বাদ দেয়া গেল। সে থাকুক শিউলি ফুল নিয়ে। অন্য দু'জন? তাদের তো বিয়ে হয় নি। তাদের তো সম্পূর্ণ নিজের লোক নেই। তারা কেন বাবাকে নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তাও করবে না? বাবা ঘরে ফিরছে না— এতে তারা যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারছে। গতকাল রাতে মাসুমা ছুটে এসে বলল, মা, আকাশবাণী থেকে খুব ভালো নাটক হচ্ছে। শুনবে?

সাফিয়া হতভম্ব। এই মেয়ে কী বলে! এখন কি নাটক শোনার সময়? মাসুমা উত্তেজিত গলায় বলল, অচিন্তকুমার সেনগুপ্তর উপন্যাস থেকে নাটক। উপন্যাসের নাম 'প্রথম কদম ফুল'। সাফিয়া বললেন, মা, তোমরা শোন। আমার বাবুকে দেখতে হবে।

মাসুমা বলল, মা, বাবু তো ঘুমাচ্ছে।

সাফিয়া বললেন, নাটক শুনতে আমার ভালো লাগে না, তোমরা শোন। তিনি গম্ভীর মুখে বাবুর পাশে বসে রইলেন। বাবুকে এখন আর ইয়াহিয়া ডাকা হয় না। তার বাবু নামই মনে হয় স্থায়ী হয়ে গেছে।

বাবু ঘুমাচ্ছে, তিনি তাকিয়ে আছেন তার দিকে। এক সময় এই ছেলের ঘুম ভাঙবে। ঘুম ভাঙার পরেও তার জগতের অন্ধকার কাটবে না। সে হাত বাড়িয়ে প্রিয়জনের স্পর্শ খুঁজবে। তার প্রিয়জন কে? সাফিয়া নামের একজন যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। বাবু যে চোখে দেখে না এবং কানে শোনে না— এই বিষয়ে তিনি এখন পুরোপুরি নিশ্চিত। বোনদের এই ভয়ঙ্কর খবরটা তিনি দেন নি। কেন দেন নি তার কারণ তাঁর কাছেও স্পষ্ট না।

সাফিয়া নিশ্চিত মেয়েরা এখনো বুঝতে পারছে না বাইরের জগতে কী ভয়ানক ওলট-পালট হয়ে গেছে। তারা তাদের নিজেদের জীবন নিয়ে প্রায় চিন্তাহীন সময় কাটাচ্ছে। সব কিছুর মধ্যেই এক ধরনের মজা পাচ্ছে। রাতে একই ঘরে সবাই যখন ঘুমুতে আসছে, তার মধ্যেও যেন মজা আছে। তিন বোন পাশাপাশি শুয়ে থাকে। গুটুর গুটুর করে কথা বলে। হঠাৎ হঠাৎ খিলখিল হাসি। একজন সঙ্গে সঙ্গে বলবে, আস্তে হাসো, আস্তে, মিলিটারি শুনবে। ওমনি আরো

জোরালো হাসি। সবচে' ছোটটা একরাতে বলল, আপু, মিলিটারিরা মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় কী জন্যে ?

মাসুমা বলল, আদর করার জন্যে ধরে নিয়ে যায়। তোকে যদি ধরে নিয়ে যায় এমন আদর করবে...

মাসুমা কথা শেষ না করেই শুরু করল হাসি। মাসুমা হাসে, মরিয়ম হাসে। তাদের হাসির মাঝখানে মাফরুহা অবাক হয়ে বলে, তোমরা হাসছ কেন ? তিন বোনের হাসি তখন আরো প্রবল হয়।

হাসির শব্দে সাফিয়ার বুক ধড়ফড় করে। সুসময়ে হাসি সংসারে আরো সুসময় নিয়ে আসে। দুঃসময়ের হাসি আনে ভয়ঙ্কর কোনো দুঃসময়। মরা বাড়িতে লাশ কবর দেওয়ার আগেই যদি কেউ হাসে, অবশ্যই সে বাড়িতে আরো একজন কেউ মারা যায়। এটা পরীক্ষিত সত্য।

মেয়েরা হাসে, সাফিয়ার বুক ধড়ফড় করে। নিঃশ্বাসে কষ্ট হয়। মেয়েরা বুঝতে পারছে না কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন সামনের দিন ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর সেই দিনের কথা ভেবে রাতে তাঁর ঘুম হয় না। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করেন। চোখ যখন লাগে বিকট সব স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নগুলি বিকট শুধু না, নোংরাও। এত নোংরা যে ঘুম ভাঙার পর তাঁর গা ঘিনঘিন করে। মনে হয় শরীর অশুচি হয়ে আছে। প্রায়ই স্বপ্নে তিনি তাঁর মৃত বাবাকেও দেখেন। বাবা যেন বাসায় এসেছেন। ছটফট করছেন। যেন খুব ব্যস্ততা। হুড়মুড় করে তিনি শোবার ঘরে ঢুকে বললেন, ও খুকি, তাড়াতাড়ি কর। লঞ্চ ধরতে হবে। (সাফিয়াকে তার বাবা সারাজীবন 'সাফি' ডেকেছেন। কখনো 'খুকি' ডাকেন নি। অথচ স্বপ্নে কেন 'খুকি' ডাকেন কে জানে)। স্বপ্নের মধ্যেই সাফিয়া বলে, বাবা এত ব্যস্ত কেন ? বললেই তো যাওয়া যায় না। আমার ছেলে-মেয়ে আছে, স্বামী আছে, সংসার আছে।

বাবা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, আরে রাখ রাখ। কিসের স্বামী কিসের ছেলেমেয়ে, লঞ্চ ছেড়ে দিবে। আয় খুকি— তাড়াতাড়ি আয়। বলেই তিনি সাফিয়ার হাত ধরে টানাটানি শুরু করেন। তখন সাফিয়ার ঘুম ভাঙে।

এই স্বপ্ন সাফিয়া প্রায়ই দেখে, তবে সবসময় লঞ্চ থাকে না। মাঝে-মাঝে থাকে ট্রেন, নৌকা, বাস। স্বপ্নের মূল বিষয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না।

স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির হাত ধরে টানাটানি খুব খারাপ। এই ধরনের স্বপ্ন দেখলে জানের সদকা দিতে হয়। মাওলানা ডাকিয়ে তওবা করে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতিও নিতে হয়। সাফিয়া তার কোনোটিই করেন নি। একটা খতম পড়তে চেষ্টা করছেন— এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার দোয়া ইউনুস।

ইউনুস নবি যখন তিমি মাছের পেটে চলে গেলেন— তখন জীবনের সমস্ত আশা ছেড়ে এক মনে এই দোয়া পড়লেন— 'লাইলাহা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজজোয়ালেমিন।' এই দোয়ার কারণে তিমি মাছ ইউনুস নবিকে উগরে ফেলে দিল। তাঁর জীবন রক্ষা হলো। দোয়াটার নাম হয়ে গেল 'দোয়া ইউনুস'। মাছের পেটে চলে যাবার মতো ভয়ঙ্কর কোনো পরিস্থিতিতে যদি মানুষ পড়ে, তাহলে এই দোয়া পাঠ করলে সে নাজাত পাবে।

সাফিয়ার ধারণা তিনি মাছের পেটেই আছেন। তিনি একা না। পুরো দেশটাই এখন মাছের পেটে। দেশের সব মানুষের উচিত দোয়া ইউনুস পাঠ করা।

শুক্রবারে আসরের নামাজের সময় মরিয়মদের বাড়ির দরজার কড়া কে যেন জোরে জোরে নাড়তে লাগল। মরিয়ম ভয় পেয়ে ছুটে গেল মা'র কাছে। মাসুমা গল্পের বই পড়ছিল। নাইমুল এই বাড়িতে অনেক গল্পের বই নিয়ে এসেছিল। এখন বইগুলি মাসুমার দখলে। সে একটার পর একটা বই পড়ে যাচ্ছে। দরজার কড়া নাড়ার সময় মাসুমা যে বইটা পড়ছিল তার নাম 'জঙ্গম'। লেখকের নাম বনফুল। কড়া নাড়ার প্রবল শব্দে সে বই ছুড়ে ফেলে দৌড়ে এলো মায়ের ঘরে।

সাফিয়া তিন মেয়েকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে মাস্টারলক তালা লাগালেন। বাবুকে কোলে নিয়ে দরজা খুলতে এলেন। যদি মিলিটারি হয়, কোলে শিশুকে দেখে দয়া হতে পারে।

সাফিয়া ভীত গলায় বললেন, কে ?

বাইরে থেকে কেউ একজন বলল, ভয়ের কিছু নাই, দরজা খুলেন।

আপনি কে ?

নাম বললে আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম শাহ্ কলিম।

সাফিয়া বলল, কী চান ?

দরজা খুলেন, তারপর বলি কী চাই। বললাম তো ভয়ের কিছু নাই। আমি বিহারি না। বাঙালি। আমি মিলিটারির কোনো লোক না। বিহারি বা মিলিটারি হলে এতক্ষণে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যেত।

সাফিয়া দরজা খুললেন। শাহ্ কলিম নামের লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দিলেন। শাহ্ কলিম বলল, আপনার বাড়ি খুঁজে বের করতে বিরাট পরিশ্রম হয়েছে। ঠিকানা ছিল ভুল। দুপুর একটা থেকে হাঁটাহাঁটি করছি, এখন খুব সম্ভব চারটা বাজে। এক গ্লাস পানি খাওয়াবার ব্যবস্থা করেন। বাড়িতে কি আপনি একা ?

হ্যাঁ, আমি একা।

আপনি তো একা না, এই বাচ্চাটা ছাড়াও আপনার তিনটা মেয়ে আছে। আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছেন কেন ? ভয় পাচ্ছেন ? ভয় পাওয়ার কিছু নাই। যান, পানি নিয়ে আসেন।

সাফিয়া পানি আনলেন। লোকটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর তাঁর মনে হলো, আসলেই ভয় পাওয়ার কিছু নাই। লোকটা বলল, আমি এসেছি আপনাদের খোঁজ-খবর নেবার জন্যে। আপনাদের কোনো সমস্যা আছে কি-না তা জানার জন্য।

সাফিয়া বললেন, আপনি কে ?

শাহ্ কলিম বলল, আমি কে সেটা তো বলেছি। আমার নাম শাহ্ কলিম। কবিতা লেখি। নানান পত্রপত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হয়। আপনাদের কাছে এক ভদ্রলোক আমাকে পাঠিয়েছেন। উনি আপনার স্বামীর বন্ধু মানুষ। আপনার স্বামীকে খুব পছন্দ করেন। আপনাদের কোনো সমস্যা আছে কি-না জানার জন্যে পাঠিয়েছেন। এখন বলেন— আছে কোনো সমস্যা ?

সাফিয়া আগ্রহ নিয়ে বললেন, মরিয়মের বাবা কোথায় আপনি জানেন ?

শাহ্ কলিম বলল, আমি জানি না।

উনি কি বেঁচে আছেন ?

আমি উনার বিষয়ে কিছুই জানি না।

উনার বন্ধু কি জানেন ? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?

শাহ্ কলিম বলল, উনার বন্ধুও কিছু জানেন না। আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের কাছ থেকে খবর নেবার জন্য। এখন দেখি আপনারাও কিছু জানেন না। যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেলেছি। গলা শুকিয়ে গেছে। এক কাপ চা খেতে পারলে ভালো হয়। চা খাওয়াতে পারবেন ?

চা খাবার সময় শাহ্ কলিমের দেখা হলো মরিয়ম এবং মাসুমা'র সঙ্গে। মাসুমাকে দেখে শাহ্ কলিম খুবই বিস্মিত হলো। অতি রূপবতী মেয়ে। নাক সামান্য চাপা। এতেই যেন রূপ ফুটেছে। মেয়েটার কথাবার্তাও চমৎকার। কথা বলার এক পর্যায়ে সে ঘাড় কাত করে। চোখ পিটপিট করতে থাকে। দেখতে ভালো লাগে।

মাসুমা বলল, আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি সত্যি সত্যি একজন কবি।

শাহ্ কলিম বলল, আমি তো আসলেই কবি।

মাসুমা বলল, যখন চাঁদ উঠে, তখন আপনি কী করেন? হা করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন?

আমি জোছনা দেখি। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো জোছনা দেখা যায় না। কোনো কবিই চাঁদ দেখেন না। তারা জোছনা দেখেন।

বলুন দেখি পূর্ণিমা কবে? যদি বলতে পারেন তাহলে বুঝব আপনি আসলেই কবি। জোছনার হিসাব আপনার কাছে আছে। আর যদি বলতে না পারেন তাহলে আপনি ভু-কবি।

শাহ্ কলিম অবাক হয়ে বলল, ভু-কবি মানে কী?

মাসুমা বলল, ভু-কবি মানে ভুয়া কবি।

ও আচ্ছা।

আপনি কি রাগ করেছেন?

না।

রাগ করা উচিত ছিল, রাগ করেন নি কেন?

তুমি এমন একটি মেয়ে— যার উপর রাগ করা একজন ভু-কবির পক্ষে খুবই কঠিন।

কবি শাহ্ কলিম রাত আটটা পর্যন্ত থাকল। তার নিজের লেখা কবিতা 'মেঘবালিকাদের দুপুর' গভীর আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করল। কবিতা আবৃত্তির মাঝখানে অবশ্যি মাসুমা দুইবার খিলখিল করে হেসে উঠল। এতে কবি হিসেবে শাহ্ কলিমের রাগ করা উচিত ছিল। সে রাগ তো করলই না, বরং তার কাছে মনে হলো— এত সুন্দর শব্দ ও ঝংকারময় হাসি সে এর আগে কোনোদিন শুনে নি। তার মাথায় এক লাইন কবিতাও চলে এলো—

তার হাসি তরঙ্গ ভঙ্গের মতো শব্দময় ধ্রুপদী নদী

'ধ্রুপদী' শব্দটা যাচ্ছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না, তবে শব্দটা জুৎসই। 'ধ্রুপদী'র শেষ অক্ষর দী, আবার নদীর শেষ অক্ষরও দী। মিলটা ভালো।

কবি শাহ্ কলিম ঠিক করল, এই অসহায় পরিবারটিকে সে নিজ দায়িত্বে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দেবে। শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়া এখন সমস্যা না। শহরে রিকশা, ঠেলাগাড়ি সবই চলছে। শহর থেকে বের হলেই নৌকা। ট্রাক আছে, বাস আছে। সামান্য চেকিং মাঝেমধ্যে হয়, সেটা তেমন কিছু না।

ঢাকা শহরের প্রায় ফাঁকা রাস্তায় ঠেলাগাড়ি নিয়ে বের হয়েছে আসগর আলি এবং তার পুত্র মজনু মিয়া। মজনু মিয়ার বয়স নয়-দশ। তার পরনে কালো রঙের প্যান্ট। গা খালি। তবে মাথায় কিস্তি টুপি আছে। মজনু মুসলমান এই পরিচয়ের জন্যে মাথার টুপি বাঞ্ছনীয়। যে-কোনো কারণেই হোক মজনুর মন বড়ই বিষণ্ণ। সেই তুলনায় আসগর আলিকে মনে হয় আনন্দেই আছে। তার বয়স চল্লিশ। শক্ত-সমর্থ শরীর। বাঁ পায়ে কিছু সমস্যা আছে বলে পা টেনে টেনে হাঁটে। তাতে ঠেলাগাড়ি চালাতে অসুবিধা হয় না। পঁচিশে মার্চের পর সে দাড়ি রেখেছে। লোকমুখে শোনা যাচ্ছে মুখে দাড়ি আছে, কলমা জানে— এরকম সাচ্চা মুসলমানদের মিলিটারিরা কিছু বলে না। চড়-থাপ্পড় দিয়ে ছেড়ে দেয়। এই খবর প্রচারিত হবার ফলে অনেক হিন্দুও দাড়ি রেখেছে। বাইরে বের হবার সময় তারা মাথায় গোলটুপি দেয়। কানের ভাঁজে আতর মাখানো তুলা থাকে। এখন অবশ্যি মিলিটারিরা চালাক হয়ে গেছে। দাড়ি এবং টুপিতে কাজ হচ্ছে না। খৎনা হয়েছে কি-না, লুঙ্গি খুলে দেখাতে হচ্ছে।

আসগর আলি তার ছেলেকে নিয়ে চিন্তিত। তার খৎনা এখনো হয় নাই। মিলিটারির হাতে ধরা পড়লে কোন ঝামেলা হয়— এই চিন্তায় আসগর অস্থির হয়ে থাকে। চার কলমা বাপ-বেটা কারোরই মুখস্থ নাই। আসগর আলি একটা কলমা জানে। কলমা তৈয়িদ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। এক কলমায় কাজ হবে কি-না কে জানে! এই কলমা মজনুকে মুখস্থ করানোর চেষ্টা সে কয়েকদিন ধরেই করছে। মুখস্থ হচ্ছে না। দেখা গেল কলমা জানার জন্যে এবং খৎনা থাকার কারণে মিলিটারি তাকে ছেড়ে দিল। ধরে নিয়ে গেল মজনুকে। মিলিটারির সঙ্গে দরবার করে কোনো লাভ হবে না। দরবার করতে গেলে উল্টা গুলি খেতে হবে। চোখের সামনে থেকে ছেলে ধরে নিয়ে যাবে। কিছুই বলা যাবে না। চোখের পানিও ফেলা যাবে না। মিলিটারি চোখের পানি দেখলে রেগে যায়। মুখে হাসি দেখলে তারা রাগে, চোখে পানি দেখলেও রাগে। বড়ই আজিব জাত।

আসগর আলি ছেলের দিকে ফিরে বলল, বাপধন শইলটা কি খারাপ ? শইল খারাপ হইলে গাড়ির উপরে উইঠ্যা বস। আমি টান দিয়া নিয়া যাব।

মজনু বলল, শইল ঠিক আছে।

ক্ষিধা লাগছে ?

না।

ক্ষিধা লাগলে বলবা। আইজ গোছ-পরাটা খাব। অবশ্য রিজিকের মালিক আল্লাপাক। উনার হুকুম হইলে খাব। হুকুম না হইলে কলের পানি।

মজনু কিছুই বলছে না। মাথা নিচু করে হাঁটছে। আসগর বলল, মা'র জন্যে পেট পুড়ে ?

মজনু সঙ্গে সঙ্গে বলল, হুঁ।

এইবার রোগ ধরা পড়েছে। ছেলের মন খারাপ মা'র জন্যে। অনেকদিন মায়েরে দেখে না। এদিকে আবার শুরু হয়েছে সংগ্রাম। খোঁজ-খবর নাই।

বলছি তো যাব। এখন পথেঘাটে চেকিং বেশি। মিলিটারি সমানে ধরতাছে। উনিশ-বিশ দেখলেই ঠুসঠাস। তোরে নিয়াই আমার বেশি বিপদ। খৎনা হয় নাই, এইদিকে আবার কইলমাও মুখস্থ নাই। মুখস্থ হইছে ?

না।

ক' দেহি, ধরাইয়া দিতেছি। প্রথমে— লা ইলাহা...। তারপর কী ?

জানি না।

আসগর তাকিয়ে দেখল, ছেলে চোখ মুছছে। লক্ষণ ভালো না। চোখের পানি মা'র জন্যে। ছেলের বয়স তো কম হয় নাই। অখনো যদি দুধের পুলার মতো 'মা মা' করে তাইলে চলবে ক্যামনে! এখন রোজগারপাতি শিখতে হবে। দুইটা পয়সা কীভাবে আসে সেই ধান্ধায় থাকতে হবে। 'মা মা' করলে মা'র আদর পাওয়া যায়, ভাত পাওয়া যায় না। জগতের সারকথা কী ? জগতের সার কথা 'মা' না, 'বাপ' না। জগতের সারকথা ভাত। হিন্দুরা বলে অন্ন।

বাপরে, ক্ষিধা লাগছে ?

না।

খেচুড়ি খাবি, খেচুড়ি ? (আসগর কী কারণে জানি খিচুড়িকে বলে খেচুড়ি। এই খাদ্যটা তার বড়ই পছন্দ। এক প্লেট আট আনা নেয়। আট আনায় পেট ভরে না।)

খেচুড়ির কথাতেও ছেলের চেহারায় কোনো পরিবর্তন হলো না। সে এখনো রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। চোখ তুলছে না। আসগর বলল, আচ্ছা যা

বিষ্যুদবারে নিয়া যাব। বিষ্যুদবার দিন ভালো। রহমতের দিন। বারের সেরা জুম্মাবার কিন্তু বিষ্যুদবারও মারাত্মক। থাকবি কিছুদিন মা'র সাথে। আমি চেষ্টা নিব এর মধ্যে খৎনা করাইতে। হাজম পাইলে হয়। সংগ্রামের সময় কে কই গেছে...

মজনুর মুখে হাসি ফুটল। সে বলল, ভুখ লাগছে।

কী খাবি ? খেচুড়ি ?

ডিমের সালুন দিয়া ভাত।

আসগর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। এই ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুখাদ্য বাদ দিয়ে সে চায় ডিমের সালুন। খেচুড়ি খাওয়ার এত বড় সুযোগ সে হেলায় হারাচ্ছে। জীবনে যখন বড় বড় সুযোগ আসবে সেগুলিও হারাবে।

খেচুড়ি খাইয়া দেখ।

ডিমের সালুন খাব।

আচ্ছা যা ডিমের সালুন।

আসগর ঠেলাগাড়ি ঘুরাল। সে বেশ আনন্দে আছে। কারণ গত কিছুদিন তার রোজগার ভালো হয়েছে। লোকজন মালামাল নিয়ে ঢাকা ছাড়ছে। কেউ যাবে কমলাপুর, কেউ বাসস্টেশন। সঙ্গে দুনিয়ার জিনিস। তারা ভাড়া হিসাবে যা দিচ্ছে তার পুরোটাই লাভ। ঠেলার মালিককে কিছু দিতে হচ্ছে না। কারণ পঁচিশে মার্চের পর ঠেলামালিকের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় ঘটনা ভালো না। পঁচিশে মার্চ রাতে ঠেলাটা ছিল আসগরের কাছে। তার শরীর ভালো ছিল না। পা ফুলে গিয়েছিল। সে ঠেলাটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে ভেবেছিল সকালে মালিকের কাছে যাবে, ঘটনা ব্যাখ্যা করবে। তারপর তো লেগে গেল ধুন্ধুমার। যাকে বলে রোজ কেয়ামত। দু'দিন পর কেয়ামত একটু ঠাণ্ডা হলে সে গেল ঠেলামালিকের খোঁজে।

মালিক দু'টা ঘর তুলে থাকে কাঁটাবনে। গিয়ে দেখে কোথায় ঘর কোথায় কী! বেবাক পরিষ্কার। ঘরবাড়ি কিছুই নাই। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এক দাড়িওয়ালা আদমি এসে বলল, কারে খুঁজেন ?

সে ভয়ে ভয়ে বলল, ঠেলামালিক ইদ্রিসরে খুঁজি। টিনের ঘর ছিল। ঘরের সামনে দুইটা আম গাছ। কোমর সমান উঁচা।

দাড়িওয়ালা বলল, টিনের ঘর ছনের ঘর সব শেষ। আম গাছ জাম গাছও শেষ। ঘরের বাসিন্দারাও শেষ। বাড়িতে যান। আল্লাখোদার নাম নেন।

সেই দুঃসময়েও আসগরের মনে হলো, আল্লা যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন। এইরকম ভয়ঙ্কর ঘটনার মধ্যেও কিছু মঙ্গল আল্লাপাক রেখেছেন। যেমন এখন ঠেলাটার মালিক বলতে গেলে সে। দৈনিক তিন টাকা ঠেলার জমা তাকে দিতে হবে না। শরীরটা যদি কোনো কারণে খারাপ হয় ঠেলার উপরে চাদর বিছিয়ে ঘুম দিবে। মালিকের জমার টাকা কীভাবে দিবে— এই নিয়ে অস্থির হতে হবে না। বরং সে ঠেলা অন্যকে ভাড়া দিতে পারে। বলতে গেলে সে এখন ঠেলার মালিক। কথায় আছে— 'আইজ ফকির কাইল বাদশা'। কথা মিথ্যা না। তাকে দিয়েই তো মীমাংসা হয়েছে।

আল্লাপাকের অসীম রহমত— 'সংগ্রাম'-এর মধ্যেও সে ভালো রোজগার করছে। ঢাকা ছেড়ে যাওয়া এখন ঠিক না। কিন্তু যেতে হবে ছেলের জন্যে। মা ছাড়া ছেলে কিছু বোঝে না। জীবন যে বড় জটিল আল্লাপাক তাকে সেই বোধ দেন নাই। আসগর আলি মাঝে-মধ্যে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। নানান বিষয়ে উপদেশ দেয়। ছেলেকে উপদেশ দিতে তার ভালো লাগে। উপদেশ শুনে তার ছেলে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায় আর মুখে বলে 'হুঁ'। ছেলের মুখে 'হুঁ' শুনতে তার বড় ভালো লাগে। কঠিন সময়ে বেঁচে থাকার জন্যে উপদেশের প্রয়োজন আছে। আসগর নানান বিষয়ে উপদেশ দেয়। ধর্ম, আল্লাপাকের বিচার, সবুরে মেওয়া ফলের মীমাংসা। কিছুই বাদ যায় না। তবে তার বর্তমান উপদেশ প্রায় সবই মিলিটারি সম্পর্কিত।

বাপধন শোন, মিলিটারি দেখলে তার চোখের দিকে তাকাইবা না। মাথা নিচু কইরা হাঁইট্টা চইল্যা যাবা। যেন কিছুই দেখ নাই। মনে থাকব?

হুঁ।

মিলিটারি যদি বলে— হল্ট। দৌড় দিবা না। দৌড় দিছ কি শ্যাষ। ধুম! পিঠের মধ্যে এক গুল্লি। মনে থাকব?

হুঁ।

মিলিটারির দিকে তাকাইয়া হাসবা না, চোখের পানিও ফেলবা না। হাসি-চোখের পানি দুইটাই মিলিটারির কাছে বিষ। মনে থাকব?

হুঁ।

সময় সুযোগ হইলে বলবা— 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। 'জয় বাংলা' বলছ কি গুড়ুম। গুড়ুম। গুল্লি যে কয়টা খাইবা তার নাই ঠিক। মনে থাকব?

হুঁ।

মিলিটারির মধ্যে কিছু আছে কালা পিরান পিন্দে। এরার নাম কালা-মিলিটারি। এরা সাক্ষাৎ আজরাইল। দূর থাইক্যা যদি দেখ কালা জামা, ফুড়ুৎ কইরা গলির মইধ্যে ঢুকবা। চুকি দিয়া দেখনের কথা মনেও আনবা না। মনে থাকব ?

হুঁ।

পথে যখনই নামবা একদমে আল্লাহু আল্লাহু করবা। আল্লাপাকের নিরানব্বুই নামের সেরা নাম আল্লাহু। খাওয়া-খাদ্যের মধ্যে সেরা খাদ্য যেমন খেচুড়ি। আল্লাপাকের নামের মধ্যে সেরা নাম আল্লাহু। দিলের মধ্যে আল্লাহু থাকলে ভয় নাই। মনে থাকব ?

হুঁ।

আসগর আলির গন্তব্য নীলক্ষেতের ভাতের দোকান। এখানে কয়েকটা দোকান আছে খাওয়া এক নম্বর। তরকারির ঝোল দুই-তিনবার নেওয়া যায়, কোনো অসুবিধা নাই। ডাইলের বাটি দুই আনা। এক বাটি শেষ করলে আরো কিছু পাওয়া যায়। সেইটা মাগনা।

বলাকা সিনেমাহলের কাছে এসে আসগরের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পাঁচ-ছয়জন কালা-মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে কাপড়ের হুড লাগানো আলিশান এক ট্রাক। ট্রাকের ভেতরও মিলিটারি, তবে কালা-মিলিটারি না। আসগর চাপা গলায় বলল, বাপধন তাকাইস না। সিনেমাহলের দিকে তাকাইস না। দমে দমে আল্লাহু বল। মাথার টুপি ঠিক কর। বেঁকা হইয়া আছে।

আসগর আলি পেছনে ফিরে ছেলের কাণ্ড দেখে হতভম্ব। টুপি ঠিক করার বদলে সে চোখ বড় বড় করে কালো-মিলিটারির দিকেই তাকিয়ে আছে। এখন ছেলেকে ইশারা করে কিছু বলা ঠিক হবে না। মিলিটারি বুঝে ফেলবে ইশারায় কথাবার্তা চলছে। মিলিটারিরা ইশারা একেবারেই পছন্দ করে না।

এই ঠেলাওয়ালা, থাম!

আসগর আলির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। একে বিপদ বলে না। একে বলে মহাবিপদ। নবিজীর শাফায়াত ছাড়া এই বিপদ থেকে রক্ষা নাই। আসগর আলি চোখ বন্ধ করে এক মনে সূরা ফাতেহা পড়ে ফেলল। এই একটা সূরাই তার মুখস্থ।

তোমার নাম কী ?

আসগর আলি ভালোমতো তাকিয়ে দেখে মিলিটারি না। বাঙালি এক লোক তাকে প্রশ্ন করছে। বিশিষ্ট কোনো লোক হবে। তার সঙ্গে আরো লোকজন

আছে। তাদের হাতে ক্যামেরা। আরো কী সব যন্ত্রপাতি। যে প্রশ্ন করছে তার গায়ে রঙচঙা শার্ট। মাথায় হইলদা টুপি। মিলিটারি যমানায় রঙচঙা শার্ট, মাথায় বাহারি টুপি পরে ঘুরে বেড়ানো সহজ ব্যাপার না। যে কেউ পারবে না। আসগর আলি বিনীত গলায় বলল, জনাব আমার নাম আসগর। আমার ছেলের নাম মজনু। আমারা ভালোমন্দ কোনো কিছুর মধ্যে নাই।

টুপিওয়ালা বলল, ভয় পাচ্ছ কেন ? ভয়ের কিছু নেই। আমরা তোমার কিছু কথাবার্তা রেকর্ড করব। টিভিতে প্রচার হবে। টিভি চিন ?

জি জনাব চিনি।

আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের ইন্টারভ্যু নিচ্ছি। ঢাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কোনো ঝামেলা নাই— এইটা বলবে। বুঝেছ ?

জি।

উল্টাপাল্টা কিছু বলবে না। শুধু ভালো ভালো কথা বলবে। যেমন শহর শান্ত। কোনো সমস্যা নাই। দোকানপাট খুলেছে। ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে— এইসব। ঠিক আছে ?

জি।

ওকে, ক্যামেরা।

একজন এসে আসগর আলির মুখের সামনে ক্যামেরা ধরল। একজন ধরল ছাতির মতো একটা জিনিস। টুপিওয়ালা মাইক হাতে প্রায় আসগর আলির গা ঘেঁসে দাঁড়াল। টুপিওয়ালার মুখভর্তি হাসি।

আমরা এখন কথা বলছি ঢাকা শহরের খেটে খাওয়া একজন শ্রমজীবির সঙ্গে। তিনি এবং তার পুত্র এই শহরে দীর্ঘদিন ধরে ঠেলা চালান। ভাই, আপনার নাম কী ?

আমার নাম আসগর। আমার ছেলের নাম মজনু।

ঢাকা শহরে এখন ঠেলা চালাতে আপনার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে ?

জে-না।

শহরের অবস্থা কী ?

অবস্থা ভালো। মাশাল্লাহ। অবস্থা খুবই ভালো।

চারদিকে যা দেখছেন তাতে কি মনে হয়— শহরে কোনো সমস্যা আছে ?

জে-না।

শহরের বর্তমান অবস্থায় আপনি কি সন্তুষ্ট ? আয় রোজগার হচ্ছে ?

জি জনাব। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

ভাই আসগর আলি, আপনাকে ধন্যবাদ।

আসগর কপালের ঘাম মুছল। আল্লাপাকের অসীম দয়ায় বিপদ থেকে অল্পের উপর রক্ষা পাওয়া গেছে। টুপিওয়ালা লোকটা ভালো। সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তাকে একটা সিগারেট দিল। এখানেই শেষ না। পাঁচটা টাকাও দিল। আসগর ভেবেছিল তার মহা বিপদ। এখন দেখা গেল— বড়ই সুখের সময়। আল্লাপাক কখন যে মানুষকে বিপদ দেন, কখন যে বিপদ থেকে উদ্ধার করে পুরস্কার দেন বোঝা মুশকিল। কে ভেবেছিল কোনো পরিশ্রম ছাড়া মুখের কথায় রোজগার হয়ে যাবে। এই জমানায় পাঁচ টাকা কোনো সহজ ব্যাপার না।

খেতে বসে মজনু সিদ্ধান্ত বদল করল। ডিমের সালুন না, সে গরুর মাংস খাবে। আসগর আনন্দিত গলায় বলল, যত ইচ্ছা খা। যেইটা খাইতে ইচ্ছা করে খা। তয় এইখানেও একটা ঘটনা আছে।

মজনু বলল, কী ঘটনা?

আসগর বলল, রিজিক আল্লাপাকের নিজের হাতে। তুই কী খাবি না খাবি সবই আল্লাপাক আগেই ঠিক কইরা রাখছেন। এখন যদি তুই ডিমের সালুন খাস, বুঝতে হবে আল্লাপাক নির্ধারণ কইরা রাখছেন ডিমের সালুন। আর যদি গরুর মাংসের ভুনা খাস, তবে বুঝন লাগব রিজিকে ছিল গো মাংস।

যদি দুইটাই খাই?

তাইলে বুঝতে হবে আল্লাহপাক নির্ধারণ কইরা রাখছেন আমার পেয়ারের বান্দা মজনু মিয়া ডিমের সালুনও খাবে, গো মাংসও খাবে। তোর কি দুইটাই খাইতে মন চাইতেছে?

হুঁ।

খা, দুইটাই খা। অসুবিধা নাই। সবই আল্লাপাকের নির্ধারণ। আমার করনের কিছু নাই। আমি উসিলা। পুরা দুনিয়াটাই তার উসিলার কারখানা।

মজনু মিয়ার খাওয়া দেখে আসগরের ভালো লাগছে। কী আগ্রহ করেই না সে খাচ্ছে! সে খাচ্ছে মাংস দিয়ে কিন্তু ডিমটাও পাতে রেখে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে ডিমটা হাতে নিয়ে দেখছে। আবার থালার এক কোনায় রেখে দিচ্ছে। তার মনে হয় খেতে মায়া লাগছে। আহা বেচারা! পঁচিশে মার্চ রাত থেকে ছাব্বিশে মার্চ সারাদিন-রাত সে ছিল না খাওয়া। তারা বাপ-বেটা লুকিয়ে ছিল গর্তের

ভেতর। মতিঝিলে বিল্ডিং বানানোর জন্যে বড় গর্ত করা হয়েছিল, সেই গর্তে। এই দীর্ঘ সময়ে মজনু একবারও বলে নাই— ভুখ লাগছে। বড়ই বুঝদার ছেলে। আসগর বলল, মাংস স্বাদ হইছে ?

মজনু বলল, হুঁ।

ডিমটা খা।

অখন না। পরে।

মা'র জন্যে তোর কি বেশি পেট পুড়তাছে ?

হুঁ।

আসগর আলি রহস্যময় গলায় বলল, পেট বেশি পুড়লে একটা 'ঘটনা' অবশ্য ঘটানি যায়। আইজও যাওয়া যায়। খাওয়া শ্যাষ কইরা বাসে উঠলাম। চইলা গেলাম। সন্ধ্যার আগে আগে উপস্থিত। এখন বাস চলাচল আছে।

মজনু একদৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ ছলছল করছে। মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে সে আনন্দে কেঁদে ফেলবে। আসগর আলির খাওয়া শেষ হয়েছে। সে টুপিওয়ালা সাহেবের দেয়া সিগারেটটা আরাম করে ধরিয়েছে। দোকানের ছেলেটাকে বলেছে জর্দা দিয়ে একটা পান দিতে। সে মন ঠিক করে ফেলেছে— আজই যাবে। ছেলেটা এত খুশি হয়ে তাকিয়ে আছে। খুশি নষ্ট করা ঠিক না। ছেলেমেয়ের খুশি অনেক বড় জিনিস।

টঙ্গীব্রিজের কাছে মিলিটারি চেকপোস্ট। বাসের সব যাত্রীদের নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মিলিটারিরা যাত্রীদের মালামাল পরীক্ষা করে দেখে। আসগর আলির বাস চেকপোস্টে থামল। বাসের আটত্রিশজন যাত্রীর মধ্যে ছয়জনকে আলাদা করা হলো। কোনোরকম কারণ ছাড়াই তুরাগ নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে তাদের গুলি করা হলো। মৃতদেহগুলি ভাসতে থাকল তুরাগ নদীতে। সেই ছয়জন হতভাগ্যের একজন আসগর আলি। গুলি করার আগমুহূর্তেও সে বুঝতে পারে নি তাকে গুলি করা হচ্ছে। সে তাকিয়েছিল মজনুর দিকে। মজনুর হাতে তার মা'র জন্যে কেনা কচুয়ারঙের শাড়ির প্যাকেট। আসগর আলির একমাত্র দুশ্চিন্তা— মিলিটারিরা শাড়ির প্যাকেট রেখে দিবে না তো ?

সেদিন রাত ন'টায় 'নগরীর হালচাল' অনুষ্ঠানে ঢাকা নগরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের কিছু মানুষের ইন্টারভিউ প্রচার করা হলো। তাদের মধ্যে সরকারি চাকুরে আছেন, ব্যবসায়ী আছেন, গৃহিণী আছেন এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতিভূ হিসেবে

আসগর আলিও আছে। গৃহিণী হাসিমুখে বললেন, শহরের অবস্থা এখন অনেক ভালো। বিশৃঙ্খলার সময় গরুর মাংসের সের হয়েছিল দু'টাকা। এখন সবচে' ভালোটা দেড় টাকায় পাওয়া যায়। পেঁয়াজ এবং লবণের দামও কমেছে।

অনুষ্ঠান শেষ হলো আসগর আলিকে দিয়ে। উপস্থাপক জিজ্ঞেস করলেন, শহরের বর্তমান অবস্থায় আপনি কি সন্তুষ্ট ?

আসগর আলি বলল, জি জনাব। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

আসগর আলির সঙ্গে গলা মিলিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, প্যাকিস্তান জিন্দাবাদ!

গৌরাঙ্গ খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার গায়ে গরম চাদর। সে চোখ বড় বড় করে টিভি দেখছে। সন্ধ্যার পর থেকে যত রাত পর্যন্ত টিভি চলে সে টিভি দেখে। শেষ অধিবেশনে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত হয়— 'পাক সার যামিন সাদবাদ।' গৌরাঙ্গ সুর করে জাতীয় সঙ্গীত গায়। তখন তাকে দেখে মনে হয় সে বেশ আরাম পাচ্ছে। শাহেদের সঙ্গে সে কথা বলে না। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকে। কথা বলে নিজের মনে। বিড়বিড় করে কথা। শাহেদ যখন বলে, 'কী বলছ ?' তখন সে এমন ভঙ্গিতে তাকায় যেন শাহেদ খুবই অন্যায় কোনো কথা বলেছে, যে কথা শুনে সে আহত। গৌরাঙ্গের আরেক সমস্যা হলো, বাথরুমে যখন যায় তখন বাথরুমের দরজা পুরোপুরি খোলা রাখে। দরজা বন্ধ করলে তার নাকি ভয় লাগে।

শাহেদ বুঝতে পারছে, গৌরাঙ্গের বড় ধরনের কোনো মানসিক সমস্যা হয়েছে। তাকে ভালো ডাক্তার দেখানো উচিত। এখন কোথায় ডাক্তার, কোথায় কী ? শহর পুরো এলোমেলো। কখন এই এলোমেলো অবস্থা কাটবে কে জানে! তার বাসার কাছেই যে ফার্মেসি সেখানে মাঝে-মাঝে একজন ডাক্তার বসেন। তার সঙ্গে শাহেদ কথা বলেছে। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, পাগলের দেশে সবাই মানসিক রোগী। এই রোগের কোনো চিকিৎসা নাই। ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন।

ঘুমের ওষুধ গৌরাঙ্গকে রাতে খাওয়ানো হয়। এতে তার ঘুম আসে না। তবে ওষুধ খাবার পর সে মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে কথা বলে। কথার বিষয়বস্তু এলোমেলো, তবে বলার ভঙ্গি স্বাভাবিক।

মিতা, আমি ঠিক করেছি মুসলমান হবো। আসল মুসলমান। তুমি ব্যবস্থা করো। হিন্দু হওয়ার অনেক যন্ত্রণা। আর ভালো লাগে না। তবে দুর্গাপূজা দিতে হবে। বৎসরে একবার তো। চুপেচাপে দিয়ে দিব। তাতে কি কোনো সমস্যা হবে ?

এই জাতীয় প্রশ্নের জবাব দেয়া অর্থহীন। শাহেদ চুপ করে থাকে। গৌরাঙ্গের তাতে সমস্যা হয় না। সে নিজের মনে কথা বলতে থাকে।

মিতা শোন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচে' নিরাপদ জায়গা কোনটা জানো ?

জানি না।

সবচে' নিরাপদ জায়গা হলো, পুরনো ঢাকার হিন্দুবাড়ি। যে-সব বাড়িতে মিলিটারি অ্যাটাক করে মানুষজন মেরে ফেলেছে সেইসব বাড়ি। যেমন ধরো, আমার বাড়ি। দ্বিতীয় দফায় সেইসব বাড়িতে মিলিটারি ঢুকবে না। বুঝেছ মিতা ?

বুঝেছি।

আমি ঠিক করেছি, নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকব। বাড়ির দখল ছেড়ে দেয়া তো ঠিক না। বুদ্ধি ভালো বের করেছি না ?

হুঁ।

তুমিও চলো আমার সঙ্গে। দুই ভাই একসঙ্গে থাকব।

ঘুমাও। রাত অনেক হয়েছে।

রাত হয়েছে বলেই তো আমি ঘুমাব না। মিতা, তোমার তো জানা উচিত আমি রাতে ঘুমাই না, দিনে ঘুমাই। নিজের নাম এখন দিয়েছি— গৌরাঙ্গ প্যাঁচক। নাম ভালো হয়েছে না ?

হুঁ।

মুসলমান হওয়ার পর নাম বদলাতে হবে। মিতা, বলো তো কী নাম দেই ? তোমার নামের সঙ্গে মিল দিয়ে একটা নাম ঠিক করো।

আচ্ছা করব।

করব না, এখন করো।

বিরক্ত করো না তো! নানান যন্ত্রণায় আছি। এখন আর বিরক্তি ভালো লাগে না।

আমি তোমাকে বিরক্ত করি ?

শাহেদ চুপ করে আছে। তার এখন সত্যি সত্যি বিরক্তি লাগছে। গৌরাঙ্গ গলা উঁচিয়ে বলল, বিরক্ত করি ? জবাব দাও, বিরক্ত করি ?

হ্যাঁ, করো।

আর করব না। কাল সকালে আমি চলে যাব।

কোথায় যাবে ?

সেটা আমার বিষয়। তুমি কোনোদিনই আমাকে পছন্দ করো না, সেটা আমি জানি। সকাল হোক। রাস্তায় রিকশা নামলেই আমি বিদায় হবো।

তোমার শরীর ভালো না। এখন পাগলামি করার সময়ও না।

এখন কী করার সময়? বিরক্ত করার সময়। Time of annoyance? আমার নতুন নাম এখন কি গৌরাঙ্গ বিরক্ত দাস? সংক্ষেপে জি বি দাস?

প্লিজ চুপ করো।

না মিতা, আমি চুপ করব না। আমি বিরক্ত করতেই থাকব। যা বিরক্ত করার আজ রাতেই করব। সকালে আমাকে পাবে না।

পরদিন ভোরবেলা গৌরাঙ্গ সত্যি সত্যিই শাহেদের বাসা ছেড়ে চলে গেল। শাহেদকে কিছু বলে গেল না। শাহেদ তখনো ঘুমে। শাহেদের বালিশের কাছে একটা চিঠি লিখে গেল। দু' লাইনের চিঠি—

মিতা, চলে গেলাম।
তুমি ভালো থেকো।

ইতি
গৌরাঙ্গ বিরক্ত দাস

আমার নাম গৌরাঙ্গ বিরক্ত দাস। এখন আমি নিজের বাড়িতে আছি। কী মজা কী মজা! নিজ বাড়িতে বাস করি নিজের মনে খাই। তাই তাই তাই।

গৌরাঙ্গের কাছে মনে হলো, সে আনন্দে আছে। বেশ আনন্দে আছে। তার বাড়ি-ঘর ঠিক আছে। জিনিসপত্রও ঠিক আছে। বুক শেলফের পেছনে হাত দিয়ে সে একটা পুরো ওল্ড স্মাগলারের বোতল পেয়ে গেল। মুখ পর্যন্ত খোলা হয় নি। আধা বোতল রাম পাওয়া গেল। রাম এমন জিনিস যে নষ্ট হয় না। যত দিন যায় ততই তার স্বাদ বাড়তে থাকে। রামের স্বাদ ঠিক আছে কি-না তা দেখার জন্যে বোতল থেকে সরাসরি কয়েক ঢোক খেল। স্বাদ ভালো আছে। শুধু যে ভালো আছে তা-না, স্বাদ জমেছে। হেভি জমেছে। গৌরাঙ্গের মনে হলো, রাম নামে এমন একটা ভালো জিনিস তৈরি হয়েছে অথচ লক্ষণ নামে কিছু তৈরি হয় নি। লক্ষণ নামে কিছু থাকলে সে দুই ভাইকে পাশে নিয়ে বসতো। এক চুমুক রাম, এক চুমুক লক্ষণ— বাহ্ কী আনন্দ!

সদর দরজা বন্ধ। বাড়ির জানালাগুলিও বন্ধ। ঘর দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে আছে। এই ভালো। অন্ধকারের আলাদা আনন্দ আছে। মানুষ এমন এক জীব যে আনন্দ পেতে চাইলে আনন্দ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। এই যে গৌরাঙ্গ আনন্দ পাচ্ছে। সে বসার ঘরে কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসেছে। তার কাছে এখন মনে হচ্ছে, সংসার আগের মতোই আছে। নীলিমা উপরের তলায় তার বাবার কাছে গেছে। সঙ্গে রুনিকে নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই গৌরাঙ্গের সঙ্গে কোনো ঝগড়া হয়েছে। রাগ করে বাবার কাছে গিয়ে বসে আছে।

মেয়েদের এই স্বভাব— ঝগড়া মাথার ভেতর রেখে দেয়। পুরুষমানুষ এই কাজ কখনো করে না। যখন ঝগড়া হবে পুরোপুরি হবে। পাঁচ-দশ মিনিটে ভুলে যাবে। মেয়েরা ভুলবে না। তারা পাঁচ-দশ বছর ঝগড়া মাথায় রেখে দিবে।

গৌরাঙ্গ রামের বোতলে আরো কয়েক বার চুমুক দিল। প্রায় খালি বোতল রেখে দেবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া আজ দুপুরে খাওয়ার কোনো ব্যবস্থাও নেই। এই জিনিস পেটে থাকলে ক্ষিধে লাগবে না।

ঘরে পিন পিন করছে মশা। তবে মশাগুলি ভালো। তাকে কামড়াচ্ছে না। দিনের মশা কামড়ায় না। রাতের মশা কামড়ায়। ব্যথা লাগে চামড়ায়। বাহ্ ভালো কবিতা হয়েছে তো! দিনের মশা কামড়ায় না, রাতের মশা কামড়ায়, ব্যথা লাগে চামড়ায়।

কবিতাটা রুনিকে বললে মজা হতো। মেয়েটা কবিতা পছন্দ করে। মেয়েটা এখন আছে তার দাদুভাইয়ের কাছে। দাদুভাইয়ের নাম— হরিভজন সাহা। সমাসের ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর হরিভজন। হরিকে যে ভজন করে হরিভজন। যা ব্যাটা হরিকে ভজন করতে থাক, এদিকে সংসার শেষ।

মশারা এখন গৌরাঙ্গকে কামড়াতে শুরু করেছে। ভালো যন্ত্রণা হয়েছে তো! আচ্ছা ঘরে কি ধূপ আছে? ধূপের ধোঁয়ায় মশা থাকে না। আছে তো বটেই। নীলিমা যেমন ধর্ম-কর্ম করা মহিলা, প্রতি সন্ধ্যাবেলায় মহাদেবের পটে সে ধূপের ধোঁয়া দেয়। পটে মাথা ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রার্থনা করে। কী প্রার্থনা করে? হে দেবাদিদেব মহাদেব। তুমি আমার সংসার সুখে রাখো। মহাদেবকে এত ধোঁয়া খাইয়েও লাভ হয় নি। সংসার মিলিটারি ছারখার করে দিয়েছে। সব শেষ করে একজনকে বাঁচিয়ে রেখেছে মশার কামড় খাওয়ানোর জন্যে। গৌরাঙ্গ বোতলে লম্বা চুমুক দিয়ে মনে মনে বলল, খা মশা খা। হিন্দুর রক্ত খা।

গৌরাঙ্গ চিন্তিত বোধ করছে। চিন্তা-ভাবনা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। মাতাল অবস্থায় কষ্টের কথা ভাবলে কষ্ট দশগুণ বেড়ে যায়। আবার আনন্দের কথা ভাবলে আনন্দ বাড়ে মাত্র দুইগুণ। এই বিচার ঠিক হয় নাই। কষ্ট দশগুণ বাড়লে আনন্দও দশগুণ বাড়া উচিত। গৌরাঙ্গ আনন্দের ভাবনা ভাবতে শুরু করল। যেন তার পেছনে তার পিঠে হেলান দিয়ে রুনি বসে আছে। (রুনি প্রায়ই এ রকম করে। বাবার পিঠে হেলান দিয়ে নিজের মনে পুতুল নিয়ে খেলে। গুট গুট করে কথা বলে। এই সময় সে রুনির মুখ দেখতে পায় না।) এখনো যেন সে রকম হচ্ছে।

ও রুনি, কী করো মা?

গৌরাঙ্গের মনে হলো রুনি ক্ষীণস্বরে জবাব দিয়েছে। জবাবটা স্পষ্ট না বলে গৌরাঙ্গ শুনতে পায় নি।

মাগো, গল্প শুনবে?

হুঁ।

কিসের গল্প শুনবে মা?

মশার গল্প।

গৌরাঙ্গ চমকে উঠল কারণ 'মশার গল্প' এই বাক্যটা সে স্পষ্ট শুনেছে। রুনি যেমন প্রতিটি শব্দ টেনে টেনে বলে, মশা শব্দটাও টেনে টেনে বলেছে— ম...শা...া...া। সে কি পেছন ফিরে দেখবে রুনি সত্যি সত্যি তার পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসে আছে কি-না ? থাক দরকার নেই, তারচে' বরং মশার গল্প করা যাক।

মাগো শোন, এই পৃথিবীতে আগে মশা ছিল না। কীভাবে মশার জন্ম হলো সেই গল্প শোন। জেলেরা সারারাত মাছ ধরে। কিন্তু রাতে তাদের খুব ঘুম পায়। প্রায়ই দেখা যায় মাছ ধরতে গিয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। একদিন তারা দেবী শীতলাকে বলল, ও দেবী, তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও না যেন আমাদের রাতে ঘুম না পায়। দেবী বললেন, তথাস্তু। বলেই নিজের বাম হাত থেকে কিছু ময়লা জেলেদের হাতে দিয়ে বললেন, এই ময়লা তোরা তোদের বাড়ির কাছের ডোবায় ফেলে দিয়ে আসবি। এতেই কাজ হবে। রাতে আর তোদের ঘুম হবে না। তারা তাই করল। দেবীর হাতের ময়লা নিয়ে ডোবায় ফেলল। ওম্নি ডোবা থেকে পিন পিন করতে করতে হাজারে বিজারে মশা বের হয়ে এলো। এরপর কী হলো শোন। জেলেরা মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরতে গিয়ে ঘুমুতে পারে না। তাদের সারা রাত মশা কামড়ায়।

গৌরাঙ্গ রামের বোতলের পুরোটা গলায় ঢেলে দিল। এখন তার মাথা ঘুরছে। শরীর যেন কেমন করছে। বমি হবে কি ? হলে হবে। কী আর করা! দরজায় খট করে শব্দ হলো। গৌরাঙ্গ চমকে তাকাল। কী আশ্চর্য নীলিমা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে! অবশ্যই চোখের ভুল। রাম বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। গৌরাঙ্গ বিড়বিড় করে বলল, নীলিমা কেমন আছ ?

নীলিমা জবাব দিল না। দরজায় ওপাশে সামান্য সরে গেল। এখন আর তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবে শাড়ির আঁচল দেখা যাচ্ছে। বাতাসে যে শাড়ির আঁচল কাঁপছে তাও বোঝা যাচ্ছে। গৌরাঙ্গের হঠাৎ মনে হলো, এখন সে যা দেখছে তাই সত্যি। আগে যা ঘটেছে তা সত্যি না। সে হড়হড় করে বলল, কয়েকদিন বাসায় ছিলাম না। শাহেদের ওখানে ছিলাম। শাহেদ ভালো আছে।

নীলিমা জবাব দিল না। গৌরাঙ্গ বলল, তুমি কি রাগ করেছো না কি ? এখন সময় খারাপ। এখন রাগ করা ঠিক না। তুমি এক কাজ করো, অল্প কিছু জিনিসপত্র ব্যাগে গুছিয়ে নাও। তোমাকে আর রুনিকে নিয়ে বর্ডার পাস করে আগরতলা চলে যাব। অনেকেই যাচ্ছে। সমস্যা নাই।

এই এই!

কে বলল— এই এই ? নীলিমা বলেছে ? তাহলে তো ব্যাপারটা স্বপ্ন না। যা ঘটছে, বাস্তবেই ঘটছে। অবশ্যই বাস্তব। নীলিমার চুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

সে গন্ধরাজ না কী তেল মাথায় দেয়। অনেক দূর থেকে সেই গন্ধ পাওয়া যায়। গন্ধরাজ নাম সার্থক।

কে কথা বলছে ? নীলিমা তুমি ?

হুঁ।

দূরে কেন ? কাছে এসো ?

নীলিমা বলল, তুমি কোথায় বসেছ জানো ?

গৌরাঙ্গ অবাক হয়ে বলল, কোথায় বসেছি ?

তাকিয়ে দেখো।

গৌরাঙ্গ তাকিয়ে দেখল। সে সোফায় বসে নি। সোফায় হেলান দিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসেছে। গৌরাঙ্গ বলল, মেঝেতে বসেছি। সামান্য ধুলা আছে।

ভালো করে দেখো। কালো দাগ দেখতে পাচ্ছ না ?

পাচ্ছি। কিসের দাগ ?

কিসের দাগ তুমি জানো না ?

না।

রক্ত শুকিয়ে গেলে কালো দাগ হয়, তুমি জান না ?

গৌরাঙ্গ অবাক হয়ে কালো দাগ দেখছে। তার হাত-পা শিরশির করছে। বুকে চাপা যন্ত্রণা। কেমন যেন লাগছে। গৌরাঙ্গ বিড়বিড় করে বলল, পানি খাব। পানি।

নীলিমা দরজায় আড়াল থেকে সরে গেল। সে কি পানি আনতে গিয়েছে ? গৌরাঙ্গ পানির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বমি করল। কালো দাগগুলি এখন বমিতে ঢাকা পড়েছে। ভালো হয়েছে। বেশ ভালো হয়েছে।

ঘর নষ্ট হয়েছে। তাতে অসুবিধা নেই। এই ঘরে সে তো থাকছে না। সে মেয়েকে আর স্ত্রীকে নিয়ে বর্ডার ক্রস করে আগরতলা যাবে। কোলকাতা যেতে পারলে ভালো হতো। আত্মীয়স্বজন আছে। আগরতলায় পরিচিত কেউ নেই। তাতে অসুবিধা হবে না। অনেকগুলি ক্যাশটাকা তার সঙ্গে আছে। উঁহু ভুল হয়েছে। তার সঙ্গে নেই। সে টাকা শাহেদের কাছে রেখে এসেছে। শাহেদের কাছে টাকা রাখা আর ব্যাংকে টাকা রাখা সমান। বরং ব্যাংকে রাখার চেয়েও ভালো। ব্যাংক ছুটির দিন বন্ধ থাকে। শাহেদকে সবদিনই পাওয়া যাবে। শুধু একটাই সমস্যা— শাহেদ সারাদিন পথে পথে ঘোরে। কখন গুলি করে মিলিটারি তাকে মেরে ফেলবে কে জানে!

গৌরাঙ্গ চাপা গলায় ডাকল, নীলিমা নীলিমা।

মনে হলো অনেক দূর থেকে নীলিমা বলল, কী ?

আচার্য ভবতোষ বাবুর ঠিকানা কি তোমার কাছে আছে ?

হুঁ।

উনার ঠিকানা লাগবে। বর্ডারের দিকে রওনা হবার সময় ভবতোষ বাবুর কাছে থেকে তিনটা রক্ষা কবচ নিব। তোমার জন্যে, রুনির জন্যে আর আমার জন্যে। রক্ষা কবচ গলায় থাকলে আর কোনো ভয় নেই।

হুঁ।

তোমার বাবাকে যে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে, এতে এক দিক দিয়ে ভালো হয়েছে। উনি বেঁচে থাকলে উনাকে নিয়ে বর্ডার ক্রস করা মুশকিল হতো। বুড়ো মানুষ হাঁটতে পারত না। তুমি তোমার বাবার মৃত্যু নিয়ে মন খারাপ করবে না। বয়স হয়েছে, মারা গেছেন। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে এইটাই সমস্যা। প্রেতযোনী প্রাপ্ত হবেন। তাঁর নামে পিণ্ডি দিতে হবে। সব ব্যবস্থা আমি করব। মোটেই চিন্তা করবে না।

আচ্ছা।

পানি আনো। কুলি করব।

গৌরাঙ্গ দেখছে নীলিমা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না। তার চেহারাও অস্পষ্ট। তাহলে সে কি মদের ঝোঁকে চোখে ভুল দেখছে ? গৌরাঙ্গ এবার হতাশ গলায় মেয়েকে ডাকতে লাগল। রুনি ! ও রুনি ! রুনি !

নেশা কেটে যাবার পর গৌরাঙ্গ পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেল। তৃপ্তি করে গোসল করল। চাল-ডালের খিচুড়ি রাঁধল। খিচুড়ি রাঁধার ব্যাপারটা সে শাহেদের কাছে শিখেছে। রান্না এত সহজ তা সে আগে বুঝতে পারে নি। আগে বুঝতে পারলে নীলিমার কাছ থেকে দু'একটা রান্না শিখে রাখত। ইলিশ মাছের পাতুরি শিখে রাখতে পারলে কাজের কাজ হতো।

গৌরাঙ্গ নিজের রান্না খুবই আনন্দ করে খেল। শাহেদের জন্যে তার সামান্য মন খারাপ হলো। শাহেদ এই খিচুড়ি খেলে মজা পেত। সে খিচুড়িতে বুদ্ধি করে তরকারির চামচে এক চামচ ঘি ঢেলে দিয়েছে। শুকনা মরিচের গন্ধের সঙ্গে ঘিয়ের গন্ধ মিলে অসাধারণ গন্ধ বের হচ্ছে। শাহেদ পাশে থাকলে গল্প করতে করতে খাওয়া যেত। সে বলত, মিতা খিচুড়ি কেমন হয়েছে ? তোরটার চেয়ে ভালো না ?

শাহেদ অবশ্যই বলতো, ভালো।

সে বলতো, বল দেখি ভালো খিচুড়ির পেছনে কার ভূমিকা প্রধান ? দশ টাকা বাজি, তুই বলতে পারবি না। তুই হয়তো ভাবছিস, তোর অবদান। আসলে তা না।

তাহলে কার অবদান ?

নীলিমার অবদান। সে প্রতিটা জিনিস গুছিয়ে রেখেছে বলে এত মজার খিচুড়ি খাওয়া যাচ্ছে। চাল-ডাল-মসলাপাতি-তেল-ঘি সবই আছে। মিউজিয়ামে জিনিসপত্র যে রকম যত্ন করে সাজিয়ে রাখে, সেইভাবে রাখা আছে।

শাহেদ বলতো, ভাবিকে সবসময় দেখেছি, গোছানো মহিলা।

সে বলতো, গোছানো এক জিনিস, আর নীলিমা অন্য জিনিস। বল দেখি, ঘরে কয় পদের ডাল ? বলতে পারলে দশ টাকা বাজি।

বলতে পারব না।

ডাল আছে চার পদের। মসুরি, মাষকলাই, মুগ এবং বুটের ডাল। মধু খেতে চাস ? মধু আছে দুই রকমের। সুন্দরবনের মধু, হামদর্দের ওষুধ টাইপ মধু। খাবি একটু মধু ? খিচুড়ি শেষ করে এক চামচ খা। ডেজার্ট হিসেবে খা।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে গৌরাঙ্গ লম্বা একটা ঘুম দিল। ঘুম থেকে উঠল সন্ধ্যা পার করে। সে কোনো বাতি জ্বালালো না। টিভি চালিয়ে কিছুক্ষণ টিভি দেখল। সামরিক আইন প্রশাসকের নির্দেশ প্রচারিত হচ্ছে। সে খুব চেষ্টা করল নির্দেশগুলি মনে রাখতে। নির্দেশ পুরোপুরি পালন করতে হবে। যে দেশে সে বাস করে, তাকে তো সেই দেশের নিয়মই মানতে হবে।

টিভি দেখার পর সে ট্রানজিস্টার রেডিও নিয়ে বসল। ট্রানজিস্টারের নব ঘুরানোয় মজা আছে। এই শোনা যাচ্ছে রেডিও পিকিং চ্যাও ম্যাও ক্যাঁও। এই বাংলা সংবাদ। এই আবার চিং মিং পিং। ট্রানজিস্টারের নব ঘুরাতে ঘুরাতেই সে আকাশবাণী শিলিগুড়ি ধরে ফেলল। সেখানে বলা হচ্ছে— স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়েছে। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং সর্বাধিনায়ক হয়েছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানী। তারিখ দশই এপ্রিল।

গৌরাঙ্গের মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল তার পরদিন। তাকে দেখা গেল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। যে কাউকে দেখলেই এগিয়ে যাচ্ছে। গলা নিচু করে বলছে— বলুন দেখি, বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নাম কী ? এক মিনিট সময়। এক মিনিটের ভিতর বলতে পারলে পুরস্কার আছে। বলতে পারছেন না ? সহজ প্রশ্ন করি বলেন দেখি, আমার মেয়ের নাম কী ? তিনটা চান্স দেব। তিন চান্সে বলতে পারলে পাশ।

শাহেদের চেহারায় পাগল পাগল ভাব চলে এসেছে। চোখ হলুদ, চোখের নিচে গাঢ় কালি। ছয় সাত দিন হলো দাড়ি কামানো হয় নি। একটা সার্ট পরে আছে যার মাঝের একটা বোতাম নেই। জায়গাটা ফাঁক হয়ে আছে— মাঝে মাঝেই পেট দেখা যাচ্ছে। পাগলের এলোমেলো ভাব তার চলাফেরার মধ্যেও চলে এসেছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। আজ এপ্রিল মাসের দশ, এখনো সে আসমানীর কোনো খবর বের করতে পারে নি। তার রোজকার রুটিন হলো, ঘুম থেকে উঠেই কলাবাগানে চলে যাওয়া। তার শাশুড়ি এসেছেন কিনা কিংবা কেউ কোনো খবর পাঠিয়েছে কিনা সেই খোঁজ নেয়া। তারপর তার অফিসে যাওয়া। তার অফিস খুললেও সেখানে বলতে গেলে কোনো লোকজন নেই, কাজকর্মও নেই। বি হ্যাপী স্যারের কোনো খোঁজ নেই। সম্ভবত তিনি পাকিস্তান চলে গেছেন। শাহেদ অফিসে তার নিজের ঘরে বসে কয়েক কাপ চা খেয়ে বের হয়ে পড়ে এবং বেলা দু'টা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে। তার সারাক্ষণই মনে হয় এই বুঝি রুনি চেঁচিয়ে ডাকবে— 'বাবা! বাবা!'

কেউ ডাকে না। দুপুর দু'টায় কোনো একটা হোটেলে ভাত খেতে বসে— তখন মনে হয়, আসমানীরা বাড়ি ফিরে এসেছে। আসমানী তার স্বভাবমতো ঝাড়মোছ শুরু করেছে। রুনি বারবার বারান্দায় আসছে। আসমানী তাকে কঠিন বকা দিচ্ছে, 'খবরদার বারান্দায় যাবি না।' এখন সময় খারাপ। মা'র বকা খেয়ে রুনির ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে কিন্তু সে কাঁদছে না।

এই জাতীয় চিন্তা মাথায় এলে আর ভাত খেতে ইচ্ছা করে না। শাহেদ আধখাওয়া অবস্থায় হাত ধুয়ে উঠে পড়ে। দ্রুত বাসায় যেতে হবে। সে বাসায় ফিরে এবং দেখে দরজায় ঠিক আগের মতো তালা ঝুলছে। গৌরাঙ্গেরও কোনো খোঁজ নেই। সে কোথায় গিয়েছে কে জানে!

শাহেদ তার অফিসে চেয়ারে পা তুলে জবুথবু হয়ে বসে আছে। তার সামনে চায়ের কাপ। এক চুমুক দিয়ে সে কাপ নামিয়ে রেখেছে আর মুখে দিতে ইচ্ছে

করছে না। অথচ চা-টা খেতে ভালো হয়েছে। গতরাতে তার এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। একবার তন্দ্রার মতো এসেছিল, তখন ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছে। প্রকাণ্ড একটা ট্রাক। মিলিটারি ট্রাক। ট্রাকভর্তি একদল শিশু। সবাই চিৎকার করে কাঁদছে। শিশুদের মধ্যে আছে রুনি। রুনি চিৎকার করে কাঁদছে না, তবে ফ্রকের হাতায় ক্রমাগত চোখ মুছছে। একজন মিলিটারি মেশিনগান তাক করে শিশুগুলির দিকে ধরে আছে। মিলিটারির মুখ হাসি হাসি। স্বপ্ন দেখে শাহেদ ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসেছে, তারপর আর ঘুম আসে নি।

এখন ঘুম ঘুম পাচ্ছে, ইচ্ছা করছে অফিসের চেয়ারেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে। অফিসের পিওন মোশতাক খবরের কাগজ এনে টেবিলে রাখল। মোশতাক বিহার প্রদেশের লোক। চমৎকার বাংলা জানে। এতদিন সে বাংলাতেই কথা বলত— এখন উর্দুতে কথা বলে। মোশতাকের গলায় নকশাদার নীল রুমাল বাঁধা। শাহেদ লক্ষ করেছে, বিহারিরা এখন কেন জানি গলায় রঙিন রুমাল বাঁধছে। হয়তো আগেও বাঁধত— চোখে পড়ত না। এখন চোখে পড়ছে কারণ বিহারিদের এখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। বিহারিরা আলাদা হয়ে পড়েছে। তারা যোগ দিয়েছে মিলিটারিদের সঙ্গে। বাঙালির দুর্দশায় তারা বড় তৃপ্তি পাচ্ছে। হয়তো তাদের ধারণা, মিলিটারি সব বাঙালি শেষ করে এই দেশটাকে বিহার রাজ্য বানিয়ে দিয়ে যাবে।

শাহেদের ঝিমুনি চলে এসেছিল— মোশতাকের খুকখুক কাশিতে নড়েচড়ে বসল। মোশতাক গায়ে আতর দিয়েছে। আতরের বোটকা গন্ধ আসছে। চোখে সুরমা দেয়া হয়েছে। সুরমা অবশ্যি সে আগেও দিত। বিহারিদের সুরমাপ্রীতি আছে। শাহেদ বলল, কিছু বলবে মোশতাক?

মোশতাক দাঁত বের করে হাসল।

দেশের খবরাখবর কী বলো?

বহুত আচ্ছা জনাব। বহুত খুব।

মিলিটারি সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছে?

গাদ্দার সব খতম হো গিয়া। আল্লাহ্ কা মেহেরবানি।

পুরানা গাদ্দার হয়তো খতম হয়েছে— নতুন গাদ্দার তৈরি হয় কি-না কে জানে।

আউর কুছ নেহি হোগা। ইন্ডিয়া খামোস রাহেগা— কিউকে চায়না হ্যায় হামলোগকো সাথ।

শাহেদ হাই তুলতে তুলতে বলল, এখন যাও তো মোশতাক— আমি ঘুমাব।

তবিয়ত আচ্ছা নেহি ?

শাহেদ জবাব দিল না। সস্তা আতরের গন্ধে তার গা গুলাচ্ছে। এইসব আতর তৈরি হয়েছে ডেডবডির গায়ে ঢালার জন্যে। জীবিত মানুষদের জন্য নয়।

মোশতাক চলে গেল। দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে গল্পগুজব করার তার বোধহয় ইচ্ছা ছিল। বিহারিরা বাঙালিদের মতোই আড্ডাবাজ।

শাহেদ খবরের কাগজ হাতে নিল। দুই পাতার 'দৈনিক পাকিস্তান' বের হচ্ছে। খবর বলতে কিছুই নেই। অভ্যাসবশে চোখ বুলিয়ে যাওয়া—

> দেশের পাঁচজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সেনাবাহিনীর কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য। অখণ্ড পাকিস্তানে যারা বিশ্বাসী নয় তাদের ব্যাপারে জনগণকে তাঁরা সদা প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছেন।...

খোলাবাজারে চালের দাম স্থিতিশীল

সচিত্র প্রতিবেদন। এক বেপারির হাসিমুখের ছবিও ছাপা হয়েছে। বেপারি দাঁড়িপাল্লায় চাল ওজন করছে। তার হাসিমুখ দেখে মনে হচ্ছে চালের ব্যবসা করে এত আনন্দ সে কোনোদিন পায় নি।

সুইজারল্যান্ডে বাস খাদে পড়ে চারজন নিহত

বিশাল রিপোর্ট। ক্রেন দিয়ে বাস তোলার ছবিও আছে।

শাহেদের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। যে দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ কুৎসিতভাবে মারা যাচ্ছে, সে দেশের একটি পত্রিকায় কী করে সুইজারল্যান্ডে বাস খাদে পড়ার ছবি ছাপায় ? চারজন কেন, চারশ জন মারা গেলেও তো সেই ছবি ছাপা উচিত না। পত্রিকাটা কি সে দলামচা করে ডাস্টবিনে ফেলবে ? কী হবে তাতে।

শাহেদ ভাই আছেন না-কি ?

দরজা ঠেলে দেওয়ান সাহেব ঢুকলেন। দেওয়ান সাহেবের মুখভর্তি পান। হাতে সিগারেট। মনে হয় তিনি খুব আয়েশ করে সিগারেট টানছেন। তার মুখ হাসি হাসি।

শরীর খারাপ না-কি শাহেদ ?

জি-না।

দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে একেবারে দেখি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। ভাবির কোনো খবর পেয়েছেন ?

জি-না।

দেশের বাড়িতে খবর নিয়েছেন ?

জি-না।

ঢাকা থেকে যারা পালিয়েছে, তাদের বেশিরভাগই কোনো না কোনোভাবে দেশের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে। আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?

ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চলে। অনেক দূরের দেশ। এত দূরে একা একা আসমানী যাবে না।

ক্ষিধে পেলে বাঘ ধান খায়। ভয় পেলে বাঙালি একা একা অনেক দূর যায়।

ও আমাকে ফেলে রেখে কোথাও যাবে না। আমার ধারণা, সে ঢাকা কিংবা ঢাকার আশপাশেই আছে।

দেওয়ান সাহেব চেয়ার টেনে বসলেন। শাহেদ অবাক হয়ে লক্ষ করল, ভদ্রলোক আনন্দিত ভঙ্গিতে পা নাচাচ্ছেন।

শাহেদ ভাই!

জি।

তখন যদি আমার কথা শুনতেন, তাহলে আজ আর এই সমস্যা হতো না।

আপনার কী কথা ?

ভুলে গেছেন ? শেখ সাহেবের ৭ই মার্চের ভাষণের পরদিন আপনাকে বললাম না ? ফ্যামিলি দেশে পাঠিয়ে দেন— সিচুয়েশন ভেরি গ্রেভ।

বলেছিলেন নাকি ?

অবশ্যই বলেছিলাম। অফিসের এমন লোক নেই— যাকে আমি এই সাজেশন দেই নি। গরিবের কথা বাসি হলে ফলে। আমার কথা বাসি হয়েছে তো— তাই ফলেছে। টাটকা অবস্থায় ফলে নি। বললে বিশ্বাস করবেন না— আপনার ভাবি কিছুতেই দেশে যাবে না। ঝগড়া, চিৎকার, কান্নাকাটি। বলতে গেলে জোর করে তাকে লঞ্চে তুলে দিয়েছি। তুলে দিয়েছি বলে আজ ঝাড়া হাত-পা। যদি সেদিন লঞ্চে না তুলতাম— আজ আমার অবস্থাও আপনার মতো হতো। শাহেদ ভাই!

জি।

আজ আমার সঙ্গে চলেন এক জায়গায়।

কোথায় ?

খুব কামেল একজন মানুষ আছেন— সবাই 'ভাই পাগলা' ডাকে। অলি টাইপের মানুষ। তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।

তাঁর কাছে গেলে কী হবে ?

ওলি টাইপ মানুষ। তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রচুর। চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবেন ভাবি এখন কোথায় ?

শাহেদ চুপ করে রইল। দেওয়ান সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, হুজুরের কাছে খুব ভিড়। নিরিবিলি কথা বলাই মুশকিল। আমার কানেকশান আছে— ব্যবস্থা করব। যাবেন ?

জি-না।

ক্ষতি তো কিছু হচ্ছে না— এরা কামেল আল্লাহওয়ালা আদমি।

শাহেদ বিরক্ত মুখে বলল, আমি পীর ফকিরের কাছে যাব না।

বিপদে পড়লে মানুষ 'গু' পর্যন্ত খায়, আর আপনি যাবেন একজন কামেল মানুষের কাছে। উনার কাছে পাকিস্তানি মিলিটারিরাও যায়। হাইলেভেলের অফিসারদের আনাগোনা আছে।

একবার তো বলেছি যাব না। কেন বিরক্ত করছেন ?

যাবে না বলার পরও শাহেদ 'ভাই পাগলা' পীর সাহেবের কাছে এসেছে। দেওয়ান সাহেব তাঁর কথা রেখেছেন। পীর সাহেবের সঙ্গে নিরিবিল কথা বলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পীর সাহেব বসে আছেন তাঁর খাস কামরায়। ছোট্ট ঘরের মাঝখানে কার্পেটের উপর হাঁটুমুড়ে তিনি বসে। তাঁর সামনে পানের বাটা ভর্তি পান।

পীর সাহেব পান চিবুচ্ছেন। পানের রস ফেলার জন্য পিকদান আছে। পিকদানটা মনে হচ্ছে রুপার। ঝকমক করছে। একটু পর পরই পিকদানে পিক ফেলছেন। তাঁর ডানহাতে বড় বড় দানার এক তসবি। সেই তসবি দ্রুত ঘুরছে। পীর সাহেব যখন কথা বলছেন তখনো তসবি ঘুরছে। সম্ভবত কথা বলা এবং আল্লাহর নাম নেয়ার দুটো কাজই তিনি এক সঙ্গে করতে পারেন। ভাই পাগলা পীর সাহেবের বয়স অল্প। তাঁর মুখভর্তি ফিনফিনে দাড়ি। সেই দাড়ি সামান্য বাতাসেই কাঁপছে। পীর সাহেবের গলার স্বর অতিমধুর।

আপনার কন্যা এবং স্ত্রীর কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না ?

জি-না।

স্ত্রীর বয়স কত ?

বাইশ তেইশ। (স্ত্রীর বয়স জানার প্রয়োজন কী শাহেদ বুঝতে পারছে না)

দেখতে কেমন ? (দেখতে কেমন দিয়ে প্রয়োজন কী ?)

জি, ভালো।

নাম বলেন।

আসমানী।

ভালো নাম বলেন।

নুশরাত জাহান।

ভাই পাগলা চোখ বন্ধ করলেন। মিনিট পাঁচ ছয় তিনি চোখ বন্ধ অবস্থাতেই থাকলেন। তাঁর হাতের তসবি অতি দ্রুত ঘুরতে লাগল। তিনি এক সময় চোখ মেলে বললেন, চিন্তার কিছু নাই, সে ভালো আছে।

ভালো আছে ?

হুঁ। আপনার কন্যাও মাশাল্লাহ্ ভালো আছে।

তারা কোথায় আছে ?

ঢাকা শহরে নাই। শহর থেকে দূরে। ঢাকা থেকে নদী পথে গিয়েছে।

শাহেদ মনে মনে বলল, চুপ কর ব্যাটা ফাজিল। ঢাকা থেকে যারা বের হয়েছে, তাদের সবাই নদী পথেই গিয়েছে। আকাশপথে কেউ যায় নাই। ব্যাটা বুজরুক।

ভাই পাগলা বললেন, তারা আছে এক দোতলা বাড়িতে। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। জবা ফুল।

শাহেদ মনে মনে বলল, ব্যাটা থাম।

তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আপনার দেখা হবে না।

তাই নাকি ?

জি। আপনার স্ত্রী তো সন্তানসম্ভবা। আপনার আরেকটি কন্যাসন্তান হবে।

শুনে খুব ভালো লাগল। হুজুর, আজ তাহলে উঠি ?

ভাই পাগলা তাঁর পা বাড়িয়ে দিলেন— কদমবুসির জন্য। শাহেদ কদমবুসি করল না। লোকটির বুজরুকিতে তার মাথা ধরে গেছে।

ভাই পাগলা পীর সাহেবের কাছ থেকে ফেরার পথে সে মিলিটারির হাতে ধরা পড়ল। নাটকীয়তাবিহীন একটা ঘটনা। দেওয়ান সাহেবকে বিদায় দিয়ে সে সিগারেট কেনার জন্য পান-সিগারেটের দোকানে গিয়েছে। এক প্যাকেট সিজার্স সিগারেট কিনে টাকা দিয়েছে, তখন তার পাশে এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। বাঙালি ভদ্রলোক। তিনি সহজ গলায় বললেন, আপনার নাম কী ?

শাহেদ বলল, নাম দিয়ে কী করবেন?

লোকটি নিচু গলায় বলল, আপনি একটু আসুন আমার সঙ্গে।

কেন?

দরকার আছে। বিশেষ দরকার।

শাহেদ তার সঙ্গে রাস্তা পার হলো। রাস্তার ওপাশে একটা মিলিটারি জিপ দাঁড়িয়ে আছে তা সে লক্ষ করে নি।

শাহেদকে জিপে উঠতে হলো।

মিলিটারি জিপগুলো সাধারণ জিপের মতো না। লম্বাটে ধরনের। বসার জায়গায় গদি বিছানো না— লোহার সিট। জিপটা সম্ভবত রঙ করা হয়েছে। নতুন রঙের কড়া গন্ধ। গা গুলিয়ে উঠছে। শাহেদকে ধাক্কা দিয়ে জিপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে— সে পিছলে পড়ে যেত অন্ধকারে, কেউ একজন তাকে ধরল, সিটে বসিয়ে দিল। শাহেদ মনে মনে বলল, ধন্যবাদ। ইংরেজিতে 'থ্যাংক য়্যু' শব্দ করে বলা যায়। বাংলা 'ধন্যবাদ' মনে মনে বলতেই ভালো লাগে।

অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও শাহেদ বুঝতে পারছে জিপ ভর্তি তার মতো সাধারণ মানুষ। মানুষগুলো ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। ভীত মানুষের গা থেকে এক ধরনের গন্ধ বের হয়। সেই গন্ধ সূক্ষ্ম হলেও কটু ও ভারি। ভয়ের গন্ধ মানুষের স্নায়ুকে অবশ করে দেয়।

জিপ চলতে শুরু করেছে। মিলিটারি গাড়ি খুব দ্রুত চলে বলে যে জনশ্রুতি তা ঠিক না। জিপটা খুব আস্তে চলছে। জিপের সাসপেনশনও খুব খারাপ। গাড়ি খুব লাফাচ্ছে। জিপের ছাদে লোহার রডে শাহেদের মাথা ঠেকে গেল। শাহেদ যার পাশে বসেছে সেই ভদ্রলোক আশ্চর্যরকম মিষ্টি গলায় বললেন, এই ডাণ্ডাটা শক্ত করে ধরে বসে থাকুন। তিনি অন্ধকারেই শাহেদের হাত ধরে ডাণ্ডা দেখিয়ে দিলেন। কিছু কণ্ঠস্বর আছে একবার শুনলেই আবার শুনতে ইচ্ছে করে। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর সে-রকম। সেই কণ্ঠস্বর আবারো শোনার জন্য শাহেদ বলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ভদ্রলোক বললেন, জানি না। গাড়ি এখন মিরপুর রোডে পড়েছে।

শাহেদ বলল, আমাদের ধরেছে কেন?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। জিপ আবারো বড় রকমের ঝাঁকুনি খেল। শাহেদ জিপের ডাণ্ডা শক্ত করে ধরেছিল বলে ব্যথা পেল না। যে ঝাঁকুনি তাতে ছিটকে পড়ে যাবার কথা।

মিলিটারিরা রাস্তাঘাট থেকে লোকজন ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন ? তাদের উদ্দেশ্যটা কী ? শাহেদ তাকে ধরার কারণ কিছুতেই বের করতে পারছে না। সে কোনো রাজনৈতিক নেতাও না, কর্মীও না। লেখক না, কবি না, গায়ক না। সামান্য একজন। নিজের পরিবারের বাইরে কেউ তাকে চেনে না। মিলিটারির লোকজন তাকে চিনল কী করে ? এই কদিনের দুঃখে, কষ্টে, চিন্তায়, দুর্ভাবনায় তার চেহারা কি ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে ? তাকে দেখলেই কি মনে হয় সে ভয়ঙ্কর কিছু করবে ? ভয়ঙ্কর কিছু করার ক্ষমতা শাহেদের নেই। সে অতি সাধারণ একজন। সাধারণরা সাধারণ কাজ করে। পড়াশোনায় সাধারণ রেজাল্ট করে, সাধারণ একটা চাকরি যোগাড় করে, সাধারণ একটা মেয়েকে বিয়ে করে সাধারণ জীবনযাপন করে। শাহেদ তাই করছে। তার জীবনযাত্রা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে বাঁধা। ঝামেলাহীন গণ্ডিবদ্ধ জীবন।

গাড়ি আরেকটা বড় ধরনের ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল। আর নড়নচড়ন নেই। কী হচ্ছে ? তারা কি পৌঁছে গেল ? পৌঁছে গেলে মিলিটারিরা তাদের নামাবে। নামাবার জন্যে কেউ আসছে না। শাহেদ প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট এবং দিয়াশলাই বের করেছে। ধরাচ্ছে না। সিগারেট হাতে বসে থাকার মধ্যেও শান্তি আছে। গাড়ি অন্ধকার একটা জায়গায় থেমেছে। ভেতরে আলো আসছে না বলে শাহেদ তার সহযাত্রীদের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। মুখ দেখলেও খানিকটা ভরসা পাওয়া যেত। ভয়াবহ দুঃসময়ে মানুষের মুখ দেখলে মনে সাহস চলে আসে। শাহেদ বিড়বিড় করে বলল, কী হচ্ছে ?

শাহেদের পাশের ভদ্রলোক বললেন, আরো লোক তুলবে।

কাদেরকে তুলবে ?

হাতের কাছে যাদের পায়।

কেন ?

জানি না ভাই, কিছুই জানি না। আপনি সিগারেট খান— কোনো অসুবিধা নাই। আমরা এখন সুবিধা অসুবিধার অতীত।

আপনি একটা খাবেন ?

আমি ধূমপান করি না।

শাহেদ সিগারেট ধরাল। দিয়াশলাই-এর আগুনে সে একঝলকের জন্যে সহযাত্রীদের মুখ দেখল। শুরুতে সে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল— সবাই একপলকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে কেন ? সে কী করেছে ? সে কি ভয়ঙ্কর কিছু করেছে ? নাকি ভয়ঙ্কর কিছু তার জীবনে ঘটতে যাচ্ছে ?

সিগারেটে টান দিয়ে প্রথম শকের ধাক্কাটা শাহেদ সামলে ফেলল। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে কেন— সেই রহস্য ভেদ হয়েছে। সে দিয়াশলাই জ্বালিয়েছে। সবাই তাকিয়েছে আগুনের দিকে। তার দিকে না। কাজেই তার ভীত হবার কিছু নেই। শাহেদ লক্ষ করল তার ভয়টা একটু যেন কমে গেল। সিগারেটের নিকোটিন শরীরে ঢোকার কারণে কি কমল ? নিকোটিন কি মানুষকে সাহসী করে ? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সে একটা ছবি দেখেছিল— নাম মনে পড়ছে না। রাশিয়ান ছবি। সেখানে রাশিয়ান একজন কর্নেলকে নাৎসি সৈন্যরা ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারে। কর্নেলকে পেছন দিকে হাত বেঁধে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন কর্নেল মাথা ঘুরিয়ে বলেন, 'আমি কি একটা সিগারেট পেতে পারি ?' তাকে সিগারেট দেয়া হয়। যেহেতু হাত বাঁধা, একজন সিগারেট ধরিয়ে কর্নেলের ঠোঁটে পুরে দেয়। কর্নেল জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে নিয়েই বলেন, থ্যাংক য়্যু সোলজার। তারপর বেশ আয়েশ করে সিগারেট টানতে থাকেন। কর্নেলের ঠোঁটে সামান্য হাসির আভাস, যেন পুরো ব্যাপারটায় তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

ছবিতে যে-সব ঘটনা ঘটে বাস্তবে কি তাই ঘটে ? মিলিটারিরা যদি শাহেদকে গুলি করে মারার জন্যে নিয়ে যায় তাহলে কি সে বলতে পারবে, 'আমি কি একটা সিগারেট পেতে পারি ?' ধরা যাক তারা তাকে একটা সিগারেট দিল। সে কি কর্নেল সাহেবের মতো ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি নিয়ে সিগারেট টানতে পারবে ? মৃত্যুর আগে আগে বিশেষ কোনো স্মৃতি কি তার মনে পড়বে ? বিশেষ কোনো স্মৃতি শাহেদের নেই— তার সব স্মৃতিই সাধারণ। অতি সাধারণ মানুষের জীবনেও কিছু নাটকীয় ঘটনা থাকে, তার তাও নেই। মিলিটারিরা তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে— এটাই বোধহয় তার জীবনের সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা। সে যদি এ যাত্রা বেঁচে যায়, তাহলে সে বৃদ্ধ বয়সে সে এই ঘটনা নিয়ে রুনির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করবে— বুঝলে দাদুরা, সে এক কাল রাত্রি, উনিশশো একাত্তর সনের ঘটনা। তোমাদের মা'র বয়স তখন ছয় বছর। সে কোথায় আছে কী করছে কিছুই জানি না। দুশ্চিন্তায় আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে গেছে। 'ভাই পাগলা' বলে এক পীর সাহেবের কাছে গিয়েছি, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা...

গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে— নতুন কাউকে তোলা হয় নি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, শাহেদের ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। বারবার ঘুমের ঘোরে পাশের ভদ্রলোকের কাঁধে মাথা লেগে যাচ্ছে। শাহেদের খুব লজ্জা লাগছে— তার সামনে এত বড় বিপদ আর সে এরকম ঘুমিয়ে পড়ছে

কেন ? তার উচিত এক মনে দোয়া দরুদ পড়া। আয়াতুল কুরসি পড়ে তিনবার বুকে ফুঁ দিতে পারলে হতো। আয়াতুল কুরসি সূরাটা শাহেদের মুখস্থ নেই। আয়তুল কুরসি ছাড়াও তো দোয়া আছে। ইউনুস নবি মাছের পেটে বসে যে দোয়া পড়ে উদ্ধার পেলেন। দোয়া ইউনুস। 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবাহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজজোয়ালেমিন।' এমন ঘুম পাচ্ছে— ঘুমের কারণে দোয়া এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। শাহেদ সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। বেশ আরামের ঘুম। সে ঘুমুল পাশের ভদ্রলোকের কাঁধে মাথা রেখে। তিনি কিছুই বললেন না। কাঁধ পেতে রাখলেন— যাতে ঘুমকাতুর মানুষটা আরামে ঘুমোতে পারে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল জামশেদ তার বয়স্যদের কাছে 'জাশ' নামে পরিচিত। গোয়েন্দা বিভাগের এই অফিসার বড় মজাদার মানুষ। কথায় কথায় রসিকতা করেন। এমন রসিকতা যে নিতান্তই অরসিক মানুষও হো হো করে হেসে উঠবে। রসিকতা ছাড়াও তিনি আর যে বিদ্যা জানেন তার একটি হচ্ছে ম্যাজিক। এক প্যাকেট তাস পেলে সেই এক প্যাকেট তাস দিয়ে তিনি আধঘণ্টা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। পামিং-এর বিদ্যাও ভালো আয়ত্ত করেছেন। শূন্য থেকে কাঁচা টাকা বের করা, সেই কাঁচা টাকা শূন্যে মিলিয়ে দেওয়া তার কাছে কিছুই না। কর্নেল জাশ অবিবাহিত। বিয়ে না করার পেছনে তার যুক্তি হচ্ছে— তিনি ট্রেনে করে ঘুরতে পছন্দ করেন। জানালার পাশে বসে দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া। বিয়ে করলে এই সুযোগ পাওয়া যাবে না— কারণ স্ত্রীকে জানালার পাশে বসতে দিতে হবে। এই কারণেই বিয়ে করছেন না।

এই অতি মজাদার কর্নেল জাশ গোয়েন্দা বিভাগে আছেন চাকরির শুরু থেকেই। কাজটা তার খুব পছন্দের। গোয়েন্দা বিভাগের কাজের পেছনে রহস্য থাকে, মজা থাকে এবং আচমকা বিস্ময় থাকে। এইসব জিনিস একজন ম্যাজিসিয়ানের পছন্দ হবারই কথা।

সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ তাদের কর্মকাণ্ড মূলত সামরিক বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। কর্নেল জাশ সেই সীমা বৃদ্ধি করেছেন। তিনি সিভিলিয়ানদের মধ্যেও কাজ করছেন। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ না। ঢাকা শহরের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে নানান ধরনের লোকজন ধরে নিয়ে আসা। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করা। আতঙ্কে অস্থির হয়ে যাওয়া মানুষদের সঙ্গে গল্প করতেও তার ভালো লাগে। কর্নেল জাশ যে-সব হতভাগ্যকে গল্পগুজব করার জন্যে ডেকে আনেন— তাদের বেশিরভাগকেই ডেথ স্কোয়াডের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে কর্নেল জাশের বিবেক খুব পরিষ্কার। তার যুক্তি হচ্ছে— আমরা

যুদ্ধাবস্থায় আছি। যুদ্ধাবস্থার প্রথম দিকে শত্রুর মনে ভয়াবহ আতঙ্ক তৈরি করতে হয়। আতঙ্ক, হতাশা এবং অনিশ্চয়তা। এই তিনটি আবেগ এক সঙ্গে তৈরি করা মানে যুদ্ধের প্রাথমিক বিজয়। শত্রুপক্ষের মোর‍্যালিটি যাবে ভেঙে। ভাঙা মোর‍্যালিটি নিয়ে শত্রু কখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

একদল লোক ধরে আনা হচ্ছে, তারা উধাও হয়ে যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজনরা তাদের কোনো খোঁজ বের করতে পারছে না। এরচেয়ে অনিশ্চয়তা তো আর কিছু হতে পারে না। এই খবর তারা চারদিকে ছড়াবে। মুখে মুখে পল্লবিত হবে ভয়ঙ্কর গল্প। যুদ্ধাবস্থায় এর প্রয়োজন আছে।

কর্নেল জাশ হালকা ঘিয়া রঙের একটা হাওয়াই শার্ট পরেছেন। তার হাতে চুরুট। তিনি চুরুট বা সিগারেট কিছুই খান না। সিগারেটের গন্ধে তার মাথা ধরে যায়। বন্দিদের জেরা করার সময় তিনি হাতে চুরুট রাখেন। চুরুট জ্বালিয়ে রাখা কঠিন— ক্রমাগত টানতে হয়। কাজটা তার খারাপ লাগে না। চুরুট নিয়ে কথা বলতে বলতে জেরা করায় আলাদা নাটকীয়তা আছে। কর্নেল জাশের ঘরটা ছোট। আসবাবপত্র বলতে ছোট্ট একটা টেবিলের পেছনে রিভলভিং চেয়ারে তিনি বসেন, সামনে আরেকটা হাতলওয়ালা চেয়ার আছে, যাকে জেরা করা হবে সে-ই এই চেয়ারে বসে। একটা সিলিং ফ্যান আছে। ডিসি কারেন্টের পাখা— বাতাসের চেয়ে শব্দ বেশি হয়। কর্নেল সাহেব ইচ্ছা করলেই ফ্যানটা বদলে ভালো একটা ফ্যান নিতে পারেন। তিনি নেন না। ফ্যানের ঘড়ঘড় শব্দের ভয় ধরানো এফেক্টটা তার ভালো লাগে। তার রিভলভিং চেয়ার যখন ঘুরে তখনো কটকট ধরনের শব্দ হয়। সেই শব্দও তার ভালো লাগে। মৃত্যুভয়ে অস্থির একটা মানুষ তার সামনে বসে আছে। তিনি নিভে যাওয়া চুরুট ধরাতে ধরাতে হঠাৎ চেয়ার ঘুরিয়ে তাকালেন— কটকট শব্দে সামনে বসে থাকা লোকটা আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। এই দৃশ্য মজার দৃশ্য।

শাহেদ কর্নেল জাশের সামনের চেয়ারে জবুথবু হয়ে বসে আছে। প্রথম সে তার দুটা হাত চেয়ারের হাতলে রেখেছিল। হঠাৎ মনে হলো এতে বেয়াদবি প্রকাশ পেতে পারে। এখন তার হাত কোলের উপর রাখা। তার প্রচণ্ড প্রস্রাবের বেগ হয়েছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি ব্লাডার ফেটে যাবে।

কর্নেল সাহেব চেয়ার ঘুরিয়ে শাহেদের দিকে তাকালেন। হালকা গলায় বললেন, আপ কা তারিফ?

শাহেদ প্রশ্নটার মানে বুঝতে পারল না। 'তারিফ' শব্দটার মানে কী? উর্দুটা মোটামুটি জানা থাকলে সহজে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত। উর্দু জানাটা উচিত ছিল। ক্লাস সিক্সে এরাবিক না নিয়ে উর্দু নেওয়া উচিত ছিল।

এরাবিক নিয়েছিল নাম্বার বেশি পাওয়া যায় বলে। তাতে লাভ হয় নি। ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠার পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাসমার্ক থাকলেও এরাবিকে পেয়েছিল বত্রিশ।

কর্নেল সাহেব একটু ঝুঁকে এসে বললেন, স্যার, আপ কা নাম ?

শাহেদ একটু কেঁপে উঠল। মানুষটা তাকে 'স্যার' বলছে কেন ? রসিকতা করে বলছে ? মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না রসিকতা। মনে হচ্ছে, সম্মান দেখাচ্ছে।

মাই নেম ইজ শাহেদ।

আপকা উর্দু নেহি আতা ?

জি-না স্যার।

কর্নেল সাহেব টেবিল থেকে তাসের প্যাকেট হাতে নিলেন। এটা তার একটা খেলা। নাম জিজ্ঞেস করে তিনি কিছুক্ষণ তাস সাফল করে একটা তাস টেনে নেবেন। লাল রঙের তাস উঠে এলে মৃত্যুদণ্ড। কালো তাস হলে লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। চান্স ফিফটি ফিফটি। ভাগ্য পরীক্ষা। তিনি এই ভাগ্য পরীক্ষার খেলাটা যখন খেলেন, তখন নিজেকে ঈশ্বরের কাছাকাছি মনে হয়। কর্নেল সাহেব তাস টানলেন— লাল রঙের তাস উঠে এলো। ফোর অব ডায়মন্ডস। লোকটার ভাগ্য খারাপ।

আর ইউ ম্যারেড ?

ইয়েস স্যার।

লোকটা যেহেতু বিবাহিত, তাকে আরেকটা সুযোগ দেয়া যেতে পারে। কর্নেল সাহেব আরেকবার তাস টানলেন। এবারো লাল রঙের তাস। হার্টের দুই। আশ্চর্য! এর ভাগ্য তো খারাপ। খুবই খারাপ।

ডু ইউ হ্যাভ চিলড্রেন ?

ইয়েস স্যার। ওয়ান ডটার।

আচ্ছা ঠিক আছে। মেয়েটার খাতিরে আরেকটা সুযোগ। তবে এই দফায় লাল উঠলে খেল খতম। কর্নেল জাশ আরেকবার তাস সাফল করলেন। কালো তাস উঠার প্রবাবিলিটি খুব বেশি। পরপর তিনবার লাল উঠার কোনো কারণ নেই।

তৃতীয়বারও লাল কার্ড উঠল। ডায়মন্ডের কুইন। কর্নেল জাশ হাসিমুখে বললেন, ওকে স্যার। ইউ ক্যান লিভ।

শাহেদ ঘর থেকে প্রায় টলতে টলতে বের হলো। কর্নেল জাশ শাহেদের নামের পাশে লাল ক্রস দিলেন।

কোনোরকম কারণ ছাড়া মানুষ মেরে ফেলা যায় ? মৃত্যু এত তুচ্ছ, এত সহজ ? শাহেদ ভয়ে অস্থির হলো না, বিস্ময়ে অভিভূত হলো। সামান্য গাছের পাতাও তো মানুষ অকারণে ছিঁড়তে পারে না। বর্ষায় পিঁপড়ার লম্বা সারি দেখা যায়। মানুষ সেই পিঁপড়ার সারিও ডিঙিয়ে যায়। মানুষ চায় না পিঁপড়ার মতো তুচ্ছ প্রাণীও তার পায়ের চাপে মারা পড়ুক। এরা কেন অকারণে এতগুলি মানুষ মেরে ফেলবে ? কোথাও কি ভুল হচ্ছে ? ভুলটা কে করছে ? সে করছে না তো ? হয়তো এমনিতেই তাদের এনে মাঠে লাইন করে দাঁড়িয়েছে। নামঠিকানা লিখে ছেড়ে দেবে। না ছাড়লেও কোনো শাস্তি-টাস্তি দেবে। মেরে ফেলার প্রশ্ন আসছে কেন ?

লম্বা দাড়িওয়ালা জোব্বা-জাব্বা ধরনের পোশাক পরা এক লোক এসে বলল, কলেমা পড়ো। কলেমা।

এ কি মিলিটারিদের মাওলানা ? মৃত্যুর আগে কলেমা পড়াচ্ছে ? শাহেদরা মোট ন'জন দাঁড়িয়ে আছে। শাহেদ আছে মাঝামাঝি জায়গায়। এরা কি একজন একজন করে নিয়ে গুলি করবে, না সবাইকে একসঙ্গে গুলি করবে ? গুলি করার হুকুম কে দেবে ? অল্পবয়স্ক অফিসারটা ? কাঁধের ব্যাজে তিনটা তারা—ক্যাপ্টেন। অফিসারটিকে তো বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে। তার চেহারা দেখে তো মনে হয় না কিছুক্ষণের মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে।

মাটির ঢিবির মতো জায়গাটার কাছে বেশ কিছু মিলিটারি বন্দুক হাতে স্ট্যান্ড ইজ পজিশনে আছে। মাটির ঢিবিটাই মনে হয় বধ্যভূমি। আশেপাশে কোনো গর্ত বা খানাখন্দ নেই। এরা ডেডবডি ফেলবে কোথায় ? আশেপাশে নদী থাকলে নদীতে নিয়ে ফেলত। নদী নেই, এরা কোনো গর্তও খোঁড়ে নি। পুরো ব্যাপারটা ওদের কোনো রসিকতা না তো ? ভয় দেখিয়ে মজা করছে। মানুষকে ভয় দেখিয়ে আধমরা করে ফেলার ভেতর মজা আছে। দারুণ মজা।

শাহেদ তার পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোককে বলল, ভাই, আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে ?

ভদ্রলোক কিছু বললেন না। অদ্ভুত দৃষ্টিতে শাহেদের দিকে তাকালেন। শাহেদ আবার বলল, ভাই, কয়টা বাজে ? আমার হাতে ঘড়ি নেই, একটু কাইন্ডলি যদি টাইমটা বলেন।

চারটা পাঁচ।

থ্যাংক য়্যু।

ভদ্রলোক এখনো শাহেদের দিকে তাকিয়ে আছেন। শাহেদ বলল, এরা আমাদের বাইরে এনেছে কেন জানেন ?

জানি।

কী জন্যে এনেছে ?

এত কথা বলছেন কেন ? কী জন্যে এনেছে আপনিও জানেন। আল্লাহ্ খোদার নাম নেন।

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার পরপরই লাইনে দাঁড়ানো প্রথম চারজনকে মাটির ঢিবির দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। শাহেদরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে আলো নেই। হলুদ রঙের টানা বারান্দা থেকে সামান্য যা আলো আসছে তাই। তবে মাটির ঢিবির কাছে বেশ আলো। তিনটা বাঁশ পাশাপাশি পোঁতা। সেখানে বাল্ব লাগানো। অল্প কয়েকটা বাল্ব, কিন্তু খুব আলো। যে চারজনকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শাহেদ অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তাদের দেখছে। তার কাছে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নে ঘটছে। পুতুলনাচের পুতুলরা যেমন হেলেদুলে হাঁটে— তেমনি হাঁটার ভঙ্গি। বাস্তবের মানুষরা কখনো এই ভঙ্গিতে হাঁটে না।

চারজনের হাত পেছনের দিকে বাঁধা হচ্ছে। চারজনের একজন উঁচু গলায় বলছে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্।' শাহেদ নিজেকেই জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী ? এদের হাত পেছনে বাঁধছে কেন ? এদের কী করবে ? ওদের মেরে ফেলবে ? তারপর আমাদের নিয়ে যাবে ? আমরা কী করেছি ? নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে। এক্ষুণি ভুল ধরা পড়বে। দেখা যাবে এতক্ষণ যা দেখছে তা ভয়ঙ্কর কোনো দুঃস্বপ্ন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবে। দেখা যাবে সব আগের মতো আছে। আসমানী এবং সে শুয়ে আছে। দু'জনের মাঝখানে গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে রুনি। সে তার একটা পা তুলে দিয়েছে শাহেদের গায়ে। গা থেকে পা নামাতে গেলেই জেগে উঠবে। তারপর আর কিছুতেই তাকে ঘুম পাড়ানো যাবে না। বারান্দায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যাবে। যখন মনে হবে রুনি পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়েছে, এখন তাকে শুইয়ে দেয়া যায়, তখন রুনি ঘাড়ে মাথা রেখে বলবে— বাবা গল্প। তৎক্ষণাৎ গল্প শুরু করতে হবে।

এটেনশান!

খট খট শব্দ হলো। শাহেদ একটু কেঁপে উঠল। চোখের সামনের দৃশ্যগুলি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। এখন আবার স্পষ্ট হয়েছে। ঐ তো চারজন মানুষ। তাদের উল্টোদিক করে দাঁড় করানো হয়েছে। তাদের বাঁধা হাত দেখা যাচ্ছে। রাইফেল তাক করে আছে অনেকে। কতজন ? শাহেদ কি গুনে দেখবে ? তার প্রয়োজন কি আছে ? আচ্ছা, ভোর হতে কত দেরি ? আকাশে কি তারা আছে ? শাহেদ কি তাকাবে আকাশের দিকে ? ঐ তো কালপুরুষ দেখা যাচ্ছে। কালপুরুষের কোমরের বেল্টে তিনটা তারা।

ফায়ার!

ঠিকই শব্দ হলো। যারা দাঁড়িয়েছিল তারা এখন দাঁড়িয়ে নেই।

কোনো চিৎকার, কোনো কাতরানি কিছুই শোনা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত সমস্ত পৃথিবী শব্দহীন হয়ে রইল। আর তখন শোনা গেল চাপা গোঙানির শব্দ। গোঙাতে গোঙাতে মৃত্যুপথযাত্রী একজন ডাকছে— 'ফরিদা! ফরিদা!' ফরিদা কে? তার মমতাময়ী স্ত্রী? তার আদরের ধন জ্যেষ্ঠা কন্যা?

শাহেদের সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল। সে গড়িয়ে মাঠে পড়ে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো আসমানী তাকে কোলে করে খাটে শুইয়ে দিচ্ছে। মাথায় পানি ঢালছে। চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। কী আরামই না লাগছে! ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। অদ্ভুত ঘুম। শরীরের সমস্ত জীবন্ত কোষ যেন একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ছে। বড় আরামের ঘুম। এর মধ্যে আবার রুনি এসে তার ছোট ছোট হাতে তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার হাত অসম্ভব ঠাণ্ডা। সে মনে হয় পানি নিয়ে ছানাছানি করেছে। আসমানী অস্পষ্ট স্বরে বলল, কী হয়েছে? তুমি এরকম করছ কেন? শাহেদ অনেক কষ্টে বলল, আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি আসমানী। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখ। কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। আসমানী গাঢ় স্বরে বলল, আমি তোমাকে ছাড়ব না।

অজ্ঞান হয়ে মাঠে পড়ে যাবার কারণেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক শাহেদ বেঁচে গেল। তার বেঁচে যাওয়ার অংশটা যথেষ্ট রহস্যমণ্ডিত। শাহেদ অনেক চেষ্টা করেও রহস্য ভেদ করতে পারে নি। জ্ঞান হবার পর সে নিজেকে দেখেছে চৌকির উপর শুয়ে আছে। সে একাই শুধু শুয়ে আছে। সেই চৌকিতে আরো অনেকেই আছে। তারা কেউ শুয়ে নেই, সবাই বসে।

ব্যাপারটা স্বপ্ন না সত্যি বোঝার আগেই সে হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই অবস্থাতেও তার সারাক্ষণ মনে হয়েছে আসমানী তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

একবার তার খারাপ ধরনের চিকেন পক্স হলো। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। আসমানী বলল, এসো, তোমার ব্যথা কমিয়ে দি।

শাহেদ বিরক্ত গলায় বলল, সবসময় রসিকতা করবে না। ব্যথা কমাবে কীভাবে?

ভালোবেসে গায়ে হাত বুলিয়ে দেব। তাতেই ব্যথা কমবে।

আশ্চর্য কাণ্ড, আসমানী গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই ব্যথা কমে গেল।

অচেতন জগতে থেকেও শাহেদের স্পষ্ট মনে হতে লাগল, আসমানী ক্রমাগত তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখ মঙ্গলবার দুপুরেবেলা শাহেদ ছাড়া পেল। একজন মিলিটারি মেজর তার দিকে তাকিয়ে বলল, ক্লিয়ার আউট।

এই ক্লিয়ার আউটের অর্থ যে মুক্তি তা বুঝতে শাহেদের অনেক সময় লাগল। রিকশায় উঠে বসার পরও তার মনে হতে লাগল— এটা আসলে সত্যি না, স্বপ্ন। রিকশা চলতে শুরু করা মাত্র স্বপ্ন ভেঙে যাবে। রিকশা চলতে শুরু করল— স্বপ্ন ভাঙল না। তখন তার মনে হলো— রিকশাওয়ালা কোনো একটা কথা বললেই স্বপ্ন ভাঙবে। রিকশাওয়ালা কোনো কথা বলছে না— স্বপ্নও ভাঙছে না। শাহেদই কথা বলল, দেশের অবস্থা কী?

রিকশাওয়ালা ঘাড় ফিরিয়ে শাহেদকে দেখল। জবাব দিল না।

শাহেদ বলল, তোমার দেশ কোথায়?

ফরিদপুর। গ্রামের নাম জয়নগর।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমার গ্রামের বাড়ি— ময়মনসিংহের কেন্দুয়ায়। আমি মিলিটারির হাতে আটক ছিলাম। আজ ছাড়া পেয়েছি।

রিকশাওয়ালা আবার তাকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। কিছু বলল না। রিকশাওয়ালার চোখে আগ্রহ, কৌতূহল, বিস্ময় কোনো কিছুই নেই। মরা মানুষের চোখ।

শাহেদ বাসায় পৌঁছাল দু'টার দিকে। বাসা খালি। গৌরাঙ্গ নেই। সদর দরজাও খোলা। সে দরজায় তালাও লাগিয়ে যায় নি। দু'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত সে এক নাগাড়ে ঘুমুল। সন্ধ্যাবেলায় ঘুম থেকে উঠে সে অল্প কিছু সময় বারান্দায় বসে রইল। তারপর ঘরে ঢুকে চিঠি লিখতে বসল।

আসমানী,

তুমি এবং রুনি, তোমরা কোথায় আছ আমি জানি না। কিছুদিন তোমাদের জন্যে খুব দুশ্চিন্তা করেছি। এখন আর করছি না। এই চিঠিটা আমি ভাইজানের কাছে পাঠাচ্ছি। ভাইজানের সঙ্গে যদি তোমার কখনো যোগাযোগ হয় তুমি চিঠি পাবে।

আসমানী, আমার ধারণা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ যুদ্ধ শুরু করবে। আমি প্রথমদিকের যোদ্ধাদের একজন হতে চাই, কাজেই তোমাদের জন্য

দুশ্চিন্তা বন্ধ করে আমি আজ থেকে খুঁজতে শুরু করব কীভাবে নিজেকে কাজে লাগাতে পারি।

পরাধীন দেশে নয়। আমি স্বাধীন দেশে তোমাকে আবার দেখব। যদি দেখা না হয়, যদি আমার মৃত্যু হয়, তাতে মনে কষ্ট পেয়ো না। রুনিকে বুঝিয়ে সব কিছু বলবে। এখন বুঝতে না পারলেও একদিন সে বুঝবে।

আমি ভয়ঙ্কর কিছু সময় পার করে এসেছি। সে-সময়ে তোমার উপস্থিতি আমি অনুভব করেছি। আমি জানি আমি যেখানেই থাকি— তুমি থাকবে আমার পাশেই।

অনেক অনেক আদর। তোমাকে ও রুনিকে।

চিঠি শেষ করে তারিখ লিখতে গিয়ে শাহেদ সামান্য চমকাল। তারিখ ১৩ এপ্রিল। তাদের বিয়ের দিন। তের তারিখে বিয়ে অশুভ হয় কি-না এই নিয়ে সে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ইরতাজউদ্দিন সব শুনে ভাইকে ধমক দিয়ে বলছিলেন, আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্টি প্রতিটা দিনই শুভ।

১৩ এপ্রিল, মঙ্গলবার, ১৯৭১।

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বলেছেন, বহিরাক্রমণ থেকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে গণচীন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে চীন সরকার পাকিস্তানকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে।

এই দিনেই খাজা খায়েরউদ্দিন ও জামায়াত নেতা গোলাম আযম জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে শান্তি কমিটির মিছিল বের করেন। পাক সেনাবাহিনীর সাফল্যের জন্যে মোনাজাত পরিচালনা করেন জামায়াতের আমীর গোলাম আযম। তিনি ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনদের মোকাবিলা করতে জিহাদের ডাক দেন।*

*সূত্র : *দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক পূর্বদেশ*

আসমানীরা যে-বাড়িতে বাস করছে তার নাম দারোগাবাড়ি। গ্রামের ভেতর হুলস্থূল ধরনের বাড়ি। দোতলা পাকা দালান, বাড়ির পেছনে আমবাগান। সানবাঁধানো ঘাটের পুকুরটা বাড়ির দক্ষিণ দিকে। পুকুরের পানি কাকের চোখের মতোই পরিষ্কার। ঘাটের সঙ্গে পাশাপাশি দু'টা চেরিফুলের গাছ। গাছভর্তি সাদা রঙের চেরিফুলে। গ্রামে চেরিগাছ থাকার কথা না। বাড়ির সামনে অনেকখানি জায়গায় আছে নানান ধরনের জবা গাছ। (ভাই পাগলা পীর সাহেবের জবা গাছ প্রসঙ্গটা মিলে গেছে।)

মোতালেব সাহেবের বাবা সরফরাজ মিয়া ব্রিটিশ আমলের দারোগা ছিলেন। রিটায়ার করার পর তিনি এই পাকা বাড়ি বানান। ব্রিটিশ আমলের দারোগাদের মধ্যে শেষ বয়সে খানিকটা জমিদারি-ভাব চলে আসে। উনার মধ্যেও চলে এসেছিল। অজপাড়াগাঁয়ে বিশাল দালান এই কারণেই তুলেছিলেন।

সরফরাজ মিয়া এখনো জীবিত। বৃদ্ধের বয়স প্রায় নব্বই। অতি রুগ্ন। বাঁকা হয়ে হাঁটেন। তবে চোখে দেখতে পান, কানে শুনতে পান। মাথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে আছে। কথায় কথায় বন্দুক বের করতে বলেন। মাঝে-মাঝে নিজেই তাঁর শোবার ঘর থেকে দু'নলা বন্দুক বের করে নিয়ে আসেন। ক্ষিপ্ত গলায় বলেন— 'সব হারামজাদাদের জানে মেরে ফেলব।' তারপর আকাশের দিকে বন্দুক তুলে একটা ফাঁকা গুলি করেন। গুলির শব্দ কানে যাবার পরপরই তাঁর সংবিৎ ফিরে আসে, তিনি খুব স্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি তাঁর অস্বাভাবিক উত্তেজনার প্রকাশে খানিকটা লজ্জিত।

রুনি এই বাড়িতে এসে আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে। বাড়ির প্রধান ব্যক্তি একজন পাগল। যে সারাদিন জবা গাছের যত্ন করে কাটিয়ে দেয়। জবা গাছের সঙ্গে কথা বলে। মাঝে-মাঝে বন্দুক হাতে বের হয়ে আসে। এ জাতীয় ভয়ঙ্কর মানুষের সঙ্গে বাস করা যে-কোনো শিশুর পক্ষেই অসম্ভব। রুনি বাস করছে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে। আসমানী হাজার চেষ্টা করেও রুনিকে সেই দুঃস্বপ্ন থেকে বের করতে পারছে না।

সরফরাজ মিয়ার সঙ্গে রুনির প্রথম সাক্ষাৎটাই ছিল ভয়াবহ। শুরুতে বাড়িটা রুনির খুব পছন্দ হয়েছিল। চারদিকে এত ফাঁকা জায়গা। জবা ফুলগুলো এত সুন্দর। মনে হয় গাছে লাল আগুনের ফুল ফুটে আছে। রুনি ছুটে গিয়ে কোঁচড় ভর্তি করে জবা ফুল নিয়ে নিল। তার এত আনন্দ হচ্ছিল! আনন্দে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করছিল। ঠিক তখন পিছন থেকে খনখনে গলায় কে যেন বলল, এই মেয়ে, ফুল কেন ছিঁড়লা? কার হুকুমে ফুল ছিড়লা? এই মেয়ে কোন বান্দির?

রুনি চমকে পেছনে তাকাল। অতি বৃদ্ধ এক লোক। বানরের মতো দেখতে। চোখ চকচক করে জ্বলছে। কী অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! বুড়ো আবার বলল, ফুল কেন ছিঁড়লা? রুনির কোল থেকে সব ফুল মাটিতে পড়ে গেল।

বুড়ো খনখনে গলায় বলল, খবরদার নড়বি না। যেখানে আছস সেখানে দাঁড়ায়ে থাক। এক কদম নড়লে অসুবিধা আছে।

রুনি তার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। ইচ্ছা থাকলেও তার নড়ার ক্ষমতা নেই। ভয়ে ও আতঙ্কে তার শরীরের সমস্ত মাংসপেশি শক্ত হয়ে গেছে। সে চোখ বড় বড় করে দেখল, বুড়ো মানুষটা প্রায় বানরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। এই সুযোগে পালিয়ে যাওয়া যায়। পালাতে হলে বুড়ো যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে তাকেও সেই দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়, সেটা সম্ভব না। সে দৌড় দিয়ে পুকুরঘাটে যেতে পারে। কিন্তু মা পুকুরের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। সে আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল। বুড়ো যেভাবে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকেছিল, সেভাবেই লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। এবারে তার হাতে দু'নলা এক বন্দুক।

খবরদার নড়বি না। তোরে আমি গুল্লি করে দেব। তুই আমার ফুল ছিঁড়ছস।

রুনি জানে বুড়ো তাকে গুলি করবে না। অবশ্যই বন্দুকে গুলি নেই। খুব সম্ভব বন্দুকটা খেলনা বন্দুক। বড়রা অনেক সময় ছোটদের খেলনা বন্দুক দিয়ে ভয় দেখায়। তার বাবা একবার একটা পিস্তল তার দিকে তাক করে গুলি করেছিল। বিকট শব্দ হয়েছিল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের মাথায় ছোট আগুন জ্বলে উঠেছিল। আসলে সেটা ছিল একটা সিগারেট লাইটার। বুড়োর হাতের বন্দুকটাও নিশ্চয়ই সে-রকম কিছু।

আল্লাহ্ খোদার নাম নে ছেমড়ি। আইজ তোর রোজ কিয়ামত।

রুনি চিৎকার করে তার মাকে ডাকল। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না।

সরফরাজ মিয়া তাঁর অভ্যাসমতো আকাশের দিকে বন্দুক তাক করে ফাঁকা গুলি করলেন। রুনি অজ্ঞান হয়ে জবা ফুলের উপর পড়ে গেল। সারা বাড়িতে একটা হৈচৈ পড়ে গেল।

রুনির জ্ঞান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরল কিন্তু তার গায়ের তাপ হু-হু করে বাড়তে থাকল। ঘরে থার্মোমিটার নেই, জ্বর কত উঠেছে বোঝার উপায় নেই। আসমানী স্তব্ধ হয়ে মেয়ের মাথার কাছে বসে আছে। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখার ইচ্ছাও তার হচ্ছে না। জীবনটাকে অর্থহীন মনে হচ্ছে। আসমানীর ইচ্ছা করছে নির্জনে কোথাও গিয়ে কাঁদতে। এ বাড়িটা বিরাট বড়, নির্জনে কাঁদার মতো অনেক জায়গা আছে। রুনিকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এরা দেখবে। এখন মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে, ডাক্তারের জন্য লোক গেছে। রুনির পাশে বসে থাকার কিছু নেই। আসমানী তারপরও বসে রইল। ডাক্তার এসে ওষুধ দিলেন। জ্বর কমে গেল। রুনি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাসল। আসমানী স্বাভাবিক হতে পারল না। সে সারারাত জেগে কাটিয়ে দিল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তা তার মাথায় আসছে।

কুমকুমের মা হঠাৎ যদি তাকে ডেকে বলেন, অনেকদিন তো হয়ে গেল, এবার তুমি অন্য কোথাও যাও। সে তাহলে যাবে কোথায়? মহিলা আগে যে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলতেন এখন তা বলেন না। আসমানী একদিন শুনেছে তিনি কাজের মেয়েকে বলছেন, নিজের মেয়ের খোঁজ নাই, পরের মেয়ে পালতেছি।

আসলেই তো তাই। আসমানী কুমকুমের বান্ধবী। তাদের তো কেউ না। তারা কেন শুধু শুধু তাকে পুষবেন?

আসমানী আজকাল প্রতিদিনই একবার করে ভাবে রুনিকে সঙ্গে নিয়ে একা একা ঢাকা চলে গেলে কেমন হয়। খুব কি অসম্ভব ব্যাপার? কেউ কি ঢাকা যাচ্ছে না?

একটা সমস্যা আছে। তার হাত খালি। হ্যান্ডব্যাগে পনেরোটা মাত্র টাকা। তার হাতে চারগাছা সোনার চুড়ি আছে। চুড়ি বিক্রি অবশ্যই করা যায়। রুনির গলায় চেইন আছে। এক ভরি ওজনের চেইন। চেইনটাও বিক্রি করা যায়। সোনার দাম এখন দুশ' টাকা ভরি। চুড়ি আর চেইন মিলিয়ে খাদ কাটার পরেও আড়াইশ'-তিনশ' টাকা পাওয়া উচিত। হাত খালি থাকলে অস্থির লাগে। আসমানীর সারাক্ষণই অস্থির লাগছে।

আসমানীর ধরাবাঁধা জীবনটা হঠাৎ এমন হয়ে গেল কেন? অন্য একটা পরিবারের জীবনের সঙ্গে তার জীবনটা জট পাকিয়ে গেছে। এরকম কি কথা

ছিল ? শাহেদ কোথায় আছে সে জানে না। বেঁচে আছে তো ? তাও জানে না। তার মা কোথায় ? দেশের বাড়িতে ? খোঁজ নেবার উপায় কী ? সবকিছুই জট পাকিয়ে এলোমেলো হয়ে গেছে। এই জট কি কখনো খুলবে ?

মানুষের জীবন এমন যে একবার জট পাকিয়ে গেলে জট বাড়তেই থাকে। রাত জেগে আসমানী বেশ কয়েকটা চিঠি লিখল। শাহেদকে, তার মাকে, নীলগঞ্জে শাহেদের বড়ভাইকে, চিটাগাং-এর ছোটমামাকে। চিঠিতে নিজের ঠিকানা জানাল। কীভাবে মুন্সিগঞ্জের অজপাড়াগাঁয়ে চলে এসেছে তা লিখল। ডাক বিভাগ কোনো দিন চালু হবে কি-না তা সে জানে না। যদি কখনো চালু হয়, তাহলে যেন আসমানীর আত্মীয়স্বজনরা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারেন আসমানী কোথায় আছে।

দেশের অবস্থা কি ভালো হবে ? যদি হয় সেটা কবে ? কত দিন আসমানীকে একটা অপরিচিত জায়গায় একদল অপরিচিত মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে ? আসমানী জানে না। শুধু আসমানী কেন, দেশের কেউই বোধহয় জানে না।

বিবিসি থেকে ভয়ঙ্কর সব খবর দিচ্ছে। সারাদেশে নাকি গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। একটা গৃহযুদ্ধ কত দিন চলে ? ছয় মাস, এক বছর, সাত বছর ? বাংলাদেশের এই গৃহযুদ্ধ কত দিন চলবে ? সাত বছর যদি চলে, এই সাত বছর তাকে মুন্সিগঞ্জের দারোগাবাড়িতে পড়ে থাকতে হবে ? আর পাগলটা যখন-তখন তার মেয়েকে ভয় দেখাবে ? তার অতি আদরের মেয়েকে বান্দি ডাকবে ?

শাহেদকে লেখা চিঠির সে দুটা কপি করল। একটা যাবে বাসার ঠিকানায়, একটা অফিসের ঠিকানায়। কোনো না কোনোদিন শাহেদ নিশ্চয়ই অফিসে যাবে। অফিসে যাওয়া মাত্রই সে যেন চিঠিটা পায়। শাহেদের চিঠি সম্বোধনবিহীন। বিয়ের আগেও আসমানী শাহেদকে অনেক চিঠি লিখেছে। তার কোনোটিতেই সম্বোধন ছিল না। কী লিখবে সে ? প্রিয়তমেষু, সুপ্রিয়, সুজনেষু, নাকি সাদামাটা শাহেদ। তার কখনো কিছু লিখতে ইচ্ছে করে নি। আসমানীর ধারণা শাহেদের জন্য যে সম্বোধন তার মনে আছে সেই সম্বোধনের কোনো বাংলা শব্দ তার জানা নেই।

আসমানী চিঠিতে খুব সহজ-স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছে। এমনভাবে চিঠিটা লিখেছে যেন সে পিকনিক করতে মুন্সিগঞ্জের এক গ্রামে এসেছে। পিকনিকে খুব মজা হচ্ছে। পিকনিক শেষ হলেই ফিরে আসবে।

সে লিখেছে—

> তুমি নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছ। অস্থির হওয়ার কিছু নেই। আমরা ভালো আছি। খুব ভালো।

নিজেদের জন্য আমাদের দুশ্চিন্তা নেই, তবে তোমার জন্য খুব দুশ্চিন্তা করছি।

কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে এসেছি বলে আবার রাগ করছ না তো ? প্লিজ, রাগ করো না। আর রাগ করে তো লাভও কিছু নেই। দূর থেকে তোমার রাগ ভাঙাবার জন্য কিছু করতে পারছি না। যে রাগ কেউ জানতে পারছে না, সেই রাগ করাটা অর্থহীন নয় কি ?

ও, আমরা কোথায় আছি সে-খবর এখনো তোমাকে দেওয়া হয় নি। আমরা ঢাকার খুব কাছাকাছিই আছি। জায়গাটার নাম মুন্সিগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জ লঞ্চঘাট থেকে দশ মাইল যেতে হয়। গ্রামের নাম 'সাদারগঞ্জ'। যে বাড়িতে আছি সেই বাড়িরও একটা নাম আছে। দারোগাবাড়ি। যিনি এ বাড়ি বানিয়েছেন তিনি একসময় দারোগা ছিলেন। তাঁর নাম সরফরাজ মিয়া। ভদ্রলোক এখনো জীবিত। কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে। যখন-তখন বন্দুক নিয়ে বের হয়ে আকাশের দিকে ফাঁকা গুলি করেন। আমরা এ বাড়িতে আসার পরদিনই এই কাণ্ড করেছেন। এখন তার বন্দুকের সব গুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বন্দুকটাও লুকিয়ে ফেলার কথা হচ্ছিল— শেষ পর্যন্ত লুকানো হয় নি। কারণ সবার ধারণা বন্দুক লুকিয়ে ফেললে তার পাগলামি আরো বেড়ে যাবে।

এখন তোমাকে বলি দারোগাবাড়িতে কীভাবে এলাম। তোমার সঙ্গে রাগ করে আমি আমার বান্ধবী কুমকুমদের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। তাদের বাড়ি গেণ্ডারিয়ায়। কুমকুমের বাবা মোতালেব সাহেব আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কুমকুমের মা-ও আমাকে তাঁর মেয়ের মতোই দেখেন। ২৫ মার্চের ভয়াবহ ঘটনার পর কুমকুমের বাড়ির সবাই গেল ঘাবড়ে। আশপাশের সবাই পালাচ্ছে। তারাও পালাবার জন্য তৈরি। এদিকে তোমার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। আমাদের বাসা তালাবন্ধ করে কোথায় যে তুমি পালিয়েছ তুমিই জানো। শুধু যে আমাদের বাসা তালাবন্ধ তাই না— মা'র বাড়িও তালাবন্ধ।

এরকম অবস্থায় আমি বাধ্য হয়ে মোতালেব চাচার সঙ্গে চলে এসেছি। দারোগাবাড়ির সরফরাজ মিয়া হলেন মোতালেব চাচার বাবা।

যা-ই হোক, মোতালেব চাচার গেণ্ডারিয়ার বাসায় মজনু বলে একজন আছে। তার দায়িত্ব হচ্ছে রোজ একবার তোমার খোঁজে যাওয়া। আমার ধারণা ইতিমধ্যে সে তোমার খোঁজ পেয়ে গেছে এবং তুমি জানো আমরা কোথায় আছি, কীভাবে আছি।

রুনি তোমাকে খুব মিস করছে। তবে মিস করলেও সে ভালো আছে। মন নিশ্চয়ই ভালো নেই— কিন্তু শরীরটা ভালো। যে-অবস্থার ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি সে অবস্থায় শরীরটা ভালো রাখাও কম কথা না। কী বলো ?

তুমি ভালো থেকো। অনেক অনেক আদর।

ইতি
আসমানী

আসমানীর ইচ্ছা করছিল— 'অনেক অনেক আদর'-এর জায়গায় সে লেখে 'অনেক অনেক চুমু'। লজ্জার জন্য লিখতে পারল না। তার মনে হচ্ছিল কেউ-না-কেউ তার চিঠি খুলে পড়ে ফেলবে। সেটা খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

চিঠিটা শেষ করার পরপরই আসমানীর মনে হলো যেন আসল কথাটাই লেখা হয় নি। যদিও সে জানে না আসল কথাটা কী। সে আরেকটা চিঠি লিখতে শুরু করল। এই চিঠির সম্বোধন আছে। সম্বোধন লিখতে লিখতেই তার চোখ ভিজে গেল। সে লিখল—

এই যে বাবু সাহেব,

তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, তুমি কোথায় ? আমি মরে যাচ্ছি। তোমাকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাব। আমি সত্যি মরে যাব। তুমি কি জানো এখন আমি কারো কথাই ভাবি না। মা'র কথা না। বাবার কথা না। ভাইবোন কারো কথাই না। আমি সারাক্ষণ ভাবি তোমার কথা। এই বাড়িতে খুব সুন্দর একটা পুকুর আছে। পুকুরের ঘাট বাঁধানো। অনেক রাতে আমি রুনিকে ঘুম পাড়িয়ে ঘাটে এসে বসে থাকি। তখন শুধু তোমার কথাই ভাবি। আমি দেশের স্বাধীনতা চাই না— কোনো কিছু চাই না। শুধুই তোমাকে চাই। কেন এরকম হলো ? কেন আমি তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলাম ? তোমার দেখা পেলে আর কোনোদিন

তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি আর পারছি না। তুমি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরো। কবে আসবে, কবে আসবে, কবে আসবে ?

তোমার আসমানী

কয়েকদিন থেকেই আসমানী খুব চেষ্টা করছে রুনির মন থেকে সরফরাজ মিয়ার ভয় ভাঙানো। যাতে সে রাতদিন ঘরে বসে না থেকে বাড়ির বাগানে হেঁটে বেড়াতে পারে। শহরের ঘিঞ্জিতে যে মেয়ে বড় হয়েছে গ্রামের খোলামেলায় সে মহানন্দে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। রুনি তা করছে না। সে দোতলা থেকে একতলায়ও নামবে না। মাঝেমধ্যে বারান্দায় এসে ভীত চোখে সরফরাজ মিয়াকে দেখবে, তারপর আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে যাবে।

এই বয়সে মনের ভেতর ভয় ঢুকে গেলে সেই ভয় কিছুতেই দূর হয় না। ভয় গাছের মতো মনের ভেতর শিকড় ছড়িয়ে দেয়। সেই শিকড় বড় হতে থাকে। ভয়টাকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা দরকার। কীভাবে তা করা যাবে তা আসমানী জানে না। সরফরাজ মিয়া যদি রুনিকে কাছে ডেকে আদর করে দুটা কথা বলেন, তাতে কি কাজ হবে ? আসমানী পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তারপরও সে সরফরাজ মিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গেল। বৃদ্ধ মানুষটা মোটামুটি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আসমানীর সঙ্গে কথা বললেন।

খুপরি দিয়ে তিনি জবা গাছের নিচের মাটি আলগা করে দিচ্ছিলেন। আসমানী সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, কেমন আছ গো মা ?

আসমানী বলল, জি ভালো আছি।

সম্পর্কে তুমি আমার নাতনির মতো, তারপরও মা বললাম। রাগ করবা না মা। যে-কোনো মেয়েকে মা ডাকা যায়। রাগ করবা না। বুঝছ রাগ করবা না।

জি-না, আমি রাগ করব না।

এই বাড়িটা তোমার নিজের বাড়ি— এরকম মনে করে থাকবা। আমি দেখি প্রায়ই তুমি দিঘির ঘাটলায় বসে থাক। ঘাটলাটা কি তোমার পছন্দ ?

জি খুব পছন্দ।

শুনে আনন্দ পেলাম। অনেক যত্ন করে বাড়ি বানিয়েছি। দিঘি কেটেছি। ঘাট বানিয়েছি। বাগান করেছি— দেখার কেউ নাই। আমি একা পড়ে থাকি। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া যে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। সংগ্রাম শুরু হয়েছে বলেই তোমরা এসেছে। ঠিক না মা ?

জি ঠিক।

ঐ দিন তোমার মেয়েটা বড় ভয় পেয়েছে। আমি খুবই শরমিন্দা। মাঝে-মাঝে কী যে হয়— মাথার ঠিক থাকে না। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে। বয়সের কারণে এসব হয়। বয়স খুব খারাপ জিনিস।

আপনি আমার মেয়েটাকে ডেকে একটু আদর করে দিন।

করব গো মা। করব। সময় হলেই করব। সব কিছুরই একটা সময় আছে, জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকে, কার্তিক মাসে পাকে না— বুঝলা মা ?

আসমানী বলল, আমি যাই ?

সরফরাজ মিয়া মুখ না তুলেই বললেন, আচ্ছা মা যাও। একটা কথা— মন প্রস্তুত করো। আমাদের জন্য খুব খারাপ সময়। বিষয়টা আমি স্বপ্নে পেয়েছি। স্বপ্নে আমি অনেক জিনিস পাই। দেশে আগুন জ্বলবে গো মা— আগুন জ্বলবে। তোমার কন্যাকে কোলে নিয়ে তোমাকে পথে পথে ঘুরতে হবে। এইটা কোনো পাগল ছাগলের কথা না। স্বপ্নে পাওয়া কথা।

আসমানী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষটা এইসব কী বলছেন ? বিকৃত মস্তিষ্ক একজন মানুষের কথাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার কোনোই কারণ নেই। তারপরেও কেমন যেন লাগে।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আরেকটা কথা গো মা। তোমার স্বামী কাছে নাই। তোমার চেহারা সুন্দর। তোমার অল্প বয়েস। মেয়েদের প্রধান শত্রু তার সুন্দর চেহারা আর অল্প বয়েস। তুমি অন্যের বাড়িতে আশ্রিত। এই অবস্থায় নানান বিপদ আসতে পারে। নিজেরে সামলায়ে চলবা।

আসমানী বৃদ্ধের এই কথা ফেলে দিতে পারছে না। সে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমস্যা আঁচ করতে পারছে। সমস্যাটা এরকম যে কাউকে বলতেও পারছে না। কারো কাছে পরামর্শও চাইতে পারছে না। তার বান্ধবী কুমকুমের বাবার ভাবভঙ্গি তার একেবারেই ভালো লাগছে না। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তিনি প্রায়ই আসমানীর পিঠে হাত রাখেন। আসমানী তার কন্যার বান্ধবী। তিনি অবশ্যই পিঠে হাত রাখতে পারেন। কিন্তু আসমানী জানে এই স্পর্শটা ভালো না। মেয়েরা ভালো স্পর্শ মন্দ স্পর্শ বুঝতে পারে।

একদিন আসমানী পুকুরে গোসল করছিল। মোতালেব সাহেব হঠাৎ গামছা হাতে উপস্থিত। তিনিও পুকুরে নামবেন। আসমানী সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেতে চাচ্ছিল। তিনি বললেন, উঠবা না উঠবা না, ঘাট খুব পিছল। আমি তোমাকে ধরে ধরে নামব। বলতে বলতেই তিনি এলেন। আসমানীর হাত ধরলেন। হাত ছেড়ে দিয়ে পরের মুহূর্তেই তিনি আসমানীর বুকে হাত রাখলেন। যেন এটা একটা দুর্ঘটনা। হঠাৎ ঘটে গেছে।

আসমানী চট করে সরে গেল। তার হাত-পা কাঁপতে লাগল। তার মনে হলো, এক্ষুনি সে মাথা ঘুরে পুকুরের পানিতে পড়ে যাবে। মোতালেব সাহেব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, পানি তো দেখি ঠাণ্ডা। তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না ?

আসমানী জবাব দিল না। সে উঠে আসবে কিন্তু তার পা এখনো স্বাভাবিক হয় নি। পা নড়াতে পারছে না। মোতালেব সাহেব বললেন, মিলিটারির ঘটনা শুনেছ ? চকের বাজার পর্যন্ত এসে পড়েছে। হিন্দুর বাড়িঘর টার্গেট করেছে। মেয়েগুলিরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ধরেই কী করে শোন, সব কাপড়চোপড় খুলে নেংটা করে ফেলে। তারপর বড় একটা ঘরে রেখে দেয়। ঘরের দরজা বন্ধ করে না। গায়ের কাপড়চোপড় নাই— এই অবস্থায় তারা পালাতেও পারে না। দিনেরবেলায় মিলিটারিরা অপারেশন করে। রাতে মেয়েগুলারে নিয়ে ফুর্তি করে। ভয়াবহ অবস্থা।

আসমানী পুকুর থেকে উঠে আসছে। মোতালেব সাহেব পেছন থেকে ডাকলেন, যাও কোথায় ? পাঁচটা মিনিট থাকো। গোসল সেরে এক সঙ্গে যাই। আমার বয়সে পুকুরে একা একা গোসল করা ঠিক না। কখন স্ট্রোক হয় কে বলবে। স্ট্রোক হয়ে পানিতে পড়ে গেলে তুমি টেনে তুলতে পারবে ?

সে এখন কী করবে ? চাচিকে গিয়ে বলবে, চাচি, আপনার স্বামী আমার বুকে হাত দিয়েছেন।

আসমানীর শরীর কেমন যেন করছে। সে বাড়িতে পা দিয়েই বমি করল। মাথা এমন করে ঘুরছে যে তাকে বসে পড়তে হলো। সে এখন প্রায় নিশ্চিত যে, হঠাৎ তার এই শরীর খারাপের কারণ শুধু মোতালেব চাচা না— তার শরীরে নতুন একটা প্রাণের সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে রওনা হবার সময়ই তার ক্ষীণ সন্দেহ ছিল। এখন আর সন্দেহ নাই।

আসমানী বসে আছে। উঠে দাঁড়াবার মতো জোর সে পাচ্ছে না।

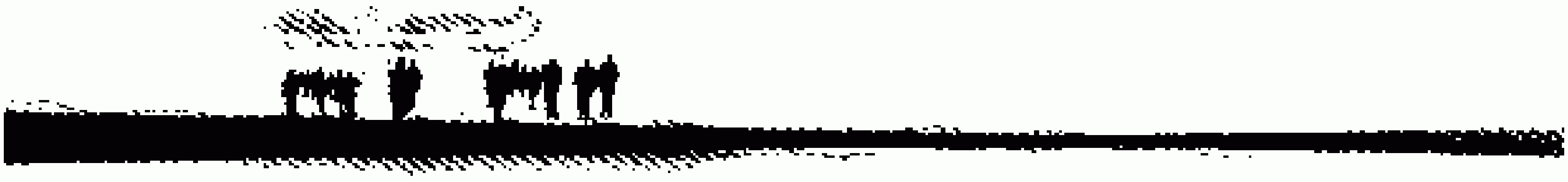

ফজরের নামাজ সময়মতো পড়তে পারেন নি, এ জাতীয় দুর্ঘটনা ইরতাজউদ্দিনের দীর্ঘ জীবনে কখনো ঘটে নি। সব মানুষের শরীরের ভেতর একটা ঘড়ি আছে। সেই ঘড়ি নিঃশব্দে টিকটিক করে সময় রাখে। যখন যা মনে করিয়ে দেবার মনে করিয়ে দেয়। ইরতাজউদ্দিন সাহেবের ঘড়িতে কোনো গোলমাল হয়েছে। ফজর নামাজের ওয়াক্তে তার ঘুম ভাঙল না। যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়েছে। পায়ের কাছে রোদ ঝলমল করছে। লজ্জা ও অনুশোচনার তাঁর সীমা রইল না। কী ভয়ঙ্কর কথা! ফজরের নামাজ ছাড়া তার দিন শুরু হতে যাচ্ছে?

গতরাতে ঘুমোতে যেতে অনেক দেরি হয়েছিল। এই কারণেই কি ভোরে ঘুম ভাঙে নি? এটা কোনো যুক্তি না। মানুষ একটা ভুল করলে ভুলের পক্ষে একের পর এক যুক্তি দাঁড়া করায়। এটা ঠিক না। ভুলকে ভুল হিসেবে স্বীকার করে নেয়াই ভালো। ইরতাজউদ্দিন মন খারাপ করে অজু করলেন। নামাজ পড়লেন। নামাজের সময় পার হয়ে যাবার পরেও তাঁকে কাজা পড়তে হলো না। কারণ আমাদের নবি-এ-করিম একবার অতিরিক্ত ঘুমের কারণে ফজরের নামাজ সময়মতো পড়তে পারেন নি। তাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। ফজরের নামাজ কাজা ছাড়াই দুপুর পর্যন্ত পড়া যাবে। জায়নামাজে দাঁড়িয়ে ইরতাজউদ্দিনের মনে হলো, কী অসাধারণ মানুষ ছিলেন আমাদের নবি! তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কর্ম কত না শ্রদ্ধা কত না ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

ইরতাজউদ্দিন নিজেকে শাস্তি দেবার জন্যে সকালে নাশতা খেলেন না। স্কুলের দিকে রওনা হলেন ঠিক সাড়ে নটায়। স্কুলে পৌঁছতে পনেরো মিনিট লাগে। তারপরেও হাতে থাকে পনেরো মিনিট। ক্লাস শুরু হয় দশটায়। এখন অবশ্যি কোনো ক্লাস হচ্ছে না। ছাত্ররা আসছে না। স্কুল বন্ধ থাকবে না খোলা থাকবে— এধরনের কোনো সরকারি ঘোষণাও নেই। কিছু শিক্ষক আসেন। কমনরুমে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে যে যার বাড়ি চলে যান।

গল্পগুজবের একমাত্র বিষয়— 'দেশের কী হচ্ছে'? শিক্ষকদের প্রায় সবাইকেই দেখা যায় আনন্দিত ভঙ্গিতে আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। পাকিস্তানি মিলিটারি যে ভয়াবহ জিনিস— এ ব্যাপারে তারা অতি দ্রুত ঐকমত্যে পৌঁছেন। কোনো এক বিচিত্র কারণে পাকিস্তানি মিলিটারির শৌর্যবীর্যের কথা বলতে এদের ভালো লাগে।

'শুনেছেন না-কি, সব তো একেবারে শোয়ায়ে ফেলেছে। যেদিকে যাচ্ছে একেবারে শ্মশান বানিয়ে যাচ্ছে।'

'জ্বালাওপোড়াও বলে এত যে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি, এক ধাক্কায় শেষ। পাকিস্তানি মিলিটারি কী জিনিস যে জানে সে জানে।'

'এদের মধ্যে কিছু আছে যাদের এরা অন্ধকারে চেইন দিয়ে বেঁধে রাখে— সাক্ষাৎ আজরাইল। দরকারের সময় ছাড়ে— তখন আর কোনো উপায় থাকে না। এদের এখনো ছাড়ে নাই। ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে ছাড়বে। তার আগে ছাড়ার দরকার নাই।'

"দয়ামায়া বলে এক বস্তু এদের মধ্যে নাই। এরা হলো 'ধর তক্তা মার পেরেক টাইপ।' তক্তা একবার ধরলে পেরেক মেরে ছেড়ে দিবে।"

পেরেক মারতে মারতে আসছে। পেরেক মেরে বাঙালি সিধা করে দেবে। বাঙালি ভেবেছিল সিংহের সাথে সাপলুডু খেলবে। সিংহ সাপলুডু খেলে না।

মিলিটারিবিষয়ক আলাপ-আলোচনার শেষে ঝালমুড়ি দিয়ে চা খাওয়া হয়। আগে পত্রিকা নিয়ে টানাটানি করা হতো, এখন পত্রিকা আসছে না বলে সেই পর্ব হয় না। অংক স্যার ছগিরউদ্দিন এক দুই দান দাবা খেলেন স্কুলের ইংরেজি স্যার কালিপদ বাবুর সঙ্গে। কালিপদ বাবু তুখোড় খেলোয়াড়— কাজেই প্রতিবারই তিনি হারেন এবং হেরে কিছু চিল্লাচিল্লি করেন। এই হলো এখনকার স্কুলের রুটিন। রুটিনের তেমন কোনো হেরফের হয় না। উত্তেজনাহীন জীবনে মিলিটারি আসছে এই একমাত্র উত্তেজনা। এই নিয়ে কথা বলতেও তাদের ভালো লাগে। এতেও কিছুটা উত্তেজনা পাওয়া যায়। খারাপ ধরনের উত্তেজনা। তাতেই বা ক্ষতি কী?

মিলিটারি নীলগঞ্জে কবে নাগাদ আসবে?

দেরি নাই। আসলো বলে। ময়মনসিংহ চলে এসেছে। যে-কোনোদিন নীলগঞ্জ চলে আসবে। খবর দিয়ে তো আসবে না। হঠাৎ শুনবেন আজদহা উপস্থিত। মেশিনগানের ট্যাট ট্যাট গুলি।

ভয়ের কথা, কী বলেন?

ভয়ের কথা তো বটেই। এরা সাক্ষাৎ আজরাইল। মুখের কথার আগেই গুল্লি। হিন্দু হলে ছাড়ান নাই।

হিন্দু মুসলমান বোঝে কীভাবে ?

কাপড় খুলে খৎনা দেখে। তারপরে চার কলমা জিজ্ঞেস করে। কলমায় উনিশ বিশ হয়েছে কি গুল্লি।

চার কলমা তো আমি নিজেও জানি না।

মুখস্থ করেন, তাড়াতাড়ি মুখস্থ করেন। মিলিটারি এসে পড়লে আর মুখস্থ করার সময় পাবেন না। ময়মনসিংহের এডিসির যে দশা হয়েছে সেই দশা হবে।

উনার কী হয়েছিল ?

চার কলমা জিজ্ঞেস করেছে। কলমা তৈয়ব বলেছে ঠিকঠাক। কলমা শাহাদতে গিয়ে বেড়াছেড়া করল। তখন জিজ্ঞেস করল বেতেরের নামাজের নিয়ত। পারল না— সঙ্গে সঙ্গে গাংগানির পাড়ে নিয়ে দুম দুম দুই গুল্লি।

বেতেরের নামাজের নিয়তও জিজ্ঞেস করে ?

সব জিজ্ঞেস করে। পাকিস্তানি মিলিটারি ধর্মের ব্যাপারে খুব শক্ত।

বিপদের কথা।

বিপদ মানে বিপদ, মহাবিপদ। রোজ কেয়ামত বলতে পারেন।

বিপদের আশঙ্কায় কাউকে তেমন চিন্তিত মনে হয় না। নীলগঞ্জ গ্রামের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। ঝকঝক করছে এপ্রিলের নীলাকাশ। খেতে খামারে কাজ কর্ম হচ্ছে— চিন্তিত হবার কী আছে। শহরে ঝামেলা হচ্ছে। শহরে ঝামেলা হয়েই থাকে। শহরের ঝামেলা গ্রামকে স্পর্শ করে না। রাজা আসে রাজা যায়— এ তো বরাবরের নিয়ম। রাজা বদলের ছোঁয়া শরীরে না লাগলেই হলো। লাগবে না বলাই বাহুল্য। বড় বড় আন্দোলন শহরে শুরু হয়ে শহরেই শেষ হয়। গ্রাম পর্যন্ত আসে না।

ইরতাজউদ্দিন স্কুলে এসে দেখলেন, স্কুলের শিক্ষকরা সবাই চলে গেছেন। জোর গুজব মিলিটারিরা ময়মনসিংহ থেকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। একটা বড় দল গেছে হালুয়াঘাট। যে-কোনো সময় নীলগঞ্জে চলে আসতে পারে। স্কুলে আছেন হেডমাস্টার সাহেব। ছাত্র থাকুক না থাকুক তিনি দশটা-পাঁচটা স্কুলে হাজির থাকেন। ছগির সাহেব এবং কালিপদ বাবুও আছেন।

ছগির সাহেব দাবা খেলছিলেন, আজ তিনি ভালো খেলেছেন। কালিপদ বাবু সুবিধা করতে পারছে না। তার মন্ত্রী আটকা পড়ে গেছে। মন্ত্রী খোয়ানো ছাড়া

কালিপদ বাবুর সামনে কোনো বিকল্প নেই। অংক স্যারের মুখভর্তি হাসি। আনন্দ তিনি চেপে রাখতে পারছেন না। ইরতাজউদ্দিনকে দেখে অংক স্যার আনন্দিত গলায় বললেন, নীলগঞ্জে মিলিটারি চলে আসতেছে শুনেছেন না-কি ?

ইরতাজউদ্দিন বললেন, তাই না-কি ?

হেড স্যারের কাছে যান। উনার কাছে লেটেস্ট সংবাদ আছে।

মিলিটারি আসছে এরকম খবর পাঠিয়েছে ?

আরে না। এরা কি খোঁজ-খবর দিয়ে আসে ? হুট করে চলে আসবে। এসেই রাজা আটক করে ফেলবে। সরাসরি গজের আক্রমণ। হা-হা-হা।

হাসতেছেন কেন ? মিলিটারি আসা কি কোনো আনন্দের বিষয় ?

আমাদের জন্যে সমান। আমরা আমেও নাই ছালাতেও নাই। দেশ শান্ত হলেই খুশি। ছাত্র পড়াব, বেতন পাব। আর কী ?

ইরতাজউদ্দিন হেডমাস্টার সাহেবের ঘরের দিকে রওনা হলেন। ছগির সাহেব দাবার বোর্ডের উপর ঝুঁকে পড়লেন। ইচ্ছা করলেই তিনি মন্ত্রীটা খেতে পারেন। খেতে ইচ্ছা করছে না। আটকা থাকুক, ধীরেসুস্থে খাবেন। খাদ্য তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তিনি গজের চাল দিলেন। তেমন চিন্তা-ভাবনা করে দিলেন না। বিপক্ষের মন্ত্রী আটকা পড়ে আছে, এখন এত চিন্তা-ভাবনার কিছু নেই।

হেডমাস্টার মনসুর সাহেব মাথা নিচু করে কী যেন লিখছিলেন। ইরতাজউদ্দিনকে দেখে মাথা তুললেন। ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনার কী হয়েছে ?

মনসুর সাহেব জবাব দিলেন না। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তিনি কথা বলতে চান না। তাঁর ভালো লাগে না। গত তিন রাত ধরে তার ঘুম হচ্ছে না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন। স্বামী আশেপাশে থাকলে মহিলা অনেকটা সুস্থ থাকেন। এবার তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। এখন তিনি স্বামীকে চিনতে পারছেন না। এক রাতে তিনি স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেখে চিৎকার করে উঠলেন— এই তুমি কে ? তুমি ঘরে ঢুকলা কেন ? খবরদার! খবরদার! মনসুর সাহেব বললেন, আসিয়া আমাকে চিনতে পারছ না ? আমি আমি।

খবরদার আমি আমি করবা না। খবরদার।

হেডমাস্টার সাহেব রাতে আলাদা ঘরে ঘুমান। আসয়াকে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। ছাড়া পেলে তিনি একা একা নদীর পাড়ে চলে যান।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, মিলিটারি নাকি আসছে ?

মনসুর সাহেব হাতের কলম নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, আসবে তো বটেই।

শুধু শুধু গণ্ডগ্রামে আসবে কেন?

দেশটাকে নিজের মুঠোয় নিতে হলে আসতেই হবে। কবে আসবে সেটা কথা। শহরগুলোর দখল এরা নিয়ে নিয়েছে— এখন ছড়িয়ে পড়বে। কোনো রেসিসটেন্স পাচ্ছে না, কাজেই ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা দ্রুত ঘটবে।

রেসিসটেন্স হবে?

অবশ্যই হবে। কে জানে, এখনই হয়তো শুরু হয়েছে। সামনের দিন বড়ই ভয়ঙ্কর ইরতাজ সাহেব। কেউ বুঝতে পারছে না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি।

ভাবি সাহেবের শরীর কেমন?

ভালো না। তাকে এখানে আনা ঠিক হয় নাই। মনে হয় বাপ-ভাইয়ের কাছেই সে ভালো ছিল। তাকে এখানে এনে ভুল করেছি।

মানুষের কর্মকাণ্ড কোনটা ভুল কোনটা শুদ্ধ সেই বিবেচনা কঠিন বিবেচনা। মানুষ প্রায়ই এই বিবেচনা করতে পারে না। ভুল এবং শুদ্ধ একমাত্র আল্লাহ্‌পাকই বলতে পারেন।

মনসুর সাহেব বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনার মতো আল্লাহ্‌ভক্ত মানুষদের একটা সুবিধা আছে— সব দায়দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করতে পারেন। বড় কোনো বিপদ যদি আসে, তখনও আপনার মতো মানুষরা সবই আল্লাহ্‌র হুকুম বলে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করতে থাকে।

এইটা কি ভালো না?

না, এটা ভালো না। মানুষকে বিবেক দেয়া হয়েছে। চিন্তা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যুক্তিবিদ্যার মতো কঠিন বিদ্যায় জন্মসূত্রেই মানুষ পারদর্শী। সেই মানুষ যদি সবই আল্লাহ্‌র হুকুম বলে চুপ করে থাকে, তাহলে কীভাবে হয়?

আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবুর করতে বলেছেন।

ভালো কথা, সবুর করেন। আপনার ছোট ভাইয়ের কোনো খবর পেয়েছেন? শাহেদ না তার নাম?

জি তার নাম শাহেদ। না, কোনো খবর এখনো পাই নাই।

এটা নিয়েও নিশ্চয়ই আপনার মনে কোনো দুশ্চিন্তা নাই? সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হচ্ছে, তাই না?

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনার মনটা মনে হয় আজ ভালো নাই।

মনসুর সাহেব জবাব দিলেন না। মন ভালো আছে— এই কথা প্রিয়জনদের জানাতে ইচ্ছা করে। মন ভালো নাই— এই খবর ঢোল পিটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে না।

মাওলানা সাহেব!

জি।

কনফুসিয়াসের নাম শুনেছেন?

জি-না।

বিখ্যাত চীনা দার্শনিক। তিনি পাঁচটি সম্পর্কের কথা বলেছেন। পাঁচটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এই পাঁচটা সম্পর্ক কী, জানতে চান?

ইরতাজউদ্দিন উসখুস করছেন। আসরের নামাজের সময় হয়ে গেছে। আসরের নামাজের সময় অল্প। পাঁচ সম্পর্কের কথা যদি হেডমাস্টার সাহেব ব্যাখ্যা করে বলা শুরু করেন, নামাজের সময় পার হয়ে যেতে পারে। নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবের স্ত্রী খবর পাঠিয়েছেন। খুব নাকি জরুরি প্রয়োজন। সেখানেও যেতে হবে। তার সঙ্গে জরুরি প্রয়োজনটা কী তিনি বুঝতে পারছেন না।

মাওলানা সাহেব শুনেন, পাঁচটা সম্পর্ক হচ্ছে শাসকের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। পিতা-পুত্র সম্পর্ক। বড়ভাই-ছোটভাই সম্পর্ক এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক। বুঝতে পেরেছেন?

জি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু হঠাৎ করে সম্পর্কের ব্যাপারটা আমাকে কেন বললেন, সেটা বুঝলাম না।

আপনাকে বললাম কারণ পাঁচটা সম্পর্কের কোনোটাই আমার সঙ্গে সম্পর্কিত না। পাকিস্তানি শাসকের সঙ্গে প্রজা হিসাবে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নাই। আমার কোনো ছেলে নাই যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হবে। আমার কোনো ভাই নাই, বন্ধুও নাই।

ইরতাজউদ্দিন শান্ত গলায় বললেন, বন্ধু কি নাই?

হেডমাস্টার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বন্ধু আছে। আপনি আছেন। আপনার কথাটা মনে ছিল না। খুব কাছাকাছি যারা থাকে, তাদের কথা মনে থাকে না।

নামাজের সময় হয়ে গেছে, উঠি? বলতে বলতে ইরতাজউদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন।

জায়নামাজে দাঁড়ানোর পর জাগতিক সব চিন্তা-ভাবনা মাথা থেকে দূর করতে হয়। বেশিরভাগ সময়ই এই কাজটা তিনি পারেন। আজ পারলেন না। কনফুসিয়াস নামের চীনা দার্শনিকের কথা মাথায় ঘুরতে লাগল। সূরা ফাতেহা পড়ার সময়ই তাঁর মনে হলো কনফুসিয়াস ভুল করেছেন। আসল দু'টা সম্পর্ক বাদ দিয়ে গেছেন। মাতা-পুত্র সম্পর্ক, মাতা-কন্যা সম্পর্ক। তিনি কি ইচ্ছা করে এই ভুলটা করেছেন? না-কি ভুলটা অজান্তে হয়েছে? মা'র সঙ্গে কি তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না?

ইরতাজউদ্দিনের নামাজে গণ্ডগোল হয়ে গেল। তিনি আবারো শুরু থেকে নামাজ শুরু করলেন। এইবার তাঁর মাথায় ওসি সাহেবের স্ত্রীর কথা চলে এলো। মহিলার নাম তিনি জানেন। নামটা এখন মনে পড়ছে না।

নামাজে দাঁড়ানোর অর্থ আল্লাহপাকের সামনে দাঁড়ানো। আল্লাহপাকের সামনে দাঁড়িয়ে একজন মহিলার নাম মনে করার চেষ্টা আল্লাহপাকের সঙ্গে বেয়াদবি করার চেয়ে বেশি। ইরতাজউদ্দিন প্রাণপণ চেষ্টা করছেন নাম মনে না করার। লাভ হচ্ছে না। মাথার মধ্যে ঘুরছে— কী যেন নাম? কী যেন নাম? ফলের নামে নাম। ফলটা কী? আঙ্গুর, বেদানা? নামের মধ্যে ক আছে। ক নাম দিয়ে যে ফল, তার মনে পড়ছে। সেই নাম কেউ রাখবে না— 'কলা'। তাহলে নামটা কী?

এদিকে ছগির সাহেবও খুব হৈচৈ শুরু করেছেন। কালিপদ বাবুর মন্ত্রী খাওয়ার পরেও তিনি হেরে গেছেন। আসলে মন্ত্রী খেতে গিয়েই ভুলটা হয়েছে। মন্ত্রী ছিল টোপ। তিনি বোকার মতো টোপ গিলেছেন। টোপ গিলে ফেঁসে গেছেন। ছগির সাহেব চেঁচাচ্ছেন, আপনি যা করেছেন তার নাম ভাওতাবাজি। ভাওতাবাজি খেলা না।

কালিপদ বাবু বললেন, ভাওতাবাজি কী করলাম?

ভাওতাবাজি কী করেছেন, বুঝেন না? হিন্দু জাতটাই ভাওতাবাজির জাত। মিলিটারি যে ধরে ধরে নুনু কেটে মুসলমান বানায়ে দিচ্ছে, ভালো করছে। আপনার যন্ত্রও কাটা দরকার।

এটা কী রকম কথা?

অতি সত্যি কথা। ভাওতাবাজির খেলা আমার সঙ্গে খেলবেন না। বুঝেছেন? আমার সঙ্গে যদি খেলতে চান স্ট্রেইট খেলবেন।

আমি তো খেলতে চাই না, আপনিই জোর করে খেলতে বসান।

আমি জোর করে খেলতে বসাই?

অবশ্যই!

আপনি যে শুধু ভাওতাবাজ তা-না, আপনি মিথ্যাবাদী নাম্বার ওয়ান।

আমি মিথ্যাবাদী ?

শাটআপ।

চিৎকার করছেন কেন ?

আবার কথা বলে ? শাটআপ মালাউন।

ইরতাজউদ্দিন নামাজ শেষ করে কমনরুমে এসে দেখেন, দু'জনের ঝগড়া মিটমাট হয়ে গেছে। তারা আবারো দাবা খেলতে বসেছেন। কনফুসিয়াসের কথা হয়তোবা সত্যি। বন্ধুত্বের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ভাই এবং বোন পাওয়া যেমন ভাগ্যের ব্যাপার, বন্ধু পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।

ওসি সাহেবের স্ত্রী ইরতাজউদ্দিনকে চমকে দিয়ে কদমবুসির জন্যে নিচু হলো। ইরতাজউদ্দিন খুবই বিব্রত হলেন। ঠিক তখনই মেয়েটির নাম তাঁর মনে পড়ল। কমলা।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, মাগো, মাথা নিচু করে সালাম করা ঠিক না। মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌পাক ছাড়া আর কারো কাছেই মাথা নিচু করবে না। এটাই আল্লাহ্‌পাকের বিধান।

কমলা নরম গলায় বলল, এইসব বিধান আপনাদের মতো জ্ঞানীদের জন্যে। আমার মতো সাধারণদের জন্যে না। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নের বিষয়ে কথা বলার জন্যে আপনাকে ডেকেছি।

স্বপ্নের তাফসির করার মতো যোগ্যতা আমার নাই। তারপরেও বলো শুনি কী স্বপ্ন দেখেছ। স্বপ্নটা কখন দেখেছ ?

ভোররাত্রে। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙার পরে পরেই মোরগের বাগ শুনেছি। স্বপ্নে দেখলাম, বড় একটা মাঠ। মাঠ ভর্তি কাশফুল ফুটেছে। আমি মনের আনন্দে ছোটাছুটি করতেছি। এক সময় ছোটাছুটি বন্ধ করে বিশ্রামের জন্যে বসলাম। তখন দেখি, আমার শাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে চোরকাঁটায়। আমি অবাক হয়ে ভাবতেছি, কাশবনে চোরকাঁটা আসল কীভাবে ? তারপর চোরকাঁটা বাছতে বসলাম। একটা চোরকাঁটা তুলি, সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গা থেকে এক ফোঁটা রক্ত পড়ে। দেখতে দেখতে শাড়ি ভর্তি হয়ে গেল রক্তে। এই হলো স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখার পর থেকে খুব অস্থির লাগতেছে।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, স্বপ্ন দেখে অস্থির হওয়ার কিছু নেই। সন্তানসম্ভবা মায়েরা ভয়ের মধ্যে থাকে। সেই ভয় থেকে তারা দুঃস্বপ্ন দেখে।

এইটা ছাড়া আর কিছু নাই ?

অনেক সময় আল্লাহ্‌পাক স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষকে সাবধান করেন। তবে তিনি সংবাদ পাঠান রূপকের মাধ্যমে। সেই রূপকের অর্থ উদ্ধার করা কঠিন। আমার এত জ্ঞান নাই। আমি মূর্খ কিসিমের মানুষ।

চাচাজি, আজ রাতে আমার এখানে খাবেন।

মাগো, আজ বাদ থাকুক।

জি-না, আজ আপনি খাবেন। আজ আমার একটা বিশেষ দিন।

বিশেষ দিনটা কী ? আজ কি তোমার বিবাহের দিন ?

কমলা জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে হাসল। ইরতাজউদ্দিন বললেন, আমি অবশ্যই তোমার এখানে খানা খেতে আসব।

১৪ এপ্রিল, বুধবার।

নীলগঞ্জ থানার ওসি ছদরুল আমিন তাঁর বাসার সামনে মোড়ায় বসে আছেন। তিনি অসম্ভব ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার কথা বলতে পারছেন না, কারণ তাঁর স্ত্রী প্রসবব্যথায় সকাল থেকে ছটফট করছে। অবস্থা মোটেই ভালো না। প্রথম পোয়াতি, সমস্যা হবে জানা কথা। এই পর্যায়ের হবে ছদরুল আমিন বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারলে স্ত্রীকে অবশ্যই তার বাপের বাড়িতে রেখে আসতেন। ডাক্তার কবিরাজ নিয়ে ছোটাছুটি যা করার তারাই করত। তিনি যথাসময়ে টেলিগ্রাম পেতেন—

A boy

Congratulations.

তিনি মিষ্টি নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হতেন। তা না করে বেকুবের মতো স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এখন ম্যাও সামলাতে পারছেন না। নান্দিনায় একজন এমবিবিএস ডাক্তার আছেন। তাকে আনতে গতকাল একজন কনস্টেবল পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তার আসে নি, কনস্টেবলও আসে নি। ছদরুল আমিনের ধারণা, কনস্টেবল নান্দিনা না গিয়ে বাড়ি চলে গেছে। হুকুম বলে এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। যে যার মতো কাজ করছে। থানায় দশজন কনস্টেবল, একজন সেকেন্ড অফিসার এবং একজন জমাদার থাকার কথা। আছে মাত্র চার জন। তারা কোনো ডিউটি করছে না। দিনরাত ঘুমুচ্ছে। আরামের ঘুম। থানার ওসিকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করবে— তাও কেউ করছে না। বিছানায় পাশ ফিরে হাই তুলছে।

থানা হাজতে তিনটা ডাকাত আছে পনেরো দিন ধরে। হারুন মাঝি আর তার দুই সঙ্গী। এদের নিয়ে কী করা যায় তাও বুঝতে পারছেন না। হারুন মাঝি ভয়াবহ ডাকাত। দিনকাল ঠিক থাকলে হারুন মাঝিকে ধরার জন্যে পাকিস্তান পুলিশ মেডেল পেয়ে যেতেন। এখন যা পাচ্ছেন তার নাম যন্ত্রণা। এদের সদরে পাঠাতে পারছেন না। নিজের বাড়ি থেকে রান্না করে খাওয়াতে হচ্ছে। সবচে'

ভালো হতো, যদি হারুন মাঝিকে ছেড়ে দিয়ে তিনি তার স্ত্রী নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতেন। দেশ ঠিকঠাক হলে আবার ফিরে আসা। দেশটা এখন কোন অবস্থায় আছে কিছুই বুঝতে পারছেন না। না পাকিস্তান, না বাংলাদেশ।

এইভাবে তো মানুষ বাঁচতে পারে না। সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থায় বাঁচে বনের পশুপাখি। তাদের থানা নেই, কোর্ট-কাচারি নেই। মানুষের আছে।

ওসি সাহেবের বাসা থানা কম্পাউন্ডের ভেতরে। থানা কম্পাউন্ডের ভেতরে বাইরের মহিলারা আসেন না। থানাকে ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখা হয়। ছদরুল আমিন সাহেবের ভাগ্য ভালো, দু'জন মহিলা এখন তার স্ত্রীর দেখাশোনা করছেন। একজন হলেন হাজী সাহেবের স্ত্রী। অন্যজন ধাই— 'সতী'। সতী এই অঞ্চলের এক্সপার্ট ধাই। তার উপর ভরসা করা যায়। হাজী সাহেবের স্ত্রী বয়স্ক মহিলা। এদের উপরও ভরসা করা যায়। বয়স্ক মহিলারা অভিজ্ঞতা দিয়ে অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

ছদরুল আমিন তেমন ভরসা করতে পারছেন না। সকাল থেকে তাঁর মনে কু ডাক ডাকছে। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে। সেই ভয়ঙ্করটা কি স্ত্রীর মৃত্যু ? এ চিন্তা মাথায় এলেই শরীর নেতিয়ে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষের ক্ষুধাবোধ তীব্র হয়। ছদরুল আমিন ক্ষিধের কষ্টেই এখন বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। ঘরে চিড়া-মুড়ি আছে। গুড় আছে। কাউকে বললে এনে দেয়, কিন্তু কাউকে বলতে লজ্জা লাগছে। স্ত্রীর এখন-তখন অবস্থা আর তিনি ধামাভর্তি গুড়মুড়ি নিয়ে বসেছেন, তা হয় না।

স্ত্রীর পাশে গিয়ে কিছুক্ষণ বসতে ইচ্ছা করছে। বেচারি নিশ্চয়ই ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। এরকম অবস্থায় মা-খালারা পাশে থাকেন। তার কেউ নেই। স্বামী হাত ধরে পাশে বসে থাকলে অনেকটা ভরসা পেত। তাও সম্ভব না। এই অঞ্চলের নিয়মকানুন কড়া— আতুরঘরে পুরুষ মানুষের প্রবেশ নিষেধ। নবজাত শিশু নিয়ে মা আতুরঘর থেকে অন্য ঘরে যখন যাবেন, তখন শুধু পুরুষরা যেতে পারবে। তার আগে না। তাঁর একবার মনে হচ্ছে, নিয়মের গুষ্ঠি কিলাই। বসি কমলার পাশে। গতকাল রাতে বড় লজ্জা পেয়েছেন। পোলাও কোরমা দেখে অবাক হয়ে বলেছেন, ঘটনা কী ? কমলা কিছু বলে নি। শুধু হেসেছে। ইরতাজউদ্দিন দাওয়াত খেতে আসার পর জানতে পারলেন, আজ তাদের বিবাহ বার্ষিকী। এই তারিখ ভুলে যাওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে।

ছদরুল আমিন সিগারেট ধরালেন। খালি পেটে সিগারেট ধরানোর জন্যে সারা শরীর গুলিয়ে উঠল। মনে হলো বমি হয়ে যাবে। হাজী সাহেবের স্ত্রী বের হলেন। এই মহিলাও হাজী। স্বামীর সঙ্গে হজ করে এসেছেন। তার প্রমাণ

হিসেবে সব সময় আলখাল্লার মতো একটা বোরকা পরেন। বোরকা পরলেও ভদ্রমহিলা আধুনিক। পুরুষদের সঙ্গে কথা বলেন। নীলগঞ্জের অন্য মেয়েদের মতো পুরুষ দেখলেই পালিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন না কিংবা শক্ত খাম্বার মতো হয়ে পড়েন না।

ভদ্রমহিলা ছদরুল আমিনের দিকে তাকিয়ে শক্ত গলায় বললেন, গতিক ভালো না। আল্লাহর নাম নেন। কলসহাটির মৌলানা সাবের কাছ লোক পাঠান 'উতার'-এর জন্যে। উতার দিয়া নাভি ধুইতে হবে।

উতারটা কী?

পানি পড়া। কলসহাটির মৌলানা সাবের উতার হইল শেষ চিকিৎসা। তাড়াতাড়ি পুলিশ পাঠাইয়া দেন।

জি আচ্ছা।

ছদরুল আমিন থানার দিকে রওনা হলেন। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ মেঘলা। সবকিছুই কেমন আধাখেচড়া। বৃষ্টি হলে ঝমঝমিয়ে হবে, আকাশ হবে ঘন কালো।

হাজতঘরের দরজায় ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। ছদরুল আমিনকে দেখে হারুন মাঝি তার ধবধবে সাদা দাঁত বের করে বলল, ওসি সাব, ভুখ লাগছে। খানা দিবেন না? কাইল খাইলাম পোলাও কোরমা। আইজ খালি পানি।

চুপ থাক।

ভুখ লাগছে তো। ফাঁস দিলে ফাঁস দিবেন। না খাওয়াইয়া মারবেন— এইটা কেমন বিচার?

হারামজাদা চুপ।

হারুন মাঝি হেসে ফেলল। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। সুন্দর মায়া কাড়া চেহারা। এই লোক ঠাণ্ডা মাথায় দশ-বারোটা খুন করেছে ভাবাই যায় না। ছদরুল আমিন বললেন, ঘরে অসুবিধা আছে। পাক হয় নাই।

না খাইয়া থাকমু? চিড়া-মুড়ির ব্যবস্থা করেন।

চিড়া-মুড়ির ব্যবস্থা অবশ্যি করা যায়। সেটাই ভালো হয়। তিনি খানিকটা খেয়ে নেবেন। উতারের জন্যেও কাউকে পাঠাতে হবে। তিনি আশপাশে কোনো কনস্টেবল দেখলেন না। কী দিন ছিল আর কী দিন হয়েছে। আগে চব্বিশ ঘণ্টা সেন্ট্রি ডিউটি থাকত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টি পিটে সময় জানানো হতো। গ্রামের মানুষ থানা-ঘণ্টি শুনে সময় বুঝত। আজ কিছুই নেই। ছদরুল আমিন থানার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন— আর তখনি চোখে পড়ল দু'টা জিপ আর তিনটা ট্রাক

আসছে। আস্তে আস্তে আসছে। রাস্তা ভালো না— দ্রুত আসার উপায়ও নেই। তার বুক ধ্বক করে উঠল— মিলিটারি আসছে! ইয়া গফরুর রহিম— মিলিটারি।

মিলিটারি কনভয় নিয়ে যাচ্ছিলেন পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কর্নেল মোশতাক। তার গন্তব্য ভৈরব। হঠাৎ তাঁকে বলা হলো ভৈরব না গিয়ে নীলগঞ্জ থানায় হল্ট করতে। কারণ কিছুই ব্যাখ্যা করা হলো না। ওয়ারলেসের সংক্ষিপ্ত ম্যাসেজ। পথে কোনো ঝামেলা হয়তো আছে। ছোটখাটো ঝামেলা তৈরি হচ্ছে। গুরুত্বহীন ঝামেলা। অতি উৎসাহী কিছু ছেলেপুলে মিলিটারি কনভয় দেখে থ্রি নট থ্রি রাইফেলে গুলি ছুড়ে বসল। হাস্যকর কাণ্ড তো বটেই। হাস্যকর কাণ্ডগুলোর ফলাফল মাঝে মাঝে অশুভ হয়। তবে এখনো তার ইউনিটে কিছু হয় নি। বাঙালি সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়েছে এমন খবর নেই। তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রও নেই। অস্ত্রের সমস্যা তারা অবশ্যি মিটিয়ে ফেলতে পারবে। গায়ের সঙ্গে গা লেগে আছে হিন্দুস্থান। প্যাকিস্তানকে একটা শিক্ষা দেবার জন্যে ১৯৪৭ সাল থেকেই তারা খাপ ধরে বসে আছে। এই তাদের সুযোগ। মূর্খ বাঙালি বোঝে না হিন্দুস্থান আসলে কী চায়। তারা পূর্ব পাকিস্তান গিলে খেতে চায়। তবে সেই সুযোগ তারা পাবে না। উচিত শিক্ষা তাদের দেয়া হবে। সেই সঙ্গে উচিত শিক্ষা দেয়া হবে বদমাশ বাঙালিদের।

প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে কর্নেল মোশতাকের জিপ থেমে গেল। তিনি জানালা দিয়ে বিরক্তমুখে গাড়ির চাকা দেখার চেষ্টা করলেন। বোঝাই যাচ্ছে চাকা পাংচার হয়েছে। মিনিট দশেক সময় নষ্ট হবে। চলন্ত কনভয়ের কাছে মিনিট দশেক সময় অনেক সময়। এই সময়ে বড় ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে। দেশে গেরিলা একটিভিটিজ নেই। যদি থাকত তিনি তার বাহিনীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে সতর্ক অবস্থায় নিয়ে যেতেন। এখন তেমন সাবধানতা গ্রহণের সময় আসে নি। দরিদ্র একটা অঞ্চলের কাঁচা রাস্তা। দু'পাশে ধানক্ষেত। ভয়ের কিছুই নেই। কর্নেল সাহেব জিপ থেকে নেমে গাড়ির চাকার বদল দেখতে লাগলেন। গরমে শরীর ঘেমে যাচ্ছে। নীলগঞ্জ থানায় রাত কাটাতে হলে একটা শাওয়ার নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

গত তিনদিন ধরে তিনি খাকি পোশাক গায়ে নিয়ে ঘুরছেন। শরীর ঘামছে। সেই ঘাম শরীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। কুৎসিত অবস্থা। গত সপ্তাহের 'নিউজ উইক' সঙ্গে আছে— এখনো পড়া হয় নি। রাতে পড়া যেতে পারে। গাড়ির চাকা বদলাতে অনেক সময় লাগল। সব কী রকম ঢিলাঢালা হয়ে গেছে। যুদ্ধ অবস্থায়

এইসব কাজ হবে বিদ্যুতের মতো। কর্নেল মোশতাক বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন। মনের বিরক্তি প্রকাশ করলেন না।

নীলগঞ্জ থানার ওসি কর্নেল সাহেবকে স্যালুট দিলেন। তার পেছনে তিনজন কনস্টেবল। তারা 'প্রেজেন্ট আর্মস' ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

কর্নেল সাহেব বললেন, সব ঠিক হ্যায় ?

ছদরুল আমিন বললেন, ইয়েস স্যার।

ভেরি গুড। হোয়াটস ইয়োর নেম ?

ছদরুল আমিন।

নাম তো বহুত আচ্ছা হ্যায়।

কর্নেল মোশতাক আবারো হাসলেন। ছদরুল আমিনের বুকের রক্ত এবং পেটের ক্ষুধা দুই-ই মিলিটারি দেখে পানি হয়ে গিয়েছিল। কর্নেল সাহেবের মুখের হাসি দেখেও লাভ হলো না। বুক ধ্বক ধ্বক করেই যাচ্ছে।

কর্নেল সাহেব হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়ালেন। ছদরুল আমিন হ্যান্ডশেক করলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, ডরতা কেউ ডরো মাৎ।

এই ঘটনা ঘটল দুপুর তিনটায়। বিকেল পাঁচটায় ঘটল সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা।

ছদরুল আমিনকে সোহাগী নদীর কাছে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। ছদরুল আমিন সাহেব একা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে ছিল পাঁচজন হিন্দু, দু'জন আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র— এরা মুসলমান।

মৃত্যুর আগে আগে ছদরুল আমিন একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলেন— 'উতার' আনতে যাকে পাঠানো হয়েছে, সে কি এসেছে ?

মৃত্যুর আগে মানুষ কত কী ভাবে— তাঁর মাথায় শুধু ঘুরতে লাগল 'উতার'-এর পানি। 'উতার' শব্দটা বারবার উচ্চারণ করতেও তাঁর খুব মজা লাগছিল।

নীলগঞ্জ থানা কম্পাউন্ড খুব জমজমাট। গেটে মিলিটারি সেন্ট্রি। থানার মূল বিল্ডিং-এর বারান্দায় দু'টা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। রাজ্যের পোকা এসে জড়ো হয়েছে। পোকাদের আনন্দের সীমা নেই।

থানার পেছনেই বাঁধানো কুয়া। কুয়ার পাশে কর্নেল সাহেবের থাকার জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। আজ রাত কর্নেল সাহেবকে নীলগঞ্জে থাকতে হবে। কর্নেল মোশতাক আহমেদ তাঁর তাঁবুর সামনে চেয়ারে বসে আছেন। টুলের উপর পা তুলে ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করছেন। তিনি গা থেকে দু'দিনের বাসি

কাপড় এখনো খোলেন নি। তবে শিগগিরই খুলবেন। তাঁর গোসলের জন্য কুয়া থেকে বালতিভর্তি ঠাণ্ডা পানি তোলা হয়েছে। তিনি স্নানে যাওয়ার আগে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চান যে, তার দলটির রাতে থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। জোয়ানদের রাতে ঘুমানোর ব্যাপারটা তেমন জরুরি নয়, তবে খাওয়ার ব্যবস্থাটা জরুরি। পুরো দলটি বলতে গেলে সারাদিন না খাওয়া।

মোশতাক আহমেদ মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন— খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। গ্রামে বাজার-হাটের সুবিধা নেই। চট করে কিছু জোগাড় করা মুশকিল। এখানে সব জোগাড় হয়েছে। দু'টা খাসি জবেহ্ হয়েছে। রান্নাও শুরু হয়েছে। রুটি-গোশত করা যাচ্ছে না, চাল-গোশত হচ্ছে। বাঙালের দেশে এসে বাঙালি ব্যবস্থা। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কোনো খাবারই খারাপ লাগবে না।

মোশতাক আহমেদ চুরুট ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। এখন আকাশ পরিষ্কার। তারায় তারায় ঝলমল করছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। শহর থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল ভালোমতো দেখা যায় না। এই সাতটি তারা দিগন্তরেখার কাছাকাছি। এদের দেখতে হলে খোলা জায়গায় যেতে হবে। থানা কম্পাউন্ডটা খুব খোলামেলা। দু'শ গজের ভেতর গাছপালার সংখ্যা কম। বর্তমান সময়ের জন্য এটা খুব জরুরি। প্রতিটি থানাকে থাকতে হবে থ্রি নট থ্রি রাইফেল রেঞ্জের বাইরে। গাছপালার কভারে কোনো অতি-উৎসাহী যেন গুলি করার স্পর্ধা না করে।

মগভর্তি এক মগ কফি মোশতাক আহমেদের পাশে এনে রাখা হলো। কফি নিয়ে এসেছেন নীলগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার ফরিদ উদ্দিন। থানার চার্জ বর্তমানে তাঁকে দেওয়া হয়েছে। ফরিদ উদ্দিন কর্নেল সাহেবের সামনে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চলে যেতে পারছেন না, আবার দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছেন না। তার পা অল্প অল্প কাঁপছে। তিনি যেন তাঁর সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখতে পাচ্ছেন। মোশতাক আহমেদ কফির মগে চুমুক দিয়ে বললেন, Do you have something in your mind ?

প্রশ্ন না বুঝেই ফরিদ উদ্দিন বললেন, Yes sir.

Speak out.

ফরিদ উদ্দিন আগে যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন, এখনো তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল সাহেব হাতের ইশারায় তাকে চলে যেতে বললেন। সেই ইশারাও তিনি বুঝতে পারলেন না। ফরিদ উদ্দিনের মাথা আসলে এলোমেলো হয়ে গেছে। এখনো তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না, এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে এতগুলি মানুষকে মেরে ফেলা যায়! নদীর পাড়ে নিয়ে লাইন করে দাঁড়া করাল। কী হচ্ছে

বোঝার আগেই একজন হাই তুলে বলল, ফায়ার। দ্রুত বাজনার মতো কিছু গুলি হয়ে গেল। গুলি করা হচ্ছে তাও ফরিদ উদ্দিন বুঝতে পারেন নি। পুরো ব্যাপারটা মনে হচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেছে। কে জানে, হয়তো স্বপ্নই। স্বপ্ন ছাড়া বাস্তবে এত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে না। বাস্তবে কেউ হাই তুলতে তুলতে ফায়ার বলে না। হাই তোলার ব্যাপারটা বানানো না। যে ফায়ার বলেছে তিনি তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তালগাছের মতো লম্বা একটা মানুষ। পাতলা গোঁফ আছে। নিচের ঠোঁটে শ্বেতীর দাগ। ফরিদ উদ্দিন নিশ্চিত জানেন— বাকি জীবনে তিনি অসংখ্যবার দুঃস্বপ্নের ভেতর এই মানুষটাকে দেখবেন।

কর্নেল সাহেব আবারো হাত ইশারা করে ফরিদ উদ্দিনকে যেতে বললেন। কফি খেতে ভালো হয়েছে। তিনি একা একা আরাম করে কফি খেতে চান। ক্ষুধা নষ্ট করার জন্যও কফি দরকার। রাতের খাবার খেতে দেরি হবে।

ফরিদ উদ্দিন থানায় ওসি সাহেবের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর খুব ঘাম হচ্ছে। থানার ভেতর মিলিটারিদের কেউ নেই। দুজন কনস্টেবল আছে— তারা পাংশুমুখে বসে আছে লম্বা বেঞ্চটায়। ফরিদ উদ্দিনের সামনের চেয়ারে বেশ আয়েশ করে বসে আছে হারুন মাঝি। কর্নেল সাহেব সব হাজতিদের ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন।

সব হুকুমই মুখে। কাগজপত্রে কিছু নেই। পরবর্তীতে এই নিয়ে নিশ্চয়ই ঝামেলা হবে। এক ফাঁকে জেনারেল ডায়েরিতে লিখতে হবে— কর্নেল মোশতাক আহমেদের মৌখিক নির্দেশে থানার সকল হাজতিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হাজতিদের মধ্যে ছিল কুখ্যাত ডাকাত হারুন মাঝি।

নদীর পাড়ে যে হত্যাকাণ্ডগুলো হয়— তার কথাও লেখা থাকা দরকার। কীভাবে লিখবেন ? ঘটনার সময় তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। কোনো এক সময় যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়— পুলিশের উপস্থিতিতে এমন ঘটনা ঘটল, পুলিশ কেন বাধা দিল না ? স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তো পুলিশের। তাকে যদি বলা হয়, ফরিদ উদ্দিন, দণ্ডবিধির ৩২৪ নম্বর ধারায় তুমি কেন মিলিটারিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে না ? ৩২৪ নম্বর ধারা তো অতি স্পষ্ট, 'বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা বা বিপজ্জনক উপায়ে ইচ্ছাকৃত আঘাত করা।' ১৪৮ ধারায় মামলা হতে পারে— 'মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দাঙ্গা।'

ওসি সাহেব!

ফরিদ উদ্দিন চমকে উঠলেন। হারুন মাঝি হাত বাড়িয়ে বসে আছে। হারুন মাঝির মুখ হাসি হাসি। ফরিদ উদ্দিন বললেন, কী হয়েছে ?

বিড়ি সিগারেট কিছু একটা দেন ওসি সাহেব, দুইটা টান দেই।

ফরিদ উদ্দিন কথা বাড়ালেন না। একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন। তাঁর নিজেরও সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না।

অবস্থা তো ওসি সাহেব গুরুতর।

হুঁ।

এক কথায় আটজনের মৃত্যু— সাক্ষাৎ আজরাইল। কী বলেন ওসি সাহেব ?

হুঁ।

এর নাম পাক-মিলিটারি, ইচ্ছা হইল গুলি কইরা হিসাব শেষ কইরা দিল। নগদ হিসাব। বাকির কারবার নাই।

বেশি কথা বলিস না হারুন।

হারুন মাঝি গলা নামিয়ে বলল, মৃত্যুর সময় আমরার আগের ওসি সাহেব কী করল ? কান্দাকাটি করল ?

জানি না।

জানেন না বললেন ক্যান ? আপনে তো লগে ছিলেন।

না, আমি ছিলাম না।

কয়েকটা হিন্দু ধইরা আনতে বলল— আপনে না ধইরা আনলেন ?

ফরিদ উদ্দিন তিক্ত গলায় বললেন, হারুন, সময় খুবই খারাপ। কথা যত কম বলবি তত ভালো। তোকে ছেড়ে দিয়েছে— তুই চলে যা। ডাকাতি শুরু কর। এত কিসের কথা ?

মিলিটারি কি এইখানেই থাকব ?

জানি না।

আগের ওসি সাহেবের যে সন্তান হওনের কথা ছিল সেই বিষয়ে কিছু জানেন ? সন্তান হইছে ?

জানি না।

উতারের পানির জন্য ওসি সাহেব লোক পাঠাইছিল। পানি নিয়া আসছে কিনা জানেন না ?

হারুন, চুপ।

জি আইচ্ছা, এই চুপ করলাম। দেন, আরেকটা সিগ্রেট দেন।

ফরিদ উদ্দিন নিঃশব্দে আরেকটা সিগারেট দিলেন। হারুন মাঝি প্রথম সিগারেটের আগুন দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমরার আগের ওসি সাহেব, ছদরুল সাহেব বিরাট সাহসী লোক ছিল। বাঘের কইলজা ছিল।

ফরিদ উদ্দিন জবাব দিলেন না। হঠাৎ করে তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তিনি মাথা তুলতেই পারছেন না। এরকম কখনো হয় না। আজ কেন হচ্ছে ?

ওসি সাহেব, ছদরুল স্যার আমারে ক্যামনে ধরছে হেই গল্প শুনেন। সে এক ইতিহাস।

ইতিহাস বলতে হবে না। চুপ করে থাক।

আমি গেছি আমার বড় শ্যালকের বাড়িত। তার একটা পুত্রসন্তান হয়েছে— সংবাদ পেয়ে গিয়েছি। সন্তানের মুখ দেখে একশ' টাকার একটা চকচকা নোট দিলাম। শ্যালক বলল, দুলাভাই রাতটা থাকেন— ভালোমন্দ চারটা খান। আমি রাজি হইলাম। শেষ রাইতে বাড়ি ঘেরাও দিল পুলিশে। ব্যাগের ভিতরে আমার গুলিভরা বন্দুক। টান দিয়া হাতে নিতেই দরজা খুইল্যা ওসি সাহেব ঢুকলেন। বললাম, ওসি সাব, গুলি কইরা দেব। ওসি সাহেব বললেন, কর, গুলি কর। বন্দুকের সামনে এই রকম কথা বলা সহজ না। কইলজা লাগে। বাঘের কইলজা লাগে। ওসি সাহেবের ছিল বাঘের কইলজা।

হারুন, আর কথা না। আরেকটা কথা বললে হাজতে নিয়ে ঢোকাব।

হারুন মাঝি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, এইটা পারবেন না। মিলিটারি মুক্তি দিছে, আফনের কিছু করনের ক্ষ্যামতা নাই। ছদরুল আমিন স্যার হইলেও একটা কথা ছিল। তাঁর ছিল বাঘের কইলজা। আর আফনের হইল খাটাসের কইলজা। হি হি হি। মনে কষ্ট নিয়েন না ওসি সাব। সত্য কথা শুইন্যা মনে কষ্ট নিতে নাই।

রান্না হয়ে গেছে। জোয়ানদের খাবার দেওয়া হচ্ছে। কর্নেল সাহেব কুয়ার পাড়ে গোসল করছেন। তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নিচু একটা জলচৌকিতে বসে আছেন। দু'জন ব্যাটম্যান হিমশীতল পানি বালতি বালতি তুলে তার মাথায় ঢালছে। স্নানপর্ব কর্নেল সাহেবের অসাধারণ লাগছে। শরীরের ক্লান্তি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। এখন নেশার মতো লাগছে। কয়েকটা বিয়ার খেয়ে নিলে হতো— ব্যাপারটা আরো জমত। সঙ্গে বিয়ার নেই। এক বোতল ভদকা আছে, ভালো এক বোতল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন আছে। ওয়াইনের বোতলটা আনন্দময় উৎসবের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই আনন্দময় উৎসবের তারিখটা হলো মে মাসের এগারো তারিখ, তার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। রোজিনা তাকে বলে দিয়েছে— সে যেভাবেই হোক মে মাসের এগার তারিখে বাঙাল মুলুকে উপস্থিত হবে। তের বছরের বিবাহিত জীবনে সব ম্যারেজ ডে-তে তারা একসঙ্গে ছিলেন। এ বছর

ব্যতিক্রম হবে না। যুদ্ধবিগ্রহের এই ভয়াবহ সময়ে রোজিনা কী করে বাঙাল মুলুকে আসবে তিনি জানেন না। তবে এসে যেতে পারে। রোজিনার বুদ্ধি ও সাহস সীমাহীন। তারচে' বড় কথা রোজিনা লে. জে. গুলহাসান খানের ভাগ্নি। পাকিস্তানের লেফটেনেন্ট জেনারেলরা অনেক কিছু পারেন।

গোসল করতে করতেই ওয়্যারলেসে খবর এলো— কর্নেল মোশতাককে তার দল নিয়ে এই মুহূর্তেই দুর্গাপুরে রওনা হতে হবে। কর্নেল সাহেব খবরটা শুনে নিচু গলায় বললেন, বাস্টার্ডস! কাদেরকে বললেন তা বোঝা গেল না।

দলটা দুর্গাপুরের দিকে রওয়ানা হলো রাত তিনটায়। সেই সময়ই ওসি ছদরুল আমিন সাহেবের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। শিশুটির ফুসফুসে অসম্ভব জোর। সে ওঁয়া ওঁয়া চিৎকারে থানা কম্পাউন্ড মাতিয়ে দিল। জিপে উঠতে উঠতে কর্নেল সাহেব সেই ওঁয়া ওঁয়া চিৎকার শুনলেন। চিৎকার শুনেই বোঝা যাচ্ছে নিউবর্ন বেবি। নিউবর্ন বেবির কান্নার শব্দ অত্যন্ত শুভ। কর্নেল সাহেবের যাত্রা শুভ হবে। তিনি আনন্দিত মুখে জিপে উঠে বসলেন।

সকাল থেকে বিরামহীন বৃষ্টি। দুপুরে একটু থেমেছিল। বিকেলে আবার আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল। আসমানী বৃষ্টি দেখছিল। দারোগাবাড়ির টানা বারান্দায় দাঁড়ালে চোখ অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। খোলা প্রান্তরে বৃষ্টি দেখতে অন্যরকম লাগে। সাদা একটা পর্দা যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে। বাতাস পেয়ে পর্দাটা কাঁপতে থাকে, এঁকেবেঁকে যায়। বড় অদ্ভুত লাগে। শহরে বসে এই বৃষ্টি দেখা যায় না। দোতলা বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে রুনি ভিজছে। পা টিপে টিপে বাগানে নেমেছে। ফুল ছেঁড়ার চেষ্টা করছে। বেলি ফুল। সরফরাজ সাহেবের চোখে পড়লে প্রচণ্ড ধমক খাবে। ধমকের চেয়েও যেটা বড়— আবারো জ্বরজারি হবে। কয়েকদিন আগে মাত্র জ্বর থেকে উঠেছে। মেয়েটাকে শক্ত ধমক দেওয়া দরকার, ধমক দিতে ইচ্ছা করছে না। বাচ্চাদের শাসন করার সময় বাবা-মা দু'জন থাকতে হয়। একজন শাসন করবে, আরেকজন আদর দিয়ে তা পুষিয়ে দেবে। এখানে আদরের কে আছে? শাহেদের কথা মনে করে আসমানীর চোখে পানি এসে পড়ার মতো হলো। সে নিজেকে সামলাল। কথায় কথায় চোখে পানি ফেলার মতো সময় এখন নয়। এর চেয়ে বরং বৃষ্টি দেখা ভালো। আচ্ছা বৃষ্টি যে চাদরের মতো পড়ে— এটা কোনো লেখকের লেখায় আসে নি কেন? সব লেখকই কি শহরবাসী? শাহেদের সঙ্গে দেখা হলে বৃষ্টির চাদররূপের কথা বলতে হবে। সে এখন কোথায় আছে? যেখানে আছে সেখানে কি বৃষ্টি হচ্ছে? শাহেদ কি দেখছে? মনে হয় না। শাহেদের মধ্যে কাব্যভাব একেবারেই নেই। বর্ষা-বাদলার দিনে সে কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমোতে পছন্দ করে। ঘুম ভাঙলে মাথা উঁচু করে বলে, এই একটু খিচুড়ি-টিচুড়ি করা যায় না? বেগুনভাজা দিয়ে খিচুড়ি হেভি জমতো। মানুষটার খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। খিচুড়ি জমবে ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে, ভুনা গোশত দিয়ে। বেগুনভাজা দিয়ে খিচুড়ি আবার কী?

ভেতরের বাড়ি থেকে মোতালেব সাহেব ডাকলেন, আসমানী কোথায়? আসমানী!

আসমানীর বারান্দা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রুনি ফুল চুরি করছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এই দৃশ্যটা দেখতে বড় ভালো লাগছে। মেয়েটা ভালো দুষ্টু হয়েছে তো। আড়াল থেকে মেয়ের এই নতুন ধরনের দুষ্টামি দেখার সুযোগ তো আর সবসময় হবে না। তাছাড়া মোতালেব সাহেব কী জন্য ডাকছেন আসমানী জানে— গল্প করার জন্য। গল্প বলার সময় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে পিঠে হাত দেবে। কী কুৎসিত স্বভাব! যতই দিন যাচ্ছে মানুষটার কদর্য স্বভাব ততই স্পষ্ট হচ্ছে। আর গল্পের বিষয়বস্তুও অদ্ভুত। সব গল্পই মিলিটারি-বিষয়ক। একই গল্প দু'বার তিনবার করে বলছে। মিলিটারিরা যে কত ভয়ঙ্কর তার বিশদ বর্ণনা। কোনো মানে হয়? মিলিটারি-বিষয়ক গল্প এখন শুনতেও অসহ্য লাগে।

আসমানী! আসমানী!

চাচা, আসছি।

আসছি বলেও আসমানী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মোতালেব সাহেবের কাছে এক মিনিট পরে গেলেই লাভ। এক মিনিটের জন্য হলেও তো যন্ত্রণা থেকে বাঁচা যাবে।

আসমানী ভেতরে ঢুকে দেখল, মোতালেব সাহেব গল্প করার জন্য ডাকেন নি। অন্যকোনো ব্যাপারে। বাড়ির সবাই সরফরাজ সাহেবের শোবার ঘরে। সরফরাজ সাহেব ইজিচেয়ারে শুয়ে লম্বা নলের হুক্কা টানছেন। তিনি তামাক খেয়ে মজা পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। ইজিচেয়ারের হাতলে বড় কাপে এক কাপ চা। মোতালেব সাহেবের মুখ শুকনো। ঠিকমতো কথাও বলতে পারছেন না। শব্দ জড়িয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সবাই জড়ো হয়েছে। তাদের মুখও শুকিয়ে আছে। শুধু সরফরাজ সাহেব বেশ স্বাভাবিক। হুক্কা টানা বন্ধ করে তিনি এখন চায়ের কাপ হাতে নিলেন। নির্বিকার ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। প্রতিবারই চায়ে চুমুক দেবার পর জিভ বের করে নাড়াচাড়া করছেন। মনে হচ্ছে চা খুব গরম।

সবাইকে ডেকে মিটিং কেন হচ্ছে আসমানী বুঝতে পারল না। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছা করছে না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

মোতালেব সাহেব বললেন, বাবা, এই বিষয়ে আপনার মতামত কী?

সরফরাজ সাহেব চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, উড়া কথায় কান দেয়া ঠিক না। মিলিটারি ঘরে ঘরে ঢুকে মেয়েছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে— এটা একটা উদ্ভট কথা। গুজবে কান দিবা না। পাকিস্তানি মিলিটারি বিশ্বে নামকরা মিলিটারি। ভদ্রলোকের ছেলেপুলেরা সেই মিলিটারিতে যায়। তাদের আদব-কায়দাও বিশ্বের নামকরা। এইটা তোমরা ভুলে যাও কেন?

মোতালেব সাহেব বললেন, এইটা আপনি অবশ্যিই ঠিক বলেছেন বাবা। আমি এই দিকে চিন্তা করি নাই।

সরফরাজ সাহেব বললেন, আরো কথা আছে। এইটা হলো দারোগাবাড়ি। এই বাড়ির একটা আলাদা ইজ্জত আছে। যাকে যতটুকু ইজ্জত দেয়া দরকার, মিলিটারি তাকে ততটুকু ইজ্জত দেয়। এই শিক্ষা তাদের আছে।

মোতালেব সাহেব বললেন, এই কথাটাও আপনি ঠিক বলেছেন। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আপাতত বাদ দিই।

অবশ্যই বাদ দিবা। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যাইবা কই ? আমরা তো যার-তার বাড়িতে উঠতে পারি না।

মোতালেব সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন, সেটাও একটা বিবেচনার বিষয়। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একদল মানুষ নিয়ে কার বাড়িতে উঠব ?

সরফরাজ সাহেব চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, গুজবের ওপর ভরসা করবা না। ভরসা করবা আল্লাহ্‌পাকের ওপর। আয়াতুল কুরসি পড়ে বাড়ি বন্ধন দিয়ে বসে থাকো, ইনশাল্লাহ্ কিচ্ছু হবে না।

মোতালেব সাহেব বললেন, সত্যি সত্যি যদি মিলিটারি আসে, এসে যদি দেখে দারোগাবাড়ির লোকজন পালিয়ে গেছে তাহলে তারা ধরেই নিবে— দারোগাবাড়ির লোকদের মধ্যে কিন্তু আছে।

সরফরাজ সাহেব বললেন, কিন্তু তো আছেই। তুমি সবচে' বড় কিন্তু। প্যাচাল শেষ করো। সকালবেলা এই প্যাচাল শুনতে ভালো লাগে না। অন্য ঘরে নিয়া মিটিং বসাও।

মিলিটারি-বিষয়ক খবর যে নিয়ে এসেছে, তার নাম কুদ্দুস। লুঙ্গিপরা গেঞ্জি গায়ের একজন মানুষ। মাথা নিচু করে সে মেঝেতে বসে আছে। এই শ্রেণীর মানুষদের কথার ওপর ভদ্রলোকেরা এমনিতেই বিশ্বাস করেন না। মোতালেব সাহেব কুদ্দুসের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে কুদ্দুস, তুমি যাও। অবস্থা তেমন দেখলে তোমাকে খবর দিব।

কুদ্দুস নড়ল না। শক্ত গলায় বলল, খবর দেওনের সময় পাইবেন না। যা বলতেছি শুনেন। এক্ষণ বাড়ি ছাড়েন। মিলিটারি অপেক্ষা করতেছে বৃষ্টি কমনের জন্য। বৃষ্টি কমব আর এরা দলে দলে বাইর হইব। পরথমে আসব দারোগাবাড়ি।

মোতালেব সাহেব বললেন, এত নিশ্চিন্ত হয়ে বলছ কী করে ? মিলিটারিরা কি তোমার সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছে ?

কুদ্দুস ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, হ, করছে। আপনারে যা করতে বলছি করেন। হাতে সময় নাই। সময় খুবই সংক্ষেপ।

প্রথমে দারোগাবাড়ি আসবে কেন?

মিলিটারিরি সাথে আছে মজিদ মিয়া, দারোগাবাড়ির সাথে তার পুরানা বিবাদ।

মোতালেব সাহেব বললেন, দারোগাবাড়ির সাথে তার বিবাদ থাকতে পারে, মিলিটারির সঙ্গে তো দারোগাবাড়ির কোনো বিবাদ নাই।

হাত জোড় করতেছি, আমার কথাটা শোনেন।

মোতালেব সাহেব বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে কুদ্দুস, তুমি এখন যাও। আমরা এইখানেই থাকব। বাড়ি-ঘর ছেড়ে যাওয়া ঠিক না। এতে মিলিটারির সন্দেহ আরো বাড়ে। মিলিটারিরা যুদ্ধের সময় খুবই সন্দেহপ্রবণ থাকে।

চাচামিয়া, আমার কথাটা শোনেন।

তোমার কথা তো মন দিয়েই শুনলাম। এখন আমাদের নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতো কাজ করতে দাও। তোমার বিবেচনায় কাজ করলে তো আমাদের পোষাবে না।

কুদ্দুস উঠে চলে গেল। জাহেদা বললেন, আমার তো ভালো লাগছে না, ওর কথা শুনলেই হতো।

মোতালেব সাহেব বললেন, এত গুজব শুনলে বাঁচা যাবে না। তুমি বরং মিলিটারির জন্যে চা-নাশতার আয়োজন কর। মুরগির কোরমা আর পরোটা। এরা পরোটা-মাংসের ভক্ত।

জাহেদা পরোটা মাংসের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

বৃষ্টি সন্ধ্যার আগে আগে ধরে গেল। এবং আশ্চর্য কাণ্ড, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় দারোগাবাড়িতে একদল মিলিটারি এলো। তাদের সঙ্গে আছে হোমিওপ্যাথ মজিদ ডাক্তার। কুদ্দুস এই মজিদ ডাক্তারের কথাই বলছিল। সরফরাজ সাহেব পাঞ্জাবি গায়ে বের হয়ে এলেন। মজিদ ডাক্তার ছুটে এসে কদমবুসি করল।

সরফরাজ বললেন, ব্যাপার কী মজিদ?

ইনারা আপনারে দুই একটা কথা জিজ্ঞেস করবে।

তুমি এদের সাথে কেন?

পথঘাট চিনে না। আমারে বলল পথ চিনায়ে দাও। মিলিটারি মানুষ কিছু বললে তো না করতে পারি না। এরা 'না' শোনার জাত না।

তুমি পথ চিনাচ্ছ? খুবই ভালো কথা।

মিলিটারি দলের প্রধান অল্পবয়স্ক একজন ক্যাপ্টেন। সরফরাজ সাহেব খুব আদবের সঙ্গে ক্যাপ্টেন সাহেবকে বসতে বললেন। ক্যাপ্টেন আদবের ধার দিয়েও গেল না, কঠিন গলায় বলল, কেয়া তুম আওয়ামী লীগ?

সরফরাজ সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, তিনি প্রায় নব্বই বছরের এক বৃদ্ধ। আর সেদিনের চেংড়া ছেলে তাকে তুমি করে বলছে। তিনি তাঁর মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করলেন, বিনয়ের সঙ্গে বললেন, জ্বি নেহি, মুসলিম লীগ।

তুম মুসলমান?

জি হ্যাঁ।

তোমকো দাড়ি কাঁহা?

সরফরাজ সাহেব এই পর্যায়ে একটা বোকামি করলেন। তিনি নিখুঁত উর্দুতে যা বললেন, তার সরল বাংলা হলো তুমিও তো মুসলমান, তোমার দাড়ি কোথায়? যার নিজের দাড়ি নেই সে অন্যের দাড়ির খোঁজ কেন নেবে?

এত বড় বেয়াদবি মিলিটারির সহ্য হবার কথা না। ক্যাপ্টেন সাহেবের ইশারায় একজন জোয়ান এসে বুটের লাথি বসাল, সরফরাজ সাহেব গড়িয়ে বারান্দা থেকে বাগানে পড়ে গেলেন। তাঁর গলা থেকে কোনোরকম শব্দ বের হলো না।

মোতালেব এবং সরফরাজ সাহেব ছাড়াও বাড়িতে আরো তিনজন পুরুষ মানুষ ছিল। তারা লুকিয়ে পড়েছিল। এই পর্যায়ে তারা বের হয়ে এলো। মিলিটারি সরফরাজ সাহেবকে বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে ধরে নিয়ে গেল।

সেই রাতেই তাদের গুলি করে মেরে ফেলা হলো। সরফরাজ সাহেব মারা গেলেন ভোরবেলায় রক্তবমি করতে করতে।

রুনি বলল, মা, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

আসমানী মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। কারণ সেও জানে না তারা কোথায় যাচ্ছে। তারা নৌকায় উঠেছে বেলা উঠার পর। বেশ বড়সড় পালওয়ালা নৌকা। যদিও নৌকায় এখনো পাল তোলা হয় নি। দু'জন মাঝি লগি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝারি ধরনের খাল— এখনো ভালোমতো পানি আসে নি। নৌকায় দারোগাবাড়ির পরিবারের সকল মহিলা সদস্য ছাড়া দু'জন পুরুষ আছে। একজন আমাদের পূর্বপরিচিত— কুদ্দুস। কুদ্দুসের পরনে আজ পায়জামা পাঞ্জাবি। মাথায় নীল রঙের কিস্তি টুপি। তাকে ভদ্রলোকের মতো লাগছে। সে মোটামুটি নির্বিকার ভঙ্গিতে পান খাচ্ছে। পানের রসে তার ঠোঁট টকটকে লাল। সে পরনের পাঞ্জাবি দিয়েই তার ঠোঁট মুছছে। পাঞ্জাবি লাল দাগে ভরে যাচ্ছে। অন্যজন অপরিচিত এক হিন্দু ভদ্রলোক— কেশব বাবু। এই গরমেও গায়ে ভারি চাদর। তিনি নৌকার পাটাতনে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। ভদ্রলোক ময়মনসিংহ জজ কোর্টের পেশকার। দেশের অবস্থা খারাপ মনে করে দুই মেয়েকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মিলিটারি আসার পর মেয়ে দুটিকে তার মাসির বাড়ি ইছাপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন যাচ্ছেন মেয়েদের খোঁজে। কেশব বাবু বয়স্ক মানুষ, অসুস্থ। তার হাঁপানি আছে। নৌকায় উঠার পরপর তার হাঁপানির টান উঠেছে। তিনি ফুসফুসে বাতাস ভরানোর চেষ্টায় ছটফট করছেন। ফুসফুস ভরছে না। এই ভদ্রলোক কে, তাদের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছেন ?— আসমানী তাও জানে না। মনে হচ্ছে আসমানী জানার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। নৌকা যেখানে ইচ্ছা যাক, কিছু যায় আসে না।

নৌকার ছই শাড়ি দিয়ে ঢাকা, যেন ভেতরের মহিলাদের দেখা না যায়। আসমানী শাড়ির ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে আছে। ভেতরের মহিলারা চাপা গলায় কাঁদছেন। কান্নার শব্দ সম্পূর্ণ অন্যরকম এবং কেউই একনাগাড়ে কাঁদছে না। হঠাৎ একসঙ্গে সবাই চুপ করে যাচ্ছে, আবার এক সঙ্গে সবাই কাঁদতে শুরু করছে।

আসমানী শান্ত হয়ে বসে আছে। সে কাঁদছে না বা তার কান্না আসছেও না। এজন্য সে একটু লজ্জিতও বোধ করছে। তার চোখের সামনে এত বড় শোকের ঘটনা ঘটল। বলতে গেলে এখন সে এই পরিবারেরই একজন সদস্য, তার কেন কান্না আসবে না?

রুনি নৌকার পাটাতনে বসে পানি স্পর্শ করার চেষ্টা করছে। যেভাবে ঝুঁকে আছে পানিতে উল্টে পড়ে যেতে পারে। রুনিকে একটা ধমক দেওয়া দরকার। সেই ধমক দিতেও ইচ্ছা করছে না। পানিতে পড়ে গেলে পড়ে যাক।

রুনি আবারো বলল, মা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আসমানী বিরক্ত গলায় বলল, জানি না।

জানো না কেন?

আসমানী চুপ করে রইল। রুনি বলল, মা, বলো আমরা কোথায় যাচ্ছি?

কুদ্দুস বলল, আমরা যাইতেছি ইছাপুর।

ইছাপুরে যাচ্ছি কেন?

আসমানী বলল, রুনি, তুমি কি একটু চুপ করবে?

চুপ করব কেন?

আসমানী জবাব দিল না। কুদ্দুস বলল, ছোট আম্মা, মিলিটারির কারণে বাঁচনের জন্য যাইতেছি।

মিলিটারি সবাইকে মেরে ফেলছে?

ঘটনা পেরায় সেই রকম।

ইছাপুরে মিলিটারি নেই?

জে না।

ইছাপুরে মিলিটারি নেই কেন?

আমরার দেশটা তো বিরাট, সবখানে মিলিটারি যাইব ক্যামনে?

আমাদের দেশটা কি বিরাট?

আরেব্বাসরে, বিরাট বলে বিরাট!

ঐ বুড়ো ভদ্রলোক এরকম করছেন কেন?

শরীর ভালো না, হাঁপানি।

উনি কি মারা যাচ্ছেন?

আরে না ছোট আম্মা, কী যেন কন। মিত্যু অত সহজ না। মিত্যু বড়ই কঠিন।

আসমানী এক ঝলক কুদ্দুসের দিকে তাকাল। মৃত্যু সহজ না সে বলছে কীভাবে? সে নিজে কি দেখছে না মৃত্যু কত সহজ হয়ে গেছে! তিনজন মানুষকে ধরে নিয়ে গেল। সুস্থ সবল ভালোমানুষ। ভোরবেলা খবর এলো, মোতালেব সাহেবের ডেডবডি গাঙের পারে পড়ে আছে। অন্য দুটি ডেডবডি পানিতে ভেসে চলে গেছে। মোতালেব সাহেবের শবদেহ উদ্ধার হয় নি। কে আনতে যাবে? সবাই জীবন বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত। তারা পালিয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে সবচেয়ে বেশি অস্থির হয়েছেন মোতালেব সাহেবের স্ত্রী জাহেদা খানম। তাঁকে কুদ্দুস এসে বলেছিল, আম্মা, চলেন আপনে আর আমি দুইজনে যাই। লাশটা নিয়া আসি। আপনে সঙ্গে থাকলে মিলিটারি কিছু বলবে না। ইস্ত্রী স্বামীর ডেডবডি নিতে আসছে এটা অন্য ব্যাপার। মিলিটারি যত খারাপই হউক, এরা মানুষ। এইটা বিবেচনা করব। জাহেদা রাজি হন নি।

নৌকায় তিনি বেশ স্বাভাবিক আছেন। কান্নাকাটি করছেন না। অপরিচিত এক মহিলার কাছ থেকে পান নিয়ে মুখে দিলেন। তাঁর পান খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে, তিনি পান খেয়ে খুব আরাম পাচ্ছেন। মাথা বের করে নদীর পানিতে পিক ফেলছেন। তাঁর কোলে একটা বালিশ। তিনি বালিশ হাতছাড়া করছেন না। বালিশের তুলার ভেতর টাকা এবং সোনার গয়না।

আসমানী অলস চোখে তাকিয়ে আছে। চারদিক এত সুন্দর! মানুষের দুঃখ কষ্টে প্রকৃতির কিছু যায় আসে না। সে তার মতোই থাকে। খালের পানি কী পরিষ্কার! ঝকঝক করছে। এই সময়ে নদীর পানি ঘোলা থাকে। ভাদ্র মাসের দিকে পানি পরিষ্কার হতে থাকে। এই খালের পানি এত পরিষ্কার কেন? কিছুক্ষণ পরপর আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে বক উড়ে যাচ্ছে। নীল আকাশে বক উড়ছে— এই দৃশ্যটা এত সুন্দর! দেশ যদি ঠিকঠাক হয়ে যায়, আবার যদি শাহেদের সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে শাহেদকে নিয়ে ঠিক এই খাল দিয়ে নৌকাভ্রমণে যেতে হবে। শাহেদের সঙ্গে কি দেখা হবে?

কেশব বাবু উঠে বসেছেন। তার চোখ টকটকে লাল। চোখের কোণে ময়লা জমেছে। তার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। কুদ্দুস বলল, শরীরের ভাব কী?

কেশব বাবু বললেন, একটু ভালো বোধ করছি। চোখ যন্ত্রণা দিচ্ছে।

মনে হয় চউখ উঠতেছে। চাইরদিকে চউখ উঠা ব্যারাম।

ইছাপুর যেতে আর কতক্ষণ লাগবে?

ধরেন আর দুই ঘণ্টা।

রুনি এক দৃষ্টিতে কেশব বাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। কুদ্দুস বলল, ছোট আম্মা, এই রকম কইরা চউখ উঠা মাইনসের চউখের দিকে তাকাইতে নাই। যে তাকায় তারও চউখ উঠে।

রুনি বলল, কেন ?

কুদ্দুস উদাস গলায় বলল, কেন তা ক্যামনে বলব ? এইটা হইল আল্লাপাকের বিধান।

আল্লাপাকের বিধান থাকা সত্ত্বেও রুনি তাকিয়েই রইল। এরকম লাল চোখের মানুষ সে আগে দেখে নি।

কেশব বাবু বললেন, খবরটা শোনা দরকার।

কুদ্দুস বলল, শোনা দরকার হইলে শুনেন, আপনের কাছে তো টেনজিস্টার আছে।

মেয়েরা সব কান্নাকাটি করছে, এর মধ্যে টেনজিস্টার ছাড়াটা কি ঠিক হবে ?

সেইটা আফনের বিবেচনা।

কেশব বাবু ঢাকা ধরলেন। খবরে বলা হলো— পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিদেশী সাংবাদিকদের একটি টিম সারা প্রদেশে ঘুরে বলেছেন— আইনশৃঙ্খলা সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। দেশের কাজকর্ম স্বাভাবিক গতিতে চলছে। অফিস আদালতে উপস্থিতির সংখ্যা আগের মতো। যারা এখনো কাজে যোগ দেন নি তাদের অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। গণচীনের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়, পূর্ব পাকিস্তানে চালের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চালভর্তি জাহাজ চট্টগ্রাম নৌবন্দরে ভিড়েছে। মাল খালাস শুরু হয়েছে।

কুদ্দুস বলল, দেশের অবস্থা তো ভালোই।

কেশব বাবু বললেন, হুঁ।

তাকে খুব চিন্তিত মনে হলো।

ইছাপুরে নৌকা ভিড়ল দুপুর নাগাদ। নৌকাঘাট জনশূন্য। অন্য সময় কেরায়া নৌকা, ঘাস কাটা নৌকায় জায়গাটা জমজমাট হয়ে থাকে। আজ একটা প্রাণীও নেই। চা-বিস্কিটের একটা দোকান ছিল, সেটাও বন্ধ। কুদ্দুস বলল, কেমন কেমন জানি লাগতেছে, বিষয়টা কী ?

বিষয় জানতে দেরি হলো না। মিলিটারির একটা দল আজ ভোরবেলাতেই ইছাপুরে এসেছে। তারা জায়গা নিয়েছে ইছাপুর থানায়। তাণ্ডব শুরু হয়েছে। মিলিটারিরা ড্রাম ভর্তি কেরোসিন নিয়ে এসেছে। হিন্দু ঘরবাড়ি জ্বালানো শুরু হয়েছে। ঘরবাড়ি জ্বালানোর জন্য আজকের দিনটাও শুভ। বাতাস নেই, বৃষ্টি নেই।

কুদ্দুসরা নৌকা থেকে নামল না। শুধু কেশব বাবু নেমে গেলেন। কাঁদো কাঁদো মুখে রুনিকে বললেন, মা গো, আমার জন্য একটু প্রার্থনা করো।

রুনি খুবই অবাক হলো। এত মানুষ থাকতে এই লোকটা তাকে প্রার্থনা করতে বলছে কেন ? প্রার্থনা কীভাবে করে তাও তো সে জানে না।

নৌকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাঝি দুজনই প্রাণপণে লগি ঠেলছে। এই অঞ্চল থেকে যত দ্রুত সরে যাওয়া যায়।

খালের পাড়ে বুড়ো এক লোক বসে ছিল। সে চাপা গলায় বলল, তাড়াতাড়ি চইল্যা যান। তাড়াতাড়ি।

আসমানী বলল, আমরা যাব কোথায় ?

কুদ্দুস পানের কৌটা থেকে পান বের করে মুখে দিল। উদাস গলায় বলল, জানি না।

জাহেদা বললেন, কুদ্দুস, সিংধা এখান থেকে কত দূর ?

কুদ্দুস নদীর পানিতে থুথু ফেলে বলল, কাছেই।

জাহেদা বললেন, আমাদের সিংধা নিয়া চল। সিংধায় আমার ফুফু-শাশুড়ির বাড়ি।

কুদ্দুস বলল, আইচ্ছা।

জাহেদা আসমানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আসমানী শোন, সিংধায় তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না। তুমি আমাদের ঘাড়ে চাপার পর থেকে বিপদ-আপদ শুরু হয়েছে। তাছাড়া সিংধায় এত মানুষ নিয়ে আমি উঠতে পারব না।

আসমানী বিস্মিত হয়ে বলল, আমি কোথায় যাব ?

জাহেদা তার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। কোলবালিশ নিয়ে ঘুরে বসলেন। তিনি আরেকটা পান মুখে দিয়েছেন। তাঁর মুখভর্তি পানের রস। রুনি বলল, মা উনি আমাদের নিতে চাচ্ছেন না কেন ? আসমানী মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিল না। তার কাছে জবাব ছিল না। রুনি বলল, আমরা এখন কোথায় যাব মা ?

আসমানী অবিকল কুদ্দুসের মতো উদাস গলায় বলল, জানি না।

জাহেদা বালিশে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়েছেন। তাঁকে দেখে মনে হবে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তবে পান খাবার জন্যে মুখ নড়ছে। আসমানী একবার ভাবল বলে, খালাম্মা, আমার শরীরের অবস্থা ভালো না। আমার পেটে সন্তান। আমাকে এইভাবে ফেলে রেখে যাবেন না। তারপরই মনে হলো, কী হবে! তার নিজেরও ঘুম পাচ্ছে। একটা বালিশ থাকলে কিছুক্ষণ ঘুমাত। চিন্তাভাবনাহীন কিছু সময় পার হয়ে যেত ঘুমে ঘুমে।

এসডিপিও ফয়জুর রহমান সাহেবের পুত্রকন্যারা এবং তাঁর স্ত্রী আয়েশা বেগম নৌকায় বসে আছেন।

আয়েশা বেগম রোজা রেখেছেন। স্বামীর মঙ্গলের জন্যে নফল রোজা। মাগরেবের সময় হয়ে গেছে। রোজা ভাঙতে হবে। রোজা ভাঙার কোনো প্রস্তুতি নেই। সামান্য পানিও নেই যে পানি খেয়ে রোজা ভাঙা যায়।

তিনি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে দুর্গাপুর ইউনিয়নের বাবলা গ্রামে এক সম্পন্ন বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। এসডিপিও সাহেবের স্ত্রী— সেই হিসেবে বাড়ির লোকজন তাদেরকে খুব আদর-যত্ন করছিলেন। হঠাৎ কী হয়ে গেল, বাড়ির কর্তা খসরু মিয়া (ছদ্মনাম)* আয়েশা বেগমের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমরা আপনাদের এই বাড়িতে রাখতে পারব না। বাড়ি ছাড়তে হবে।

আয়েশা বেগম অবাক হয়ে বললেন, বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাব?

বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবেন— সেটা আপনি খুঁজে বের করেন। আমি নৌকা আনায়ে রেখেছি, নৌকায় উঠেন।

আমি আপনাদের অঞ্চল কিছুই চিনি না। বাচ্চাদের নিয়ে আমি যাব কোথায়? আমার বড় বড় দু'টা মেয়ে আছে।

আপনি খামাখা সময় নষ্ট করতেছেন। নৌকায় উঠতে বলছি, নৌকায় উঠেন। আমরা খবর পেয়েছি, আপনার স্বামীকে মিলিটারি মেরে ফেলেছে। আপনার দুই ছেলেকে খুঁজতেছে। আপনাকে এখানে রাখলে আমরা সবাই মারা পড়ব।

আয়েশা বেগম বললেন, আজকের রাতটা থাকতে দিন। সকালবেলা আমি যেখানে পারি চলে যাব।

অসম্ভব। নৌকায় উঠেন।

সামান্য দয়া করেন। আমরা মহাবিপদে আছি।

**মূল নাম ব্যবহার করছি না। এই মানুষটির নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার অপরাধ আমার মা ক্ষমা করেছেন বলে আমিও ক্ষমা করলাম।*

সবাই বিপদে আছে, এখন দয়া করাকরির কিছু নাই।

খসরু মিয়ার হুকুমে জিনিসপত্র নৌকায় তোলা হতে লাগল। আয়েশা বেগম তার ছোট মেয়ের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে নৌকায় উঠলেন। নৌকার মাঝি বলল, আপনারা কোথায় যাবেন ? তিনি বললেন, জানি না।

সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। নৌকা বরিশালের আঁকাবাঁকা খাল দিয়ে এগুচ্ছে। আয়েশা বেগম কিছুক্ষণ আগে নৌকা থেকে হাত বাড়িয়ে খালের পানি দিয়ে রোজা ভেঙেছেন। নৌকার মাঝি খুবই অস্থির হয়ে গেছে। কোথায় যাবে কেউ বলছে না। সে কিছুক্ষণ পরপর জিজ্ঞেস করছে, পরিষ্কার করেন। কথা পরিষ্কার করেন। আপনেরা যাইবেন কই ? এসডিপিও সাহেবের বড়ছেলে বলল, আমরা কোথাও যাব না। নৌকায় নৌকায় ঘুরব।

মাঝি বলল, এইটা কেমন কথা ?

বড়ছেলে বলল, এইটাই আসল কথা।

মাঝি ভীত চোখে তাকাচ্ছে, কারণ এই ছেলের হাতে বন্দুক। শুধু এই ছেলের হাতেই যে বন্দুক তা-না, তোর ছোটভাইয়ের হাতেও বন্দুক।

এসডিপিও সাহেবের অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি অন্যরকম অনুরাগ ছিল। সরকারি পিস্তল ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত একটা পিস্তল আছে। দু'টা আছে পয়েন্ট টু টু বোর রাইফেল। জীবনের বিরাট দুঃসময়ে এসডিপিও সাহেবের ছেলেমেয়েরা এইসব অস্ত্র হাতে নিয়ে বসে আছে। বরিশাল ডাকাতের দেশ। ডাকাতদের কাছে খবর চলে যাবার কথা যে একটা অসহায় পরিবার নৌকায় ঘুরছে।

নৌকা বড় একটা বাঁক পার হলো আর তখনি দেখা গেল একুশ-বাইশ বছর বয়েসি মাথায় টুপি পরা এক যুবক ছুটতে ছুটতে আসছে। হাত উঁচিয়ে ইশারা করছে নৌকা থামানোর জন্যে। নৌকা থামানো হলো। যুবক বলল, আপনাদের যে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমি সেই বাড়ির ছেলেমেয়েদের কোরান শরিফ পড়াই। আপনাদের বিপদ দেখে আমার মন খারাপ হয়েছে। আপনারা কি আমার বাড়িতে উঠবেন ? আমার ছোট্ট একটা ঘর আছে। আমি একা থাকি।

আয়েশা বেগম সঙ্গে সঙ্গে বললেন, উঠব। তাঁর বড়ছেলে বলল, এই লোক যে গভীর রাতে ডাকাত খবর দিয়ে আনবে না বা আমাদের মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দেবে না— তার নিশ্চয়তা কী ?

আয়েশা বেগম বললেন, একটা লোক আশ্রয় দিতে চাচ্ছে, আল্লাহর নাম নিয়ে তার বাড়িতে উঠ।

সবাইকে নিয়ে রাত দশটার দিকে গভীর জঙ্গলের ভেতর এক বাড়িতে আয়েশা বেগম উঠলেন। স্বামীর মৃত্যু বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না। উড়া উড়া খবর এসেছে। কেউ নিশ্চিত হয়ে কিছু বলছে না। তিনি সারা রাত তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে কোরান পাঠ করলেন। তাঁর দুই ছেলে রাইফেলে গুলি ভরে পাহারায় থাকল। ভোরবেলা পাংখাপুলার রশিদ এসে উপস্থিত। তার চোখ লাল, মুখ শুকনা। রশিদকে দেখে আয়েশা বেগম বললেন, তোমার সাহেবের খবর কী ? উনি কোথায় ?

রশিদ চুপ করে রইল।

উনি কি বেঁচে আছেন ?

রশিদ বলল, জি আম্মা। (এটা রশিদের মিথ্যা ভাষণ। সে সব জেনেই এসেছে। পরিবারটিকে গভীর বেদনার সংবাদ দিতে পারছে না।)

আয়েশা বেগম বললেন, বেঁচে আছেন, তাহলে উনি কোথায় ?

পলাতক আছেন। আম্মা শুনেন, উনার কথা এখন চিন্তা করে লাভ নাই। আপনাদের বিষয়টা এখন চিন্তা করা দরকার। অনেক সন্ধান করে আপনাদের পেয়েছি। এইখানে আমি আপনাদের রাখব না। অন্য জায়গায় নিয়ে যাব।

গোয়ারেভখার পীর সাহেবের বাড়িতে নিয়া যাব। উনাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আপনারা নিরাপদে থাকবেন।

কখন নিয়ে যাবে ?

এখন নিয়া যাব। আমি নৌকার ব্যবস্থা করতেছি। আম্মা অস্থির হয়েন না। আমি আছি। আমি আপনাদের জন্যে জীবন দিয়া দিব। আপনাদের কোনো বিপদ হইতে দিব না। নবিজির কসম, আল্লাহপাকের কসম।

রশিদ এই অসহায় পরিবারটিকে গোয়ারেভখার পীর সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। তাদের সে বাড়িতে স্থায়ী করে ফিরে গেল পিরোজপুরে। এসডিপিও সাহেবের বাসা থেকে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে আসবে।

রশিদকে পিরোজপুর শহরে ঢোকার মুখেই অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসডিপিও সাহেবের পরিবার কোথায় আছে সেই খবর বের করা হবে। পিরোজপুরের মিলিটারি কমান্ডের প্রধান কর্নেল আতিক (ফুটবল প্লেয়ার)* এসডিপিওর ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া তিন ছেলেমেয়েকে খুঁজছে। তাকে খবর দেয়া হয়েছে পিরোজপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এ তারাও ছিল। তারা ট্রেনিং নিয়েছে।

---

*পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলের একজন।

কর্নেল আতিককে সাহায্য করছে পিরোজপুর থানার ওসি। এই ওসি সাহেব খুব সম্ভব জীবন রক্ষার জন্যেই মিলিটারিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। রশিদের সঙ্গে ওসি সাহেবের নিম্নোক্ত কথাবার্তা হলো—

এসডিপিও সাহেবের ফ্যামিলি কোথায় আছে ?

স্যার, আমি জানি না।

অবশ্যই তুমি জানো। আমার কাছে খবর আছে তুমি জানো। তুমি যে শুধু জানো তাই না। তুমি তাদের দেখভালও করছ।

স্যার, আমি জানি কিন্তু বলব না।

মিলিটারি কী ভয়ঙ্কর জিনিস তুমি জানো। এই খবর না দিলে কিন্তু ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে।

স্যার, আমি কিছুই বলব না।

আরে ব্যাটা নিজের জীবন বাঁচা। এখন ইয়া নফসি সময়। বলে দে তারা কোথায় আছে ?

আমি কোনোদিনও বলব না।

রশিদকে সেই দিনই সন্ধ্যায় হুলারহাট লঞ্চঘাটে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হলো।

২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মেয়ে বেগম আখতার সোলায়মান করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন— পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান চালানো ছাড়া পাকিস্তান সরকারের অন্য কোনো উপায় ছিল না। তিনি বলেন, মার্চের প্রথম দিকে যখন ধারণা করা হচ্ছিল যে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন, তখন তিনি ঢাকায় গিয়ে তাঁর মরহুম পিতার দোহাই দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে এ ধরনের মারাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।*

---

*সূত্র : *৭১-এর দশমাস।*
রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী

২৬ মে, ১৯৭১

পাকিস্তান সরকার স্বীকার করে ৩০ হাজার পুলিশ বাহিনী সদস্য, ১৪ হাজার নিয়মিত বাহিনী সদস্য, ৪ হাজার ইপিআর পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।*

*সূত্র : *দৈনিক পাকিস্তান*

২ জুন, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর লেফটেনেন্ট জেনারেল টিক্কা খান 'রাজাকার অর্ডিনেন্স ১৯৭১' জারি করেন।

রাজাকার বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাহায্যকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করা হবে। তারা প্রধানত গেরিলাদের খুঁজে বের করা, তাদের আশ্রয়দাতাদের খবর সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়া, রেললাইন, ব্রীজ পাহারা দেবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছ থেকে খুবই বিনম্র সহানুভূতিশীল আচরণ পাচ্ছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পেছনে প্রদেশের জনগণের কোনো সমর্থন ছিল না এবং নেই।*

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা আমাদের প্রিয় ভূমি পাকিস্তানকে খণ্ড করার অভিসন্ধির তীব্র নিন্দা করছি। রাজনৈতিক চরমপন্থীদের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণায় আমরা দুঃখ পেয়েছি ও হতাশ হয়েছি।*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক কাজে যোগ দেন। তারা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারছেন এই মর্মে বিবৃতি দেন।*

**আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বিবৃতি দিতে আগেও পছন্দ করতেন। এখনো করেন। —লেখক*

৩ জুন, ১৯৭১

জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট বললেন, মানব ইতিহাসের সবচে' বিষাদময় ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে।

ভ্যাটিকান সিটি থেকে জন পোপ পল পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।*

---

* *বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, মুসলিম দেশের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান কোনো নেতা মুখ খোলেন নি। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের লেনিন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ডন পত্রিকায় পাকিস্তানি মিলিটারিদের নৃশংসতার প্রতিবাদ করে একটি রচনা লিখেন। তিনি সংগ্রামী বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে করে একটি কবিতাও রচনা করেন যার শিরোনাম— 'পাও সে লহুকো ধো ডালো' পা থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলো।*

—লেখক

১১ জুন, ১৯৭১

গভর্নর টিক্কা খান সকল বাঙালি দোষীদের জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। দেশত্যাগীদের ফিরে আসার জন্যে অভ্যর্থনা শিবির খোলার কথা বলা হয়। এক ইস্তাহারে বলা হয়— খাঁটি পাকিস্তানিরা নির্ভয়ে দেশে ফিরতে পারবেন।

তাদের ফিরে আসার সুবিধার জন্যে তিনি অভ্যর্থনা শিবির খোলার নির্দেশ দেন।

কবি শামসুর রাহমান ভেতরের দিকের একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে আছেন। গ্রামের নাম পাড়াতলী। নরসিংদীর পাড়াতলীর যে বাড়িতে তিনি বাস করছেন সেটা মাটির। তার জানালা আছে। গ্রামের মানুষ বড় জানালা পছন্দ করে না। রেলের টিকিটঘরের জানালার মতো ছোট্ট জানালা। সেই জানালায় ঘরের ভেতর আলো-বাতাস কিছুই আসে না। তবুও তো জানালা।

কবি জানালার পাশে বেতের মোড়ায় বসে আছেন। বেতের মোড়াটা এই বাড়ির সবচে' আরামদায়ক। একটাই সমস্যা— হেলান দেয়া যায় না। সবসময় ঋজু অবস্থানের কথা মনে রাখতে হয়। অবশ্যি এখন যে সময় সেই সময়ে ঋজু থাকারই কথা। তিনি উঠোনের দু'টো বেগুন গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন। বেগুন গাছে বেগুন হয়েছে— অদ্ভুত বেগুন। হাঁসের ডিমের মতো ধবধবে সাদা রঙ। এই জিনিস তিনি আগে দেখেন নি। মনে হচ্ছে গাছে ডিম ফলে আছে। তিনি নাগরিক মানুষ। এখন গ্রামে পড়ে আছেন। গ্রামগঞ্জের অনেক খুঁটিনাটি তাকে আকৃষ্ট করছে। কোনো একটি বিশেষ দৃশ্যে যখনি তাঁর চোখ আটকাচ্ছে তিনি মনে মনে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা আবৃত্তি করছেন—

> Heaven gives Her glimses only to those
> Not in a position to look too close.

কবি সাহেব কি আছেন ? কবি সাহেব!

কেউ কি তাঁকে খুঁজছে ? নাকি তিনি ভুল শুনছেন ? মেয়েলি ধরনের এই পুরুষগলা তিনি কি আগেও শুনেছেন ? যেখানে তিনি অজ্ঞাত বাস করছেন সেখানে 'কবি সাহেব' হিসেবে কেউ তাকে চেনার কথা না। অপরিচিত কেউ ডাকছে ?

কবি চমকালেন। এখন দুঃসময়। দুঃসময় অপরিচিত আহ্বানের জন্যে ভালো না।

কবি খালি গায়ে আছেন। কড়া সবুজ রঙের লুঙ্গি নাভির উপর পরেছেন। অন্ধকারে তাঁর ফর্সা দুধসাদা শরীর জ্বলজ্বল করছে। এই অবস্থাতেই তিনি উঠে

দাঁড়ালেন। গায়ে কিছু দেবার কথা তাঁর মনে হলো না। এই গণ্ড গ্রামে নাগরিক সভ্যতা ভব্যতা দেখাবার কিছু নেই। সুরুচি? দুঃসময়ে সুরুচি প্রথম নির্বাসনে যায়।

কবি কি আমাকে চিনেছেন? আমি শাহ কলিম। আপনার খাদেম।

আমার খাদেম মানে কী? আমি কি পীর সাহেব?

আমার পীর তো অবশ্যই।

কলিমুল্লাহ কদমবুসি করার জন্যে নিচু হলো। কবি চমকে সরে গিয়েও কদমবুসির হাত থেকে বাঁচতে পারলেন না। কলিমউল্লাহ হাসিমুখে বলল, আপনাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে লিভিংস্টোনের সাক্ষাৎ পেলাম।

তার মানে?

আমাজানের জঙ্গলে লিভিংস্টোন হারিয়ে গিয়েছিলেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি থেকে কমিশন করে একজনকে আমাজানে পাঠানো হলো। তিনি অনেক ঝামেলা করে লিভিংস্টোনের খোঁজে উপস্থিত হলেন। গভীর অরণ্যে একদল কালো মানুষের মধ্যে একজন সাদা মানুষ দেখে তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, I presume you are Dr. Livingstone.

কবি কলিমউল্লাহর দিকে তাকিয়ে আছেন। মানুষটা হড়বড় করে কী বলছে কিছু তার মাথায় ঢুকছে না। সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে, মানুষটাকে তিনি চিনতে পারছেন না। দাড়ি রাখার কারণে কি তা হয়েছে? আজকাল অনেকেই দাড়ি রেখে চেহারা পাল্টে ফেলছে। দাড়ি, চোখে সুরমা, মাথায় টুপি। নতুন লেবাস।

লিভিংস্টোন সাহেবের মতোই আপনার গায়ের রঙ। পড়েও আছেন বলতে গেলে আমাজানের জঙ্গলে। কবি বোধহয় আমাকে চিনতে পারেন নাই। দৈনিক পাকিস্তান অফিসে আপনার সঙ্গে পরিচয়। আপনার একটা কবিতা ঝাড়া মুখস্থ বলেছিলাম। আসাদের শার্ট। মনে পড়েছে?

শামসুর রাহমান হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বুঝালেন তিনি চিনেছেন। আসলে মোটেই চিনতে পারেন নি।

আপনাকে মনে মনে খুঁজছিলাম, এইভাবে যে পেয়ে যাব ভাবি নাই।

কীভাবে পেয়েছেন?

সে এক বিরাট ঘটনা। বসে বলি? ঘরে কোথাও গিয়ে বসি?

শামসুর রাহমান বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, অবশ্যই অবশ্যই।

শাহ্ কলিম নামের মানুষটাকে তিনি এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। নিজে দু'হাতে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দূর থেকে যে কেউ দেখলেই ভাববে, শাহ কলিম যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে সেইজন্যে তিনি দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছেন।

কবি বললেন, চা খাবেন?

শাহ্ কলিম বাংলাঘরের বিছানায় পাতা পাটিতে বসতে বসতে বললেন, চায়ের ব্যবস্থা কি আছে?

আছে, গুড়ের চা।

বাহ্ ভালো। গুড়ের চা অনেক দিন খাই না। চা খাব। আপনার সঙ্গে বসে চা খাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। মহা ভাগ্য!

কবি চায়ের কথা বলতে গেলেন। সার্ট গায়ে দিতে হবে। খালি গায়ে এই মানুষের সামনে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। চা খেয়েই যে বিদায় হবে তাও মনে হয় না। এই লোকটা অবশ্যই খুঁটি গেড়ে বসা টাইপ লোক।

কলিমউল্লাহ গুড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে 'আহ্' বলে তৃপ্তির শব্দ করল।

চা ভালো হয়েছে। গুড়ের গন্ধ চায়ের গন্ধ মিলে একাকার হয়ে গেছে। এই চা এক কাপ খেলে হবে না। আরেক কাপ খাব।

শামসুর রাহমান হতাশ গলায় বললেন, অবশ্যই খাবেন। তবে আমি ব্যস্ত আছি। আপনাকে বেশি সময় দিতে পারব না।

স্যার, আমাকে কোনো সময়ই দিতে হবে না। আপনি আপনার কাজে যান। আমি আছি। চা খাব। কবি-কুটিরে কিছুক্ষণ থেকে চলে যাব।

আমার খোঁজ পেয়েছেন কীভাবে?

সেটা স্যার ইতিহাস পর্যায়ের ঘটনা। আমি চড়নদার হিসেবে একটা ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছি গ্রামে। এক পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেবের ফ্যামিলি। তাঁর স্ত্রী, তিন মেয়ে, এক ছেলে। আপনার গ্রামে এসে ইন্সপেক্টর সাহেবের ছোট মেয়ে মাসুমা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। নাকে রুমাল চেপে ধরলে কিছুক্ষণের মধ্যে রুমাল রক্তে লাল। এই গ্রামে তাদের আত্মীয় বাড়ি আছে। সেখানে আপাতত উঠেছি। মাসুমাকে ডাক্তার দেখিয়ে আবার রওনা দেব। আমরা যাচ্ছি ফরিদপুরের দিকে। মাসুমাদের আদি বাড়ি ফরিদপুরে।

ও আচ্ছা।

পাশ করা কোনো ডাক্তার পেলাম না। হিন্দু এক ডাক্তার ছিল। হরি বাবু নাম। সে তার গুষ্ঠী নিয়ে মিলিটারির ভয়ে ইন্ডিয়া পালিয়ে গেছে। এটা একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে— 'বন্যেরা বনে সুন্দর, হিন্দুরা হিন্দুস্থানে।'

এটা কেমন কথা ?

কথার কথা বলেছি স্যার। এটা গুরুত্বের সঙ্গে নিবেন না। মূল বিষয়টাই আপনাকে বলা হয় নাই, কীভাবে আপনার খোঁজ পেলাম। মাসুমার এক খালু বললেন, আপনি এই গ্রামে লুকিয়ে আছেন। তবে স্যার লুকিয়ে থাকার জন্যে জায়গাটা ভালো না।

ভালো না কেন ?

কেউ যদি আপনাকে খুঁজে বের করতে চায়, তার চোখ বেঁধে দিলে সে চোখ বাঁধা অবস্থায় আপনাকে খুঁজে বের করতে পারবে। কারণ আপনি পালিয়ে আছেন আপনার নিজের গ্রামের বাড়িতে। পালানোর সবচে' ভালো জায়গা কি জানেন স্যার ?

না।

পালানোর সবচে' ভালো জায়গা হলো হিন্দুস্থান। দাগি লোকজন সব বর্ডার পার হয়ে যাচ্ছে।

দাগি লোকজন মানে ?

এন্টি পাকিস্তান লোকজন।

আপনি নিজে কোন দিকের মানুষ ?

স্যার শুনেন, আমার দাড়ি, চোখের সুরমা সবই লেবাস। লেবাস পরে পাকিস্তানি সেজেছি। বাঁচার উপায় একটাই— লেবাস পরিবর্তন। খোলস দেখে বিভ্রান্ত হবেন না স্যার।

কবি নিঃশ্বাস ফেললেন। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। লোকটি সত্যি কথা বলছে না মিথ্যা বলছে তাও ধরা যাচ্ছে না।

গ্রামে বাস করতে কি ভালো লাগছে ?

কবি মাথা নাড়লেন। গ্রাম তার ভালো লাগছে কি লাগছে না— তা তাঁর মাথা নাড়া থেকে ঠিক বোঝা গেল না।

স্যার, আপনার উচিত শহরে চলে যাওয়া।

কেন ?

যেখানে অনেক মানুষ থাকে, সেখানে গোপনে বাস করা যায়। গ্রামে গোপনে থাকতে পারবেন না। দেখেন না আমি কীভাবে চট করে আপনাকে খুঁজে বের করে ফেলেছি।

হুঁ।

পত্রিকা অফিসে যোগ দিয়ে কাজ শুরু করে দেন। কেউ আপনাকে ঘাঁটাবে না। আপনি নিজের মনে থাকবেন। কবিতা লিখবেন। মিলিটারির দিক থেকে আপনার কোনো ভয় নেই।

ভয় নাই কেন ?

আপনার মতো সম্মানিত কবিকে মিলিটারি কিছু বলবে না। তারা পৃথিবীকে দেখাতে চায় ঢাকা স্বাভাবিক। আমার কথাটা স্যার রাখেন। ঢাকায় চলেন।

আপনার স্বার্থ কী ?

আপনি নিরাপদে আছেন। নিজের মনে লেখালেখি করছেন— এইটাই আমার স্বার্থ। গ্রামে আপনার নিরাপত্তা নাই। শান্তি কমিটি আলবদর কত কিছু তৈরি হচ্ছে। কখন আপনাকে ধরে নিয়ে যায়— এইটাই আমার ভয়। এরা যদি ধরে নিয়ে যায় তার হিসাব থাকবে না। মিলিটারি ধরলে তার হিসাব থাকবে।

আপনার কি চা খাওয়া হয়েছে ?

জি।

দিব আরেক কাপ ?

না থাক, মনে হয় আপনি আমার ওপর নারাজ হয়েছেন। কবি, আপনি আমার ওপর নারাজ হবেন না। আমি নিজে কবিতা লিখি, আমি জানি আপনি কী।

আমি নারাজ হই নি।

কবিতা লেখেন না ? মিলিটারির ক্রাকডাউনের পরে কিছু লিখেছেন ?

হুঁ।

যে-কোনো একটা কবিতা কি আমি পড়তে পারি ? আমার খুবই ইচ্ছা ক্রাকডাউনের পরে লেখা একটা কবিতা পড়ি।

কেন ?

কবিদের বলা হয় দেশের আত্মা। আমি কথাটা বিশ্বাস করি। যারা সত্যি সত্যি কবি, তারা অবশ্যই দেশের আত্মা। আমি না। আমি কবি হিসেবে দুই নম্বরি, দেশের আত্মা হিসেবেও দুই নম্বরি। আপনি তা না। আপনার এখনকার কবিতা পড়লে বোঝা যাবে দেশের অবস্থা কী ?

সত্যি সত্যি পড়তে চান ?

জি।

কয়েকদিন আগে দু'টা কবিতা একসঙ্গে লিখেছি। আমার কাছে এরা দুই যমজ কন্যার মতো।

কবি, কবিতার খাতাটা নিয়ে আসেন পড়ি। আর যদি তেমন তকলিফ না হয় তাহলে আরেক কাপ গুড়ের চা।

কবি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর যাবার ভঙ্গিতে এক ধরনের অনিশ্চয়তা। যেন তিনি ধরতে পারছেন না এই মানুষটাকে তাঁর দু'টি অতিপ্রিয় কবিতা শোনানো ঠিক হবে কি-না।

কলিমউল্লাহ্ অনেকক্ষণ বসে রইল। কবিতার খাতা নিয়ে আসতে এত সময় লাগার কথা না। মনে হচ্ছে কবি একই সঙ্গে কবিতা এবং চা নিয়ে ঢুকছেন। কলিমউল্লাহ্র ভালো ক্ষিধা লেগেছে। গুড়ের চায়ে এই ক্ষিধা যাবার কথা না। গুড়ের চা খেলে উল্টা ক্ষিধা বাড়ে। গ্রামের এই সমস্যা— চায়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্যে কিছুই থাকে না। বিস্কুট-চানাচুর কিছু না। দু'এক জায়গায় পাকা পেপে কেটে দেয়। চায়ের সঙ্গে পাকা পেপে খাওয়া যায় না। গ্রামের বেকুবরা এটা বোঝে না।

কবি নিজেই চা নিয়ে ঢুকলেন। এক কাপ চা, আরেকটা পিরিচে দু'টা মুড়ির মোয়া। কবি চা এবং মুড়ির মোয়া কলিমউল্লাহ্র সামনে রাখতে রাখতে বললেন, আজ কবিতা শোনাতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

কলিমউল্লাহ্ মুড়ির মোয়াতে কামড় দিয়ে বলল, ইচ্ছা না হলে থাক। কবির ইচ্ছার উপরে কোনো কথা চলে না।

গ্রামে বসে কবি শামসুর রাহমান যে দু'টা কবিতা লিখেছিলেন তার একটির নাম 'স্বাধীনতা'।

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।

স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ-খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদির রঙ।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকির অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।

স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

প্রায় সন্ধ্যা।

কলিমউল্লাহ্ ফিরে যাচ্ছে। অনেকটা পথ হেঁটে বাজারে উঠলে রিকশা-ভ্যান পাওয়া যাবে। কাঁচা রাস্তায় রিকশা-ভ্যানে চড়াও এক দিগদারি। ঝাঁকুনির চোটে কলিজা ফুসফুস হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। এরচে' হেঁটে যাওয়া ভালো। কলিমউল্লাহর হাঁটতে সমস্যা হয় না। তার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে হাঁটতে পারে। একটাই শুধু অসুবিধা— হাঁটার সময় তার মাথায় কবিতা আসে না। এই সময় পাকা রাস্তায় রিকশা করে যেতে পারলে অতি দ্রুত তার মাথায় কবিতা আসত। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই চলমান রিকশায় পাওয়া।

আজ একটা কবিতা মাথায় আসা প্রয়োজন। খুবই প্রয়োজন। আজ তার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ক্র্যাক ডাউনের পর বিয়ের সিজন চলছে। অবিবাহিত মেয়েদের বাবা-মা অতি দ্রুত বিয়ে দিয়ে ফেলছে। যেন বিয়েই সব সমস্যার সমাধান। বিপদ শুধু কুমারী মেয়েদের। বিবাহিতদের কোনো সমস্যা নাই। গাধারা বুঝে না মিলিটারিদের কাছে কুমারী, বিবাহিত বা বিধবা কোনো ব্যাপার না। সবই তাদের কাছে— আওরাত।

মাসুমার সঙ্গে যদি সত্যি সত্যি বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে এটাকে আল্লাহর রহমত হিসেবে ভাবা যেতে পারে। অতি ভালো মেয়ে। বেশি চালাক— এটা একটা সমস্যা। স্ত্রী হলো সঙ্গিনী। সঙ্গিনী বেকুব হলেও সমস্যা। চালাক হলেও সমস্যা। শাখের করাত দু'দিকে কাটে।

কলিমউল্লাহর মাথায় হাঁটতে হাঁটতেই একটা কবিতার লাইন চলে এলো— 'সঙ্গী ছিল না কেউ পাশে।' লাইনটা খারাপ না, দশ মাত্রা দিয়ে শুরু। ষোল মাত্রা করা দরকার। 'সঙ্গী ছিল না কেউ পাশে, আবেগে সন্তাপে।' এটা কেমন হয় ? ষোল মাত্রা। শেষ তিনটা শব্দে একারের মিল— 'পাশে, আবেগে সন্তাপে'।

রিকশা-ভ্যানের ভাড়া নিয়ে দরাদরি করার কারণেই হয়তো কবিতার লাইন মাথা থেকে পুরোপুরি মুছে গেল। ভ্যান চলছে। সে বেশ আরাম করেই ভ্যানে বসেছে। রাস্তা তেমন উঁচু-নিচু না। ঝাঁকুনি হচ্ছে না। পরিবেশ ভালো। সন্ধ্যা নামছে। আরামদায়ক বাতাস মাথায় নামছে। মনে মনে কবিতা তৈরির জন্যে

অতি উত্তম ব্যবস্থা। অথচ মাথা পুরোপুরি ফাঁকা। কবিতাটা তৈরি হয়ে গেলে ভালো হতো। সে যদি কোনো দিন বড় কোনো কবি হয়ে যেত, তাহলে ইন্টারভিউতে বলতে পারত— এই কবিতাটার পেছনে একটা বিশেষ ঘটনা আছে। ঘটনা কী হয়েছে শোন— ১৯৭১ সন। অতি দুঃসময়। কবি শামসুর রাহমান গ্রামে পালিয়ে আছেন। হঠাৎ তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হলো। ঢাকা ছেড়ে প্রায় জীবন হাতে নিয়ে কবির গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। কবির কাছে তো খালি হাতে যাওয়া যায় না। রিকশা-ভ্যানে বসে বসে একটা কবিতা লিখলাম। কবিতা পকেটে নিয়ে যাচ্ছি। তখন সন্ধ্যা। তোমাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস।

রিকশা-ভ্যান প্রবল ঝাঁকুনি খেল। কলিমউদ্দিন ভ্যান থেকে উল্টে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলাল। কবিতা নিয়ে চিন্তা করা আর ঠিক হবে না। চোখ-কান খোলা রেখে বসে থাকতে হবে। হাত-পা ভাঙা কবি কোনো মজার ব্যাপার না। তাছাড়া আজ রাতে তার বিয়ের সমূহ সম্ভাবনা। হাত-পা ভাঙা পাত্রের বিয়ে হবে কীভাবে ?

ভ্যানওয়ালা আবার চালানো শুরু করেছে। কলিমউল্লাহর এখন সামান্য আফসোস হচ্ছে— কবি সাহেবের সঙ্গে এতক্ষণ ছিল, এক ফাঁকে সে বলতে পারত, কবি সাহেব আজ রাতে আমার বিয়ে। আপনার কাছে ছোট্ট একটা উপহার চাই। কবি বিস্মিত হয়ে বলতেন, কী উপহার ? আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে আশীর্বাদ করে দুই-তিন লাইনে যদি কিছু লিখে দেন— আপনার জন্যে এটা কিছুই না। আমাদের জন্যে অনেক কিছু। কবি নিশ্চয়ই কিছু লিখতেন। বেচারা লাজুক মানুষ। লাজুক মানুষরা কখনো না বলতে পারে না।

কলিমউল্লাহ লাজুক মানুষ না। তবে সে লাজুক মানুষের অভিনয় ভালো করতে পারে। মাসুমার মা যখন বললেন, আপনাকে একটা কথা সরাসরি বলতে চাই। এখন সময় খারাপ। কুমারী মেয়ে ঘরে কেউ রাখছে না। আমি খোঁজ নিয়েছি মাসুমা আপনাকে পছন্দ করে। আপনার বিষয়ে আমরা তেমন কিছুই জানি না। তারপরেও আপনাকে ভালোমানুষ বলে মনে হয়। আপনি কি মাসুমাকে বিবাহ করবেন ?

কলিমউল্লাহ অতি লাজুক ভঙ্গিতে বলল, আপনাকে দেখার পর থেকে আমি আপনাকে আমার মায়ের মতো জানি। কারণ আপনার চেহারা-কথাবার্তা সবই আমার মায়ের মতো। আজ যে এটা প্রথম বলছি তা-না, আগেও আপনাকে বলেছি। মা হিসেবে আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন, তাই আমি করব।

এখনকার বিয়ে তো বিয়ে না। মাওলানা ডেকে বিয়ে পড়িয়ে দেয়া। যখন সময় ভালো হবে, তখন অনুষ্ঠান করব। আল্লাহ্ চাহে তো মেয়ের বাবাও তখন উপস্থিত থাকবেন।

মা, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

আমি চাচ্ছি ফরিদপুর রওনা হবার আগেই বিয়ে পড়িয়ে দিতে। আপনার কি আপত্তি আছে ?

মা, আমাকে তুমি করে বলবেন। আর আমি তো আগেই বলেছি, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

কলিমউল্লাহর সেই রাতেই বিয়ে হলো। পরদিন তাদের ফরিদপুর যাবার কথা, তা না করে সে সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঢাকায় নিয়ে চলে এলো। এখন সে সঙ্গে থাকবে, কাজেই ঢাকায় থাকাই ভালো। ঢাকা নিরাপদ। তাছাড়া শ্বশুর আব্বার খোঁজ নিতে হবে। উনি যে-কোনোদিন বাসায় চলে আসতে পারেন। বড় আপার স্বামীও কোথায় আছেন কে জানে! তিনি যদি খোঁজ-খবর করেন ঢাকার ঠিকানাতেই করবেন।

সবার কাছে কলিমউল্লাহর যুক্তি অকাট্য মনে হলো। তারা ঢাকায় ফিরলো লঞ্চে করে। মাসুমা সারা পথই স্বামীর সঙ্গে লেপ্টে রইল। মহিলারা সবাই বোরকা পরে যাচ্ছে। শুধু মাসুমাই একটু পর পর নেকাব খুলে ফেলছে। সে এক ফাঁকে ফিসফিস করে বলছে— আমার সারাক্ষণ ইচ্ছা করে তোমাকে দেখি। বোরকার ভেতর থেকে ঠিকমতো দেখা যায় না। আমি কী করব, বলো ?

'ডেইলি পিপল' পত্রিকার সাব-এডিটর নির্মলেন্দু গুণ লুকিয়ে আছেন ময়মনসিংহ জেলার বারহাট্টা গ্রামে। ঢাকা থেকে পালিয়ে আসতে তাঁর তেমন অসুবিধা হয় নি। লম্বা দাড়িতে তাঁকে দেখাতো তরুণ সুফিদের মতো। ঢাকা ছেড়ে আসার দিনও তিনি শহরে নিজের মনে হেঁটেছেন। শহীদ মিনারের দিকে গেলেন। দূর থেকে দেখলেন। কাছেই জি সি দেবের কোয়ার্টার। এই দার্শনিক মানুষটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। তবু কী মনে করে যেন গেলেন। শূন্য বাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ তাকালেন। আবার পথ হাঁটা। দূর থেকে ইকবাল হল দেখা।

তিনি হাঁটতে হাঁটতে হাইকোর্টের মাজারের দিকে গেলেন। এখানে এসে বড় ধরনের চমক খেলেন। দুটা লম্বা টেবিল পেতে মিলিটারিরা অফিসের মতো করেছে। রেডিও-টেলিভিশনের ঘোষণা মতো বেসামরিক লোকজনদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নেয়া হচ্ছে। প্রতিটি থানায় অস্ত্র জমা নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্যা হলো অনেক থানা আছে, যেখানে কেউ নেই। বাঙালি পুলিশ থানা ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে। সে কারণেই হয়তো বিকল্প ব্যবস্থা।

ঢাকা শহরের বেশকিছু লোক অস্ত্র জমা দিতে এসেছে। তারা মিলিটারিদের দিকে তাকাচ্ছে না। তাদের দৃষ্টি মাটির দিকে। অস্ত্রধারী হবার অপরাধে তারা যেন মরমে মরে যাচ্ছে।

মিলিটারিদের ভেতর থেকে একজন নির্মলেন্দু গুণের কাছে এগিয়ে এলো। ধমক দিয়ে জানতে চাইল— কী চাও তুমি ?

নির্মলেন্দু গুণ বিনীতভাবে বললেন, অস্ত্র জমা দেয়া দেখি।

তুমি এই দৃশ্য দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ ?

জি জনাব।

ভাগো হিঁয়াসে। ভাগো।

মিলিটারি হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার মতো ভঙ্গি করল। নির্মলেন্দু গুণ হাঁটা ধরলেন। হাঁটতে হাঁটতেই ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ থেকে

নেত্রকোনা। নেত্রকোনা থেকে বারহাট্টা। তার নিজের বাড়ি। এই বাড়িতেই এক নিশুতি রাতে তিনি 'আগ্নেয়াস্ত্র' নামের ছোট্ট একটি কবিতা লেখেন—

পুলিশ স্টেশনে ভিড়, আগ্নেয়াস্ত্র জমা নিচ্ছে শহরের
সন্দিগ্ধ সৈনিক। সামরিক নির্দেশে ভীত মানুষের
শটগান, রাইফেল, পিস্তল এবং কার্তুজ, যেন দরগার
স্বীকৃত মানৎ, টেবিলে ফুলের মতো মস্তানের হাত।

আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য করে হয়ে গেছি
কোমল বিদ্রোহী, প্রকাশ্যে ফিরছি ঘরে
অথচ আমার সঙ্গে হৃদয়ের মতো মারাত্মক
একটি আগ্নেয়াস্ত্র, আমি জমা দেই নি।

ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরী খুব প্রফুল্ল বোধ করছেন। ফজরের ওয়াক্তে এমনিতেই তিনি প্রফুল্ল বোধ করেন। অন্য এক ধরনের আনন্দ কিছুটা হলেও তাঁকে অভিভূত করে রাখে। কেন এরকম হয় তিনি নিজেও জানেন না। হয়তো নতুন একটা দিন শুরু করার আনন্দ। শুধু মানুষ না, পশুপাখি গাছপালা সবাই নতুন দিন শুরু করে। সেই সবার সঙ্গে যুক্ত থাকার আনন্দ। আজকের আনন্দের সঙ্গে বিষাদ মিশ্রিত আছে। তিনি তাঁর শোবার ঘর থেকে শিশুর কান্না শুনছেন। এই শিশু সব সময় কাঁদে না। হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে ওঠে। আবার হঠাৎই থেমে যায়। তাঁর বাড়িতে দীর্ঘদিন কোনো শিশু কাঁদে নি, এই প্রথম কাঁদছে। জায়নামাজে বসে থেকে তাঁর মনে হলো, শিশুর কান্নার মধ্যে পবিত্র কোনো ব্যাপার অবশ্যই আছে। যতবারই তিনি শিশুর কান্না শুনছেন, ততবারই তাঁর মন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

শিশুটির এখনো কোনো নাম দেওয়া হয় নি। ছদরুল আমিন সাহেবের পুত্র সন্তান। ছদরুল আমিন সাহেব ছেলের মুখ দেখে যেতে পারেন নি। ছেলের জন্ম সংবাদও শুনে যেতে পারেন নি। একজন বাবার জন্যে এরচে' দুঃখের কিছু হতে পারে বলে ইরতাজউদ্দিনের মনে হয় না। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের কোনো উদ্দেশ্য এর পেছনেও আছে।

ইরতাজউদ্দিন কমলা এবং তার পুত্রকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। দেশের অবস্থা আরেকটু ভালো হলেই মা-পুত্রকে খুলনা দিয়ে আসবেন। কমলার মা'র বাড়ি খুলনার বাগেরহাটে। এই সুযোগে বাগেরহাটের খানজাহান আলির মাজারও জিয়ারত করা হবে।

ইরতাজউদ্দিন অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ অনেক বেশি সময় জায়নামাজে কাটালেন। তার সামান্য কারণও আছে। তিনি খতমে জালালি শুরু করেছিলেন। আজ সেই খতম শেষ হলো। ফজরের নামাজ শেষ করে দীর্ঘ সময় নিয়ে দোয়া করলেন। দোয়ার পরপর মনটা একেবারেই শান্ত হয়ে গেল। কদিন ধরেই মন খুব অশান্ত হয়েছিল। রাতে ভালো ঘুম হতো না। মাঝে-মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখতেন।

সেইসব দুঃস্বপ্নের কোনো আগামাথা নেই। একটা দুঃস্বপ্ন খুব স্পষ্ট দেখলেন, যেন শাহেদ এসেছে নীলগঞ্জে। সে একা, সঙ্গে কেউ নেই। সে খুব রোগা হয়ে গেছে, রোগা এবং বুড়ো। কণ্ঠার হাড় বের হয়ে গেছে, ঠোঁট ফ্যাকাশে, মাথার চুল প্রায় সবই সাদা। তিনি বললেন, তোর এই অবস্থা কেন ? চুল টুল পেকে বুড়ো হয়ে গেছিস, কী হয়েছে ? শাহেদ জবাবে বিড়বিড় করে কী বলল, বোঝা গেল না। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, শাহেদ ক্রমাগত মাথা চুলকাচ্ছে। মাথাভর্তি উকুন। মাথা থেকে উকুন টপটপ করে মাটিতে পড়ছে।

তিনি বললেন, তুই একা কেন ? ওদের কোথায় রেখে এসেছিস ?

তার উত্তরেও শাহেদ বিড়বিড় করে কী বলল। তিনি বললেন, বিড়বিড় করছিস কেন ? কী বলবি পরিষ্কার করে বল। কেশে গলা পরিষ্কার করে নে। তোর দেখি মাথা ভর্তি উকুন। তুই গোসল করিস না ?

শাহেদ বলল, ভাইজান, বিরাট বিপদে পড়েছি। বলেই কাঁদতে শুরু করল। তখন তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। সেই রাতে তাঁর ঘুম হলো না। তিনি শাহেদকে চিঠি লিখতে বসলেন।

শাহেদ,

দোয়া গো। পর সমাচার এই, আমরা মঙ্গলমতো আছি। তোমাদের কোনো খবর না পাইয়া বিশেষ চিন্তাযুক্ত। ফুলপুর টেলিগ্রাম অফিস হইতে তোমাকে পরপর দুইটি টেলিগ্রাম করিয়াছি, কোনো জবাব পাই নাই। টেলিগ্রাম ছাড়াও তোমাকে পত্র দিয়াছি, তাহারও জবাব পাই নাই।

নীলগঞ্জের অবস্থা এখন মোটামুটি ভালো। প্রথম দফায় জনৈক আধাপাগল সামরিক অফিসার নীলগঞ্জে কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছিলেন। তিনি কোনোরকম কারণ ছাড়াই কিছু মানুষ মেরে ফেলেছেন। তার মধ্যে নীলগঞ্জ থানার ওসি ছদরুল আমিন সাহেবও ছিলেন। আল্লাহর অশেষ রহমত উনি অতি অল্প সময়েই প্রস্থান করেছেন। বর্তমানে নীলগঞ্জ থানায় একদল মিলিটারি অবস্থান করিতেছে। তাহাদের প্রধান একজন ক্যাপ্টেন, নাম মুহাম্মদ বাসেত। অতি ভদ্র ও সজ্জন। সবচেয়ে বড় কথা ধর্মপ্রাণ। গত জুম্মার দিনে তিনি সকলের সঙ্গে জুম্মার নামাজ আদায় করিয়াছেন। খোতবার শেষে তিনি ইংরেজিতে একটা বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতাটি আমার বিশেষ পছন্দ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন— বহু দুঃখ

ও বহু কষ্টে আমরা ইংরেজের গোলামি হইতে মুক্ত হইয়াছি। এখন আবার নতুন চক্রান্ত শুরু হইয়াছে। আমাদের সবাইকে সেই চক্রান্ত সম্পর্কে সাবধান থাকিতে হইবে। একজন মুসলমান অন্য আরেকজন মুসলমানের ভাই। ভাই সবসময় থাকিবে ভাইয়ের পাশে। এক ভাই যদি ভুল করে অন্য ভাই তাহা শুধরাইয়া দিবে।

ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে অত্র এলাকার হিন্দুদের সঙ্গেও সদ্ভাব আছে। আমাদের স্কুলের শিক্ষক কালিপদ বাবুকে ডাকাইয়া নিয়া তার সঙ্গে দাবা খেলেন। কালিপদ বাবুও ক্যাপ্টেন সাহেবের ভদ্রতায় মুগ্ধ। ক্যাপ্টেন সাহেবের উদযোগে এইখানে স্থানীয়ভাবে শান্তি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আমি সেই কমিটির প্রেসিডেন্ট। কমিটির প্রধান কাজ শান্তি বজায় রাখা। নীলগঞ্জের শান্তি বর্তমানে বজায় আছে।

ছদরুল আমিন সাহেবের বিধবা স্ত্রী পুত্রসহ বর্তমানে আমার সঙ্গে আছে। আমি তাহাদের খুলনায় পৌঁছাইয়া দিয়া খুলনা হইতে রকেট-স্টিমার যোগে ঢাকা যাইব এবং তোমাদেরকে আমার কাছে নিয়া আসিব। তোমাদের চিন্তায় আমি বড়ই অস্থির থাকি...।

ভোরবেলা চিঠি পোস্ট করতে গিয়ে ফিরে এলেন। পোস্টাপিস বন্ধ। পোস্টমাস্টার কাউকে কিছু না বলে পোস্টাপিস তালাবন্ধ করে চলে গেছে। চিঠি পোস্ট করতে হলে এখন যেতে হবে ফুলপুর। তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। হাঁটলে হাঁটুতে ব্যথা করে। পায়ে পানি এসে যায়। তারপরও তিনি নিজেই হেঁটে হেঁটে ফুলপুরে গেলেন। এই কাজটা অন্যকে দিয়েও করানো যেত। তিনি ব্যক্তিগত কাজ কখনোই অন্যকে দিয়ে করান না। নবি-এ-করিম তাঁর কাজ নিজে করতেন। ইরতাজউদ্দিন সারাজীবন নবি-এ-করিমকে অনুসরণ করে এসেছেন। আজ শুধুমাত্র বয়সের দোহাই দিয়ে তা থেকে বিরত থাকবেন তা হয় না। তিনি ফুলপুর রওনা হলেন। চিঠির সঙ্গে টেলিগ্রামও করলেন।

সেই টেলিগ্রামেরও কোনো জবাব এলো না। মনে হচ্ছে পুরো দেশে ডাক যোগাযোগ বলে কিছু নেই। তার মন খুবই অস্থির হলো। তিনি অস্থিরতা দূর করার জন্য ইসতেখারা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইসতেখারায় বিশেষ বিশেষ দোয়াদরুদ পড়ে পবিত্র মনে ঘুমুতে যেতে হয়। তখন স্বপ্নে প্রশ্নের জবাব আসে। তবে স্বপ্ন খুব সরাসরি হয় না।

আল্লাহপাক প্রতীকের মাধ্যমে বান্দার প্রশ্নের জবাব দেন। সেই প্রতীক বোঝা সবসময়ই কঠিন।

তারপরও তিনি একরাতে ইসতেখারা করে ঘুমোতে গেলেন। স্বপ্নে দেখলেন রুনিকে। রুনি বড় একটা থালায় কী যেন খাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী খাচ্ছিস ? রুনি বলল, বলব না। তিনি বললেন, দেখি। রুনি বলল, দেব না।

এই স্বপ্নের মানে কী ? রুনি খাওয়া-দাওয়া করছে, তার মানে সে ভালো আছে। বড় একটা থালায় খাবার নিয়ে খাচ্ছে, এর অর্থও ভালো। ছোট একটা পিরিচে খাবার নিয়ে খাচ্ছে দেখলে অভাব বুঝাত। তবে তিনি রুনিকে একা দেখেছেন, সঙ্গে বাবা-মা কেউ নেই। এরও কি কোনো অর্থ আছে ? শাহেদ এবং আসমানী এরা দুজন কোনো বিপদে পড়ে নি তো ? তিনি রুনির কাছে খাবার চাইলেন। রুনি দিতে রাজি হলো না। এরও কি আলাদা কোনো অর্থ আছে ? আছে নিশ্চয়ই। তিনি ধরতে পারছেন না। এর পরপরই তিনি খতমে জালালি শুরু করেন। আজ সেই খতম শেষ হয়েছে। তিনি খুব ভালো বোধ করছেন। তাঁর মন বলছে আর কোনো ভয় নেই।

ইরতাজউদ্দিন জায়নামাজ ছেড়ে উঠতেই কমলা ঘর থেকে বের হলো। ইরতাজউদ্দিন বলল, কেমন আছ গো মা ? কমলা বলল, ভালো।

তোমার ছেলের জ্বর কি কমেছে ?

জি কমেছে।

আলহামদুলিল্লাহ্।

কমলা বলল, চাচাজি, আমি আপনাকে একটা কথা বলতে আসছি। জরুরি কথা।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, বলো মা।

আমি খুলনা যাব না। সেখানে আমার কেউ নাই। মা মারা গেছেন। সৎভাই আছে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো না। খুলনা গেলে ছেলে নিয়ে আমি বিপদে পড়ব।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, বিপদ দেওয়ার মালিক আল্লাহ্। বিপদ থেকে উদ্ধারের মালিকও আল্লাহ্। মাগো শোন, তোমার যতদিন ইচ্ছা তুমি এই বাড়িতে থাকবা। তোমার কোনো সমস্যা নাই।

আপনার অনেক মেহেরবানি। চাচাজি, আপনাকে চা বানায়ে দেই ? চা খান।

বানাও চা বানাও। ততক্ষণ আমি তোমার ছেলে কোলে নিয়া বসে থাকব। আল্লাহপাকের রহমতের একটা সূরা আছে। সূরা আর-রাহমান। এইটা পড়ে তার মাথায় ফুঁ দিব। মাশাল্লাহ তোমার এই ছেলে সুসন্তান হবে।

চা শেষ করে ইরতাজউদ্দিন সাহেব হাঁটতে বের হলেন। তাঁর এই হাঁটা স্বাস্থ্যরক্ষার হাঁটা না। ফজরের নামাজের পর হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড় পর্যন্ত যেতে তাঁর খুব ভালো লাগে। সোহাগী নদীর পানি এই বছর দ্রুত বাড়ছে। ফুলে ফেঁপে উঠছে। প্রতিদিনই নদী বদলে যাচ্ছে। সব পরিবর্তনের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখার মধ্যেও আনন্দ আছে।

ইরতাজউদ্দিন দেখলেন, নদীর পানি আরো বেড়েছে। বন্যা হবে না তো? নীলগঞ্জ উঁচু অঞ্চল। সহজে বন্যা হয় না। তবে প্রতি সাত বছর পরপর প্রবল বন্যা হয়। সাত বছর কি হয়েছে?

মাওলানা সাব, আপনের শইলডা আইজ কেমুন?

ইরতাজউদ্দিন চমকে তাকালেন। নিবারণ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই মানুষ হাস্যমুখি। অতি দুঃসময়েও তার মুখে হাসি থাকে। অতি ভালো গুণ।

ছোটখাটো মানুষ। গায়ের রঙ গাঢ় কৃষ্ণ। মাথার ঘন চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। সাদামাটা চেহারার এই লোক গানের আসরে নিমিষের মধ্যে ঘোর তৈরি করতে পারে। এমন দরদি গলা এই অঞ্চলেই আর নাই।

তুমি কোত্থেকে নিবারণ?

নিবারণ হাসল। এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তার প্রণামের ভঙ্গি অদ্ভুত। আঙুল দিয়ে পা ছুঁয়ে সেই আঙুল জিভে ঠেকায়।

আমরা হইলাম বাদাইম্মা পাখি, আমরার কি কিছু ঠিক আছে? ঘুরতে ঘুরতে চইল্যা আসছি।

এখন সময় খারাপ, এখন কি আর এত ঘোরাঘুরি করা ঠিক?

কথা ঠিক। তয় একজাগায় মন টিকে না। অনেকে বলছে ইন্ডিয়া চইল্যা যাও। যাব কেন কন? এইটা আমার দেশ না?

অবশ্যই তোমার দেশ।

নিজের দেশে আমারে সবেই চিনে। যেখানে যাই আদর কইর‍্যা বসায়। ইন্ডিয়ায় আমারে চিনে কে?

ঠিকই বলেছ।

নিবারণ গুনগুন করে উঠল,

পাখি থাকে নিজের বনে,
বনের মধু খায়।
সেই পাখি ক্যামনে বলো
বন ছাইড়্যা যায়?

বনে লাগছে মহা আগুন
সব পুইড়্যা যায়,
এখন বলো সেই পাখিটার হবে কী উপায় ?

ইরতাজউদ্দিন বললেন, গানটা এখন বাঁধলা ?

জে।

ভালো গান বেঁধেছ। নদীর পাড়ে একা একা কী করছ ?

মনটা খুব খারাপ ছিল। এই জন্য ভাবলাম নদীর পাড়ে আইস্যা বসি। নদীর পানি হইল চলতি পানি। চলতি পানি মনের দুঃখ সাথে নিয়া যায়।

নিবারণ, আমার সাথে চলো। নাশতা করবে।

নিবারণ বিনয়ের সঙ্গে বলল, জি-না। মন ভালো করতে আসছি, দেখি মন ভালো হয় কি-না।

মন এত খারাপ কেন ?

নিবারণ আবারো গুনগুন করে উঠল,

আসমানে উড়তাছে শকুন
জলে পড়ছে ছায়া।
মানুষ মরে ঘরে ঘরে
আমি থাকি চাইয়া

ইরতাজউদ্দিন সাহেবের ইচ্ছা করছে কিছুটা সময় নিবারণের সঙ্গে থাকেন। সেই ইচ্ছা তিনি দমন করলেন। নিবারণ এসেছে একা একা থাকার জন্য, তাকে একা থাকতে দেওয়া উচিত। তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন। নিবারণ একা একা ঘুরতে লাগল। দুপুরের দিকে মিলিটারি তাকে নদীর পাড় থেকে ডেকে নিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন সাহেব নিবারণের অনেক নাম শুনেছেন। তাঁর গান শুনতে চান।

ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেত নিবারণের গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তার আফসোস হলো যে, সঙ্গে ক্যাসেট প্লেয়ার নেই। ক্যাসেট প্লেয়ার থাকলে গানটা রেকর্ড করা যেত। ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন, যে গানটা গেয়েছ সেটা আবার গাও। এটা কী ধরনের গান ?

নিবারণ বলল, এরে বলে কাটা বিচ্ছেদের গান। উকিল মুনশির কাটা বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ কইলজা কাটে।

ক্যাপ্টেন সাহেব বাংলা জানেন না। নিবারণের কথা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছেন নীলগঞ্জ স্কুলের শিক্ষক ছগীর সাহেব। ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে ছগীর উদ্দিনের ভালো সখ্যতা হয়েছে। তিনিও প্রায়ই ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে

দাবা খেলতে আসেন। ক্যাপ্টেন সাহেব দাবায় তেমন পারদর্শী না। ছগীর উদ্দিন ইচ্ছা করে ভুল খেলে হেরে যান। কারণ তিনি জানেন দাবায় হারলে মেজাজ খারাপ হয়। তিনি বুদ্ধিমান মানুষ। মিলিটারির মেজাজ খারাপ হয়— এমন কাজ তিনি করবেন না।

নিবারণ গান ধরল,

শোয়া চান পাখি
আমি ডাকিতাছি
তুমি ঘুমাইছ না কি ?

গানের কথাগুলি ছগীর উদ্দিন অনুবাদ করে দিচ্ছেন—

Oh my lying bird
I am calling you
Why you are not responding ?

ক্যাপ্টেন বাসেত নিবারণকে কফি খাওয়ালেন। তার সঙ্গে ছগীর উদ্দিনের মাধ্যমে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলেন।

তুমি হিন্দু ?

জি জনাব, আমি হিন্দু। আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

হিন্দু হওয়া কোনো অপরাধ না। ক্ষমার প্রশ্ন আসছে না। মুসলমানের মধ্যে যেমন ভালো-মন্দ আছে, হিন্দুর মধ্যেও তেমন আছে।

জনাব আপনার কথা শুনে আনন্দ পেয়েছি।

আমিও তোমার গান শুনে আনন্দ পেয়েছি। তোমাকে একটা প্রশংসাপত্র লিখে দিচ্ছি। বিপদে পড়লে এই প্রশংসাপত্র দেখালে ছাড়া পাবে।

জনাব আপনার অনেক দয়া।

দয়া-টয়া কিছু না, আমি গুণের কদর করি।

অন্তরে দয়া না থাকলে কেউ গুণের কদর করতে পারে না।

ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেত একটা প্রশংসাপত্র লিখে নিবারণকে দিলেন। যে কলম দিয়ে প্রশংসাপত্র লেখা হয়েছে সেই কলমটাও দিলেন। নিবারণ তার বিশেষ ভঙ্গিমায় ক্যাপ্টেন সাহেবকে প্রণাম করল। প্রণামের বিশেষ ভঙ্গিটাও ক্যাপ্টেন সাহেবের ভালো লাগল। ছবি তুলে রাখলে দেশে ফিরে দেখানো যেত।

ইরতাজউদ্দিনের বাড়ির উঠানে হারুন মাঝি উবু হয়ে বসে বিড়ি টানছে। হারুন মাঝির সঙ্গে আছে তার দীর্ঘদিনের সহচর কালা মিয়া। কালা মিয়াকে দেখলে দুবলা-পাতলা মানুষ বলে ভুল হতে পারে, তবে তার ক্ষিপ্রতা গোখড়া সাপের

মতো। হারুন মাঝিও বিড়ি টানছে। সে বসেছে ওস্তাদের দিকে পেছন ফিরে। ওস্তাদের সামনে বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার মতো বেয়াদবি সে করতে পারবে না। ইরতাজউদ্দিন বাড়িতে ছিলেন না। তিনি শেখেরহাট গিয়েছিলেন কমলার ছেলের জন্যে তালমিছরি কিনতে। বাচ্চাটার বুকে প্রায়ই কফ জমে। তালমিছরি খেলে কফের দখল কিছু কমে।

বাড়ি ফিরে এই দুইজনকে বসে থাকতে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। হারুন মাঝি এবং কালা মিয়া দু'জনেই অতি দ্রুত তাদের বিড়ি ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ইরতাজউদ্দিন বললেন, ব্যাপার কী?

হারুন মাঝি বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, আপনার কাছে একটা আবদার।

কী আবদার?

ওসি সাহেবের ছেলের জন্যে একটা স্বর্ণের চেইন আনছি। চেইনটা গলায় পরাব।

তোর চুরি-ডাকাতির চেইন গলায় পরাবি কী জন্যে? এটা কেমন কথা?

হারুন মাঝি বিব্রত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাতে লাগল। চুরি-ডাকাতির চেইন ব্যাপারটা সত্যি। ডাকাতির জিনিসপত্র কিছুই সে সঙ্গে রাখে না। এই চেইনটা কীভাবে যেন ছিল।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, উঠানে বসে থাকবি না। বাড়িতে যা।

বাড়িঘর কি আমরার আছে যে বাড়িতে যাব? ওসি সাবের ছেলেটারে একটু আইন্যা দেন। দেখি বাপের মতো চেহারা হইছে কি না। তার বাপ ছিল বিরাট সাবাসি মানুষ। কইলজা ছিল বাঘের। উনারে মাইরা ফেলছে— এইটা মনে হইলেই রাগে শইল কাপে। ওসি সাহেবের ইসতিরি আর ছেলেরে যে আপনে নিজের কাছে আইন্যা রাখছেন— এইটা বিরাট কাজ করছেন। আপনে বেহেশতে যাইবেন এই কারণে।

আমার বেহেশতে যাওয়া নিয়া তোর মীমাংসা দিতে হবে না।

হারুন মাঝি বলল, ওসি সাহেবের পুলাটারে একটু আনেন। দূর থাইক্যা দেখি বাপকা বেটা হইছে কি না।

ইরতাজউদ্দিন ছেলে কোলে নিয়ে বের হলেন। হারুন মাঝি আগ্রহ করে হাত বাড়াল। এই দুর্ধর্ষ ডাকাতের হাতে ছেলে তুলে দিতে ইরতাজউদ্দিনের মন সায় দিচ্ছে না। কিন্তু ডাকাতটা এত আগ্রহ করে হাত বাড়িয়েছে! ইরতাজউদ্দিন ছেলেকে হারুন মাঝির হাতে দিলেন।

মৌলানা সাব ছেলের নাম কী?

নাম রাখা হয় নাই।

হারুন মাঝি আনন্দের সঙ্গে বলল, দেখেন দেখেন আমারে কেমন চোখ পিটপিটাইয়া দেখতাছে। ঐ ব্যাটা, কী দেখস ? তোর পিতা আমারে ধরছিল। সে বিরাট সাবাসি মানুষ ছিল। তুইও তোর বাপের মতো সাবাসি হইবি, মেনা গরু হইবি না।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, অনেক হয়েছে, এখন তারে দেও মার কোলে দিয়া আসি। ছোট শিশুদের কখনোই অধিকক্ষণ মায়ের কোল ছাড়া করতে নাই।

হারুন মাঝি ছেলে ফেরত দিয়ে ইরতাজউদ্দিনকে কদমবুসি করে বিদায় হলো। ইরতাজউদ্দিন কমলার হাতে ছেলেকে তুলে দেবার সময় দেখলেন, ছেলের গলায় সোনার চেইন চকচক করছে। তিনি খুবই বিরক্ত হলেন।

নীলগঞ্জে ফকির বাড়ির সামনে দু'জন মিলিটারি। তারা গ্রাম পরিদর্শনে বের হয়েছে। ফকির বাড়িতে তাদের ডাব খেতে দেয়া হয়েছে। ডাব খাওয়া শেষ হবার পর তারা মহানন্দে ডাবের শাঁস খাচ্ছে। লোকজন একটু দূর থেকে ভীত চোখে তাদের দেখছে। ফকির বাড়ির মেজ ছেলে আরো ডাব কাটছে। ডাবের পানি ফেলে দিয়ে শুধু শাঁস বের করে প্লেটে রাখা হচ্ছে।

ডাবের শাঁস খাওয়ার এই দৃশ্যটা হারুন মাঝি এবং তার সঙ্গী কালা মিয়া ধান খেতের আড়াল থেকে দেখল। হারুন মাঝি বলল, অলংগা* দিয়া এই দুইটারে বিনতে পারবি ?

কালা বলল, একটারে পারব।

হারুন মাঝি বলল, তুই একটারে আমি একটারে।

কালা মিয়া বলল, বাদ দেন।

হারুন মাঝি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আচ্ছা যা বাদ। তাছাড়া অলংগাও নাই।

হারুন মাঝি মাথা নিচু করে ধান খেতের আল বেয়ে এগুচ্ছে। হঠাৎ সে তার মত পরিবর্তন করল। অলংগা সঙ্গে নেই এটা সত্যি, তবে অলংগা জোগাড় করা কোনো সমস্যাই না। মিলিটারি দু'টা ডাব খেয়ে নিশ্চিত মনে হাঁটতে হাঁটতে নীলগঞ্জ হাইস্কুলের দিকে যাবে। তাদের যেতে হবে বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে। তখন পিছন থেকে অলংগার ঘা দিলে আর দেখতে হবে না। এদের সঙ্গে ভালো বন্দুক আছে। বন্দুক দু'টা কব্জা করা যাবে। ডাকাতির সুবিধা হবে। এই সময় তার হাত খালি। রামদা ছাড়া অস্ত্রপাতি কিছুই নাই। মিলিটারিদের এইসব বন্দুক কীভাবে চালাতে হয়— তা অবশ্য জানা নাই। সেটা শেখা যাবে। সব বন্দুকই একরকম। গোড়ায় চাপ দিলে গুলি।

**অলংগা : বর্শা। তালগাছের কাঠ দিয়ে এই বর্শা বানানো হয়।*

কালা মিয়া!

হঁ।

চল্ অলংগার জোগাড় দেখি।

কালা মিয়া ওস্তাদের দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, চলেন।

দুপুর তিনটায় ক্যাপ্টেন বাসেতকে ঘুম থেকে তুলে বলা হলো, সেনাবাহিনীর দু'জন সদস্যকে গ্রামের লোকজন বর্শা বিঁধিয়ে মেরে ফেলেছে।

সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে নীলগঞ্জের এক-তৃতীয়াংশ বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হলো। সর্বমোট আটত্রিশ জন মানুষকে গুলি করে মারা হলো। এর মধ্যে গাতক নিবারণও আছে। তার হাতে ক্যাপ্টেন বাসেত সাহেবের লেখা প্রশংসাপত্র। সেই প্রশংসাপত্রেও কাজ হলো না।

রাত এগারোটায় ক্যাপ্টেন বাসেত হতভম্ব হয়ে গেলেন, কারণ জঙ্গলে ঢাকা দক্ষিণ দিক থেকে নীলগঞ্জ হাইস্কুল লক্ষ্য করে কারা যেন গুলি করছে। এতটা সাহস বাঙ্গালি কুত্তাদের হবে— তা তাঁর ধারণাতেও ছিল না। তাঁর ধারণাতে ভুল ছিল। হারুন মাঝির সাহসের সঙ্গে তিনি পরিচিত না। হারুন মাঝি জঙ্গলের দিক থেকে গুলি করছে মিলিটারি বন্দুক কী করে চালাতে হয় এটা শেখার জন্যে। তার পরিকল্পনা ভিন্ন। সে গুলি করবে খুব কাছ থেকে। ডাকাত কখনো দূর থেকে গুলি করে না। তারা গুলি করে খুব কাছে থেকে।

ভোর ছ'টা। প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে হারুন মাঝি তার সঙ্গী কালা মিয়াকে নিয়ে নীলগঞ্জ হাইস্কুলের দিকে এগুচ্ছে। কালা মিয়া বলল, ওস্তাদ বিড়িতে টান দিতে পারলে হইত। হারুন মাঝি বলল, বৃষ্টির মধ্যে বিড়ি ধরাইবি ক্যামনে ? কালা মিয়া হতাশ গলায় বলল, সেইটাও একটা বিবেচনা।

হারুন মাঝি ভয় একেবারেই পাচ্ছে না কিন্তু তার গা ছমছম করছে। তার মনে হচ্ছে, তারা মানুষ দু'জন না। তিনজন। নীলগঞ্জ থানার ওসি ছদরুল আমিনও তাদের সঙ্গে আছে। তবে ওসি সাহেবকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হারুন মাঝি জানে এই সবই মনের ধান্ধা। মন অনেক ধান্ধাবাজি করে। তারপরেও সে ওসি সাহেবকে মন থেকে দূর করতে পারছে না। এই বিষয়টা নিয়ে কালা মিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারলে হতো। কথা বলা ঠিক হবে না। কালা মিয়া প্রচণ্ড সাহসী কিন্তু সে ভূত-প্রেত ভয় পায়।

নীলগঞ্জ থেকে ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেতের তার মা'কে লেখা (তারিখবিহীন) চিঠি।

আমার অনেক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার
মা,

আসসালাম। মা, মেজর সফদর জামিলের মাধ্যমে পাঠানো আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনি যে কিসমিস ও চিলগোজা পাঠাইয়াছেন তাহাও পাইয়াছি। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমি ভালো আছি। আমাকে নিয়া দুশ্চিন্তার কোনোই কারণ নাই। দুষ্ট বাঙালিদের আমরা শায়েস্তা করিয়াছি। অল্পকিছু ইন্ডিয়ার দালাল বিভিন্ন স্থানে উৎপাতের চেষ্টা করে। তবে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে তারাও কুকুরের মতো লেজ গুটাইয়া পালাইতেছে। সেই দিন আর দূরে নাই যেদিন পূর্ব পাকিস্তান হইতে সমস্ত কুকুরকে আমরা জাহান্নামে পাঠাইব।

বর্তমানে আমার পোস্টিং নীলগঞ্জে। আমি মোটামুটিভাবে এই পোস্টিং-এ ভালো আছি। অত্র এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। ইহাতে আমাদের কিছু লোকক্ষয় হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ সঙ্গত কারণেই বহুগুণে বেশি।

আমাদের প্রচলিত ধারণা বাঙ্গালি সাহসী না। এই ধারণা সঠিক না। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মাত্র দুইজনের একটা ক্ষুদ্র দল অতর্কিতে আমাদের ক্যাম্পে ঢুকিয়া পড়ে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে হত্যা করা। তারা সেই কাজ করিতে পারে নাই, তবে আমাদের কিছু ক্ষতি করিয়াছে।

আপনি কোনো চিন্তা করিবেন না। পরদিন দুপুরেই রিএনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সাবধান।

মা, এখন আপনাকে একটা জরুরি বিষয় বলি। জেনারেল বেগের সঙ্গে আপনার ভালো পরিচয় আছে। আমি যতদূর জানি উনার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তাও আছে। আপনি উনার মাধ্যমে আমাদের কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল গুল হাসানকে অনুরোধ করাইবেন যেন আমি দেশে ফিরিয়া আসিতে পারি। আপনি মনে করিবেন না যে, আমি ভীত বলিয়া দেশে ফিরিতে চাইতেছি। আমি মোটেই ভীত নেই। দেশে ফিরিতে চাইবার প্রধান কারণ— এইখানে আমার স্বাস্থ্য টিকিতেছে না।

অতি জঘন্য এই দেশ। শুকনায় থাকে সাপ। পানিতে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর এক প্রাণী, তার নাম জোঁক। এই জোঁকের প্রধান খাদ্য মানুষের রক্ত।

রাইফেলের সাহায্যে শত্রুর মোকাবেলা সম্ভব কিন্তু জোঁকের বা সাপের মোকাবেলা সম্ভব না।

মা, আপনি যেভাবে পারেন আমাকে ওয়েস্টার্ন কমান্ডে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা নিবেন। আমার বড় চাচি হয়তো এই বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করিতে পারেন। বড় চাচিকে আমার সালাম। বোন রেহনুমাকে আমার আদর ও স্নেহ। তাহার বিবাহের দিন কি ধার্য হইয়াছে ?

মা, আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। কিছুদিন হইল মন এবং শরীর কোনোটাই ভালো যাইতেছে না।

ইতি

আপনার আদরের ছোট ছেলে

ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : অষ্টম খণ্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়

যতিন্দ্রনাথ মণ্ডল
গ্রাম : শশীদ
ডাকঘর : মৌশাণী
থানা : স্বরূপকাঠি
জেলা : বরিশাল

১৭ই বৈশাখ পাকবাহিনী গান বোট নিয়ে ঝালকাঠি দিয়ে কাটাখালী নদী দিয়ে শশীদের হাটে আসে। তারা এসে হাটের পাশে গান বোট রেখে গ্রামের উপর নেমে পড়ে। পাকবাহিনী গ্রামের ভেতর প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের নারী-পুরুষ প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে চেষ্টা করে। পাকবাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে প্রথমে দামি দামি জিনিসপত্র লুঠতরাজ করে এবং পরে ৯ খানা বাড়ি অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে দেয়। ঐ দিন ২জন লোককে তারা গুলি করে। এদের একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় আর একজন গুরুতর রূপে আহত হয়।

২৬শে বৈশাখ পাকবাহিনী ও রাজাকাররা পুনরায় আমাদের গ্রামে আসে। তারা গান বোট ও স্পিড বোট নিয়ে ছোট খাল দিয়ে গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ে। মতিলাল দেবনাথ (ব্যানার্জী) ও হিরালাল দেবনাথের কাপড়ের দোকান লুঠ করে স্পিড বোট বোঝাই করে কাপড় নিয়ে যায়। এই সময় মতিলাল দেবনাথের কাছ থেকে নগদ ১২০০০ হাজার টাকা নেয় এবং তাকে বেয়োনেট চার্জ করে পরে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এইদিন আমাদের গ্রামের ১৮জন লোককে পাকবাহিনী গুলি করে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এর মধ্যে জিতেন নামে

একজনকে পাক বর্বর বাহিনী নারিকেল গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে তার পায়ের কাছে খড়কুটা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার সারা শরীরে আগুন ধরে গেলে সে ভীষণভাবে চিৎকার করতে থাকে, তখন পাক বর্বর বাহিনী গুলি করে তার মাথার অর্ধেক অংশ উড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনা তার স্ত্রীর সম্মুখে হয়। কেননা পাকবাহিনী তার স্ত্রীকে ধরে এনে তার সম্মুখে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই সময় 'ক্ষীরদা সুন্দরী' নাম্নি এক বিধবা মেয়েকে পাকবাহিনী সারা শরীর বেয়োনেট নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এইসময় আর এক মহিলা পাশের জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে ছিল তার ছোট ১ ছেলে ও ১ মেয়েকে নিয়ে। পাকবাহিনী তাদের লক্ষ করে গুলি ছুড়লে এক গুলিতে ছেলে, মেয়েসহ তিনজনই মারা যায়।

ঐ দিন আমাদের গ্রামের মোট চারখানা বাড়ি বাদে আর সব বাড়ি অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে দেয়।

৫ই জ্যৈষ্ঠ পাকবাহিনী ঝালকাঠি থেকে গান বোট নিয়ে পুনরায় শশীদ হাটে আসে এবং হাটের উপর ক্যাম্প স্থাপন করে। ঐ দিনই পাকবাহিনী আমাদের গ্রাম থেকে ২জন লোককে হত্যা করে। তার মধ্যে একজন ছিল স্থানীয় স্কুলের সেক্রেটারি কালী কান্ত মণ্ডল। এইসময় পাকবাহিনী স্কুলের লাইব্রেরি লুট করে এবং ভেঙেচুরে সব তছনছ করে দেয়। এবং লাইব্রেরির ভেতরে ছাত্রদের দেওয়া রিলিফের গম পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই গমের আগুন নেভাতে গিয়েই সেক্রেটারি সাহেব গুলি খান।

পাকবাহিনী এই সময় ১০ দিন শশীদ হাটে ক্যাম্প করে থাকে। এই সময় তারা ব্যাপক হারে নারী ধর্ষণ করে। একমাত্র আমাদের গ্রামে অনেক মেয়েকে পাকবাহিনী ধর্ষণ করে। পাকবাহিনী রাত্রিতে গ্রামের ভেতর ঢুকে মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং কিছু কিছু মেয়েকে তারা ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং এক একজনের উপর পর পর কয়েকজন পাক পশু ধর্ষণ করে। এই সময় ১১ বৎসরের একটা ছোট মেয়েকে পাকবাহিনী তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং একাধারে তার উপর চলে পাশবিক অত্যাচার। পাকবাহিনী চলে যাবার পর এই মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। ৩ মাস পর্যন্ত এই ছোট মেয়েটি হাঁটতে পারত না।

৮ মাসের গর্ভবতী একটি মেয়ের উপর পাকবাহিনী এই সময় অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার চালায়, যার দরুন সন্তান

প্রসব করার পর সে ও সন্তান মারা যায়।

২৫শে শ্রাবণ পাকবাহিনী দালালের সহযোগিতায় ঝালকাঠি থেকে গান বোট নিয়ে শঙ্কর ধবল গ্রামে আসে এবং আছমত আলী ও রহিনী মিস্ত্রিকে ধরে নিয়ে শশীদ গ্রামে আসে এবং সুনীল সরকার নামে একটা ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে। এই সময় খুব বৃষ্টি নেমে পড়ে। পাকবাহিনী তখন রহিনী কুমার মণ্ডলের ঘরে আশ্রয় নেয়। এবং হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা নিয়ে খুব গান-বাজনা করে এবং কলা খায়। বৃষ্টি শেষে যাবার সময় গৃহকর্তা রহিনী কুমার মণ্ডলকে গুলি করে হত্যা করে। যে দুইজন লোককে তারা বন্দি করে আনে, তাদের একজনকে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয় এবং একজনকে শশীদ হাটে বসে গুলি করে হত্যা করে। তাকে হত্যা করার আগে খুব মারপিট করে এবং খুব গালাগালি দেয়। যাকে এইসময় ছেড়ে দেয় তাকে বলে দেয় তোমরা 'জয় বাংলা' বলতে পারবে না, বলবে 'জয় পাকিস্তান'।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বরূপকাঠি থানার অশ্বত্থকাঠি, জিনহার, মাদ্রা, পূর্বজলা বাড়ি, মৌশানী, জুলুহার, আতা, জামুয়া, জৌসার, গণপতিকাঠি, আরামকাঠি প্রভৃতি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। এই সময় বহু লোককে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। এই সময় মাদ্রা গ্রাম থেকে দুইজন লোককে কুঠার দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের অপরাধ ছিল পাকসৈন্য যখন একটা মেয়েকে ধর্ষণ করার জন্য যায়, তখন তারা দুইজন বাধা দেয়। এই সময় তারা বহু মেয়েকে ধর্ষণ করে। একমাত্র স্বরূপকাঠি থানাতেই ১০০০ হাজারের বেশি মেয়েকে পাকবাহিনী ধর্ষণ করেছে।

বিভিন্ন সময় আমাদের থানাতে প্রায় ২০০/৩০০ লোককে পাকবাহিনী হত্যা করে। স্বাধীনতার পর আটঘর কুড়িয়ানা স্কুল-ঘরের পেছনে একটা পুকুরের ভেতর থেকে ১৫৬টা মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়।

পাকবাহিনী স্বরূপকাঠি দখল করার পর স্বরূপকাঠি, কুড়িয়ানা, শশীদ, বাউকাঠি, জলাবাড়ি— এইসব জায়গায় ক্যাম্প স্থাপন করে এবং এখান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন চালায়। জলাবাড়ি ক্যাম্প অঞ্চলে ৩৩টা গ্রাম শুধু হিন্দু বসতি ছিল, পাকবাহিনী সব গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

স্বাক্ষর/-

যতিন্দ্রনাথ মণ্ডল

আলেয়া বেগম
গ্রাম : বাঘেরিয়া
ডাকঘর : সোনাগাজী
জেলা : নোয়াখালী

পাকবাহিনী সোনাগাজী ও মতিগঞ্জে শিবির স্থাপন করিয়া স্থানীয় দালাল ও রাজাকারদের সহায়তায় শিবিরের আশেপাশের গ্রামগুলি আক্রমণ করিত। হঠাৎ গ্রামে প্রবেশ করিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিত এবং অসহায় নারীদের উপর চালাইত নির্মম অত্যাচার। পাকবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে উক্ত এলাকার প্রায় সকল যুবক, যুবতীগণ নিজ বাড়ি ছাড়িয়া কেহ ভারতে এবং অন্যেরা সুদূর গ্রামে আত্মীয় পরিজনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

জুন মাসে পাকবাহিনী সোনাগাজী দখল করিলে আমি আমার স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করিয়া সুদূর পল্লীর গ্রামে পলাইয়া ছিলাম। আগস্ট মাসে আমি নবজাত সন্তান প্রসব করি। সন্তান প্রসবের দুই মাস পর শরীর অসুস্থ থাকায় পিতার বাড়ি হইতে স্বামীর বাড়ি বাঘেরিয়ায় আশ্রয় নেই। তখন আমার স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্বল ছিল। আমি তখন নিয়মিত ডাক্তারের ওষুধ ব্যবহার করিতাম।

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পাকবাহিনী, দালাল, রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসের অত্যাচার খুব বৃদ্ধি পায়, পাকবাহিনী গ্রামে প্রবেশ করার সংবাদ পাইলেই গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে আত্মগোপন করিতাম। নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে পাকবাহিনী ও মিলিশিয়া আমার স্বামীর বাড়ি আক্রমণ করে। পাকবাহিনীরা আমাকে ধরিয়া ফেলে এবং হাত হইতে আমার নবজাত সন্তানকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেখানেই নির্মমভাবে পশুর মতো অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচারে আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। অনুমান ৪/৫ জন নরপশু আমার অসুস্থ দেহের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া আমাকে জ্ঞানহীন অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যায়। পরে আমার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন স্থানীয় ডাক্তারের সহায়তায় আমার জ্ঞান ফিরাইয়া আনে।

স্বাক্ষর/-
আলেয়া বেগম

ডা. আব্দুল লতিফ

গ্রাম : ছিরামিসি

থানা : বিশ্বনাথ

জেলা : সিলেট

৩১শে আগস্ট রোজ মঙ্গলবার সময় সকাল ৯ ঘটিকার সময় অনুমানিক ১৫জন পাক সৈন্য ও সমপরিমাণ রাজাকার ছিরামিসি বাজারে আসে। তাহার পূর্বে ঐ বাজারে পাক সৈন্য আর আসে নাই। রাজাকার কমান্ডার স্কুলের শিক্ষক, পোস্ট অফিস ও তহ্শিল অফিসের কর্মরত লোকজন সকলকে ছিরামিসি হাই স্কুলে যাইবার জন্য আদেশ দিল। সেখানে শান্তিকমিটি গঠন করা হইবে। নিরীহ জনগণ ভয়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইল। কয়েক মিনিট আলাপ-আলোচনার পর পাক বাহিনী ছিরামিসি এলাকার লোকদিগকে একদিকে এবং সরকারি কর্মচারী ও বাহির হইতে আগত লোকদের অপর পার্শ্বে বসাইল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে দুইভাগে দুই জায়গায় নিয়া যায়। আমি ঐ জায়গায় প্রায় ৭ বৎসর যাবৎ ডাক্তারি করিতেছি। সরকারি কর্মচারীসহ আমাদের বহিরাগত ২৬ জনকে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিসে নিয়া শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে এবং আমাদিগকে পার্শ্ববর্তী থানা জগন্নাথপুর নিয়া ছাড়িয়া দিবে বলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া নৌকায় লইয়া যায়। অপর দিকে ছিরামিসি গ্রাম ও বাজারের ৩৭ জনকেও বাঁধিয়া অপর গ্রামের দিকে নিয়া যায়। আমাদের ২৬জনকে নৌকা যোগে কচরাকেলী গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে আমাদিগকে পুকুরের পাড়ে কিছু পানির মধ্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। ঐ সময় আমাদের হাত পেছনের দিকে শক্তভাবে বাঁধা ছিল। দুইদিক হইতে পাকবাহিনী ও রাজাকার গুলি করিতে থাকে। আমি হাতে ও পায়ে গুলিবিদ্ধ হইয়া পুকুরের পানিতে ডুব দেই। বহুকষ্টে পুকুরের অপর পাড়ে গাছের আড়ালে আশ্রয় নেই। কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর আমি সেখান হইতে আবার পুকুরের অপর পাড়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শহিদ লোকদের পার্শ্বে আসি। সেখানে প্রত্যেককে ভালোভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখি সকলেই নরপিশাচদের গুলিতে শাহাদৎ বরণ করিয়াছে। অপরদিকে ছিরামিসি এলাকার ৩৭জনকে মাঠে নিয়া অনুরূপ অবস্থায় গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। আমি আহত অবস্থায় অপর গ্রামে গিয়া আশ্রয় নেই। সেইদিন যাহারা শহিদ হইয়াছেন তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

আব্দুল বারিক মেম্বার, আব্দুল লতিফ, সুন্দর মিঞা, তহশীলদার ও তাহার দুই ছেলে, পোস্টমাস্টার ছিরামিসি বাজার, ছিরামিসি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, ছিরামিসি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক একজন, নজীর আহমদ, একলাস মিঞা, মজীদ উল্লা, দবীর মিঞা, রুসমত উল্লাহ, তৈয়ুব আলী, মোসাদ্দের আলী ও অন্যান্য। ৩১শে আগস্ট পাকবাহিনী ও তাহাদের অনুচরগণ ৬৩জন নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। ১লা সেপ্টেম্বর ছিরামিসি বাজার ও গ্রাম জ্বালাইয়া দেয় ও মা-বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে।

স্বাক্ষর/-
আবদুল লতিফ

মোছাঃ চানুভান
গ্রাম : ফুলবাড়িয়া
থানা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
জেলা : কুমিল্লা

আমি দরিদ্র পিতৃহীন অবিবাহিতা নারী। বিধবা মাতা একমাত্র সংসারের আপন পরিজন। আমার কোনো ভাইবোন নাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইলে পাকবাহিনী পত্তন ইউনিয়নে শিবির স্থাপন করে। জুন মাসের শেষের দিকে পাক সৈন্য ও রাজাকারদের অত্যাচার ও নৃশংসতা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় রাজাকাররা গ্রামের ও ইউনিয়নের বহু ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে। জুলাই মাসের ১৭ তারিখ বানু মিঞা, সোনা মিঞা ও চাঁদ মিঞা গভীর রাত্রে আমার নিজ বাড়ি হইতে ধরিয়া লইয়া পাকবাহিনীর শিবিরে নিয়া যায়। আমাকে দেখিয়া পাকবাহিনীরা আনন্দে নাচিয়া উঠে, আমার ক্রন্দন তাহাদের প্রাণে একটুও মায়ার সঞ্চার করে নাই। রাজাকাররা ধরিয়া নিবার সময় তাহাদের নিকট বহু আকুতি মিনতি ও পায়ে জড়াইয়া পড়িয়াছি। উক্ত রাজাকারদের নিকট আমি যতই ক্রন্দন করিয়াছি, রাজাকারগুলি আমার সহিত তত বেশি অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছে।

পাঁচদিন পাক নরপিশাচরা আমাকে তাহাদের শিবিরে ও বাঙ্কারে আটকাইয়া রাখে ও আমার দুর্বল দেহের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে ও মুক্তিবাহিনীর সংবাদ জানি কি-না জিজ্ঞাসা

করে। আমি মুক্তিবাহিনীর সম্বন্ধে জানি না বলিলে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করে। এই পাঁচদিন তাহারা আমাকে গোসল করিতে পর্যন্ত দেয় নাই।

আমাকে ধরিয়া দিবার পরিবর্তে রাজাকারগণ পাক নরপিশাচদের হইতে প্রচুর মদ ও গ্রামে গ্রামে লুণ্ঠন করার অনুমতি পাইয়াছিল। সৈন্যদের অত্যাচারে বহুবার আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেও দেখি ও অনুভব করি আমার দুর্বল শরীরে অত্যাচার করিতেছে। সেই কথা ভাবিতে আজো আমার ভয় হয়।

আমাকে ১৭ জুলাই রাত্রে রাজাকাররা ধরিয়া নিবার পর ১৮ জুলাই আমার মা কেসবপুর গ্রামে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার নজীর আহমদ সাহেবের নিকট আমাকে পাক শিবিরে ধরিয়া নিবার করুণ সংবাদ বলিলে উক্ত মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ২১ জুলাই গভীর রাত্রে বহু মুক্তিযোদ্ধা নিয়া ফুলবাড়িয়া পাক সৈন্যদের শিবির ও বাঙ্কার আক্রমণ করেন। হঠাৎ আক্রমণে পাকবাহিনী ও রাজাকাররা আত্মসমর্পণ করে। আক্রমণের সময় তাহারা সকলে আমার উপর অত্যাচার করিতেছিল। মুক্তিযোদ্ধা ভাইরা আমাকেসহ ১৪জন সৈন্য ও তিনজন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়া যান। তাহারা আমার সম্মুখে রাজাকার ও পাক নরপিশাচদের জীবন্ত মাটি চাপা দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি ত্রিপুরা রাজ্য হইতে নিজ জন্মভূমি ফুলবাড়িয়া ফিরিয়া আসি।

স্বাক্ষর/-

মোছাঃ চানুভান

রাত দশটা।

তুমুল বর্ষণ হচ্ছে। নাইমুল অতিতবাড়ি স্কুলের অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার তালেবুর রহমান সাহেবের বাড়ির উঠানে। টিনের চালের একপ্রান্ত থেকে প্রবলবেগে বৃষ্টির পানি নেমে আসছে। নাইমুল এই পানিতে গোসল সারছে। বৃষ্টির পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা। নাইমুলের শরীর কাঁপছে কিন্তু গোসল শেষ না করে উঠতে ইচ্ছা করছে না।

তালেব সাহেব একটা শুকনা গামছা এবং ধোয়া লুঙ্গি নিয়ে বারান্দায় অপেক্ষা করছেন। তালেব সাহেবের পাশে তার বড়মেয়ে চাঁপা। চাঁপা নাইনে পড়ে। চাঁপার হাতে একটা হারিকেন। চাঁপার মা আমেনা বেগমও কিছুক্ষণ স্নানের দৃশ্য দেখেছেন। এখন তিনি গেছেন রান্নার আয়োজনে। ঘরে কিছুই নেই। অতি দ্রুত কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। ডিমের তরকারি, বেগুনভাজি, মাষকলাইয়ের ডাল। খোয়াড়ে মুরগি আছে। মুরগির মাংস করতে পারলে ভালো হতো। সন্ধ্যার পর মুরগি জবেহ্ করা নিষেধ বলেই মুরগি জবেহ্ করা যাচ্ছে না।

যে মানুষটা গোসল করছে, সে কোনো সাধারণ মানুষ না। সে মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ শুরু করেছে— স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে এরকম খবর পাওয়া গেলেও তালেব সাহেবের পরিবার এই প্রথম চোখের সামনে মুক্তিযোদ্ধা দেখছে। কী সুন্দর চেহারা! দেখেই মনে হয় বড় ঘরের সন্তান। পথে পথে ঘুরছে।

তালেব সাহেব বললেন, আপনার সাবান লাগবে? ঘরে সাবান আছে।

নাইমুল বলল, সাবান লাগবে না।

বৃষ্টির পানি ঠাণ্ডা না?

বেশ ঠাণ্ডা।

তাহলে বেশিক্ষণ থাকবেন না। উঠে পড়েন।

নাইমুল বলল, আরেকটু থাকি।

তালেব সাহেব বললেন, আপনার জন্যে একটু চা করতে বলব ? ঘরে চায়ের ব্যবস্থা আছে। গুড়ের চা। রান্না হতে সামান্য বিলম্ব হবে। গোসল সেরে চা খান। ভালো লাগবে।

চা দিতে বলুন।

চাঁপা দৌড়ে তার মা'কে চায়ের কথা বলতে গেল। সে একটা মুহূর্তের জন্যেও মানুষটাকে চোখের আড়াল করতে চাচ্ছে না। তাদের বাড়িতে একজন মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র হাতে উঠে এসেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মানুষটার প্রতিটা কথা সে খুব মন দিয়ে শুনতে চায়।

তালেব মাস্টার বললেন, কিছু মনে করবেন না, আপনার দলের আর লোকজন কোথায় ?

আমার দলে আর লোক নেই। আমি একাই একটা দল করেছি। দলের নাম বললে আপনি হয়তো চিনবেন। আমার দলের নাম হাছুইন্যার দল। ইংরেজিতে হাছুইন্যা গ্রুপ।

তালেব মাস্টার চমকে মেয়ের দিকে তাকালেন। হাছুইন্যার দলের অসীম সাহসী কর্মকাণ্ডের খবর এই অঞ্চলের সবাই জানে। এই মানুষটা হাছুইন্যা ?

নাইমুল বলল, নামটা ভালো হয়েছে না ? হাছুন অর্থ ঝাড়ু। হাছুইন্যার দল ঝাড়ু মেরে দেশ থেকে মিলিটারি তাড়াবে।

চাঁপা হেসে ফেলল। মানুষটার কথা তার এত মজা লাগছে! সে চট করে হাসি থামিয়েও ফেলল। হাছুইন্যার দলের হাছুইন্যা অবাক হয়ে এখন তাকে দেখছে। তার খুব লজ্জা লাগছে। সে চা আনতে রান্নাঘরে চলে গেল। গোসল যে করছে এই মানুষটাই বিখ্যাত হাছুইন্যা— এই খবর মা'কে দিতে হবে।

চাঁপার হাসি শুনে কিছুক্ষণের জন্যে নাইমুল বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল মরিয়ম হাসছে। হারিকেন হাতে মেয়েটির সঙ্গে মরিয়মের কোনো মিল নেই কিন্তু দু'জনের হাসির শব্দ এত কাছাকাছি!

আমেনা বেগম রান্না প্রায় সেরে ফেলেছেন। মাষকলাইয়ের ডালটা শুধু বাকি। ডাল সিদ্ধ হতে সময় লাগছে। স্বামী এবং কন্যার মতো তারও ইচ্ছা করছে অদ্ভুত মানুষটার আশেপাশে থাকতে। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। রান্নাঘর ছেড়ে যাওয়া যাবে না। ডাল ধরে যাবে। আয়োজন সামান্য, এর মধ্যে একটা যদি নষ্ট হয় বেচারা খাবে কীভাবে ? এরা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, আরাম করে একবেলা হয়তো খেতেই পারে না।

নাইমুল আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। তার এবং মাস্টার সাহেবের হাতে সিগারেট। মাস্টার সাহেব সিগারেট খান না। আজ একটা বিশেষ রাত, এই রাত

বারবার ঘুরেফিরে আসবে না। রাতটা স্মরণীয় করে রাখার জন্যেই একটা সিগারেট খাওয়া দরকার।

তালেব মাস্টার বললেন, চা খেতে খেতে গল্প করেন। আপনার কথা শুনি।

নাইমুল বলল, কী গল্প করব ?

যুদ্ধের গল্প করেন। কীভাবে যুদ্ধ করেন এইসব।

যুদ্ধের গল্প করতে ভালো লাগে না। অন্য গল্প করি ?

চাঁপা খুবই আগ্রহ নিয়ে বলল, জি জি করেন।

নাইমুল মজার কোনো গল্প মনে করার চেষ্টা করছে। গল্প মনে পড়ছে না। মজার কোনো গল্প শুনে যদি মেয়েটা হেসে দিত, তাহলে মরিয়মের হাসি আরেকবার শোনা যেত। নাইমুল চাঁপার দিকে তাকিয়ে গল্প শুরু করল।

শোন চাঁপা, একবার এক জীববিজ্ঞানী সুন্দর একটা গবেষণা করলেন। তিনি করলেন কী, বড় একটা অ্যাকুরিয়ামে দু'ধরনের মাছ রাখলেন। এক ধরনের মাছ বড় বড়, আরেক ধরনের মাছ ছোট। ছোট মাছগুলি বড় মাছের খাদ্য। তিনি করলেন কী, অ্যাকুরিয়ামের মাঝামাঝি কাচের একটা পার্টিশন দিয়ে দিলেন। এখন কী হলো শোন— বড় মাছগুলি ছোট মাছ দেখে খাবার জন্যে হা করে ছুটে আসে। এসেই এক সময় কাচের দেয়ালে ধাক্কা খায়। ছোট মাছ তারা আর খেতে পারে না। দিনের পর দিন এরকম চলল। তারপর তারা একসময় বুঝল— কোনো এক বিচিত্র কারণে ছোট মাছগুলিকে খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তারা ছোট মাছ খাবার চেষ্টা বন্ধ করে দিল। আর তখনই বিজ্ঞানী ভদ্রলোক কাচের পার্টিশন তুলে দিলেন। দু'ধরনের মাছই একসঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু বড় মাছগুলি ছোট মাছ খায় না। মুখের সামনে দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারা খাচ্ছে না। খাবার চেষ্টাও করছে না।

চাঁপা বলল, ও আল্লা! সত্যি ?

হ্যাঁ সত্যি। অ্যাকুরিয়াম থেকে কাচের পার্টিশন উঠে গেছে কিন্তু সেই পার্টিশন চলে গেছে বড় মাছগুলির মাথায়।

চাঁপা বলল, মাছের মাথায় কাচের পার্টিশন যাবে কীভাবে ?

নাইমুলের কাছে অদ্ভুত লাগছে কারণ মরিয়মও চাঁপার মতোই একই প্রশ্ন করেছিল— কাচের পার্টিশন মাছের মাথায় যাবে কীভাবে ? মেয়েটা শুধু যে মরিয়মের মতো হাসছে তা না, তার চিন্তা-ভাবনাও মরিয়মের মতো।

আমেনা বেগম দরজার ওপাশ থেকে বললেন, খাওয়া কি এখন দিব ? নাইমুল বলল, দিন। খুবই ক্ষুধার্ত। তালেব মাস্টার বললেন, আপনি খাওয়া-দাওয়া করে আরামে ঘুমান। বিছানা করে দিতেছি। আপনার ভয়ের কিছু নাই।

আমি ঘুমাব না। সারারাত জেগে থাকব। পাহারায় থাকব। চাঁপা বলল, আমিও জেগে থাকব।

নাইমুল বলল, কারো জেগে থাকতে হবে না। আমি আরামেই ঘুমাব। আমার ভয়-ডর একেবারেই নাই।

নাইমুল খেতে বসেছে। তালেব মাস্টারের পরিবার তাকে ঘিরে আছে। আমেনা বেগমের মন খারাপ লাগছে— ছেলেটা কী আগ্রহ করেই না খাচ্ছে! একটু ভালো আয়োজন যদি করা যেত! নাইমুল তালেব মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, চন্দ্রপুর এখান থেকে কত দূর ?

তালেব মাস্টার বললেন, দূর আছে। আপনি চন্দ্রপুর যাবেন ? চন্দ্রপুর কার কাছে যাবেন ?

নাইমুল জবাব দিল না। চন্দ্রপুর কার কাছে সে যাবে— এই তথ্য প্রকাশ করার কিছু না।

ভাত দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমেনা বেগমের বুক ধড়ফড় করছে। ভাতে টান পড়বে না তো ?

চন্দ্রপুরের পীর সাহেবকে তাঁর খাদেম এবং ভক্তরা ডাকে 'সুরমা বাবা'। তিনি চোখে সুরমা ছাড়া সারা গায়ে কোনো কাপড় পরেন না বলেই এই নাম। তিনি দিনরাত অন্ধকার একটা ঘরে থাকেন। ঘরের একটা মাত্র দরজা। সেই দরজা চটের ভারি পর্দায় ঢাকা থাকে। সেই ঘরে খাদেম ছাড়া অন্য কারো প্রবেশ নিষেধ। ভক্তরা বিশেষ চাপাচাপি করলে দর্শন দেন। ভক্তদের তখন ঘরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়। সুরমা বাবার সঙ্গে দেখা করার আগে ভক্তদেরও চোখে সুরমা দিতে হয়। সুরমাদানি নিয়ে খাদেম দরজার পাশে বসে থাকেন। হাদিয়ার বিনিময়ে খাদেম চোখে সুরমা দিয়ে দেন।

আজ চন্দ্রপুরের পীর সাহেবের হুজরাখানা জমজমাট। প্রথমত, আজ বৃহস্পতিবার। সারারাত জিগির হবে। জিগির শেষ হবে ফজর ওয়াক্তে, তখন সিন্নি দেয়া হবে। সিন্নি হলো গরু, খাসি, মুরগি এবং চাল-ডালের খিচুড়ি জাতীয় খাদ্য। সুরমা বাবার দোয়ায় এই খাদ্য অতি সুস্বাদু হয়। একবার যে খেয়ে যায়, বাকি জীবন তার এই সিন্নির কথা মনে থাকে।

জিগির ছাড়াও আজ আরেকটি বড় ঘটনা আছে। পীর সাহেবের দাওয়াতে ধর্মপাশা থেকে মিলিটারির মেজর সাহেব আসছেন। তিনি যেহেতু সন্ধ্যার পর থাকবেন না, কাজেই আজ সিন্নি সকাল সকাল রান্না হচ্ছে। মেজর সাহেবকে 'ইজ্জত' করার জন্যে আজ সিন্নি দেয়া হবে আছর ওয়াক্তে। সিন্নি দেয়ার আগে

পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করা হবে। এই দোয়ায় শামিল হবার জন্যে পীর সাহেব তার ভক্তদের ডেকেছেন। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই এসেছে।

মেজর সাহেবকে ইজ্জত করার জন্যে সুরমা বাবা আজ ঘিয়া রঙের একটা চাদর লুঙির মতো কোমরে পেঁচিয়ে রেখেছেন। একবার নিজে এসে রান্নার খোঁজও নিয়ে গেলেন। সচরাচর এই কাজ তিনি করেন না।

সুরমা বাবার হুজরাখানার সামনে নাইমুল বসে আছে। তার গায়ে চাদর। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। সে সুরমা বাবার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে চায়। আজ যে ব্যস্ততা তাতে দেখা করা অসম্ভব, তবে সুরমা বাবার এক খাদেমের হাতে দু'প্যাকেট ক্যাপস্টেন সিগারেট এবং দশটা টাকা দেয়ায় খাদেম আশ্বাস দিয়েছে দেখা করিয়ে দেবে। নাইমুল ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। সে খাদেমকে বলেছে, সুরমা বাবার জন্যে সে কিছু নজরানা নিয়ে এসেছে। বাবার সঙ্গে দেখা হবার পর সে খাদেমকেও খুশি করে দেবে।

এই গরমেও নাইমুলের গায়ে কালো রঙের প্রায় কম্বল জাতীয় চাদর। তার চোখ লাল। সে মাঝে-মাঝে কাশছে। চোখ লালের কারণ তার চোখ উঠেছে। এই চোখ উঠার নাম 'জয় বাংলা' রোগ। সবারই হচ্ছে। এই রোগ এক সপ্তাহের বেশি থাকে না। নাইমুলের বেলায় রোগ মনে হয় স্থায়ী হয়ে গেছে। আজ নিয়ে বারদিন হলো রোগ সারছে না। এমন কোনো কষ্ট নাই, শুধু রোদের দিকে তাকানো যায় না। চোখ কটকট করে।

সকাল থেকে নাইমুলের কিছু খাওয়া হয় নি। এখন দুপুর। সিন্নির গন্ধে পেটের ভেতর পাক দিচ্ছে। গন্ধেই বোঝা যাচ্ছে এই সিন্নি আসলেই খেতে ভালো হবে।

সুরমা বাবার হুজরাখানায় নাইমুলের ডাক পড়েছে। খাদেম বলল, আপনার সমস্যার কথা বাবাকে অতি অল্প কথায় বলবেন। লম্বা ইতিহাস বলার প্রয়োজন নাই। বাবা সবই বুঝেন। এখন আসেন, চোখে সুরমা দিয়ে দেই। সুরমার নজরানা এক টাকা।

নাইমুল বলল, সুরমা না দিলে হয় না? আমার চোখের অসুখ।

খাদেম বিরক্ত গলায় বলল, সুরমা চোখে না দিলে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না। মেজর সাহেব যে আসতেছেন, উনারও চোখে সুরমা দিতে হবে। টিক্কা খান দেখা করতে আসলে তার জন্যেও একই ব্যবস্থা।

দেন, চোখে সুরমা দেন। ব্যথা দিবেন না।

সুরমা বাবা গা থেকে চাদর খুলে ফেলেছেন। ঘরের ভেতরটা গরম। গরমে তিনি ঘামছেন। চাদর দিয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে গায়ের ঘাম মুছছেন। বাবার সামনে জলচৌকি। জলচৌকিতে পিতলের গ্লাসে পানি। একপাশে হাতপাখা। তিনি হাতপাখা দিয়ে অতি দ্রুত নিজেকে কিছুক্ষণ বাতাস করেই এক চুমুক পানি খান। নাইমুল কাউকে কখনো এত দ্রুত বাতাস করতে দেখে নি। সুরমা বাবা নাইমুলের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, কী চাস ? তুই চাস কী ?

নাইমুল বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, আপনার জন্যে কিছু নজরানা এনেছি। নিজের হাতে দিতে চাই।

জিনিসপত্র না টেকা ?

টাকা।

পরিমাণ কত ?

পরিমাণ ভালো।

সুরমা বাবার মুখের বিরক্তি দূর হলো। তিনি প্রায় হাসিমুখে বললেন, আমার কাছে টেকার পরিমাণ কোনো বিষয় না। আমার কাছে এক টেকার যে মূল্য, হাজার টেকার একই মূল্য। সব টেকা-পয়সা গরিব দুঃখীর কাজে ব্যবহার হয়। এইটাও একটা ইবাদত। এই ইবাদতের নাম হাক্কুল ইবাদত। নজরানার টেকা জলচৌকির নিচের দানবাক্সে রাখ। যা বলার তাড়াতাড়ি বলে চলে যা। মেজর সাব আসতেছেন।

হুজুর কি মেজর সাহেবকে দাওয়াত দিয়েছেন ?

অবশ্যই দাওয়াত দিয়েছি। দাওয়াত ছাড়া তারা আসবেন ?

হুজুর যদি কিছু মনে না করেন, যদি বেয়াদবি না নেন— একটা প্রশ্ন করব ?

কী প্রশ্ন ?

শুনেছি মিলিটারিরা অনেক মানুষ মেরেছে, মেয়েদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। তাদেরই দাওয়াত করেছেন— ব্যাপারটা কেমন না ?

সুরমা বাবা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কেমন মানে ? বিধর্মীর সাথে যুদ্ধের নিয়ম তুমি জানো ? বিধর্মীর মাল হলো গনিমতের মাল। সেই মাল নেওয়ার হুকুম আছে। বিধর্মীদের মেয়েছেলেও মালের মধ্যে পড়ে।

যুদ্ধ তো বিধর্মীর সঙ্গে হচ্ছে না। এই দেশের মানুষের সঙ্গে হচ্ছে।

তুমি চাওটা কী পরিষ্কার করে বলো তো ? তুমি কে ?

আমার আসল নাম নাইমুল। আসল নামে আপনি আমাকে চিনবেন না। যে নামে আপনি আমারে চিনবেন সেই নাম হলো— হাছুইন্যা। এখন চিনেছেন ?

সুরমা বাবার মুখ যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তা এই প্রায়ান্ধকার ঘরেও বোঝা গেল। নাইমুল গায়ের কালো চাদর খুলে ফেলল। স্টেনগান এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নাইমুল বলল, শুনেন সুরমা বাবা— চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই করবেন না। যেভাবে বসে আছেন, বসে থাকেন। আমি এসেছি মেজরটাকে মারার জন্যে। আমার সঙ্গে আরো চারজন আছে। এরা বাইরে আছে। আপনি হাছুইন্যা গ্রুপের নাম শুনেছেন?

জি বাবা শুনেছি।

আমার দলটার নাম হাছুইন্যার দল।

ইয়া গাফুরুর রহিম। এইটা কী বলেন!

ভয় লাগে?

জি লাগে।

নেংটা বসে থাকবেন না, কাপড় গায়ে দেন।

সুরমা বাবা অতি দ্রুত চাদর গায়ে প্যাঁচালেন। নাইমুলও চাদর গায়ে দিল। ভয় যতটুকু দেখানোর দেখানো হয়েছে। সুরমা বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, বাবাজি, আমাকে কিছু করবেন না তো?

নাইমুল বলল, আপনি যদি মেজরটাকে মারার জন্যে আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে আপনাকে কিছু করব না। আর যদি সাহায্য না করেন— আপনাকে মেরে ফেলব। আমি আপনার সঙ্গেই থাকব। মেজর আপনার সঙ্গে কথা বলতে যখন আসবে, তখন গুলি করব।

বাবাজি এইসব কী বলেন?

ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনি এত বড় পীর! মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেহেশতে চলে যাবেন। সত্তরটা হুর আপনার গা টিপাটিপি করবে।

বাবাজি, ভুল-ত্রুটি কিছু হয়ে থাকলে ক্ষমা দেন।

হাছুইন্যা গ্রুপের কাজ-কারবার তো জানেন। ক্ষমা এক বস্তু এদের মধ্যে নাই। বিদায় নিয়েছে। দেশ যেদিন স্বাধীন হবে, সেদিন হয়তো ফিরে আসবে।

চটের পর্দা ফাঁক করে একজন খাদেম উঁকি দিল। নাইমুলের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, এই তুমি আসো। বাবার সামনে বেশিক্ষণ থাকার নিয়ম নাই।

নাইমুল বলল, আরেকটু দেরি হবে। বাবার সঙ্গে আসল কথাই এখনো হয় নাই। সুরমা বাবা, আপনি আপনার খাদেমকে বলেন, আমার দেরি হবে।

সুরমা বাবা যন্ত্রের মতো বললেন, উনার দেরি হবে। তুমি এখন যাও।

খাদেম পর্দা নামিয়ে চলে গেল। ঘর আবারও অন্ধকার হয়ে গেল। নাইমুল বলল, সুরমা বাবা, মেয়েভক্তরা আপনার কাছে আসে না ?

আসে।

তাদের সামনেও নেংটা হয়ে বসে থাকেন ?

বাবাজি, আমার শরীরে গরম বেশি, এই জন্যে গায়ে কাপড় রাখতে পারি না। বাবাজি গো, এইবার আমারে মাফ দেন। মাফ দিলে আমি 'জয় বাংলা'র লোক হবো।

নাইমুল সিগারেট ধরাল। সুরমা বাবার দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন সিগারেট খান।

সুরমা বাবা সিগারেট নিলেন। দেয়াশলাই দিয়ে সিগারেট ধরাতে তার অনেক সময় লাগল। তাঁর হাত কাঁপছে।

লোকে বলে আপনার জ্বীন সাধনা আছে। সত্যি নাকি ?

জি বাবা সত্যি।

কয়েকটা পোষা জ্বীনও নাকি আছে। কয়টা আছে ?

তিনজন আছে। চারজন ছিল। একজনের মৃত্যু হয়েছে। এখন আছে তিনজন।

তাদের ডাকেন, তারা আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুক। যার কন্ট্রোলে তিনটা জ্বীন আছে, সে যদি এত ভয় পায় তাহলে কীভাবে হবে ? আপনি কি পিসাব করে দিয়েছেন ?

জি-না। পিসাব করি নাই। তবে বাবাজি আমারে টাট্টিঘরে যেতে হবে। পিসাব চেপেছে।

পিসাব এখানেই করেন। আপনাকে টাট্টিঘরে যেতে দিব না।

ছড়ছড় শব্দ হচ্ছে। সুরমা বাবা সত্যি সত্যি 'পিসাব' করছেন।

আছরের সময় খবর পাওয়া গেল মেজর সাহেব আসবেন না। তবাররুক পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। তবাররুক নেয়ার জন্যে ধর্মপাশা থানার একজন সেপাই নৌকা নিয়ে এসেছে।

নাইমুল উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, কাজ তো হলো না, এখন তাহলে উঠি ?

সুরমা বাবা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, জি আচ্ছা বাবাজি। জি আচ্ছা।

নাইমুল সহজ গলায় বলল, আপনি কাপড় খুলে আবার নেংটা হয়ে যান। আপনি নেংটা বাবা। আপনাকে নেংটা অবস্থায় মারি।

সুরমা বাবা এমনভাবে তাকাচ্ছেন যেন তিনি নাইমুল কী বলছে বুঝতে পারছেন না। নাইমুল বলল, দেরি করছেন কেন? কাপড় খুলেন।

খুব কাছ থেকে নাইমুল স্টেনগান দিয়ে গুলি করল। সে সামান্যতম বিকারও বোধ করল না। তার একটাই সমস্যা হলো— ক্ষিধে নষ্ট হলো।

ধর্মপাশা থানা থেকে হাছুইন্যা গ্রুপের নাইমুলকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেবার জন্যে এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। পুরস্কার ঘোষণা করলেন শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট। তিনি রাতে থাকেন থানায়। বাড়িতে থাকা নিরাপদ বোধ করেন না। পুরস্কার ঘোষণার দু'দিনের মাথায় শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট দুপুরে বাজারে চায়ের দোকানের সামনে মারা গেলেন। নাইমুলের হাতেই মারা গেলেন। গুলি করার আগে নাইমুল জিজ্ঞেস করল, প্রেসিডেন্ট সাহেব, ভালো আছেন? আমাকে চিনেছেন তো, আমি হাছুইন্যা।

প্রেসিডেন্ট সাহেব জর্দা দিয়ে পান খাচ্ছিলেন। তার মুখ থেকে জর্দার রস গড়িয়ে পড়ল। নাইমুল বলল, থানায় কতগুলি মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে জানেন?

প্রেসিডেন্ট সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, থানায় কোনো মেয়ে আটক নাই।

নাইমুল বলল, সত্যি কথা বলেন। আমি কিন্তু চাদরের নিচে স্টেনগান তাক করে আছি।

প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, কয়টা মেয়ে আছে আমি সঠিক জানি না।

আপনার নিজের মেয়ে তো নাই। না-কি আছে?

আপনি কী বলতেছেন বুঝতে পারতেছি না।

গুলি খাওয়ার পরে বুঝবেন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়— বুলেট শরীরে ঢোকামাত্র মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। বুলেট হলো মাথা পরিষ্কারের ট্যাবলেট।

প্রেসিডেন্ট সাহেব কথাবার্তার এই পর্যায়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তাকে সেই অবস্থাতেই গুলি করা হলো।

একটা সময় পর্যন্ত দেশের মানুষ কলমিলতার মতো নিজের দেশেই পালিয়েছে। যারা ঢাকার মানুষ, তারা ঢাকা ছেড়ে গেছে গ্রামে। গ্রামের মানুষেরা নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে। যারা রাজশাহীর মানুষ, তাদের কাছে মনে হয়েছে রাজশাহী ছাড়া অন্য যে-কোনো জায়গা বোধহয় নিরাপদ। এক জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় যাওয়া। নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধান।

জুন মাসের মাঝামাঝি যখন রাজাকার বাহিনী ভালোমতোই তৈরি হয়ে গেছে, তখন শুরু হলো Exodus. দেশ ছেড়ে ভিন্ন দেশে যাত্রা। শত শত মানুষ বর্ডার পাড়ি দেয়া শুরু করল। তাদের কাছে মনে হলো, কোনোরকমে নিজ দেশের সীমানার বাইরে যেতে পারলেই প্রাণে বেঁচে যাওয়া হবে। আহারে কী কষ্টের সেই যাত্রা!

ফয়জুর রহমান সাহেবের অসহায় পরিবারও সেই যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলো। তারাও বর্ডার পার হয়ে কোলকাতার দিকে যাবে। যাবার ব্যবস্থা একটাই— নদীপথে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে যাওয়া। অনেকেই যাবে। অনেকের যাত্রা আবার মাঝখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারা ধরা পড়ছে সুন্দরবনের জলদস্যুদের হাতে।

পাকিস্তানি মিলিটারিও এই যাত্রাপথের খবর পেয়ে গেছে। তাদের গানবোট নিয়মিত নদীপথ টহল দিচ্ছে। নৌকাভর্তি মানুষ দেখা মাত্রই গানবোট থেকে কামান দাগছে।

আয়েশা বেগম এই পরিস্থিতিতে ছেলেমেয়ে নিয়ে সুন্দরবন পাড়ি দিতে রাজি হলেন না। তাঁর প্রধান চিন্তা তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, যে-কোনো দিন রাজাকার দল নিয়ে মিলিটারি বাড়ি ঘেরাও করে ছেলে দু'টিকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। তিনি যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন, সেই বাড়ির প্রধান ব্যক্তিটির সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলে দু'জনকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এই গল্পটি বরং আমরা আয়েশা বেগমের বড় ছেলের জবানিতেই শুনি—

> পিরোজপুর শহর থেকে পনেরো-ষোলো মাইল দূরের অজ পাড়া গাঁ। নদীর পাশে ছোট্ট গ্রাম। নদীর নাম মনে

নেই— বলেশ্বর বা রূপসা হতে পারে। নদী যেমন সুন্দর, গ্রামটা তার চেয়েও সুন্দর। নারিকেল আর সুপারি গাছ দিয়ে অতি যত্নে কেউ যেন এই গ্রাম সাজিয়ে দিয়েছে। ভরা বর্ষা— থৈ থৈ করছে নদী। জ্যোৎস্নারাতে আলোর ফুল ঝরে ঝরে পড়ে। কিছু ফুল আটকে যায় গাছের পাতায়। সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নদৃশ্যের মতো। এই স্বপ্নদৃশ্যে আমি আমার মা এবং ভাইবোনদের নিয়ে বাস করছি। আমাদের মধ্যে কোনো স্বপ্ন নেই।

মা ক্রমাগত কাঁদছেন। কারণ খবর পাওয়া গেছে, পাক মিলিটারি আমার বাবাকে হত্যা করেছে। শুধু তাই না, তারা এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে এবং আমার ছোট ভাই জাফর ইকবালকে। দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দু'জনই রাইফেল নিয়ে প্রচুর ছোটাছুটি করেছি। ভেবেছি, পয়েন্ট টু টু বোরের রাইফেলে মিলিটারিদের আটকে দেয়া যাবে। বাস্তবে তা হয় নি। পাক আর্মির গানবোট বিনাবাধায় পিরোজপুরের হুলারহাটে ভিড়েছে। তাদের একটি দল মার্চ করে ঢুকেছে পিরোজপুর শহরে। শুরু হয়েছে ধ্বংস এবং হত্যার উৎসব।

আমরা তখন পলাতক। প্রথমে যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। বিপদজনক মানুষ হিসেবে আমাদের কোথাও জায়গা হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত আশ্রয় দিলেন গোয়ারেখার জনৈক মাওলানা। তিনি সর্ষিনার পীর সাহেবের ভক্ত খাদেম। মনেপ্রাণে পাকিস্তানি। পাকিস্তান যাতে টিকে যায়, সেই দোয়া তিনি প্রতি নামাজেই করছেন। তারপরেও আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মা'কে বারবার আশ্বাস দিচ্ছেন, জোর গলায় বলছেন— কোনো ভয় নাই। মিলিটারি আপনার ছেলেদের ধরতে পারবে না। উপরে আছেন আল্লাহপাক, নিচে আমি। আমাকে গুলি না করে তারা আপনার ছেলেদের গুলি করতে পারবে না।

মা তাঁর কথায় খুব ভরসা পাচ্ছেন না। কারণ আশেপাশে মিলিটারি অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে।

এইসব হত্যাকাণ্ডের খবর আবার মাওলানা সাহেব নিজেই নিয়ে আসছেন এবং আমাদের সবাইকে একত্র করে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছেন।

'আজ কাউখালিতে বিশটা মানুষ লাইন করে দাঁড়া করেছে। ব্রাশ ফায়ার। সব শেষ।'

'আজ দুইটা মানুষরে খেজুর গাছে তুলে বলল— 'জয় বাংলা বোল।' তার পরেই ঠাস ঠাস গুলি।'

'আজ কুড়াল দিয়ে এক কোপ দিয়ে হিন্দু কম্পাউন্ডারের কল্লা আলাদা করে ফেলেছে।'

হত্যাকাণ্ডের বর্ণনার সময় মাওলানা সাহেবের মুখে এক ধরনের আনন্দময় আভাও দেখতে পাই। আমি কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারি না। ভদ্রলোক নিতান্তই ভালোমানুষ। তিনি শুধু যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন তাই না, কয়েকজন হিন্দু যুবককেও আশ্রয় দিয়েছেন।

হিন্দুদের জন্যে তখন সব পথ বন্ধ। হিন্দু জানলেই দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সুযোগ নেই— গুলি। হিন্দু পরিবারগুলি বাড়ি-ঘর ছেড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলে। বর্ষাকালে সাপ-খোপ ভর্তি জঙ্গল। দিন-রাত বৃষ্টি পড়ছে। বর্ণনার অতীত সব দৃশ্য। এরা পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতেও পারছে না। যেতে হবে সুন্দরবন হয়ে। নদীতে ঘুরছে মিলিটারি গানবোট। সাহায্য করবার জন্য মুক্তিবাহিনী তখনো শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি।

আমরা আমার নিজের দেশের অপূর্ব সুন্দর একটি গ্রামে আটকা পড়ে গেছি। পালিয়ে যেতে চাচ্ছি অন্য একটি দেশে। চারপাশে মৃত্যু ঘোরাফেরা করছে। তীব্র আতঙ্কে কাটছে আমাদের দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী।

এইরকম সময়ে গোয়ারেখার মাওলানা সাহেব চিন্তিত মুখে মা'কে বললেন, আপনার ছেলে দু'টাকে সরিয়ে দেয়া দরকার। আর দেরি করা যায় না।

মা চমকে উঠে বললেন, কেন?

অবস্থা ভালো দেখতেছি না।

ভালো দেখতেছেন না কেন ?

জোয়ান ছেলেপুলে সব ধরে ধরে মেরে ফেলতেছে।

ওদের কোথায় সরিয়ে দিতে চান ?

এমন জায়গায় সরাব যে মিলিটারি কোনো সন্ধান পাবে না।

এমন জায়গা কি আছে ?

অবশ্যই আছে। ওদের রেখে আসব সর্ষিনা পীর সাহেবের মাদ্রাসায়। ওরা মাদ্রাসার হোস্টেলে থাকবে। দরকার হলে ওদের মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেব— জামাতে ছওম ক্লাসে।

মা বললেন, আপনার হাতে আমি ছেলে দু'টাকে তুলে দিলাম। আপনি যা ভালো মনে করেন...।

আমরা দু'ভাই লুঙি-পাঞ্জাবি পরলাম। মাথায় দিলাম গোল বেতের টুপি। রওনা হলাম সর্ষিনা। যেতে হবে নৌকায়। পথ মোটেই নিরাপদ না। মিলিটারির গানবোট চলাচল করছে। আতঙ্কে অস্থির হয়ে যাত্রা। এই নৌকা ভ্রমণ মনে হচ্ছে কোনোদিন শেষ হবে না। ইঞ্জিনের বিজবিজ শব্দ হতেই অতি দ্রুত নৌকা কোনো খাড়িতে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে মাঝে মাওলানা সাহেব বলেন, বাবারা ডাইনে তাকাবা না। আমরা ডাইনে তাকাই না, কারণ তখন ডানে গলিত মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে।

সর্ষিনার পীর সাহেবের আস্তানা চমৎকার। জায়গাটা নদীর তীরে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকার জন্যে বিশাল হোস্টেল। পাড়া গাঁ মতো জায়গায় বিরাট কর্মযজ্ঞ। আর হবে নাই বা কেন! পাকিস্তানের সব রাষ্ট্রপ্রধানই এখানে এসেছেন। কিছু সময় কাটিয়েছেন।

আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে সর্ষিনা পৌছলাম বিকেলে। মাদ্রাসার ছাত্ররা দুধে রুটি ছিঁড়ে চিনি মাখিয়ে খেতে দিল। গপাগপ করে খেলাম। তাদের যে মিলিটারিরা কিছুই বলছে না— এ জন্যে তাদের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের সীমা নেই। তাদের কাছেই জানলাম, পিরোজপুরের সঙ্গে সর্ষিনার পীর সাহেবের সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে।

ক্যাপ্টেন সাহেব দিনের মধ্যে তিন-চার বার টেলিফোন করেন। অপারেশনে যাবার আগে পীর সাহেবের দোয়া নিয়ে যান। আমরা দু'ভাই মাদ্রাসায় ভর্তি হতে এসেছি শুনে তারা যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করল। আমরা আমাদের পরিচয় প্রকাশ করলাম না।

সঙ্গের মাওলানা সাহেব সন্ধ্যার আগে আগে আমাদের দু'জনকে পীর সাহেবের কাছে উপস্থিত করলেন। পীর সাহেব চারদিকে কিছু লোকজন নিয়ে গল্প করছেন। কাছে যাওয়ার সাহস হলো না। শুনলাম, মৌলানা পীর সাহেবকে নিচু গলায় কিছু বলছেন এবং পীর সাহেব রেগে যাচ্ছেন। সব কথা বুঝতে পারছি না। পীর সাহেব বেশিরভাগ কথার জবাবই দিচ্ছেন উর্দুতে। আমার বাবার প্রসঙ্গে কী কথা যেন বলা হলো। পীর সাহেব বললেন, আমি এই লোকের কথা জানি। বিরাট দেশোদ্রোহী। ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। যাও যাও, তুমি চলে যাও।

মাওলানা সাহেব আরো নিচু গলায় সম্ভবত আমাদের দু'ভাই সম্পর্কে কিছু বললেন। পীর সাহেব ভয়ঙ্কর রেগে বললেন— না, না। এদের কেন এখানে এনেছ ?

মাওলানা সাহেব আমাদের নিয়ে ফিরে চললেন। কী কথাবার্তা তাঁর হয়েছে তিনি কিছুই ভেঙে বললেন না। নৌকায় করে ফিরছি এবং প্রার্থনা করছি খুব তাড়াতাড়ি যেন চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারে মিলিটারিরা গানবোট নিয়ে বের হয় না। খোলা নৌকার পাটাতনে বসে আছি। ভরা জোয়ার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ মাঝি বলল, দেহেন দেহেন। তাকালাম। দুটি মৃতদেহ ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। এমন কোনো দৃশ্য নয় যে অবাক বিস্ময়ে দেখতে হবে। খুবই সাধারণ দৃশ্য। রোজই অসংখ্য দেহ নদীতে ভাসতে ভাসতে যায়। শকুনের পাল দেহগুলির উপর বসে বসে ঝিমোয়। নরমাংসে তাদের এখন আর রুচি নেই। কিন্তু আজকের মৃতদেহ দু'টির উপর শকুন বসে নেই। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। চোখ ফেরাতে পারছি না। সবুজ সার্ট গায়ে দেয়া ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একজন যুবকের মৃতদেহ। তার গলা জড়িয়ে ধরে আছে

সাত-আট বছরের একটি বালিকা। বালিকার হাতভর্তি লাল কাচের চুড়ি। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে হয়তো পরম নির্ভরতায় এই বালিকা তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছিল।

এখন আমরা বাস করছি স্বাধীন দেশে। স্বাধীন বাংলাদেশ। এই দেশে সবচে' সম্মানিত, সবচে' বড় পদকটির নাম— স্বাধীনতা পদক। বঙ্গবীর আতাউল গণি ওসমানী, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মুনীর চৌধুরী, রনদা প্রসাদ সাহা, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এই পদক পেয়েছেন।

১৯৮০ সনে, মুক্তিযুদ্ধের ন'বছর পর, মহান বিজয় দিবসে রেডিও ও টেলিভিশনের খবরে শুনলাম— স্বাধীনতা পদক দেয়া হয়েছে সর্ষিনার পীর মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ্‌কে।

হায়, এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি?

ঢাকা শহরে আজ শাহেদের শেষ রাত্রিযাপন।

সে মনস্থির করে ফেলেছে ভোরবেলা কুমিল্লা রওনা হবে। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে আসমানীর দাদার বাড়ি। শাহেদ সেখানে কখনো যায় নি। তাতে সমস্যা নেই। খুঁজে বের করতে পারবে। আসমানীর দাদা তাঁর গ্রামের প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। তিনি রেঙ্গুনে ব্যবসা করতেন বলে গ্রামের বাড়ি 'রেঙ্গুন বাড়ি' নামে পরিচিত। আসমানীর দাদার নাম শাহেদের মনে নাই। 'রেঙ্গুন বাড়ি' নাম মনে আছে। শাহেদের ধারণা 'রেঙ্গুন বাড়ি'তে উপস্থিত হলেই সে একসঙ্গে সবার দেখা পাবে।

কুমিল্লার পাশেই আগরতলা। এমনও হতে পারে সবাই বাড়িঘর ছেড়ে আগরতলা চলে গেছে। সে-রকম হলে শাহেদও আগরতলা যাবে। শরণার্থী শিবির ঘুরে ঘুরে দেখবে। এতগুলি মানুষ হারিয়ে যেতে পারে না।

আবার এটাও হতে পারে শাহেদ যেদিন রওনা হবে, সেদিন দুপুরে বা সন্ধ্যায় আসমানীরা এসে উপস্থিত হবে। আসমানী যেন তার খোঁজ পায়, সে ব্যবস্থাও শাহেদ করেছে। বাথরুমের আয়নায় একটা চিঠি ঝুলিয়ে রেখেছে। চিঠিতে লেখা—

আসমানী,

তুমি যদি এই চিঠি পড়, তাহলে ধরে নিও আমি এখনো নিরাপদে আছি। আমি তোমাদের খোঁজ বের করার চেষ্টায় ঢাকা ছেড়েছি। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। একটা বড় বিপদ বারবার আসে না। কাজেই ধরে নাও আমি নিরাপদেই থাকব। তুমি আমার জন্যে এই বাড়িতেই অপেক্ষা করবে। রান্নাঘরে চাল, ডাল, আটা এবং তেল রেখে দিয়েছি। ডালের কৌটা ভালোমতো দেখবে।

ইতি
শাহেদ

'ডালের কৌটা' সে আন্ডারলাইন করে দিয়েছে। ডালের কৌটায় ডালের নিচে টাকা রাখা আছে। আসমানী হয়তো খালিহাতে উপস্থিত হবে। তার টাকার দরকার হবে।

শাহেদের নিজের টাকা এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে চলছে গৌরাঙ্গের টাকায়। গৌরাঙ্গের কোনো খোঁজ নেই। গৌরাঙ্গের খোঁজ বের করার জন্যে সে ভয়ে ভয়ে একদিন পুরনো ঢাকায় গিয়েছিল। গৌরাঙ্গের বাড়ি তালাবন্ধ। শাহেদ দরজার নিচ দিয়ে একটা চিঠি দিয়ে এসেছে। সেই চিঠি পড়লে গৌরাঙ্গ অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করত। বোঝাই যাচ্ছে গৌরাঙ্গ চিঠি পায় নি।

শাহেদের কুমিল্লায় যাবার ব্যাপারে তার অফিসের 'বি হ্যাপী স্যার' অনেক সাহায্য করেছেন। এই অফিসে আইডেনটিটি কার্ডের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তিনি আইডেনটিটি কার্ড ছাপিয়ে, ছবি লাগিয়ে সব কর্মচারীকে দিয়েছেন। শাহেদের জন্যে আলাদা যে কাজটা করেছেন তা হলো— এক কর্নেল সাহেবের দেয়া পাশের ব্যবস্থা করেছেন। সেই পাশে লেখা— 'শাহেদুদ্দিন নামের এই লোক খাঁটি পাকিস্তানি। তাকে যেন কোনো হ্যারাসমেন্ট না করা হয়।' বি হ্যাপী স্যারের কিছু কথা শাহেদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। এই অবাঙালি মানুষ শাহেদকে তার খাসকামরায় নিয়ে দরজা বন্ধ করে নিচু গলায় বলেছেন, আমি ঠিক করেছি মুক্তিযোদ্ধা হবো। আমার বয়স যুদ্ধে যাবার মতো না। তারপরেও চেষ্টা করছি। যোগাযোগ বের করতে পারছি না। তবে পারব।

শাহেদ বলেছে, আপনি যুদ্ধ করবেন কেন ?

বি হ্যাপী স্যার বলেছেন, কেন করব না বলো ? আমি এই দেশে পথের ফকির হয়ে ঢুকেছিলাম। এই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আমি অবস্থার পরিবর্তন করেছি। আজ আমার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ব্যাংকে টাকা আছে। যে দেশ আমাকে এত কিছু দিয়েছে, সেই দেশকে আমি কিছু দেব না ?

আপনার ফ্যামিলি ? তারা কি আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানেন ?

জানে। তারা পাকিস্তান চলে গেছে। তাদের চিন্তা ভিন্ন। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতো চিন্তা করে।

শাহেদ বলল, স্যার, আপনার কি মনে হয় দেশ স্বাধীন হবে ?

হবে। পাকিস্তানিদের দিন শেষ হয়ে আসছে। তারা মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। নারীদের উপর অত্যাচার আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। যাই হোক, তুমি যাও। স্ত্রী-কন্যার খোঁজ বের করো। যে চিঠিটা তোমাকে জোগাড় করে দিয়েছি, সেই চিঠি তাবিজের মতো যত্ন করে রাখবে। বিপদে কাজে দিবে। বি হ্যাপী ম্যান। বি হ্যাপী।

ঢাকা থেকে বের হবার মুখে বেশ কিছু চেকপোস্ট পার হতে হয়। রাজাকারদের চেক পোস্ট, পশ্চিমা পুলিশের চেক পোস্ট। সবশেষে সেনাবাহিনীর চেক পোস্ট। সব জায়গায় 'ডান্ডি কার্ড' দেখাতে হয়। ডান্ডি কার্ড দেখার পর চলে ব্যাগ স্যুটকেস তল্লাশী। একজন এসে ঘাড় টিপে দেখে ঘাড় নরম না শক্ত। ঘাড় শক্ত হলে পলাতক বাঙালি পুলিশ বা বিডিআর। রাইফেল কাঁধে ট্রেনিং-এর ফলে ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে।

সবচে' অপমানসূচক পরীক্ষাটা হলো খৎনা পরীক্ষা। প্যান্ট খুলে দেখাতে হয় সত্যি খৎনা আছে কি-না! পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশরা এই পরীক্ষাটার সময় বেশ আনন্দ পায়। নানান ধরনের রসিকতা করে। হেসে একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থা হয়।

শাহেদকে এই পরীক্ষাও দিতে হলো। প্যান্ট-আন্ডারওয়ার খুলতে হলো। যে পরীক্ষা নিচ্ছে, তার হাতে অর্ধেক লাল অর্ধেক নীল রঙের মোটা একটা পেন্সিল। সে পেন্সিল দিয়ে খোঁচার মতো দিল। মনে হচ্ছে এই খোঁচা দেয়াতেই তার আনন্দ।

নাম বলো।

শাহেদ।

কিধার যাতা ?

কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম।

ইধার যাতা কেঁউ ?

মেরা পিতাজি বিমার। হাম মিলনা চাতে হে।

শাহেদ যে অসুস্থ পিতাকে দেখার জন্যেই যাচ্ছে, এটা দেখানোর জন্যে সে সঙ্গে একটা ঠোংগায় আঙ্গুর, আপেলও নিয়েছে। শাহেদ ফলের ঠোংগা দেখাল। তার ভাগ্য ভালো কর্নেল সাহেবের পাশ ছাড়াই সে বাসে উঠার সুযোগ পেল। কয়েকজন ছাড়া পায় নি, আটকা পড়ে আছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তারা হয়তো ছাড়া পাবে, হয়তো পাবে না। অনিশ্চয়তা। The day and nights of uncertainity.

মেঘনা ফেরিতে উঠার সময় আবারো চেকিং। এবার চেক করতে এসেছে মিলিটারিরা। বোরকা পরে যে সব মহিলা এসেছেন, তাদেরও নেকাব খুলে মুখ দেখাতে হচ্ছে। তারা যে আসলেই 'জেনানা', মিলিটারি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। যে মিলিটারির দায়িত্ব পড়েছে মহিলাদের চেক করা, সে ভদ্র। সবাইকেই বলছে, ডরো মৎ। তোম মেরা বহিন হ্যায়।

শাহেদের জীবনের অতি বিস্ময়কর ঘটনার একটি ফেরিতে ঘটল। সে এক ঠোংগা ঝালমুড়ি কিনেছে। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি, ক্ষিধেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে। ঝালমুড়ি খেয়ে ক্ষিধেটা কোনোমতে চাপা দেয়া। সে যখন মুড়ি মুখে দিতে যাচ্ছে, তখনই রুনির বয়েসি ভিখিরী ধরনের এক মেয়ে ঝাঁপ দিয়ে তার গায়ে পড়ল। তার ঝাপ্টায় হাতের মুড়ির ঠোংগা পড়ে গেল।

শাহেদ মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে 'তুই কে' বলে চিৎকার করতে গিয়ে থমকে গেল। এই মেয়ে তার অতি পরিচিত। এর নাম কংকন। মেয়েটার নিজের নাম 'কংকন' বলতে পারে না। সে বলে 'ককন'।

তুমি? তুমি কোত্থেকে? তোমার মা কোথায়? তোমার দাদু কোথায়?

মেয়েটি কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছে না। শাহেদের পায়ে ক্রমাগত মুখ ঘষছে।

কংকন আমার কথা শোন, এইখানে তুমি কার সঙ্গে এসেছ?

মেয়েটা এই প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। শাহেদকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল।

কংকন এখানে কার সঙ্গে এসেছে, সেই রহস্য ভেদ হলো। তার নাম রমজান। সে বাড্ডায় রং মিস্ত্রির কাজ করে। সে শাহেদকে পেয়ে পরম স্বস্তিবোধ করছে এটা বোঝা যাচ্ছে। ঘটনা হলো, ক্র্যাকডাউনের পর সে তার ছোটশালাকে নিয়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল। সে একা না, তার সঙ্গে শত শত মানুষ। তখন মিলিটারি শুরু করল বোম্বিং। যে যেখানে পেরেছে, দৌড় দিয়ে পালিয়েছে। অবস্থা কিছুটা যখন শান্ত, তখন সে দেখে এই মেয়ে তার সঙ্গে। মেয়ে তার সার্ট ধরে আছে। কিছুতেই সার্ট ছাড়ে না।

বুঝছেন ভাইসাব, মেয়ে কিছুই বলতে পারে না। বাপ-মায়ের নাম জানে। বাপ-মায়ের নাম দিয়া আমি কী করুম কন? আমার দরকার ঠিকানা। আমি রঙ মিস্ত্রি। কাজকর্ম নাই— খায়া না-খায়া আছি। এরে পালব ক্যামনে?

শাহেদ বলল, এখন যাচ্ছেন কোথায়?

আমার বড়শালার বাড়িতে। সে বিবাহ করেছে মাইজদি। সেখানে তার দোকান আছে। ঠিক করেছিলাম তার কাছে মেয়েটারে রাইখা আসব। আল্লাহপাক আপনেরে মিলায়ে দিয়েছে। যন্ত্রণা ঘাড় থাইক্যা নামছে। ভাইজান, আপনে তার কে হন?

আমি তার চাচা।

আলহামদুলিল্লাহ, থাকেন এখন চাচায়-ভাইস্তিতে।

কংকন এখনো খামচি দিয়ে শাহেদের পা ধরে আছে। কিছুতেই মুখ তুলছে না। বারবার তার ছোট্ট শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। শাহেদ তার পিঠে হাত রেখে বলল, কংকন ভয় পেও না। আমি তোমাকে তোমার বাবা-মা'র কাছে নিয়ে যাব। কংকন, ঠিক আছে ?

হুঁ।

ক্ষিধে লেগেছে ? কিছু খাবে ? কলা খাবে ? কলা কিনে দেই, একটা কলা খাও ?

হুঁ।

শাহেদ কলা কিনে কংকনের হাতে দিতে গিয়ে দেখল, মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার গা গরম। জ্বর এসেছে। ঘুমের মধ্যে বমি করে সে শাহেদের প্যান্ট ভিজিয়ে দিল।

কংকনের সঙ্গে আমার দেখা হয় নিউইয়র্কে। মুক্তধারার বিশ্বজিৎ আমাকে বইমেলায় নিয়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রবাসী বাঙালিরা বইমেলা উপলক্ষে খুব হৈচৈ আনন্দ করছে। খাবারের দোকান বসেছে। একদিকে ভিডিও প্রদর্শনী, বড় প্রজেকশন টিভিতে নাটক দেখানো হচ্ছে। শাড়ি-গয়নার দোকানও আছে। অতি জমজমাট অবস্থা। এর মধ্যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের অতি রূপবতী এক তরুণী এসে পুরো বাঙালি কায়দায় আমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। আমি চমকে পা সরিয়ে নিলাম।

তরুণী বলল, আপনাকে চাচা ডাকব, না স্যার ডাকব ?

আমি বললাম, তোমার যা ডাকতে ইচ্ছা করে ডাক।

তাহলে চাচা ডাকি। স্যার ডাকলে মনে হবে আপনি সত্যি আমার স্যার। এক্ষুনি আমাকে ধমক দেবেন। তাছাড়া আপনার চেহারাও রাগী রাগী।

তরুণীর গুছিয়ে কথা বলার ভঙ্গি বেশ ভালো লাগল। সে বলল, আমি আপনাকে আমার বাসায় নিয়ে যাব। আপনি তো লেখক মানুষ, আপনাকে সুন্দর একটা গল্প শুনাব।

আমি বললাম, শোনা গল্প আমি লিখি না।

সে বলল, আমার গল্পটা আপনার লিখতে ইচ্ছা করবে। এই নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে এক হাজার ডলার বাজি রাখতে পারি।

মেলা শেষ করে আমি কংকনের সঙ্গে তার অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম। নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টগুলি যেমন হয় সেরকম। ছোট কিন্তু খুব গোছানো। এক কথায় বললে বলতে হবে, ছবির মতো সাজানো সংসার। কংকন বিয়ে করেছে

এক আমেরিকানকে। সে কনস্ট্রাকশান ফার্মে চাকরি করে। তাদের একটা ছেলেও আছে। ছেলের নাম রবিন। তবে তাকে ডাকা হয় রবি নামে। ছেলে তার বাবার সঙ্গে লায়ন কিং ছবি দেখতে গিয়েছে। কংকন বলল, আপনি থাকতে থাকতেই ওরা এসে পড়বে। আমরা একসঙ্গে ডিনার করব।

আমাকে ডিনার পর্যন্ত থাকতে হবে?

অবশ্যই। তবে আপনার ভয় নেই— বাংলাদেশের মতো রাত দশটায় ডিনার না। এখানে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই ডিনার করা হয়। আপনি যেভাবে পা তুলে বসেন, সেইভাবে আরাম করে বসুন, আমি গল্প করি।

আমি পা তুলে বসি তুমি জানো কীভাবে?

বইমেলায় দেখলাম। আপনাদের লেখকদেরই শুধু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকবে, আমাদের পাঠকদের থাকবে না?

আমি নরম সোফায় পা তুলে বসেছি। কংকন গল্প শুরু করেছে।

খুব ছোট ছিলাম তো, পরিষ্কার কিছু মনে নেই। আবছা আবছা সব স্মৃতি। সেই আবছা স্মৃতির মধ্যেও কিছু কিছু আবার খুবই স্পষ্ট। যেমন ধরুন, আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে— শাহেদ চাচা বাজারের মতো একটা জায়গায় আমাকে গোসল করাচ্ছেন। মাথায় পানি ঢালছেন কেতলি দিয়ে। সেই পানিটা গরম। কিছুক্ষণ মাথায় পানি ঢালেন, তারপর গায়ে সাবান ডলেন। সাবান থেকে লেবুর মতো গন্ধ আসছিল— এটা পরিষ্কার মনে আছে। সেই স্মৃতি এমনভাবে মাথায় ঢুকে আছে যে আমি এখনো লেমন ফ্লেভারের সাবান ছাড়া অন্য সাবান ব্যবহার করি না।

শাহেদ চাচা আমাকে নতুন জামা কিনে দিলেন। জুতা কিনে দিলেন। সস্তা ধরনের প্লাস্টিকের পুতুল কিনে দিলেন। পুতুলটা এখনো আমার সঙ্গে আছে। আপনাকে দেখাব। আমরা এক রাত থাকলাম হোটেলে। চাচাকে জড়িয়ে ধরে কী আরাম করে যে সেই হোটেলে ঘুমালাম! আমি ঠিক করেছি যদি কোনোদিন বাংলাদেশে যাওয়া হয়, তাহলে হোটেলটা খুঁজে বের করব। এক রাত থাকব সেই হোটেলে।

হোটেল খুঁজে বের করতে পারবে?

অবশ্যই পারব। হোটেলটা দাউদকান্দি নামের এক জায়গায়। টিনের ঘর। হোটেল থেকে নদী দেখা যায়। হোটেলের সব খুঁটিনাটি আমার মনে আছে।

তারপর বলো।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, মাইলের পর মাইল শাহেদ চাচা আমাকে ঘাড়ে নিয়ে হেঁটেছেন। আমরা তখন বর্ডার ক্রস করছি। বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছি

আগরতলায়। চাচা ক্লান্ত হয়ে যান। আমাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে বলেন, মা, কিছুক্ষণ হাঁটতে পারবে? আমি বলি, হ্যাঁ। আমি হাঁটতে পারি না। চাচা আবার আমাকে ঘাড়ে তুলে নেন। আমার কোনো কষ্ট হচ্ছিল না। আমার খুবই মজা লাগছিল। আমাদের সঙ্গে আরো অনেক লোক যাচ্ছিল। একজন বৃদ্ধা মহিলা যাচ্ছিলেন। তাঁর ছেলে তাঁকে কোলে করে নিচ্ছিল।

বৃদ্ধা মহিলার কথা তোমার মনে আছে?

জি আমার মনে আছে। কারণ শাহেদ চাচা আমাকে বলছিল— ছেলে তার মা'কে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে আর আমি আমার মা'কে ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছি। মজা না?

তারপর কী হলো বলো।

আমরা আগরতলা পৌঁছলাম সন্ধ্যায়। সেখান থেকে শরণার্থী শিবিরে ট্রাকে করে যেতে হয়। ট্রাকে ওঠার সময় শাহেদ চাচা বললেন, মা শোন, অনেকগুলো শিবির আছে। আমরা তোমার মা'কে প্রত্যেকটা শিবিরে খুঁজব। তাঁকে পাওয়া যাবে— সে সম্ভাবনা খুবই কম। পাওয়া না গেলে তুমি মন খারাপ করবে না। আমি তো তোমার সঙ্গে আছি। আমি যেভাবেই হোক তোমাকে তোমার মা'র কাছে পৌঁছে দেব। ঠিক আছে মা? আমি বললাম, ঠিক আছে।

ট্রাকে আমার জ্বর এসে গেল। চাচা চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, আমি যেন আমার মা'কে জড়িয়ে ধরে আছি। মজার ব্যাপার কী জানেন? প্রথম শরণার্থী শিবিরেই আমার মা এবং দাদুকে পাওয়া গেল।

বলো কী?

জি। তবে আমাদের দেখা হওয়ার কোনো স্মৃতি আমার মাথায় নেই। শুধু মনে আছে আমার মা, দাদু আর শাহেদ চাচা তিনজনেই খুব কাঁদছিলেন। শাহেদ চাচার কান্না দেখে আমার খুবই মজা লাগছিল। আমি তাকিয়েছিলাম শাহেদ চাচার দিকে।

কংকন কাঁদছে। প্রথমে নিঃশব্দে কাঁদছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'হাতে মুখ ঢেকে শব্দ করে কাঁদতে শুরু করল। অ্যাপার্টমেন্টের বেল বাজছে। হয়তো কংকনের স্বামী তার সন্তানকে ছবি দেখিয়ে ঘরে ফিরেছে। কংকন দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে না। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজের কান্না থামাতে।

রোরুদ্যমান তরুণীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হলো, কংকন কাঁদছে না। কাঁদছে আমাদের বাংলাদেশ। আমাদের জননী।

আগরতলার যে হোটেলে শাহেদ উঠেছে তার নাম নিরালা। স্কুলঘরের মতো লম্বা একতলা দালান। টিনের ছাদ। জানালা দিয়ে টিলা এবং দূরের শালবন দেখা যায়। হোটেলের রুম খুপড়ির মতো হলেও প্রচুর আলো-বাতাস খেলে। হোটেলের রান্না ভালো। সবজি এবং অড়হড়ের ডালের মিশ্রণে যে খাদ্যটি তৈরি হয় তা অতি স্বাদু। হোটেলের মালিকের নাম মিশ্র। তিনি প্রথম পরিচয়েই শাহেদকে বলেছেন, বাংলাদেশের সব মানুষ আমারে ডাকে মিছরি বাবু। আপনিও তাই ডাকবেন। আমি আসলে বাংলাদেশেরই মানুষ। কুমিল্লার নবীনগরে আমার মায়ের বাড়ি।

শাহেদ বলল, কেমন আছেন ভাই ?

মিছরি বাবু আনন্দিত গলায় বললেন, ভালো আছি, তবে আপনাদের দুঃখ-কষ্ট দেখে মনটা অস্থির।

শাহেদ বলল, আপনার হোটেলটা ভালো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

মিছরি বাবু বললেন, জলের কিছু সমস্যা আছে। মানুষ বেশি হয়ে গেছে। সাপ্লাই-এর জল পাওয়া যায় না। নিজগুণে ক্ষমা করবেন। প্রতিদিন স্নান করা সম্ভব না। ফতু বলে একটা ছেলে আছে, তারে একটা টাকা দিলে দুই বালতি জল এনে দিবে।

শাহেদ এই হোটেলে আছে চারদিন ধরে। প্রতিদিনই সে এক টাকা খরচ করে দুই বালতি পানি আনাচ্ছে। ঘুমুতে যাবার আগে দুই বালতি পানি খরচ করে দীর্ঘ গোসল করে। রাতে খুব ভালো ঘুম হয়। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার পর তার মনে হয়, এত শান্তির ঘুম সে দীর্ঘদিন ঘুমায় নি। রাতে ঘুম ভাঙিয়ে মিলিটারি ধরে নিয়ে যাবে— এ ধরনের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। বিহারিরা ঘুমন্ত অবস্থাতেই জবাই করে যাবে সেই আশঙ্কা নেই। প্রায়ই তার মনে হয়, সে পৃথিবীতে বাস করছে না। সে বেহেশতি আরামে আছে।

কংকনকে সে তার মায়ের হাতে তুলে দিতে পেরেছে— এই ঘটনাটা তার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। এই অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হয়েছে ? তাহলে কি সত্যি

এমন কেউ আছেন যিনি আমাদের দিকে লক্ষ রাখছেন ? তিনি তাঁর বিচিত্র কৌশলে হারানো শিশুদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন বাবা-মা'র কোলে ? পঁচিশে মার্চের পর এই বিশ্বাস প্রায় ভেঙে পড়তে বসেছিল। এখন আবার ফিরে আসছে।

কংকনের ঘটনার পর শাহেদের ভেতর কেমন এক আলস্য এসে গেছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, তার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন সে বিশ্রাম করতে পারে। আগরতলা নামের এই দেশ যার নাম শুনেছে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র সময়, সেই আগরতলা এখন ট্যুরিস্টের মতো দেখা যেতে পারে। নিশ্চয়ই অনেক কিছু দেখার আছে। শাহেদের এইটাই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। বিদেশ ভ্রমণ সে কীভাবে করবে ? তার পাসপোর্টও নেই। এখন পাসপোর্ট ছাড়াই চলে এসেছে বিদেশে।

আসমানীদের খোঁজ সে প্রথম দুই দিনেই নিয়েছে। সবক'টা শরণার্থী শিবির দেখেছে। লস্ট পারসন ব্যুরোতে খোঁজ নিয়েছে। এখানকার প্রতিটি হোটেলের অতিথি তালিকা দেখেছে। আসমানীরা আগরতলায় নেই। তারপরেও কিছুই বলা যায় না, হয়তো দেখা যাবে কোনো একদিন সে রাস্তায় ভাড়ে করে চা খাচ্ছে— হঠাৎ বাচ্চা একটা মেয়ে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ধরার সময় এমন ধাক্কা লেগেছে যে তার হাত থেকে চায়ের খুড়ি পড়ে ভেঙে গেল। সে বিরক্ত হয়ে ধমক দিতে যাবে তখন মেয়েটা বলবে— বাবা বাবা আমি। কংকনের ক্ষেত্রে যদি এ রকম ঘটতে পারে, তার মেয়ের ক্ষেত্রে কেন ঘটবে না ?

শাহেদ এক সন্ধ্যায় সিনেমাহলে গিয়ে সিনেমা দেখে এলো। উত্তম-সুচিত্রার ছবি *সাগরিকা*। খুবই ভালো লাগল ছবি দেখে। ছবিঘর থেকে বের হয়ে মনে হলো, সব ঠিক আছে। আমি ভালো আছি। আসমানীরাও ভালো আছে। এই ছবিটাই আমি কোনো একদিন আসমানীকে নিয়ে দেখব। অবশ্যই দেখব।

কংকনরা যে শরণার্থী শিবিরে ছিল, শাহেদ সেখানে আর যায় নি। যদিও তার উচিত প্রতিদিন একবার গিয়ে খোঁজ নেয়া। কেন জানি শাহেদের এটা করতে ইচ্ছা করে না। একদিন শিবিরের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এলো। কেন এ রকম হচ্ছে কে জানে ? কংকনকে দেখলেই নিজের মেয়ের কথা মনে পড়বে— এই ভেবেই কি এ রকম হচ্ছে ? হতে পারে।

মিছরি বাবুর কাছে ঠিকানা নিয়ে একদিন সে নীরমহল দেখে এলো। ত্রিপুরার মহারাজাদের প্রাসাদ। পানিতে প্রাসাদের ছায়া পড়েছে। দূরে নাগকেশর ফুলের বন। কী অপূর্ব দৃশ্য! শাহেদ তৎক্ষণাৎ ঠিক করল, দেশ স্বাধীন হলে অতি অবশ্যই সে আসমানীকে নিয়ে এদিকে আসবে। উঠবে হোটেল নিরালায়। সেখান থেকে কোনো এক সন্ধ্যায় যাবে নীরমহল দেখতে। সেখান থেকে শালবন, শালবন দেখে নাগকেশরের বন। ঐ গানটা যেন কী ?

হেলিয়া দুলিয়া পড়ে নাগকেশরের ফুল।
বালা নাচ তো দেখি।
বালা নাচ তো দেখি।

একদিন সে গেল মুক্তিযোদ্ধারের ক্যাম্প দেখতে। জায়গাটার নাম মেলাঘর। বাংলাদেশের কসবা এবং ভারতের ভিলুনিয়ার মাঝামাঝি একটা জায়গা। ক্যাম্পের দায়িত্বে আছেন দুই নম্বর সেক্টর অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ। ঘন জঙ্গলের ভেতর সেই ক্যাম্প। পানির বড়ই অভাব। সব অভাব সহ্য করা যায়, পানির অভাব না। শত শত যুবক ছেলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তাদের একজনের সঙ্গে শাহেদের পরিচয় হলো। নাম ইফতেখার।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ছাত্র। সেকেন্ড ইয়ার অনার্স।

শাহেদ বলল, কেমন আছেন ভাই ?

ইফতেখার বলল, ভালো আছি।

আপনার কি ট্রেনিং শুরু হয়েছে ?

এখনো হয় নাই। নাম লেখালেখি চলছে।

আপনাদের খাওয়া-দাওয়া কী ?

দুইবেলা খাই। রাতের খাওয়াটা ভালো হয়।

রাতের খাওয়াটা ভালো হয় কেন ?

ইফতেখার হাসিমুখে বলল, অন্ধকারে খাই তো এই জন্যে ভালো হয়।

শাহেদ বলল, বুঝলাম না।

ভাতে অসংখ্য সাদা সাদা কীরার মতো থাকে। অন্ধকারে কীরা দেখা যায় না বলে খেতে সমস্যা হয় না। হা হা হা।

শাহেদ নিতান্তই অল্পবয়েসী এই ছেলের আনন্দময় হাসি দেখে মুগ্ধ হলো। সে বলল, ভাই, আপনি যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে কি আমি হোটেলে একবেলা খাওয়াতে পারি ? একদিনের ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে শহরে আসবেন ?

ইফতেখার বলল, না। তবে আপনি আমাকে একটা সিগারেট খাওয়াতে পারেন। আগে সিগারেট খেতাম না। এখন ধরেছি।

---

*দুর্ধর্ষ ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হিসেবে ইফতেখার ঢাকা শহরে যথাসময়ে প্রবেশ করে। এই ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা ব্যতিব্যস্ত করে রাখে ঢাকা শহরের পাকিস্তানি বাহিনীকে। 'মুক্তি' শব্দটাই তাদেরকে তখন আতঙ্কে অস্থির করে তুলত। তারা তখন ঘরে ঘরে অনুসন্ধান চালাত, একটাই তাদের প্রশ্ন— 'মুক্তি কাহা ?' কোথায় মুক্তি ? শহীদ জননী জাহানারা ইমামের পুত্র দুঃসাহসী রুমি এই গ্রুপেরই একজন সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে তিনি ২৯ আগস্ট ধরা পড়েন। তারা বাংলার এই বীর সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

শাহেদ খুবই লজ্জার মধ্যে পড়ে গেল। তার সঙ্গে সিগারেট নেই। সে বলল, আমি কাল আপনার জন্যে সিগারেট নিয়ে আসব। কয়েক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসব।

কোনো দরকার নেই।

শাহেদ বলল, দরকার আছে। অবশ্যই দরকার আছে। আমি কাল আসব। এমনিতেই আমার আসতে হবে। আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ দেব। এখানকার রিক্রুটিং অফিসার কে? মুক্তিযোদ্ধা হতে যোগ্যতা কী লাগে? নিশ্চয়ই সাহস লাগে। আমার একেবারেই সাহস নেই।

ইফতেখার বলল, আমারো নাই।

শহরে ফিরতে শাহেদের অনেক রাত হলো। ট্রাকের পেছনে চড়ে উঁচু-নিচু রাস্তায় অনেক দূর আসা। পথে কয়েক দফা বৃষ্টির মধ্যে পড়তে হলো। পাহাড়ি বৃষ্টি। এই আছে এই নাই। তার জ্বর উঠে গেল ট্রাকেই।

রাতে শাহেদ কিছু খেতে পারল না। জ্বর হু-হু করে বাড়তে লাগল। একটা কম্বলে শীত মানে না। হোটেলের বয়কে দিয়ে আরেকটা কম্বল আনানো হলো। মিছরি বাবু একবার এসে দেখে গেলেন। কিছু ট্যাবলেট দিলেন। প্রবল জ্বরের ঘোরে শাহেদ স্বপ্ন দেখল আসমানীকে। যেন আসমানী ঢাকায়, তার বাসার শোবার ঘরে বসে আছে। রুনির জ্বর এসেছে। সে রুনির মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে। রুনির সঙ্গে রাগী রাগী গলায় কথা বলছে— তোর বাবার কাণ্ডটা দেখেছিস? আমরা ঢাকায় এসেছি আর সে বসে আছে আগরতলায়। তার কি বুদ্ধিশুদ্ধি পুরোটাই গেছে?

রুনি বলল, বাবাকে বকা দিও না মা।

আসমানী বলল, বকা দিব না তো কী করব? আমি একা মানুষ। আমি তোকে এখন কার কাছে নিয়ে যাব? কে ডাক্তার ডেকে আনবে?

রুনি বলল, বাবা ডাক্তার ডেকে আনবে। বাবা চলে আসবে।

স্বপ্ন দেখে শাহেদের ঘুম ভেঙে গেল। পরদিন ভোরেই গায়ে একশ' দুই ডিগ্রি জ্বর নিয়ে সে রওনা হলো ঢাকার দিকে।

৩০ জুলাই, ১৯৭১

বিকালে বৌমা আমি হাসিনার* ছেলে দেখতে হাসপাতালে গেলাম। কী ভীষণ দুর্ব্যবহার যে করল ওখানের মিলিটারি পাহারাদারটা! হাসিনার মা মাত্র দশ মিনিটের জন্যে গতকাল ওদের দেখতে পেয়েছিলেন। আজ হতে কড়া নিয়ম চালু করা হলো, কোনো মানুষই আর ওদের দেখতে যেতে পারবে না। এ যে কী অমানুষিক ব্যবহার! জেলখানার কয়েদিও সাক্ষাতের জন্য সময় পায়। আল্লাহ্ আর কত যে দেখাবে! আজও ছোটনের চিঠি নেই, কারোর কোনো খবর নেই। আল্লাহ্‌র হাতে সঁপে দিয়েছি, আল্লাহ্ মেহেরবান।*

*সূত্র : বেগম সুফিয়া কামালের দিনলিপি— মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তির জয়;
হাসিনা— শেখ হাসিনা। পরে প্রধানমন্ত্রী। পুত্রের নাম জয়।

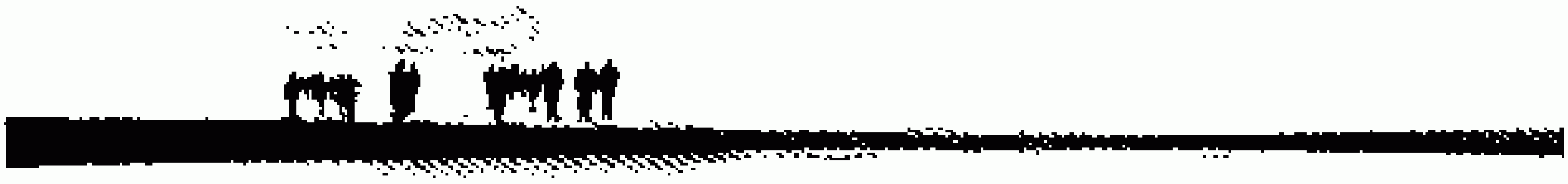

৮ আগস্ট, ১৯৭১

'সানডে টাইমস'-এ প্রকাশিত সাংবাদিক রালফ্ শ-র নেয়া পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার সাক্ষাৎকার।

প্রেসিডেন্ট বলছেন, শেখ মুজিব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ কারাগারে জীবিত ও সুস্থ আছেন। তবে আজকের পর তাঁর জীবনে কী হবে সেই ওয়াদা আমি দিতে পারছি না।

দেশের আইন অনুসারে তাঁর বিচার হবে। তার মানে এই নয় যে, আগামীকালই আমি তাকে গুলি করব। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুও তো হতে পারে। তাঁকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর কারাগারে রাখা হয়েছে। তাঁকে কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। বিছানা, পাখা ও গরম পানির ব্যবস্থা সমেত ছোট ঘর তার রয়েছে। দেখাশোনার জন্যে একজন ডাক্তারও আছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানি খাবারের কারণে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল, তবে এখন তাকে বাঙালি খাবার দেয়া হচ্ছে। তার ওজন আবার বেড়েছে।

তিনি এখনো দৈনিক বিশ থেকে এক ডজন গালগপ্পো করেন। কথার তুবড়ি ছোটান।

লায়ালপুরের (বর্তমান নাম ফয়সলাবাদ) জেলের একটি বিশেষ কক্ষ। সেই বিশেষ কক্ষে আটকে রাখা হয়েছে একজন 'বিশেষ' বন্দিকে। তাঁর উপর কঠিন খবরদারি। সশস্ত্র প্রহরীদের একটি দল সার্বক্ষণিক নজর রাখছে। বন্দি এখন কী করছেন ? তাঁর অভ্যাসমতো সেলের ভেতর হাঁটাহাঁটি করছেন ? নাকি সেলের জানালায় বাইরের আকাশ দেখার চেষ্টা করছেন ?

বন্দির কর্মকাণ্ড তিনে সীমাবদ্ধ। কোরান শরীফ পাঠ করা। সেলের জানালায় আকাশ দেখার চেষ্টা করা এবং হাঁটাহাঁটি করা। প্রহরীদের কেউ কেউ বন্দিকে সালাম দেয়। বন্দি তাদের সালামের জবাব দেন। সেই খবর আবার তাৎক্ষণিকভাবে জেলারকে দিতে হয়। বন্দির কর্মকাণ্ডের প্রতিটি খুঁটিনাটি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়াকে জানাতে হয়।

বন্দির অবস্থান, তাঁর দিনযাপন বিষয়ে পৃথিবীর কোনো মানুষ কিছু জানে না। চরম গোপনীয়তা। তবে নানান গুজব দেশী এবং বিদেশী পত্রপত্রিকায় আসছে। পাকিস্তান সরকার এইসব গুজবের সত্য-মিথ্যা নিয়েও কিছু বলছে না। শেখ মুজিবর রহমান বিষয়ে তাদের কিছু বলার নেই।

একটি জোর গুজব যা কোলকাতার স্টেটমেন্ট পত্রিকাতেও এসেছে তা হলো— শেখ মুজিব অনশন করছেন। অনশন শুরু হয়েছে জুন মাস থেকে। তিনি জানিয়েছেন, স্ত্রী এবং সর্বকনিষ্ঠ সন্তান রাসেলের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি অনশন ভঙ্গ করবেন। তিনি এখন দিনরাত লিখে চলছেন। পাতার পর পাতা লেখা হচ্ছে। কী লেখা কেউ জানে না।

এমনও রটনা হলো যে, শেখ মুজিব পাগল হয়ে গেছেন। তিনি সারাদিন সারারাত দুর্বোধ্য বক্তৃতা করেন। যখন বক্তৃতা করেন না তখন বিড়বিড় করেন।

শেখ মুজিবর রহমান অস্থির সময় কাটাচ্ছিলেন। যে চিন্তা তাঁকে গ্রাস করে রেখেছিল তা হচ্ছে— তাকে মেরে ফেলা হবে, না জীবিত রাখা হবে ? পাইপ টানতে টানতে তিনি প্রায়ই এই হিসাব করেন (কারাগারে তাঁকে তামাক নামক

একমাত্র বিলাসদ্রব্যটি সরবরাহ করা হতো)। পাকিস্তানি মিলিটারি যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে, তাহলে অবশ্যই তাঁকে হত্যা করা হবে। যদি পরাজিত হয় তাহলে কী হবে ? পরাজিত হলেও তাঁকে হত্যার সম্ভাবনা। প্রতিশোধ নেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই এটা করা হবে। সেই হত্যা প্রক্রিয়াটি কী রকম হবে ? তাঁকে কি ফাঁসি দেয়া হবে, নাকি ফায়ারিং স্কোয়াডে নেয়া হবে ? পুত্র রাসেলের প্রিয়মুখ কি মৃত্যুর আগে দেখে যেতে পারবেন না ? তাঁর বড়মেয়েটির সন্তান হবার কথা। তা কি হয়েছে ?

নিজের পুত্রকন্যাদের কথা যখনই তাঁর মনে হয়, তখনি তিনি খানিকটা লজ্জিত বোধ করেন। এ-কী, দেশের কথা একপাশে সরিয়ে তিনি কিনা নিজের প্রিয়মুখগুলির কথা ভাবছেন! একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপকার তিনি। দেশের প্রতিটি মানুষ তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। আর তিনি কি-না তাঁর মৃত্যু কীভাবে হবে তাই নিয়ে ভাবছেন ?

মাঝে-মাঝে তাঁর ঘোরের মতো হয়। তিনি শুনতে পান তার জীবনের মধুরতম শব্দ 'জয় বাংলা'। হৃদয়ের গভীর গোপন কোনো জায়গা থেকে কেউ একজন বলে, 'ভয় পেও না। এই মধুর শব্দ তুমি আবারো শুনবে।' তাঁর নিজের ভাষ্যমতে— 'একে বলতে পারেন স্বজ্ঞা, টেলিপ্যাথি, ইন্দ্রিয় কিংবা অন্য যা খুশি তাই। কিংবা সম্ভবত এটা এক ধরনের ঐশী প্রেরণা, আমি যেটা জানি তা হলো আমার মন বলছিল বিজয় আমাদের হবেই।'

আগস্ট মাসের তিন তারিখ টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন— 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে শেখ মুজিবকে বিচার করা হবে।'

অতি দ্রুত বিচারপর্ব শুরু হলো। তারিখ ৯ আগস্ট। প্রধান বিচারক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার। তার সঙ্গে আছেন দু'জন কর্নেল, একজন উইং কমান্ডার, একজন নেভাল কমোডর ও একজন (একমাত্র সিভিলিয়ন) জেলা সেশন জজ।

শেখ মুজিব আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃতির কথা জানান এবং কোনো আইনজীবীর সঙ্গে বসতে রাজি হন না। বিচার চলতে থাকে। প্রতিদিন ভোরবেলা শেখ মুজিবকে কঠিন পাহারায় বিচারকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল পাঁচটায় আবারো সেলে ফিরিয়ে আনা হতে থাকে।

বিচারকক্ষটি লায়ালপুর জেলের ভেতরই। লাল ইটের দালান। বন্দিকে লোহার চারটি ভারি দরজা পার হয়ে লম্বা সরু করিডোর দিয়ে আদালতে প্রবেশ করতে হতো। পাহারা থাকত সাব-মেশিনগান হাতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত একদল কমান্ডো।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে দেখে সবসময়ই নেশাগ্রস্ত মনে হয়। মনে হয় তিনি তার প্রিয় সুরা ব্ল্যাকডগে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। অতি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়েও তার কথাবার্তা থাকে জড়ানো। এতে তিনি কোনো অস্বস্তি বোধ করেন না।

আজ তাকে নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে না। তিনি একগাদা ফাইল নিয়ে বসেছেন। দ্রুত ফাইল ক্লিয়ার করা হচ্ছে। তার হাতে সময় নেই। চীনা রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্ট ভবনে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসছেন। দশ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য চীনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এখন আলাপ আলোচনা চলছে এক জাহাজ বোঝাই সমরাস্ত্র নিয়ে, এর মধ্যে হালকা চৈনিক ট্যাংকও আছে। চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আজকের আলোচনা এই কারণেই অতি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেসিডেন্টের অতি ব্যস্ততার মধ্যে ঘরে ঢুকলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। প্রেসিডেন্ট এক ঝলক ভুট্টোর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার যা বলার বলুন। আমি কাজ করতে করতে আপনার কথা শুনব। আজ আমার সীমাহীন ব্যস্ততা।

জুলফিকার আলি বললেন, শেখ মুজিবকে কি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে?

প্রেসিডেন্ট কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, অবশ্যই।

ফর গডস সেক। ডোন্ট ডু দ্যাট।

না কেন?

আপনার হাতে মৃত্যুর চেয়ে সে বড় মাপের মানুষ।

জুলফি, আপনার ধারণা তাকে হত্যা করার মতো বড় আমি না?

তাকে হত্যা করলে সারা পৃথিবী আমাদের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। বিশেষ করে আমেরিকানরা। আমেরিকানরা আপনাকে যত খুশি বাঙালি মারতে দেবে, কিন্তু নট শেখ মুজিব।

জুলফি, আপনি কি মনে করেন আমেরিকানদের মনোভাব আমি জানি না? খুব ভালো যোগাযোগ তাদের সঙ্গে আমার আছে। শেখের কী হলো নিক্সন তার পরোয়া করে না। আমি নিক্সনকে ভালোমতো জানি। আমরা যোগাযোগ রেখে চলি। আপনার সঙ্গে আমি এখন আর কথা বলতে পারছি না, চীনা রাষ্ট্রদূত আসছেন। শুনুন জুলফি, আমি শেখকে অবশ্যই ফাঁসির দড়িতে ঝুলাব। যে ঝামেলায় সে আমাকে ফেলেছে তাকে তার মূল্য দিতে হবে। Good bye.*

---

*সূত্র : ১. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : এ লিডার উইথ এ ডিফারেন্স*। ওবায়দুল হক।
২. *পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দি জীবন*। আহমেদ সালিম, অনুবাদ মফিদুল হক।
৩. *দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অব শেখ মুজিব*। রায়হান ইন্টারন্যাশনাল, তেহরান, আগস্ট ১, ১৯৭১

সূত্র : দৈনিক বাংলা
তারিখ : ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
শিরোনাম : বেগম মুজিব কিভাবে কাটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

বেগম মুজিবের বিষাদঘন দিনগুলোর কয়েকটি কথা

নববর্ষের দিন সূর্যের আলোয় পথ চিনে এগিয়ে গেলাম, আঠার নং রোডের দুর্গসদৃশ সেই বাড়িটার দিকে। বাইরের ঘরেই বসেছিলেন বেগম শেখ মুজিব। হাসিমুখেই আহ্বান জানালেন আমাকে। বাড়িটার উল্লেখ করতেই হেসে বললেন— এটা তো তবুও একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই, কিন্তু ২৫শে মার্চের পর পুরো দেড় মাস তাও কোথাও পাই নি। আজ এখানে কাল সেখানে, এমনি করে সেই মাসে কম করে হলেও চৌদ্দ পনেরটা বাসা বদল করেছি।

হাসছিলেন বেগম মুজিব, কিন্তু দেখলাম হাসির মাঝে কেমন জানি অস্পষ্ট এক বিষণ্ণতার ছোঁয়ায় করুণ হয়ে উঠেছে তাঁর চোখের দৃষ্টি।

২৫শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাত। অন্ধকার শোবার ঘরটাতে বিছানায় শুয়ে শেখ সাহেব শুনছিলেন বাইরে বোমায় বিধ্বস্ত ঢাকার আর্তনাদ। উত্তেজনায় এক এক সময় উঠে বসছিলেন তিনি।

ঠিক এমনি এক মুহূর্তে গুলির একটি টুকরো জানালা ভেদ করে ছোট ছেলে রাসেলের পায়ে আস্তে করে লাগে। অন্ধকারে হাতড়ে গুলিটা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন শেখ সাহেব। আর সেই দুঃসহ রাতেই নরপিশাচরা তাকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে তখন ছিলেন বেগম মুজিব, আর তার দু'ছেলে।

২৬শে মার্চ— সমস্ত দিন ছিল কারফিউ। গোলাগুলির শব্দ তখনও থামে নি। নিস্তব্ধ বাড়িটা জুড়ে যেনো এক ভৌতিক বিভীষিকা মাথা খাড়া করে উঠেছে। সামনে ধানমণ্ডি বালিকা বিদ্যালয়ে তাক করে রাখা বড় বড় কামানের মুখগুলো আমার

বাসার দিকে। ভয়ে জানালাগুলো পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারি নি। দুপুরে কারফিউর মধ্যেই এবাসা ওবাসা করে বড় ছেলে কামাল এসে পৌঁছালো।

রাত এলো। সেই আঁধার কালো রাত। ইয়াহিয়া খানের হিংস্রভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে বলা বিবৃতি শুনেই নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারলেন বেগম মুজিব। তাই কালবিলম্ব না করে ছোট ছেলে আর মেজ ছেলেকে নিয়ে পাঁচিল টপকে প্রতিবেশী ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। অন্যদিকে বড় ছেলে কামাল এবং মহিউদ্দীন সাহেব পালালেন অন্যদিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে। রাত ১১টা থেকেই তোপ দাগার শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। কতকটা চেতন কতকটা অচেতন অবস্থায় বেগম মুজিব ২৬শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাতে শুনলেন তাঁর আদরের বাড়িতে গোলাগুলির শব্দ। রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত। সেরাতে এভাবে না পালালে তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের ভাগ্যে কী যে ঘটতো আজও তিনি তা ভাবতে পারেন না।

২৭শে তারিখ সকালে বাচ্চা দুটো সাথে নিয়ে তিনি আবার পালালেন। পুরো দেড় মাস এ বাসা ও বাসা করেন। শেষে মগবাজারের এক বাসা থেকে পাক বাহিনী তাঁকে আঠারো নং রোডের এই বাসায় নিয়ে আসে।

১৮নং রোডে আসবার পূর্বকার মুহূর্তটি স্মরণ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন বেগম মুজিব। বললেন— 'আমি তখন মগবাজারে একটা বাসায় থাকি। আমার বড় মেয়ে হাসিনা তখন অন্তঃসত্ত্বা। সে, জামাই, আমার দেওর, জা, মেয়ে রেহানা, পুত্র রাসেলসহ বেশ কয়েকজন একসাথে ছিলাম মগবাজারের বাসাটাতে। হঠাৎ একদিন পাকবাহিনী ঘেরাও করে ফেলল বাসাটা। একজন অফিসার আমাকে জানাল যে আমাকে তাদের তত্ত্বাবধানে অন্যত্র যেতে হবে। জানি না কী হবে। ঠিক সেই মুহূর্তটাতে ভীষণ সাহসী হয়েছিলাম আমি। কড়াভাবেই সেই অফিসারকে বললাম, লিখিত কোনো আদেশপত্র না দেখালে আমি এক পা-ও বাড়াব না। উত্তরে সে উদ্ধতভাবে জানাল যে ভালোভাবে তাদের সাথে না গেলে তারা অন্য পন্থা গ্রহণ করবে। তখন বাধ্য হয়ে আমি বললাম যে, আমার মগবাজার বাসায় যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে আমার সাথে থাকতে দিতে হবে। আমার কথায় তারা নিজেরা কী যেন আলোচনা করল, পরে তারা রাজি হয়ে নিয়ে এলো আমাদেরকে ১৮নং রোডের এই বাসাটাতে।

১৮নং রোডে আসার প্রথম দিনের কথা বলতে গিয়ে আবার হেসে ফেললেন বেগম মুজিব। ময়লা আবর্জনা পূর্ণ এই বাড়িটাতে

তখন বসবার মতো কোনো আসবাবপত্র দূরে থাক, একটা মাদুর পর্যন্ত ছিল না। জানালার পাশ ঘেঁসা ৩/৪ ফুট প্রশস্ত একফালি জায়গায় ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেছিলেন তিনি এবং পরিবারের সমস্ত সদস্যরা।

অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে এইভাবে কষ্ট করে বসে থাকতে দেখে সেদিন বুক ফেটে যাচ্ছিল তাঁর। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন নি, শুধু অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলেন চারিদিক। হয়তো অসহায়ের করুণ ডাক আল্লাহতায়ালা সেদিন শুনেছিলেন। প্রহরী পাক-বাহিনীর এক পাঠান অফিসার অনুভব করেছিল তাঁর অসহায় অবস্থাকে। সেই অফিসার একজন ঝাড়ুদার সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে দেয় ঘর দুয়ার— সংগ্রহ করে দিয়েছিল কয়েকটি চেয়ার এবং একটি কম্বল।

বন্দি জীবনের নৃশংস পাক-পাহারাদার বাহিনীর মধ্যে এই অফিসারটিই ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম।

ধানমণ্ডির এই বাড়িটার মাঝে অনেক দুঃখ দৈন্যের স্মৃতি চিরদিনের মতো বেগম মুজিবের বুকে আঁকা হয়ে গেছে, তবুও এই বাসাতেই তিনি তার প্রথম আদরের নাতিকে বুকে নিতে পেরেছিলেন— এ স্মৃতি তাঁর কাছে কম উজ্জ্বল নয়।

দৈনিক বাংলা

বেগম মুজিবের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার

ডিসেম্বরের দুপুর। বঙ্গবন্ধুর ৩২নং রোডের বাড়ির দ্বিতলের বসবার ঘরে বসে কথা বলছিলাম বেগম মুজিবের সাথে। গত বছরের বন্দি জীবনের দুর্বিষহ ও ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলোর কথা। বর্ণনা করছিলেন তিনি...

২৬শে মার্চের পর পরই বড় ছেলে কামাল চলে গেছে ওপারে। হাসিনার শরীর খারাপ। তবুও অসুস্থ শরীরে সে-ই ছিল আমার সব চেয়ে ভরসা।

মে মাসের ১২ তারিখ। ১৮নং রোডের সেই একতলা কারাগৃহে আমাদের নেয়া হয়। হানাদারদের পাহারাতে জীবন কাটাচ্ছিলাম আমি। বাসার যে সব প্রহরী ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন সাদা পোশাকধারী সিভিল আর্মড ফোর্সের লোকও ছিল। এরা কার্যত আর্মির প্রহরীদের ঠিক রাখতো।

একদিনের ঘটনা। আমার শোবার ঘরে জামাল আর রেহানা ঝগড়া করছিল। বন্দি জীবন জামালের মতো ছেলে সহ্য করতে পারছিল না। কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন তাই ওদের দু'ভাই বোনের ঝগড়াটা একটু বেশি

রকমের শুরু হয়েছিল। ওদের ঝগড়ার মাঝেই হুট করে ঘরের মধ্যে সিভিল আর্মড ফোর্সের একজন অফিসার ঢুকল। চোখ লাল করে হিংস্রভাবে সে জামালকে বলল, তুমি আজকাল বেশি বাড়াবাড়ি করছ। এভাবে গোলমাল করলে আমরা তোমাকে আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যাব। পা দু'টো উল্টো করে বেঁধে তোমাকে চাবুক মারা হবে। জীবনে আর যাতে কারো মুখ দেখতে না পাও, সে ব্যবস্থাও করা হবে। বেশ চিৎকার করেই অফিসারটি কথাগুলি বলেছিল। আমি প্রথমে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে বললাম ঘর থেকে। একটা হিংস্র দৃষ্টি সে আমাদের ওপর নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিসারটি চলে যাবার পর বেগম মুজিব তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নিলেন। সে দিনই তিনি অফিসারটির জঘন্য আচরণের সমস্ত ঘটনা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত উপর মহলেই লিখে জানালেন।

কিন্তু এ ঘটনার পর থেকেই জামাল যেন আরও অশান্ত হয়ে উঠল। পালাবার জন্য সমস্ত সময় সে সুযোগ খুঁজত। ২৭শে জুলাই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাসিনার সন্তান হলো। আমাদের জীবনে এলো প্রথম নাতি। অথচ তাঁকে দেখবার জন্য আমাদের কাউকেই অনুমতি দেয়া হলো না। ঘরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলাম সেদিন। কেঁদেছিলাম পাক করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরগায়।

৫ই আগস্ট জামাল পালিয়ে গেল বাসা থেকে। কয়েকদিন আগে থেকেই পালিয়ে যাবার জন্য সে চেষ্টা চালাচ্ছিল। আমাকে বলছিল আমি যদি পালাতে পারি তাহলে ৩/৪ ঘণ্টা ওদেরকে কোনো খবর দিও না। জামাল পালাবার পর বুঝতে পারলাম যে ও পালিয়েছে। মন আবার অশান্ত হলো। যদি ধরা পড়ে শেষ হয়ে যায়, আবার সান্ত্বনা পেলাম বাঁচলে এবার ও বাঁচার মতো বাঁচবে। বেলা দু'টায় খাবারের সময় ওর খোঁজ পড়ল। খোঁজ খোঁজ, চারিদিকে খোঁজ। কিন্তু জামাল কোথায়? সন্তানের খোঁজে আমি তখন দিশেহারা হবার ভান করলাম।

সরাসরি চিঠি পাঠালাম ওপর মহলে। আমার ছেলেকে তোমরা ধরেছ। এবার ফিরিয়ে দাও। হানাদারদের তরফ থেকে কিছুই বলার ছিল না। কেননা আগেই আমি এ সম্পর্কে সজাগ হবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম সর্বত্র। তদন্তের জন্য যে কর্নেলকে পাঠানো হয় সে মনে মনে শঙ্কিত হলো। হয়তো সত্যিই ওদের বাহিনীর কেউ জামালকে গুম করেছে। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে কর্নেল ফিরে গেলেন। কিন্তু আমাদের ওপরে কড়াকড়ির মাত্রা আরেক দফা বাড়ল।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে জামালের চিঠি পেলাম। এসময় আমার শাশুড়ির শরীর বেশি খারাপ থাকায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। প্রতিদিন দু'ঘণ্টার জন্য আমাকে হাসপাতালে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। রোগী দেখার ভান করে ওপার থেকেও অনেকেই আসত। ওদের মাথায় হাত রেখে হানাদার প্রহরীদের দেখিয়ে উপদেশ দিতাম ঠিকমতো ঘরে থেকে লেখাপড়া করার জন্য। এক ফাঁকে চিঠিটা হস্তগত করে নিজে সাথে করে নিচ পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম ওদেরকে। ভীষণ ভয় লাগত ওদের জন্য। কিন্তু আল্লাহকে ডাকা ছাড়া কীইবা আমি করতে পারতাম তখন!

ঠিক এভাবেই কেটে গেছে আমার দিন। সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তা দিয়েই চলত আমার ছোট সংসার। দুঃখ-দৈন্য যন্ত্রণা দেহমনে সবকিছুই যেন আটকে গিয়েছিল। প্রতি মুহূর্ত একটি সন্দেহ দিয়ে ঘেরা মৃত্যুর রাজত্বে ধুকেধুকে দিন কাটতো আমাদের।

প্রিয়জনরা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। জানতাম না কেমন আছে ওরা। স্বামীর জন্য আর চিন্তা করতাম না। কেননা আল্লাহ ছাড়া তাঁকে বাঁচাবার সাধ্য যে আর কারো নেই।

একথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। তবুও মাঝে-মাঝে শিরা উপশিরাগুলো অবশ হয়ে আসত। কোথায় আমার বুকের সন্তানেরা আর এই কারাগৃহে আবদ্ধ আমাদের জীবনের স্থায়িত্বই বা কোথায়?

নবেম্বরের শেষের দিকেই বুঝতে পেরেছিলাম ডিসেম্বরে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমার বন্দি জীবনে বাইরের সংবাদ আসার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ট্রানজিস্টার সেটটা ছিল। আমরা শুনেছিলাম ভারত বাংলাদেশকে যেদিন স্বীকৃতি দেবে সেই দিনই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে। তিন তারিখের কলকাতার ঐতিহাসিক জনসভা শোনার জন্য তাই আমাদের প্রতীক্ষা ছিল একটু ভিন্নতর। ইন্দিরাজীর ভাষণ শেষ হলো। খুবই বিস্ময় লেগেছিল। কেন জানি ট্রানজিস্টারের সামনে থেকে নড়তে ইচ্ছা করছিল না। রাত বাড়ল, আকাশ বাণীর সংবাদ শেষ হলো। হঠাৎ ঘোষণা করা হলো শীঘ্রই বিশেষ ঘোষণা প্রচার করা হবে। সমস্ত দিনের ক্লান্ত দেহমন। পরিবারের সকলেই ঘিরে বসলাম ট্রানজিস্টারের চারিদিক। কিন্তু কোথায় সে ঘোষণা! সময় কেটে যাচ্ছিল। একে একে বাচ্চারা ঘুমুতে চলে গেল। মাথার কাছে ট্রানজিস্টারটা খোলা রেখে প্রতীক্ষা করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল বিমান বিধ্বংসী কামানের কটকট শব্দে। বুঝলাম যুদ্ধ বেঁধে গেছে।

৬ই ডিসেম্বর ভারত স্বীকৃতি দিল স্বাধীন বাংলাদেশকে। সে এক অনন্য অনুভূতি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির সংবাদ

এলোমেলো করে দিচ্ছিল আমার দেহ মনকে। বাচ্চারা কাঁদছিল ওদের আব্বার জন্য। আমি চেষ্টা করছিলাম ওদেরকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু স্বাধীনতার স্বীকৃতি আর অতি প্রিয়জনের মৃত্যুর আশংকা আমার আত্মাকে যেন অসাড় করে তুলেছিল।

ডিসেম্বরের দিনগুলো প্রতিদিন যেন নতুন নতুন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াতো। ১৮ তারিখ সকালে যখন পাক আর্মিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল তখন শেখ মুজিবের বাসা থেকে শুধুমাত্র সিভিল আর্মড অফিসার দুজনকে সরিয়ে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে সিভিল আর্মড অফিসার দুজনকে ফিরিয়ে নেয়ার সাথে সাথেই আর্মি প্রহরীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে ওরা আশা করেছিল যে, ওদেরও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত যখন চারিদিক থেকে 'জয় বাংলা' ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল তখন ভীষণ রকম ক্ষেপে গেল ওরা।

আমাদের ঘরের মধ্যে কাপড় শুকোবার জন্য তার বাঁধা ছিল। রাতে তারটা ঝনঝন করে বেজে উঠতেই সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। রক্তের মতো লাল দুটো চোখ। প্রহরী দলের অধিনায়ক সুবেদার রিয়াজ দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। কঠোরভাবে সে বলল, খোকাকে ডাকো। ঠাণ্ডা হয়ে বললাম, খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো কথা থাকলে আমাকে বলতে পারো। আমার মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে সে বলল, সাবধানে থাকো।

মেজর তারা সিং এলেন বেলা ন'টার সময়। তারা সিং সাধারণ বেশে এসেছিলেন কিন্তু পেছনে তিনি একদল সৈন্যকে পজিশন নেয়া অবস্থাতে রেখে দিয়েছিলেন চারিদিকে। খালি হাতে শুধু ওয়্যারলেস সেট সাথে নিয়ে তিনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ওদেরকে বুঝাচ্ছিলেন। প্রথমে ওরা সারেন্ডার করতে চায় নি। শেষে দু'ঘণ্টা সময় চেয়েছিল। গেটের সামনে থেকে ওদের কথা শুনে মেজর তারা সিং যেই পা বাড়ালেন অমনি ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল বাচ্চারা— আপনি যাবেন না মেজর। যাবেন না। সময় পেলেই ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। সত্যিই সময় পেলে ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলত। কিন্তু মেজর সিং তাদের আর সে সময় দেন নি। ঢুকে পড়েছিলেন গেটের মধ্যে।

পাশের বাঙ্কার থেকে কাঁপতে কাঁপতে হানাদাররা তখন বের হয়ে আসছে আত্মসমর্পণের জন্য।

---

*সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*
দলিলপত্র : ৮ম খণ্ড (পৃষ্ঠা : ৬৩৫)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়

হাজি মতলুব মিয়ার নির্মাণ নীলগঞ্জ জামে মসজিদ এই এলাকার সবচে' সুদৃশ্য পাকা দালান। হাজি মতলুব মিয়া জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ধর্মকর্মে মন দেন। তিনি ঘোষণা করেন, আসল ইবাদত হলো হক্কুল ইবাদত। জনতার জন্যে কিছু করা। তিনি তখন হক্কুল ইবাদতের অংশ হিসাবে মসজিদ বানানো শুরু করেন। এই সময় তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। নানান ব্যাধিতে আক্রান্ত। মসজিদ তৈরি যেদিন শুরু করেন, সেদিন তিনি একটা স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে অলি ধরনের এক মানুষ, যার পরনে সাদা লম্বা কুর্তা, মাথায় পাগড়ি, হাতে বাঁকা লাঠি, তাঁকে দেখা দেন। সেই সুফি মানুষ হাতের বাঁকা লাঠি দিয়ে তাকে বুকে খোঁচা দিয়ে বলেন— 'মতলুব মিয়া, তোমার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল। তুমি একটি সৎকর্মে হাত দিয়েছ, এই সৎকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার মৃত্যু হবে না। সৎকর্ম সুন্দরভাবে সমাধা করো।' এই বলেই সুফি পুরুষ অদৃশ্য হয়ে যান। ঘুম ভেঙে মতলুব মিয়া দেখেন এই সুফি পুরুষ তার বুকের যে জায়গায় বাঁকা লাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়েছেন সেই জায়গা কালো হয়ে আছে।

তিনি বিপুল উৎসাহে মসজিদ বানানো শুরু করেন। কাজ দ্রুত সমাধা করার প্রয়োজন নাই। ধীরে-সুস্থে হবে। ভালোমতো হবে। যেভাবেই হোক কাজটা লম্বা করতে হবে। মেঝেতে প্রথমে সিমেন্ট করা হলো। সেই সিমেন্ট উঠিয়ে মোজাইক করা হলো। মিনার একটা করার কথা ছিল। তিনি চার মিনারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে সময় বেশি লাগবে। যত ইচ্ছা সময় লাগুক। মসজিদ নির্মাণ পুরোপুরি শেষ করা যাবে না। একটা দরজা কিংবা একটা জানালা বাকি থাকবে। এই ছিল তার পরিকল্পনা। পরিকল্পনা কার্যকর হলো না। এক মিনার তৈরি হবার পরপরই তার মৃত্যু হলো। মসজিদের শুরু হলো তার জানাজা পাঠের মাধ্যমে।

হাজি মতলুব মিয়ার মসজিদের বর্তমান নাম 'এক মিনারি মসজিদ'। ঈদের দিন দূরদূরান্ত থেকে এই মসজিদে লোকজন নামাজ পড়তে আসে। জুম্মাবারেও মুসল্লিদের ভালো সমাগম হয়।

নীলগঞ্জে মিলিটারি আস্তানা গাড়ার পর জুম্মাবারে লোক সমাগম আরো বেড়েছে। মসজিদের বাইরেও চাটাই বিছাতে হয়। জুম্মাবারে মিলিটারি ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেত দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে নামাজ পড়তে আসেন। নামাজের শেষে তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্যে এক ধরনের ব্যস্ততা সমাগত মুসল্লিদের মধ্যে দেখা যায়। ঘটনাটা বিস্ময়কর হলেও সত্যি। দু'একজন কোলাকুলিও করেন।

জুম্মার নামাজ মাওলানা ইরতাজউদ্দিন পড়ান। সেদিন তাঁর পরনে থাকে ইস্ত্রি করা আচকান, ধবধবে সাদা পাগড়ি। জুম্মাবারে তিনি চোখে সুরমা দেন। কানের লতিতে আতর। নবি-এ-করিমের সুগন্ধী পছন্দ ছিল। সুগন্ধ ব্যবহার করা সেই কারণেই প্রতিটি মুসলমানের জন্যে সুন্নত।

নামাজ একটার সময় শুরু হয়, তবে মাঝে-মাঝে একটা বাজার পরেও অপেক্ষা করা হয়। ক্যাপ্টেন সাহেবের জন্যে অপেক্ষা। মসজিদের মুয়াজ্জিন মুনশি ফজলুল হক ক্যাপ্টেন সাহেবের অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন। এখান থেকে থানা কম্পাউন্ড পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। ক্যাপ্টেন সাহেব থানা কম্পাউন্ড থেকে ঢোলা কুর্তা পরে যখন বের হন, তখন মুনশি ফজলুল হকের ভেতর অন্যরকম উত্তেজনা দেখা যায়।

ইরতাজউদ্দিন জুম্মাবারে মসজিদে বারোটার মধ্যে এসে পড়েন। তখন মুয়াজ্জিনও আসে না। মসজিদ থাকে খালি। এক একজন করে মুসল্লি আসে, তাদের আসা দেখতে তাঁর ভালো লাগে। কাউকে দেখে মনে হয় তার অসম্ভব তাড়া। বসে থাকতে পারছে না, সারাক্ষণ ছটফট করছে। আঙুল ফোটাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কেউ কেউ আসে নিতান্তই অনাগ্রহে। তাদের চোখেমুখে থাকে 'কী বিপদে পড়লাম?' দূর দূরান্ত থেকে কিছু আগ্রহী লোকজনও আসে। এরা হাদিস-কোরান শুনতে চায়। এরা অনেক আগে চলে আসে। তাদের সঙ্গে হাদিস-কোরান নিয়ে কথা বলতে ইরতাজউদ্দিন পছন্দ করেন। ধর্মের কত জটিল বিষয় আছে। কত সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি আছে। এইসব নিয়ে আলাপ করতেও ভালো লাগে।

এখন সময় অন্যরকম। এই সময়ের নাম সংগ্রামের সময়। এই সময়ে মানুষজন কোনো বাধাধরা নিয়মে চলে না। জুম্মাবারে মুসল্লিরা প্রবল আতঙ্ক নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেউ কিছু শুনতে চান না।

ইরতাজউদ্দিন মাথা নিচু করে ইমামের জায়নামাজে বসে আছেন। তাঁর হাতে তসবি। তসবির নিরানব্বইটা দানা তিনি এক এক করে টানছেন এবং একেক দানায় আল্লাহপাকের একেকটি নাম স্মরণ করছেন।

ইয়া রাহমানু : হে দয়াময়।

ইয়া সাদেকু : হে সত্যবাদী।

ইয়া কুদ্দুসু : হে পবিত্র।

ইয়া মুমীতু : হে মৃত্যুদাতা।

ইরতাজউদ্দিন 'ইয়া মুমীতু' বলে থেমে গেলেন। আল্লাহপাকের পরের নামগুলি এখন আর তাঁর মনে পড়ছে না। ঘুরেফিরে মাথায় আসছে 'ইয়া মুমীতু' 'ইয়া মুমীতু'।

মসজিদের বাইরে উঠানের দক্ষিণ পাশে কদমগাছের ছায়ায় চারজন হিন্দু বসে আছে। তাদের একজন মিষ্টির দোকানের মালিক পরেশ, ধুতি পরে আছে। চরম দুঃসময়ে সে ধুতি পরার সাহস দেখিয়েছে। কারণ আজ জুম্মা নামাজের পর তারা মুসলমান হবে। মুসলমান হবার পর লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরবে। কাজেই শেষবারের মতো ধুতি পরা যায়। চারজন হিন্দুর মধ্যে দু'জন নমশূদ্র। নমশূদ্ররা সাহসী হয়— এমন কথা চালু থাকলেও এরা ভয়ে কুঁকড়ে আছে।

হিন্দু মুসলমান হচ্ছে— এই দৃশ্য দেখার জন্যে ক্যাপ্টেন সাহেব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই চার হিন্দুর জন্যে মুসলমান নাম তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন।

আবদুর রহমান।

আবদুর কাদের।

আবদুর হক।

আবদুর সালেহ।

ক্যাপ্টেন সাহেবের ইচ্ছা ছিল চারজনকেই একটা করে কোরান শরীফ দেবেন। নীলগঞ্জের একমাত্র লাইব্রেরিতে কোনো কোরান শরীফ পাওয়া যায় নি। ক্যাপ্টেন সাহেব এতে বিরক্ত হয়েছেন।

যে চারজনকে আজ মুসলমান করা হবে তাদের যেন নিয়মমাফিক খৎনা করানো হয়— সেই বিষয়েও ক্যাপ্টেন সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন। হাজামকে খবর দেয়া হয়েছে। সে ধারালো বাঁশের চল্টা দিয়ে খৎনা করাবে। ক্যাপ্টেন সাহেবের ধারণা এই দৃশ্যও উপভোগ্য হবে। তার নিজের ক্যামেরা ছিল না। এই মজার দৃশ্য ক্যামেরায় তুলে রাখার জন্যে তিনি ক্যামেরার ব্যবস্থাও করেছেন।

পৌনে একটায় জুম্মার নামাজের আযান দেয়া হলো। আযানের পরপরই ইরতাজউদ্দিন মসজিদ থেকে বের হয়ে কদমগাছের কাছে গেলেন। গাছের নিচের চারজনই নড়েচড়ে বসল। এদের একজন শুধু তার চোখে চোখ রাখল। অন্যরা মাটির দিকেই তাকিয়ে রইল।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনারা ভালো আছেন ?

তিনজন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। একজন অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনারাই শুধু মুসলমান হবেন ? আপনাদের পরিবারের কেউ হবে না ?

পরেশ বলল, সবেই হবে। প্রথমে আমরা, তারপর পরিবার।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনাদের ধর্ম কী বলে আমি জানি না। আমাদের ধর্ম বলে জীবন বাঁচানো ফরজ। মুসলমান হলে যদি জীবন রক্ষা হয়, তাহলে মুসলমান হন। জীবন রক্ষা করেন।

মুকুল সাহা ধুতির এক প্রান্ত দিয়ে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। ইরতাজউদ্দিন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, পবিত্র কোরান মজিদে একটা বিখ্যাত আয়াত আছে— 'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দ্বিন।' যার যার ধর্ম তার তার কাছে। ইসলাম অন্য ধর্মের উপর জবরদস্তি করে না।

ইরতাজউদ্দিনের আরো কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, এর মধ্যেই মুয়াজ্জিন মুনশি ফজলুল হক তাঁর কাছে ছুটে এসে বলল, ক্যাপ্টেন সাহেব থানা কম্পাউন্ড থেকে বের হয়েছেন। আজ তাঁর সঙ্গে ছয়জন আছেন। ক্যাপ্টেন সাহেবকে নিয়ে সাতজন।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, জুম্মার নামাজ আমি পড়াব না। এখন থেকে আপনি পড়াবেন।

এইটা কী বলেন!

ইরতাজউদ্দিন বললেন, কেন জুম্মার নামাজ পড়াব না সেই ব্যাখ্যা আজ নামাজ শুরুর আগে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দিব না। আমি এখন চলে যাব।

জুম্মার নামাজও পড়বেন না ?

না।

এইসব কী বলতেছেন!

যা বলতেছি চিন্তাভাবনা করে বলতেছি। এখন থেকে আমি জুম্মার নামাজ পড়ব না। পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজ হয় না। নবি-এ-করিম যতদিন মক্কায় ছিলেন জুম্মার নামাজ পড়েন নাই। তিনি মদীনায় হিজরত করার পর একটা সূরা নাজেল হয়। সূরার নাম 'জুমুয়া'। সেই সূরায় জুম্মার নামাজের নির্দেশ দেয়া হয়। তখন তিনি জুম্মার নামাজ শুরু করেন।

মাথা খারাপের মতো কথা বলবেন না। ক্যাপ্টেন সাহেব চলে এসেছেন।

আসুক। আমি চলে যাচ্ছি।

মাওলানা ইরতাজউদ্দিন বাড়িতে ফিরে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। নামাজের শেষে মোনাজাতের সময় তিনি বললেন, হে গাফুরুর রহিম। আমি যদি ভুল করে থাকি আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমার বুদ্ধি এবং জ্ঞান দুই-ই অল্প। আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা আমার অল্প বুদ্ধি এবং অল্প জ্ঞানের ফসল। এতে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার ক্ষমার সাগরে হাত পাতলাম।

ক্ষমা চাইবার সময় তাঁর চোখে পানি চলে এলো। তিনি অনেকক্ষণ কাঁদলেন। নামাজের সময় তাঁর চোখে পানি আসে না। অনেকদিন পর চোখে পানি এলো। তিনি মোনাজাত শেষ করে জায়নামাজে বসে রইলেন। গায়ের পোশাক বদলালেন না। কারণ তিনি জানেন ক্যাপ্টেন সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠাবেন। জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তিনি ক্যাপ্টেন সাহেবকে যা যা বলবেন তা মোটামুটি ঠিক করা আছে। এইসব কথা ক্যাপ্টেন সাহেবের পছন্দ হবে না। যদি পছন্দ না হয় তাহলে নদীর পাড়ে তাকেও যেতে হতে পারে।

মৃত্যু নিয়ে তিনি ভীত না। কে কখন কীভাবে মারা যাবে তা আল্লাহপাক নির্ধারিত করে রেখেছেন। লাওহে মাহফুজে এইসব দলিল রাখা আছে। যে মৃত্যু আল্লাহপাক কর্তৃক নির্ধারিত— সেই মৃত্যুকে ভয় পাবার কিছুই নেই।

ওসি সাহেবের স্ত্রী কমলা এসে কয়েকবার ঘুরে গেছে। ইরতাজউদ্দিন জায়নামাজে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন বলে কিছু বলতে সাহস পায় নি। এইবার সে সাহস করে বলল, চাচাজি, কী হয়েছে?

তিনি বললেন, মনটা সামান্য অস্থির হয়ে আছে। আর কিছু না।

ভাত খাবেন না চাচাজি?

না, এখন খাব না। মা, আমি এখন কী বলব মন দিয়ে শোন। যদি আমার ভালোমন্দ কিছু হয় তুমি হেডমাস্টার সাহেবের কাছে চলে যাবে। উনি অতি শুদ্ধ মানুষ। উনি যা করার অবশ্যই করবেন। কমলা ভীত গলায় বলল, এইসব কথা কেন বলতেছেন?

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আমার মন অস্থির হয়ে আছে বলেই বলতেছি। অস্থির মানুষ অনেক কথা বলে।

চাচাজি, এক কাপ চা কি বানায়ে দেব?

না গো মা, কিছুই খাব না। তবে এক গ্লাস পানি খাব। এই পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে পানি হলো শ্রেষ্ঠ খাদ্য এবং আল্লাহপাকের দেয়া অতি পবিত্র নেয়ামত। যতবার পানির গ্লাসে চুমুক দিবে ততবারই মনে মনে আল্লাহপাকের শুকুর গুজার করবা, তোমার প্রতি এই আমার একমাত্র উপদেশ।

আছরওয়াক্তের আগে আগে ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ বাসেত ইরতাজউদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। তাকে থানা কম্পাউন্ডে নিয়ে যাবার জন্যে থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি দু'জন কনস্টেবল নিয়ে এসেছেন। ওসি সাহেব একবারও ইরতাজউদ্দিনের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে যে-কোনো কারণেই হোক এই মানুষটির দিকে চোখ তুলে তাকানোর মতো অবস্থা তাঁর না।

ইরতাজউদ্দিন থানার দিকে রওনা হবার আগে অজু করলেন। কমলার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আদর করলেন। নবি-এ-করিম শিশুদের পছন্দ করতেন। তাদের বলতেন, বেহেশতের ফুল। শিশুদের প্রতি স্নেহ ও মমতা দেখানো সুন্নত। সেই মমতা ইরতাজউদ্দিন কেন জানি দেখাতে পারেন না। শাহেদের মেয়ে রুনি ছাড়া কোনো শিশুই তাকে আকর্ষণ করে না। এটা অবশ্যই তাঁর চরিত্রের বড় একটা দুর্বলতা। তবে কমলার এই ছেলেটার প্রতি তাঁর মায়া পড়ে গেছে। এই ছেলেকে কোলে নিলেই সে খপ করে তাঁর দাড়ি ধরে ফেলে। তার হাত ছুটানো তখন সমস্যা হয়ে যায়। হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলে কাঁদতে শুরু করে।

ক্যাপ্টেন বাসেতের সামনে কফির কাপ। চিনি-দুধবিহীন কালো কফি। তিনি একেকবার কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন, কড়া কফির তিক্ত স্বাদে মুখ বিকৃত করছেন। ইরতাজউদ্দিন তাঁর সামনে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকেও কফি দেয়া হয়েছে। তিনি কফিতে চুমুক দেন নি।

ক্যাপ্টেন বাসেত সিগারেট ধরালেন। লম্বা করে ধোঁয়া ছেড়ে হাত ইশারা করলেন। ঘরে দু'জন সিপাই এবং একজন হাবিলদার মেজর ছিল, তারা ঘর ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়াল। তাদের দৃষ্টি ঘরের ভেতর। ক্যাপ্টেন বাসেত খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, আমি খবর পেয়েছি আপনি জুম্মার নামাজ পড়াবেন না, কারণ আমি জুম্মার নামাজ পড়তে যাই। আমার মতো খারাপ মানুষকে পেছনে নিয়ে নামাজ হয় না— এই জাতীয় বক্তৃতাও না-কি দিয়েছেন।

ইরতাজউদ্দিন শান্ত গলায় ব্যাখ্যা করলেন কেন তিনি জুম্মার নামাজ পড়াচ্ছেন না। ব্যাখ্যা শুনে ক্যাপ্টেন বাসেতের মুখ কঠিন হয়ে গেল।

আপনি বলতে চাচ্ছেন পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন পূর্বপাকিস্তান পরাধীন?

জি জনাব।

আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি কী বলছেন?

বুঝতে পারছি।

আপনার এই কথার জন্যে আপনাকে কী শাস্তি দেয়া হবে তা কি জানেন?

জি-না জনাব।

দেশের যে শত্রু তার শাস্তি একটাই। আপনি মুক্তিদের একজন। আপনি মুক্তির হয়ে কাজ করছেন।

আমি যা করেছি নিজের বিচার ও বিবেকে কাজ করেছি।

আপনি চান না পাকিস্তান থাকুক? আপনি হিন্দুস্তানের পা-চাটা কুকুর হতে চান?

জনাব, আমি নিজেকে খাঁটি মুসলমান মনে করি। একজন খাঁটি মুসলমানের দায়িত্ব জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

ক্যাপ্টেন বাসেত হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে নতুন সিগারেট ধরালেন। কঠিন গলায় বললেন, মাওলানা সাহেব, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ইরতাজউদ্দিন চুপ করে রইলেন। ক্যাপ্টেন বাসেত ঠাণ্ডা কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে বললেন, খারাপ মাথা ঠিক করার কৌশল আমি জানি। এমনভাবে মাথা ঠিক করব যে বাকি জীবন আপনি তসবি টানবেন আর বলবেন, পাকিস্তান পাকিস্তান।

ইরতাজউদ্দিন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন।

মাওলানা, চুপ করে থাকবেন না, কথা বলেন।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, জনাব, আমার যা বলার ছিল আমি বলে ফেলেছি।

আর কিছু বলার নাই।

জি-না।

আমি আপনাকে কী শাস্তি দেব জানেন? আপনাকে উলঙ্গ করে সারা গ্রামে ঘুরানো হবে। আমি রসিকতা করছি না। আমি বিশ্বাসঘাতককে কঠিন শাস্তি দেই।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আল্লাহপাক যদি এই লজ্জা আমার কপালে লিখে থাকেন তাহলে এই লজ্জা আমাকে পেতে হবে। পবিত্র কোরান শরীফের সূরা বনি ইস্রায়িলে আল্লাহপাক বলেছেন— 'আমি সবার ভাগ্য সবার গলায় হারের মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি।' আমার ভাগ্য আমার কপালে লেখা, একইভাবে আপনার ভাগ্যও আপনার কপালে লেখা।

আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ?

জনাব, ভয় দেখানোর মালিক আল্লাহপাক। আমি না।

ক্যাপ্টেন বাসেত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলে টোকা দিতেই সেপাই এবং সুবাদার মেজর ঘরে ঢুকল। ক্যাপ্টেন বাসেত বললেন, ওসিকে বলো এই গাদ্দারকে নেংটা করে সারা গ্রামে ঘুরাতে। তোমরাও সঙ্গে থাকবে।

নীলগঞ্জের অতি শ্রদ্ধেয় অতি সম্মানিত মানুষ মাওলানা ইরতাজউদ্দিনকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় প্রদক্ষিণ করা হলো। তাঁকে প্রথম নিয়ে যাওয়া হলো নীলগঞ্জ স্কুলে। সেখান থেকে নীলগঞ্জ বাজারে। বাজারে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটল। দরজির দোকানের এক দরজি একটা চাদর নিয়ে ছুটে এসে ইরতাজউদ্দিনকে ঢেকে দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকল। ঘটনা এতই দ্রুত ঘটল যে সঙ্গের মিলিটারিরা বাধা দেবার সময় পেল না।

ইরতাজউদ্দিন এবং দরজিকে মাগরেবের নামাজের পর সোহাগী নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করা হলো। মৃত্যুর আগে আগে ইরতাজউদ্দিন পরম নির্ভরতার সঙ্গে আল্লাহপাকের কাছে উঁচু গলায় শেষ প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহপাক, যে মানুষটা জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল তুমি তার প্রতি দয়া করো। তুমি তার প্রতি তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।*

*নেত্রকোনা অঞ্চলের এই সত্য ঘটনাটির সাক্ষী যে দরজি সে গুলি খাওয়ার পরেও প্রাণে বেঁচে যায়। আমি তার কাছ থেকেই গল্পটি শুনি। —লেখক।

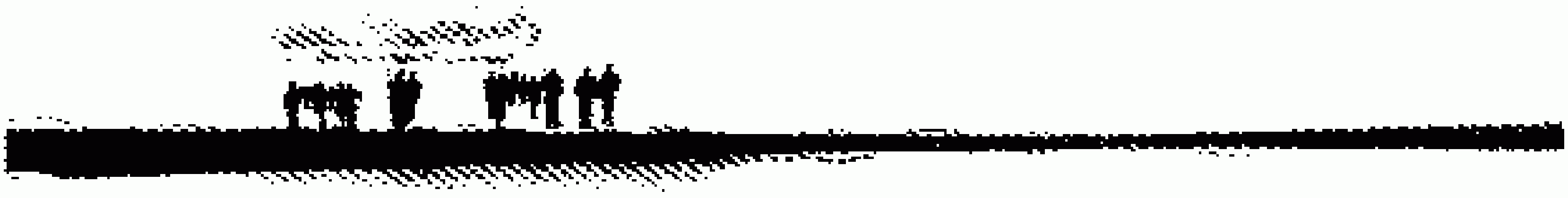

নীলগঞ্জ হাই স্কুলে হেডমাস্টার মনসুর সাহেব মাথা নিচু করে তাঁর শোবার ঘরের খাটে বসে আছেন। তাঁর সামনেই ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী আসিয়া। বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে আসিয়া এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর মাথায় কোনো সমস্যা নেই।

মধ্যদুপুর। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে কাল রাত থেকে। এত প্রবল বর্ষণ নীলগঞ্জে এর আগে কখনো হয়েছে বলে মনসুর সাহেব মনে করতে পারছেন না। তিনি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আসিয়া, তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি একটা কাজ করতে চাই।

আসিয়া ক্ষীণ গলায় বললেন, কী কাজ ?

মনসুর সাহেব বললেন, ঘোমটা সরাও। কথাগুলি আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে চাই।

আসিয়া ঘোমটা সরালেন। মনসুর সাহেব বললেন, আমার অতি প্রিয়জন ইরতাজউদ্দিন কাসেমপুরী সবসময় বলতেন, যে স্বামী স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে কোনো কাজ করবে আল্লাহপাক তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। যে কাজটা আমি করতে যাচ্ছি, তার জন্যে তোমার অনুমতি চাই।

আসিয়া আবারো বললেন, কী কাজ ?

মনসুর সাহেব বললেন, ইরতাজউদ্দিন কাসেমপুরীকে মিলিটারিরা গতকাল সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে গুলি করে মেরেছে। তারা এ অঞ্চলে কারফিউ দিয়ে রেখেছে। মৃতদেহ পড়ে আছে নদীর পাড়ে। ভয়ে কেউ সেখানে যাচ্ছে না। আমি উনার ডেডবডি নিয়ে আসতে চাই। নিয়মমতো কবর দিতে চাই।

আসিয়া বললেন, আপনি একা এই কাজ পারবেন ?

কেন পারব না ? পারতে হবে।

আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি যাব আপনার সঙ্গে।

মনসুর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি যেতে চাও ?

জি যেতে চাই। মিলিটারি যদি আপনাকে গুলি করে মারে, তাহলে আপনার সঙ্গে আমিও মরতে চাই। আমি একা বেঁচে থেকে কী করব ?

নীলগঞ্জের মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল, হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে ঘোমটা পরা একজন মহিলা প্রবল বর্ষণের মধ্যে মাওলানা ইরতাজউদ্দিনের বিশাল শরীর টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। অনেকেই দৃশ্যটা দেখছে, কেউ এগিয়ে আসছে না।

হঠাৎ একজনকে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সে আসিয়া বেগমের কাছে এসে উর্দুতে বলল, মাতাজি আপনি সরুন, আমি ধরছি।

মনসুর সাহেব বললেন, আপনার নাম ?

আগন্তুক বলল, আমি বেলুচ রেজিমেন্টের একজন সেপাই। আমার নাম আসলাম খাঁ।*

*ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীর নামাযে জানাজা হয় দেশ স্বাধীন হবার পর। ঐদিন তার কবর হলেও জানাজা হয় নি। জানাজার জন্যে মাওলানা খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আসমানী হতাশ চোখে রুনির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটা এত অবুঝ কী করে হয়ে গেল! সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যান করছে, এখন দুপুর। সে সন্দেশ খাবে। সন্দেশের ব্যাপারটা মেয়ের মাথায় কী করে এসেছে আসমানী জানে না। শরণার্থী শিবিরে সে কি কাউকে দেখেছে সন্দেশ খেতে ? দেখতেও পারে। এই মেয়ে এখন নিজের মনে ঘুরঘুর করতে শিখেছে। কাউকে কিছু না বলে এখানে-ওখানে যাচ্ছে। এই পাশে আছে, এই নেই। একদিন তো সারা দুপুর তার খোঁজ নেই। চিন্তায় অস্থির হয়ে আসমানী যখন ঠিক করল, ক্যাম্প ওয়ার্ডেনকে জানাবে— তখন মেয়েকে দেখা গেল হেলতে দুলতে আসছে। হাতে একটা বনরুটি। কে দিয়েছে বনরুটি ? মেয়ে বলবে না। আসমানীর ধারণা, সে কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছে। মেয়েটার ভিখিরি স্বভাব হয়ে গেছে। যেখানে-সেখানে হাত পাতছে।

রুনিকে অবশ্যি দোষ দেয়া যায় না। তারা তো এখন ভিখিরি। নিজ দেশ ছেড়ে অন্য এক দেশে ভিখিরি সেজে বাস করছে। থালা হাতে খাবারের জন্যে দু'বেলা লাইন ধরতে হচ্ছে। কী লজ্জা কী লজ্জা! এই লজ্জা এই অপমানের শেষ কি হবে ? না-কি বাকি জীবন কেটে যাবে শরণার্থী শিবিরে ? এইসব নিয়ে চিন্তা করতে এখন আর আসমানীর ভালো লাগে না। তাঁর এখন একটাই চিন্তা— রুনিকে আগলে রাখা। যেন হারিয়ে না যায়। হারিয়ে গেলে এই মেয়েকে তার পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না।

নানা হাতবদল হয়ে একসময় রুনির জায়গা হবে খারাপ পাড়ায়। রুনি ভুলেই যাবে এক সময় তার অতি সুখের সংসার ছিল।

কী দ্রুতই না মেয়েটা বদলাচ্ছে! একদিন আসমানী শুনল রুনি কাকে যেন কুৎসিত সব গালি দিচ্ছে— 'তোর হোগায় লাথি।' আসমানী ছুটে বের হয়ে মেয়ের হাত ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এইসব কী বলছ মা ? রুনি ঘাড় শক্ত করে বলল, ও তো আমাকে আগে বলেছে।

ও বললেই তুমি বলবে ?

হ্যাঁ, বলব।

তুমি জানো না এইসব খুব খারাপ গালি?

আমি এরচেয়েও খারাপ গালি জানি।

আসমানী কী করবে, মেয়েকে কীভাবে সামলে রাখবে ভেবে পায় না। কী ভয়ঙ্কর পরিবেশ চারপাশে! শরণার্থী শিবিরে চুরি হচ্ছে, এক শরণার্থী অন্যজনের কাপড় চুরি করছে। ধরা পড়ছে। মারামারি হচ্ছে। ওয়ার্ডেনরা ছুটে আসছে। তাদের মুখেও গালি— 'তোমরা জান বাঁচাইতে আসছ না চুরি করতে আসছ? কাজ তো জানো মোটে তিনটা— হাগা, মুতা আর চুরি।'

মাঝে-মাঝে বাংলাদেশ সরকারের লোকজন আসেন। তারা মুখের ভাব এমন করে রাখেন যে শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশায় তাদের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। কী সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা— 'আমরা বাঙালি। আমরা ধ্বংস হয়ে যাব কিন্তু মাথা নোয়াবো না। আপনারা ধৈর্য ধরুন। আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করে যাচ্ছে। বিজয় এলো বলে।'

তারা নানান ধরনের পরিকল্পনা নিয়েও আসেন। শরণার্থী শিশুদের জন্যে স্কুল হবে। পড়াশোনা যেন বন্ধ না হয়। শরণার্থীদের দিয়ে নাটক করানো হবে। নাটকের বিষয়বস্তু দেশপ্রেম। বাইরের পৃথিবী যেন দেখে এর মধ্যেও আমরা জীবনের আলোয় উদ্ভাসিত।

প্রায়ই বিদেশীরা আসে ছবি তুলতে। কেউ আসে মুভি ক্যামেরা নিয়ে। তাদের সঙ্গে বিরাট লটবহর। সেই সময় যদি শরণার্থীদের কেউ মারা যায়, তবেই তাদের আনন্দ। কত কায়দা করেই না ডেডবডির ছবি তোলা হয়! যারা শোকে অস্থির হয়ে কাঁদছে, তাদের ছবি তোলা হয়।

বিদেশীরা প্রায়ই এটা-সেটা উপহার হিসেবে নিয়ে আসে। গায়ে মাখা সাবান, বাচ্চাদের জন্য লজেন্স, চকলেট। তখন ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়! সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ঝাঁপিয়ে পড়ার দলে রুনিও আছে। ঝাঁপাঝাঁপি করে একবার সে গায়ে মাখা একটা সাবান এনে মাকে দিল। সেদিন তাকে দেখে মনে হয়েছিল, সে বিরাট এক যুদ্ধ জয় করে ফিরেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বড় বড় কর্মকর্তারাও আসেন। একদিন এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। তিনি খুবই সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে হাতজোড় করে বলেছিলেন— 'আমরা আপনাদের শুধু আশ্রয় দিতে পেরেছি। আর কিছু দিতে পারছি না। সাধ আছে, সাধ্য নেই। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

কিছুদিন পর পরই খবর আসে— ইন্দিরা গান্ধীর আসার সম্ভাবনা আছে। তখন সাজ সাজ পড়ে যায়। ব্যাটন হাতে ওয়ার্ডেনরা তাঁবুতে ঢুকে অকারণেই চিৎকার চেঁচামেচি করে— 'বিছানা পরিষ্কার, বিছানা পরিষ্কার। খবরদার কেউ ঘরে হাগা-মুতা করবেন না।'

রেডক্রস সাইন লাগানো একটা ডিসপেনসারি প্রতিদিনই খোলা থাকে। সেখানে দু'জন ডাক্তার বসেন। তারা যত্ন নিয়েই রোগী দেখেন। ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। কিন্তু ওষুধ দিতে পারেন না। ডিসপেনসারিতে ওষুধ নেই। মাঝে-মাঝে দান হিসেবে ওষুধ পাওয়া যায়। সেই ওষুধ নিমিষেই শেষ হয়ে যায়।

গর্ভবতী মা'দের একটা তালিকা রেডক্রস করেছে। সেখানে আসমানীর নাম আছে। তালিকায় নাম উঠার কারণে আসমানী সপ্তাহে এক টিন প্রোটিন বিসকিট পায়। সেই বিস্বাদ বিসকিট রুনি একা কুটকুট করে খায়। মা'কে টিন ধরতে দেয় না। মেয়েটার জন্যে আসমানীর এত মায়া লাগে! তার বাড়ন্ত শরীর। এই শরীর খাদ্য চায়। সেই বাড়তি খাবার জোগাড়ের সামর্থ্য আসমানীর নেই।

সকাল থেকে মেয়েটা 'সন্দেশ সন্দেশ' করছে। কোত্থেকে আসমানী সন্দেশ দেবে! গতকালই তার হাত পুরোপুরি খালি হয়ে গেছে। এখন হাতে একটা টাকাও নেই। মেয়েটার জন্যে আসমানীর এতই খারাপ লাগছে যে হাতে একটা টাকা থাকলেও সে সন্দেশ কিনে দিত।

মা, সন্দেশ কিনে দেবে না?

আসমানী বললেন, দেব।

কখন দেবে? এখন দিতে হবে। এই এখন।

কাঁদবে না রুনি।

রুনি কঠিন মুখ করে বলল, আমি কাঁদব। আমি চিৎকার করব। আমি তোমাকে খামচি দেব।

এসো বাইরে যাই। চিৎকার চেঁচামেচি খামচা-খামচি ক্যাম্পের বাইরে করো। ভেতরে না।

না, আমি এইখানে চিৎকার করব। আমি বাইরে যাব না।

আসমানী মেয়েকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে টিনশেডের বাইরে এনে প্রচণ্ড শব্দে মেয়ের গালে চড় বসাল। রুনি হতভম্ব হয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে আছে। সে এর আগে কখনো মায়ের কাছ থেকে এমন ব্যবহার পায় নি।

রুনি বলল, মা, তুমি আমাকে মারছ?

আসমানী বলল, আজ মেরে আমি তোমার হাড্ডি গুঁড়া করে দেব। বলতে বলতেই আসমানী মেয়ের গালে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে আবার চড় বসাল।

ভাবি, স্লামালিকুম।

আসমানী ঘুরে তাকাল। মুখভর্তি দাড়িগোঁফের জঙ্গল নিয়ে অচেনা একজন দাঁড়িয়ে আছে। রোদে ঝলসে যাওয়া তামাটে চেহারা। মাথাভর্তি উড়ুক্কু চুল।

ভাবি, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন ? চেনার অবশ্যি কথা না। আমি নিজেই এখন নিজেকে চিনি না। ভাবি, শাহেদ কি ক্যাম্পে আছে ?

না, ও ক্যাম্পে নেই। ক্যাম্পে আমি মেয়েকে নিয়ে আছি।

শাহেদ কোথায় ?

ও কোথায় আমি জানি না। বেঁচে আছে কি-না তাও জানি না। আপনার নাম কি নাইমুল ?

ভাবি, আপনি দশে এগারো পেয়েছেন। আমি নাইমুল।

আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা ?

জি ভাবি। মেয়ের নাম রুনি না ? রুনি মার খাচ্ছে কেন ?

আসমানী শান্ত গলায় বলল, ও সন্দেশ খেতে চায়। আপনি কি রুনিকে একটা সন্দেশ কিনে খাওয়াতে পারবেন ?

নাইমুল বলল, পারব, তবে এখন না ভাবি। আমি সন্ধ্যাবেলায় সন্দেশ নিয়ে আসব।

আসমানী তাকিয়ে আছে। মানুষটা লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে। তার চলে যাবার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে ফিরবে না। এখন দুঃসময়। দুঃসময়ে কেউ কথা রাখে না।

রুনি কাঁদছে না। সন্দেশের জন্যেও হৈচৈ করছে না।

সন্ধ্যাবেলা নাইমুলের আসার কথা, সে এলো না। আসমানীর মনে হলো কোনো কারণে হয়তো আটকা পড়ে গেছে, রাতে আসবে। রাতেও এলো না। রুনি বলল, মা, আমি কি ঘুমিয়ে পড়ব ? উনি মনে হয় আসবেন না।

আসমানী বলল, ঘুমাও। আমরা যখন দেশে ফিরে যাব, যখন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে, তখন যত ইচ্ছা সন্দেশ খাবে।

দেশে কবে যাব মা ?

জানি না কবে যাবে।

আসমানীর চোখ ভিজে উঠতে শুরু করছে। সে মেয়ের দিকে তাকাতে পারছে না। রুনির গালে হাতের দাগ বসে গেছে। গাল কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। রুনি বলল, মা শোন, আমার এখন আর সন্দেশ খেতে ইচ্ছে করছে না।

তোমার যা খেতে ইচ্ছা করবে, তোমার বাবা তাই কিনে দেবে।

মা'র কান্না দেখেই হয়তো রুনির কান্না পেয়ে গেছে। মা'র শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বাবার কি আমাদের কথা মনে আছে মা ?

রাতে রুনির জ্বর এসে গেল। ভালো জ্বর। আসমানী সারারাত মেয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে রইল।

নাইমুল এসে উপস্থিত হলো ভোরবেলা। লজ্জিত গলায় বলল, ভাবি, জোগাড়যন্ত্র করতে দেরি হয়ে গেল। আপনার মেয়ের জন্যে সন্দেশ আনার কথা। সেটাও ভুলে গেছি। খালিহাতে এসেছি। এখন চলুন। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

আসমানী অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাব ?

বারাসাত। আমার ফুপার বাড়ি। উনি এখানে সেটেল করেছেন। আমি কাল উনার সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে এসেছি। কোনো সমস্যা হবে না। আমি ক্যাম্পে আপনাদের এইভাবে ফেলে রেখে যাব না।

আসমানী বলল, ভাই, আপনি কী বলছেন!

নাইমুল বলল, কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না তো ভাবি। আমি জিপ নিয়ে এসেছি। ক্যাম্পের লোকদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার ফুপা-ফুফু দু'জনই অতি ভালো মানুষ। তাঁরা আপনাকে নিজের মেয়ের মতো যত্নে রাখবেন। আপনার শরীরের যে অবস্থা, আপনার যত্ন দরকার।

সত্যি যেতে বলছেন ?

অবশ্যই। ভাবি শুনুন, আপনি আপনার মনে সামান্যতম দ্বিধা বা সংকোচ রাখবেন না। আপনার মনের সংকোচ দূর করার জন্যে ছোট্ট গল্প বলি— মন দিয়ে শুনুন। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার সময় খুবই খারাপ অবস্থায় দিন কাটাতাম। বইপত্র কেনা দূরের কথা, ভাত খাওয়ার পয়সাও ছিল না। আমার এই অবস্থা দেখে শাহেদের বড়ভাই, মাওলানা ভাই, প্রতিমাসে মানি অর্ডারে আমাকে টাকা পাঠাতেন। আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছিলেন এই ঘটনা যেন শাহেদ না জানে। আমি শাহেদকে জানাই নি। আজ আপনাকে বললাম। আর আমি এতই অমানুষ যে মাওলানা ভাইকে আমার বিয়ের খবরও জানাই নি। ভাবি, উনি কেমন আছেন জানেন ?

ভাই, আমি জানি না। আমি কারোরই কোনো খবর জানি না।

লক্কর ধরনের জিপ রাস্তায় ধুলা উড়িয়ে ছুটে চলেছে। নাইমুল বসেছে ড্রাইভারের পাশে। রুনি বসেছে নাইমুলের কোলে। গাড়িতে উঠার পরই তার জ্বর সেরে গেছে। সে ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। নাইমুল খুবই মজা পাচ্ছে। রুনি একটা গল্প শেষ করে আর নাইমুল হাসতে হাসতে বলে, এই মেয়ে তো কথার রানী। শাহেদ তো কথাই বলতে পারে না, এই মেয়ে এত কথা শিখল কার কাছে ?

পথে এক দোকানের পাশে নাইমুল গাড়ি থামাল। রুনিকে বলল, এসো এখন সন্দেশ খাবার বিরতি। দেখি কয়টা সন্দেশ তুমি খেতে পারো। তোমার সঙ্গে আমার কম্পিটিশন। দেখি কে বেশি খেতে পারে!

তারা বারাসাতে এসে পৌঁছল সন্ধ্যায়। ছবির মতো সুন্দর গাছ দিয়ে ঢাকা একতলা পাকা দালান। গেটের কাছে জিপ এসে থামতেই এক বৃদ্ধা ছুটে এসে আসমানীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এসো গো মা, এসো। সেই দুপুর থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। আহা মা'র মুখ শুকিয়ে গেছে! খুব কষ্ট হয়েছে তাই না মা ?

খড়ম পায়ে খালি গায় এক বৃদ্ধও বের হয়ে এলেন। তিনিও অতি মিষ্টি গলায় বললেন, দেখি আমাদের বাঙ্গাল মেয়ের চেহারা। ও আল্লা, এই মেয়ের গায়ের রঙ তো ময়লা। আমাদের হলো ফর্সা ঘর। ফর্সা ঘরে কালো মেয়ের স্থান নাই। এই মেয়ে আমরা রাখব না। বলেই শব্দ করে হাসতে লাগলেন।

অনেক অনেক দিন পর আসমানীর মনে হলো, সে নিজের বাড়িতেই ফিরেছে। এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাঁর অতি আপনজন।

যুদ্ধ খুব অদ্ভুত জিনিস। যুদ্ধ যেমন মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়, আবার খুব কাছাকাছিও নিয়ে আসে।

নাইমুল বসে আছে ঢিবির মতো উঁচু একটা জায়গায়। উঁচু থেকে সমতল ভূমির অনেকখানি দেখা যায়। চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। সে বসেছে ছায়ায়। তার মাথার উপর ছাতিম গাছের বড় বড় পাতা ছায়া ফেলে আছে। এই অঞ্চলে ছাতিম গাছের ছড়াছড়ি। কেউ নিশ্চয়ই হিসাব-নিকাশ করে ছাতিম গাছ লাগায় নি। আপনা-আপনি হয়েছে। গত সপ্তাহে সে যেখানে ছিল, সেখানে আবার শিমুল গাছের মেলা। একটু পরপর শিমুল গাছ। বসার জন্যে শিমুল গাছ ভালো না, গাছ ভর্তি কাঁটা। গাছে হেলান দিয়ে বসা যায় না। ছাতিম গাছে হেলান দেয়া যায়। তবে ছাতিম গাছ শব্দহীন বৃক্ষ। বড় বড় পাতা বলেই বাতাসে পাতা কাঁপার শব্দ হয় না।

নাইমুলের পরনে সেলাইবিহীন সবুজ রঙের লুঙ্গি। লুঙ্গির নিচে হাফপ্যান্ট আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে হাফপ্যান্ট ভালো পোশাক। তবে হাফপ্যান্ট পরে চলাচল সম্ভব না। লোকজন প্রথম দেখাতেই চিনে ফেলবে। সেলাইবিহীন লুঙ্গিটার প্রয়োজন এইখানেই। অপারেশনের সময় টান দিয়ে খুলে ফেলা যায়। তার গায়ে কালো রঙের হাফ হাতা গেঞ্জি। গেঞ্জির উপর ময়লা সুতি চাদর। কাঁধে ঝুলানো স্টেইনগান লুকিয়ে রাখার জন্য এই গরমে সুতি চাদর গায়ে রাখতে হচ্ছে। স্টেইনগান নাইমুলের পছন্দের অস্ত্র না। তার সীমা পঞ্চাশ গজ। শত্রুর পঞ্চাশ গজের ভেতরে যাওয়া গেরিলাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে উঠে না।

নাইমুল পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসেছে। তার পায়ের কাছে যে বসে আছে তার নাম রফিক। বসেছে ব্যাঙের মতো। দেখলেই মনে হয় লাফ দেবে। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। ব্যাঙের মতোই বড় বড় চোখ। সামান্য উত্তেজিত হলেই চোখ কোটর থেকে বের হয়ে আসতে চায় এমন অবস্থা।

রফিক বিরাট গল্পবাজ। পরিচয়ের পর থেকেই সে বিরামহীন কথা বলে যাচ্ছে। নাইমুল কী বলছে না বলছে সে বিষয়ে তার আগ্রহ নেই। তার কথা বলাতেই আনন্দ।

স্যার, আপনে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ?

নাইমুল হাই তুলতে তুলতে বলল, হুঁ। গেরিলাদের প্রধান ট্রেনিং তাদের পরিচয় গোপন রাখা। নাইমুল সেদিক দিয়ে গেল না। প্রয়োজন মনে করল না।

শম্ভুগঞ্জের ব্রিজ উড়াইতে আসছেন ? আপনের খবর আছে।

খবর আছে কী জন্যে ?

আপনের আগে আরো তিন পার্টি আসছে। সব ঝাঁঝরা। মেশিনগানের গুল্লি ছুটাইয়া ঝাঁঝরা কইরা দিছে।

তুমি মেশিনগান চেন ?

চিনব না কী জন্যে ? মায়ের কোলের নয়া আবুও অখন মেশিনগান চিনে। মর্টার চিনে। পিকেওয়ান চিনে।

পিকে ওয়ানটা কী ?

রফিক চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে। লোকটা বলছে সে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার অথচ পিকেওয়ান চেনে না! নাকি লোকটা তাকে খেলাচ্ছে ? কেউ তাকে নিয়ে খেলালে রফিকের ভালো লাগে না।

স্যার, আপনের হাতিয়ার কই ?

আছে, সবই আছে।

রাখছেন কই ?

জেনে কী করবে ? শান্তি কমিটির কাছে খবর দিবে ?

এইটা কী কন ?

এই অঞ্চলে শান্তি কমিটি নাই ?

শান্তি কমিটি থাকব না— এইটা কেমন কথা! অবশ্যই আছে। আগের চেয়ারম্যান সাব মুক্তির হাতে মারা পড়ছে। নতুন আরেকজন হইছে চেয়ারম্যান। তারে মারবেন ? বাড়ি চিনি। আপনেরে নিয়া যাব ?

নাইমুল বলল, চা খাওয়াতে পারবে ?

রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, এই মাঠের মধ্যে চা কই পামু ?

সেটাও একটা কথা।

চেয়ারম্যান সাবের বাড়িতে চলেন, চা খাইয়া আসবেন। তার বাড়িতে চায়ের আয়োজন আছে। আপনে মুক্তির কমান্ডার শুনলে লুঙ্গির মধ্যে পিসাব কইরা দিবে। এমন ডরাইল্যা।

চেয়ারম্যান সাহেবের নাম কী ?

হাশেম চেয়ারম্যান। বউ দুইটা। ভাটি অঞ্চল থাইক্যা এক বউ আনছে, খুবই সুন্দর। তয় চরিত্রে দোষ আছে। সবেই জানে।

নাইমুল আবার হাই তুলল। টেনশনের সময় তার ঘনঘন হাই ওঠে। এর কারণটা তার কাছে স্পষ্ট না। মানুষের হাই ওঠে অক্সিজেনের অভাব হলে। টেনশনের সময় কি তার শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়? ব্রেইন প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন নিয়ে নেয় বলেই কি এই ঘাটতি?

নাইমুলের টেনশনের প্রধান কারণ, তার দলের কারোরই কোনো খোঁজ নেই। গতকাল ভোরে PEK1 (Plastic Explosive) এসে পৌঁছানোর কথা। সঙ্গে থাকবে ফিউজ, কর্ড X, ডিটেনেটর। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ খুব কম হলে পঁচিশ কেজি লাগবে। পঁচিশ কেজির কমে ব্রিজের স্প্যান ভাঙা যাবে না। এখন দুপুর। তারা আসবে নৌকায়। এই অঞ্চলে নৌকায় চলাচল এখনো নিরাপদ। মিলিটারি গানবোট বা লঞ্চ নিয়ে নদীতে নামে নি। তারা শুকনা অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করছে। তার প্রধান কারণ পানি হয় নি। ছোট ডিঙ্গি টাইপ নৌকা বা খুন্দাই (তালগাছের নৌকা) ভরসা। মিলিটারিরা এত ছোট জলযানে উঠবে না।

দলটা কোনো বিপদে পড়ে নি তো? এখন সময় এমনই যে হুট করে বিপদ নেমে আসে। আগে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

রফিক ঝুঁকে এসে বলল, কমান্ডার সাহেবের নাম কী?

আমার নাম নাইমুল।

সকাল থাইক্যা এই জায়গায় বসা। এর কি কোনো ঘটনা আছে?

নাইমুল আবারো হাই তুলতে তুলতে বলল, কোনো ঘটনা নাই। ছায়ায় বসছি। ছায়া মূল ঘটনা না। নৌকা এখানেই আসবে। ছাতিম গাছ দেখে তারা নৌকা ভেড়াবে। তাছাড়া এখান থেকে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের অনেকখানি চোখে পড়ে। এই সড়কে মিলিটারির চলাচল কী রকম সেটা দেখাও উদ্দেশ্য।

রফিক বলল, রইদ চড়া উঠছে। কমান্ডার সাব দেন একটা ছিরগেট, টান দিয়া দেখি কী অবস্থা। আপনের আগে যে কমান্ডার সাব আসছিল, আমারে আস্তা এক প্যাকেট ছিরগেট দিয়েছিলেন। বিরাট কইলজার মানুষ ছিলেন।

নাইমুল সিগারেট দিল। রফিক আগ্রহের সঙ্গে সিগারেট টানছে। কায়দা করে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ছে। নাইমুলের ধারণা ব্যাঙ-টাইপ এই লোক সিগারেটের আশায় বসে ছিল। আশা পূর্ণ হয়েছে, এখন সে হেলতে দুলতে চলে যাবে। লোকজন জোগাড় করে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারের গল্প করবে। যুদ্ধের কারণে বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। লেখক হলে বাকি জীবন সে এইসব চরিত্র নিয়ে লেখালেখি করে কাটিয়ে দিতে পারত।

কমান্ডার সাব, আপনে কোন বাহিনী ? মুজিববাহিনী ?

নাইমুল বলল, তুমি মুজিববাহিনীও চেন ?

চিনব না কেন ? একেক বাহিনীর একেক কায়দা। মুজিববাহিনীর ট্রেনিং ভালো। অস্ত্র-শস্ত্র ভালো। অন্য বাহিনীর সাথে তারার বনে না।

ভালো কারা ?

সবই ভালো। মিলিটারি মারা দিয়া কথা। কী কন কমান্ডার সাব ?

হুঁ।

শান্তি মারলেও লাভ আছে, তয় শান্তি দেশের মানুষ— এইটা বিবেচনায় রাখতে হয়। আপনে কী কন ?

নাইমুল নিজে একটা সিগারেট ধরাল। হিসাবের সিগারেট। দ্রুত শেষ করা ঠিক হবে না। রফিকের সিগারেট খাওয়া দেখে তার খেতে ইচ্ছা করছে।

আগের শান্তি চিয়ারম্যান ক্যামনে মারা পড়ছে সেই গল্প শুনবেন ?

না।

আমগাছের সাথে নিয়া যখন বানছে, তখন পেসাব পায়খানা কইরা ছেড়াবেড়া। এমন কান্দন শুরু করল যে কইলজার মধ্যে ধরে। আমি মুক্তি হইলে দিতাম ছাইড়া। বলতাম, তোর শান্তি নিজের গু নিজে চাটা দিয়া খাবি। জানে মারনের চেয়ে এই শান্তি ভালো, কী কন কমান্ডার সাব ? গু খাওয়া সহজ ব্যাপার না। নিজের গু হইলেও না।

নাইমুল জবাব দিল না। জবাব দেবার প্রয়োজনও নেই। রফিক এই ধরনের মানুষ যে জবাবের অপেক্ষা করে না। নতুন গল্প শুরু করে। রফিক তার সিগারেটে শেষ লম্বা টান দিয়ে বলল, নতুন চিয়ারম্যান সাবের দিনও শেষ। মুক্তি যখন আইসা ঢুকে, তখন তারা আর কিছু করতে পারুক না পারুক শান্তির লোকজন মারে।

আর কিছু করে না ?

নাহ্।

মিলিটারি মারতে পারে না ?

সত্য কথা বলতে কী পারে না। পাক মিলিটারি তো ঘুঘু পাখি না। গুলাইল দিয়া মারবেন। পাক মিলিটারি কঠিন জিনস। সাক্ষাৎ আজরাইল। এরার শইল্যে ভয় ডর বইল্যা কিছু নাই।

পাক মিলিটারি দেখেছ ?

দেখব না কী জন্যে ? একবার মাথাত কইরা তারার গুলির বাক্স নিয়া গেছি। খেতে কাম করতেছিলাম, ডাক দিয়া আইন্যা আমারে আর পুব পাড়ার ফজলু ভাইয়ের মাথাত তুইল্যা দিল গুলির বাক্স। আরে বাপ রে— ওজন কী! দুই দিন ছিল ঘাড়ে ব্যথা। কমান্ডার সাব আরেকটা সিগারেট দেন।

আর তো সিগারেট দেয়া যাবে না।

তাইলে উঠি। আপনের সাথে গফ কইরা মজা পাইছি।

উঠতে পারবে না। যেখানে বসেছিলে সেখানে বসে থাকো। গল্প করতে চাও গল্প করো। উঠার চিন্তা বাদ দাও।

রফিক বিস্মিত হয়ে তাকাল। মুক্তিদের হাবভাব বোঝা মুশকিল। এতক্ষণ এই কমান্ডার নরম-সরম গলায় কথা বলেছে। এখন তার গলা কঠিন। চোখের দৃষ্টিও ভালো না।

আমার একটা কাজ ছিল কমান্ডার সাব।

কাজ থাকলেও বসে থাকো। তোমাকে আমি ছেড়ে দেব আর তুমি সারা অঞ্চলের মানুষকে বলে বেড়াবে মুক্তি ঢুকেছে, তা হবে না। তাছাড়া তোমাকে আমার দরকার।

কী জন্যে দরকার ?

শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি চিনায়ে দিবে। আমি বাড়ি চিনি না। আরো খোঁজ খবর দিবে। শম্ভুগঞ্জ ব্রিজ কি মিলিটারি পাহারা দেয় ?

আমি জানব ক্যামনে ? আমি কি ব্রিজের উপরে দিয়া হাঁটি ? রেলগাড়ি চলাচলের পুল। মাইনষের হাঁটার পুল না।

রাজাকাররা থাকে কোথায় ?

থানা কম্পাউন্ডে থাকে।

তারা মোট কয়জন ?

আমি কি গুইন্যা দেখছি ? রাজাকারের হিসাব নেওনের ঠেকা আমার নাই।

রফিক উসখুস করছে। নাইমুল কড়া গলায় বলল, নড়াচড়া করবে না।

নড়াচড়াও করতে পারব না— এইটা কেমন কথা ?

নাইমুল গায়ের চাদরটা সামান্য উঠিয়ে কাঁধে ঝুলালো চাইনিজ স্টেনগান দেখিয়ে দিল। রফিক নড়াচড়া বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল। তার চোখ কোটর থেকে সামান্য বের হয়ে এলো। মিলিটারিদের যেমন বিশ্বাস নাই, মুক্তিরও বিশ্বাস নাই। হুট করে কী করে বসে না বসে তার নাই ঠিক।

নাইমুল বলল, রাজাকার কমান্ডারের নাম কী ?

জয়নাল।

জয়নালের বাড়ি তো তুমি চেন। চেন না?

জি চিনি।

সে বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে না? চব্বিশ ঘণ্টা সে নিশ্চয়ই থানা কম্পাউন্ডে থাকে না।

জয়নাল ভাইরে কি গুল্লি করবেন?

জানি না করব কি-না। করতেও পারি।

জয়নাল ভাই বৈকালে ছুলুর স্টলে চা খাইতে যায়। একলা যায় না। সাথে সব সময় এক দুইজন থাকে। যন্ত্রপাতি থাকে।

থাকুক।

গুল্লি কোন খানে করবেন? চায়ের স্টলে করবেন না দূরে নিয়া করবেন?

দেখি কী করা যায়।

কমান্ডার সাব, আমার বিরাট পেসাব চাপছে। পেসাব করন দরকার। ক্ষেতের আইলে বইস্যা পেসাব কইরা আসি।

নাইমুল হাই তুলতে তুলতে বলল, পেসাব এই খানেই করো। নিচে নামার দরকার নাই।

আপনের সামনে পেসাব করব?

উল্টা দিকে ফির। উল্টা দিকে ফিরে পিসাব করো। জায়গা থেকে নড়বে না।

কমান্ডার সাব, আমি কিন্তু জয় বাংলার লোক।

এই জন্যেই তো তোমাকে পাশে বসিয়ে রেখেছি। আমার জয় বাংলার লোকই দরকার।

এই খানে কতক্ষণ বইস্যা থাকবেন?

নাইমুল আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, জানি না।

রফিক বলল, পুরাটা শেষ কইরেন না। আমি দুইটা টান দিব। ইন্ডিয়ান ছিরগেটের মজাই আলাদা।

নাইমুল তাকে আস্ত একটা সিগারেট দিল।

রফিক বলল, ফাইটিং কি আইজ রাইতেই হইব?

হুঁ।

আফনের লোকজন কই?

আমার দলে লোক কম। আমরা মোটে দুইজন।

আরেকজন কে ?

আরেকজন তুমি। তোমাকে গ্রেনেড মারা শিখায় দিব। পারবে না ?

রফিকের ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে গেল। সে মনে মনে বলল, ভালো পাগলের হাতে পড়ছি।

গ্রেনেড নিশ্চয়ই চেন। সব অস্ত্রপাতির নাম তুমি জান, গ্রেনেডের নাম জানবে না তা হয় না। লোহার বল।

গ্রেনেড চিনি। গ্রেনেড আছে দুই পদের। ভালটার নাম এনেগ্রা গ্রেনেড। বন্দুকের নলে লাগাইয়া মারতে হয়।

তোমাকে ঐ গ্রেনেড দেব না। তোমাকে যে গ্রেনেড দেব সেখানে একটা পিন থাকে। দাঁত দিয়ে টান দিয়ে পিন খুলতে হয়। পিন খোলার পরে ছুড়ে মারতে হয়।

রফিক বিড়বিড় করে বলল, ভাইজান আমার দাঁতে অসুবিধা আছে। দাঁত পোকায় খাওয়া। এই দেখেন।

সে দাঁত বের করে দেখাল। নাইমুল সহজ গলায় বলল, এই দাঁতেও চলবে।

বিকাল পর্যন্ত নাইমুলের দলের লোকজন কেউ এসে পৌঁছল না। এদের কি সমস্যা সেটাও জানার উপায় নেই। সে কি তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না ফিরে যাবে তাও বুঝতে পারছে না।

দলের লোকজন কি ধরা পড়ে গেছে ? ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম, তবে একেবারেই যে নেই তা না। গত মাসে শেরপুরের জহুকান্দিতে কাদের মিয়ার পুরো দল ধরা পড়েছিল। তারা ভুল যা করেছে তা হলো আয়োজন করে খাওয়া-দাওয়া করতে গেছে। যে বাড়িতে তারা উঠেছিল, সেই বাড়ির কর্তা মুক্তিবাহিনী দেখে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় খাসি জবাই করা হয়েছে তাদের খাওয়ানোর জন্যে। পোলাও রান্না হয়েছে। খাসির মাংস রান্না হতে সময় লাগছিল। এই সময়ই কাল হলো। মিলিটারি বাড়ি ঘিরে ফেলল। ট্রেনিং ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধের নিয়ম কানুন ব্যাখ্যা করতে করতে এক পর্যায়ে বলা হতো— আর যাই হও খাসি কাদের হয়ো না।

কাদের দুর্দান্ত সাহসী যোদ্ধা ছিল। সামান্য ভুলের জন্যে তার নাম হয়ে গেল খাসি কাদের। তার বীরত্বের কথা সবাই ভুলে গেল। শুদ্ধ কাজের জন্যে মানুষ মানুষকে মনে রাখে না। মানুষ মনে রাখে তাদের অশুদ্ধ কাজের জন্যে। কাদেরের নাম হওয়া ছিল বীর কাদের অথচ তার নাম হয়ে গেল খাসি কাদের।

কমান্ডার সাব ?

হুঁ।

আমার কপালে একটু হাত দিয়া দেখেন।

কেন ?

জ্বর আসছে। আমার কেঁথার তলে যাওন দরকার। আমার শইলের অবস্থাটা একটু বিবেচনা করেন।

নাইমুল আবারো বলল, হুঁ।

রফিক বলল, উঠি কমান্ডার সাব ?

নাইমুল বলল, উঠার চিন্তা বাদ দাও। তোমাকে পাঠাব ব্রিজের কাছে রাজাকারদের যে আউট পোস্ট আছে সেখানে।

লাখ টেকা দিলেও আমি এর মধ্যে নাই। ভুইল্যা যান।

ভুলে যাব কেন ?

ব্রিজ পাহারা দেয় কালা মিলিটারি। এরা সাক্ষাৎ যম।

কালো পোশাক পরা মিলিশিয়া ?

মিলিশিয়া কি-না জানি না, এরা যে আসল যম এইটা জানি। এরার ছায়া দেখলেও মৃত্যু।

নাইমুল দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, উঠ।

কই যাব ?

কালা মিলিটারির ছায়া দেখে আসি।

আসমানের দিকে চাইয়া দেখছেন আসমানের অবস্থা। দেওয়া নামতাছে।

নাইমুল আকাশের দিকে তাকাল। ঘন হয়ে মেঘ করছে। আকাশের ঘন কালো মেঘ সৌভাগ্যের লক্ষণ। মেঘ-বৃষ্টিতে মিলিটারিরা অভ্যস্ত না। তারা তখন কোঠরে ঢুকে থাকে। তাদের কাছে বজ্রের গর্জনকে কামানের শব্দ বলে মনে হয়। মেঘ ডাকলেই তাদের কলিজা কাঁপে। এমন ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দলের লোকজন থাকলে ভালো হতো। ব্রিজের ব্যবস্থা করে ফেলা যেত। দলে নাসিম আছে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিডের বিষয়ে অতি এক্সপার্ট। ছোটখাটো মানুষ, মনে হয় হাঁটতে জানে না— লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। তাকে আদর করে ডাকা হয় মিস্টার স্প্রিং। দলে আছে সুন্নত মিয়া। তাকে সুন্নত মিয়া ডাকলে সে রাগ করে। তাকে ডাকতে হয় গৌরনদীর সুন্নত। এই বিশেষ নামে তাকে কেন ডাকতে হয়— নাইমুল এখনো জানে না। অসীম সাহসী যুবক। প্রতিটি অপারেশনের পর সে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলে, শহিদ হওয়ার শখ ছিল, হইতে পারলাম না।

আফসোস। দেখি পরেরবার পারি কি-না। গ্রেনেডের থলি নিয়ে সে মাটিতে শুয়ে সাপের মতো ভঙ্গিতে আগায়। ক্রলিং-এর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। শত্রুর খুব কাছাকাছি গিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে গ্রেনেড চার্জ করে। বিড়বিড় করে বলে, 'যারে পক্ষী যা। জায়গা মতো যা।' তার পক্ষী বেশির ভাগ সময়ই জায়গা মতো যায়। সুন্নতের হাতের জোর অসম্ভব। গ্রেনেড থ্রোয়ারে গ্রেনেড পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত যায়। সে হাতে ছুড়েই চল্লিশ গজ পর্যন্ত পাঠাতে পারে।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খোলা নৌকায় নাইমুলের দল চলে এলো। আনন্দে দাঁত বের করে রফিক হেসে ফেলে বলল, এই তো আপনে আপনের লোক পাইছেন। আমারে বিদায় দেন। ছিরগেটে টান দিতে দিতে বাড়িত গিয়া ঘুমাই। নাইমুল বলল, যেখানে আছ সেখানে থাক। নড়বে না। অনেক কথা বলেছ। আর কোনো কথাও না।

দলটা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন। নাইমুল বলল, অপারেশনের শেষে আমরা খুব আরাম করে খাওয়া-দাওয়া করব। অপারেশনের আগে কোনো খাওয়া নাই। আমি সব রেকি করে রেখেছি। একটা গাইডও আমার সঙ্গে আছে। রফিক নাম।

রফিক সঙ্গে সঙ্গে বলল, এইটা ভুইল্যা যান কমান্ডার সাব। আমি আপনারার সাথে নাই। নতুন বিবাহ করে করেছি। ঘরে আমার কাঁচা বউ।

নাইমুল বলল, কাঁচা বউ পাকা বউ যাই থাকুক, তুমি আছ সঙ্গে। এখন তোমরা সবাই আমার প্ল্যান অব অ্যাকশান শোন। আমি পুরো ব্যাপারটা অন্যরকমভাবে সাজিয়েছি। মন দিয়ে শুনতে হবে। পরিকল্পনার পরিবর্তন হবে না। আমি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কিছু ঠিক করি না। এইসব সিদ্ধান্ত তর্ক-বিতর্কে ঠিক করা যায় না। ব্রিজ পাহারা দেয় ছয় থেকে সাতজন রাজাকারের একটা দল। মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গে দু'জন মিলিশিয়া থাকে। আজ তারা নেই।

প্রথমে আমরা তাদের কাছে খবর পাঠাব— আজ ভোররাতে ব্রিজ উড়ানো হবে। খবরটা বিশ্বাসযোগ্য হবে কারণ খবরটা সত্যি। ব্রিজ আমরা আজ রাতেই উড়াব। খবর শোনার পর এরা যা করবে তা হচ্ছে হয় সবাই মিলে থানায় মিলিটারির কাছে খবর দিতে যাবে। অথবা একদল যাবে আরেকদল ব্রিজ পাহারা দেয়ার নামে থাকবে। যারা থাকবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের পালিয়ে যাবার কথা। যদি পালিয়ে না যায় ভয়ের চোটে ফাঁকা গুলি করতে থাকবে।

একই সঙ্গে আমরা থানায় খবর পাঠাব যে ব্রিজ অ্যাটাক করা হবে। খবর পাঠানো হবে স্থানীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের মাধ্যমে। থানার মিলিটারিরা ব্রিজ রক্ষার জন্যে একদল মিলিটারি পাঠাবে। তাদের রুট একটাই ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক। আমাদের দলটা তিন ভাগ হবে। এক ভাগ সড়কে মিলিটারিকে

অ্যাম্বুশ করবে। এক ভাগ যাবে ব্রিজে, আর এক ভাগ থানা অ্যাটাক করবে। থানা অ্যাটাকে আমরা এনেগ্রা গ্রেনেড ব্যবহার করব। এসএমজি থাকবে ব্রিজের উপরে। এখন ঠিক করি কে কোন দিকে থাকবে। তার আগে শুনতে চাই কেউ কিছু কি বলবে?

রফিক প্রথম কথা বলল, তার কথা দুই শব্দের, 'আমারে খাইছে রে'।

রফিকের কথার পর পর মিস্টার স্প্রিং বলল, চিড়ামুড়ি যাই হোক, কিছু মুখে দিতে হবে।

ঝড়-বৃষ্টি যেমন আচমকা এসেছিল সে রকম আচমকা চলে গেল। রাত ন'টার দিকে মেঘের ফাঁকে চাঁদ দেখা গেল। চাঁদের আট তারিখ। চাঁদের আলো তেমন জোরালো না আবার খারাপও না। গৌরনদীর সুন্নত বলল, মেঘের মধ্যে জোছনা খারাপ জিনিস। এই জোছনায় ভূত দেখা যায়। আমি মিলিটারি ভয় পাই না। ভূত ভয় পাই।

শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হাশেম সাহেব যখন ঘুমুবার আয়োজন করেছেন, তখন তাঁর বাড়ির উঠানে কুকুর ডাকতে লাগল। কুকুরের ডাকের সঙ্গে মনে হলো, অনেক লোকজনও হাঁটাহাঁটি করছে। হাশেম চেয়ারম্যান ভীত গলায় বললেন, কে?

রফিক বলল, চেয়ারম্যান সাব আমি রফিক। উত্তরপাড়ার রফিক।

কী চাও?

একটু বাইর হন। মুক্তির কমান্ডার সাব আসছেন।

হাশেম চেয়ারম্যান একা বের হলেন না, তাঁর সঙ্গে বিশাল বাড়ির কয়েকটা দরজা এক সঙ্গে খুলে গেল। মেয়েদের কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। এর মধ্যে একটি মেয়ে বেশ রূপবতী। সেই মনে হয় হাশেম চেয়ারম্যানের— ভাটি অঞ্চলের স্ত্রী।

হাশেম চেয়ারম্যানের হাতে টর্চলাইট। গায়ে হাতকাটা পাঞ্জাবি। পরনে লুঙ্গি। তার কাছে মনে হচ্ছে লুঙ্গির আঁট নরম হয়ে এসেছে, যে-কোনো সময় লুঙ্গি খুলে পড়ে যাবে। তিনি এক হাতে লুঙ্গি ধরে আছেন। আরেক হাতে টর্চ। তিনি ভীত গলায় বললেন, কে কে?

নাইমুল বলল, আমরা মুক্তিবাহিনীর। আপনি ভালো আছেন?

হাশেম চেয়ারম্যান জড়ানো গলায় বললেন, জি ভালো আছি। জি ভালো আছি।

নাইমুল বলল, ভয় পাচ্ছেন নাকি?

হাশেম চেয়ারম্যান তার জবাবে কাশতে শুরু করল। মেয়ে মহলে কান্নার শব্দ আরো জোরালো হলো। একজন বৃদ্ধা মহিলা ছুটে এসে হাশেম চেয়ারম্যানের হাত ধরল। সম্ভবত চেয়ারম্যান সাহেবের মা। বৃদ্ধা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, বাবারা আমার একটা কথা শোন।

নাইমুল বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমি কখনো বাঙালি মারি না। কান্না বন্ধ করেন।

সব মহিলার কান্না একসঙ্গে থেমে গেল। নাইমুল শান্ত গলায় বলল, আমার ছেলেরা এখানে এসেছে রেলের পুল উড়ায়ে দিতে। তারা এই কাজটা শেষ করে আপনার এখানে খানা খাবে।

হাশেম চেয়ারম্যান বলল, অবশ্যই, অবশ্যই। অবশ্যই খানা খাবেন। অবশ্যই।

গরম ভাত করবেন। ঝাল দিয়ে মুরগির সালুন।

বৃদ্ধা বললেন, বাবারা পোলাও করি?

করতে পারেন। অনেক দিন পোলাও খাওয়া হয় না।

হাশেম চেয়ারম্যান বলল, আপনারা ঘরে এসে বসেন। চা খান, চা বানাতে বলি।

নাইমুল বলল, চা খাব না। আমরা এখন ব্রিজের কাছে যাব। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ?

আপনি থানায় যাবেন। থানায় গিয়ে মিলিটারি কমান্ডারকে বলবেন মুক্তিবাহিনী ঢুকেছে। তারা ব্রিজ উড়াতে এসেছে। যা সত্য তাই বলবেন। ব্রিজ উড়াবার পর আপনার বাড়িতে যে পোলাও মুরগির মাংস খাব তাও বলতে পারেন, অসুবিধা নাই।

বৃদ্ধা বললেন, আমার ছেলে কোনোখানে যাবে না। তোমরা ফাঁকি দিয়া তারে ঘর থাইক্যা বাইর করতাছ। টাকা-পয়সা কী চাও বলো দিতাছি। সিন্দুকে স্বর্ণের অলঙ্কার আছে। অলঙ্কার নিবা?

নাইমুল বলল, বুড়িমা, আপনি যদি আপনার ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাহলে আমি যা বলছি তা করুন। আমি কথা চালাচালি পছন্দ করি না। একেবারেই করি না।

রফিক বলল, চাচিআম্মা, আমরার কমান্ডার সাব এককথার মানুষ। উনার কথা না শুনলে বিপদ আছে।

নাইমুল রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যাবে ব্রিজে। রাজাকার গ্রুপকে ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার খবর দিবে। তুমি কাজটা ঠিকমতো করছ কি-না তা দেখার জন্যে আড়াল থেকে তোমার পিছনে পিছনে আমাদের একজন যাবে। বেতালা কিছু সন্দেহ হলেই সে গুলি করবে। বুঝতে পারছ ?

রফিকের মুখ হা হয়ে গেল। চোখ কোটর থেকে আরো খানিকটা বের হয়ে এলো।

গেরিলা অপারেশনে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যা ভাবা গিয়েছিল তা হয় না। তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়। সব সময় যে সিদ্ধান্ত পাল্টাবার সুযোগ পাওয়া যায় তাও না। একটা মাঝারি আকৃতির দল কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল, তারা একত্রিত হবার সুযোগই পায় না।

এই ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে সব কিছু হলো নাইমুলের পরিকল্পনা মতো। রাজাকারদের দল ব্রিজ আক্রমণ হবে খবর পাওয়া মাত্র থ্রি নট থ্রি রাইফেল রেখে পালিয়ে গেল।

থানা কম্পাউন্ড থেকে আটজন মিলিটারির একটা ছোট্ট দল গেট থেকে বের হয়ে আবার ঢুকে পড়ল।

নাইমুলের কাছে রাখা গ্রেনেড থ্রোয়ার ঠিকমতো কাজ করল। রাইফেলের নল থেকে দশ-বার গজ দূরে গিয়ে ফাটল না। পর পর দু'টা এনের্গা গ্রেনেড দেয়াল ফুটো করে ভেতরে ঢুকে গেল।

রাস্তার পাশে অ্যাম্বুশ করে রাখা দলটাকে নাইমুল ঠিক সময়ে থানার দুই দিকে জড় করতে পারল।

মিলিটারির অতি ক্ষুদ্র দলের কাছেও লাইট মেশিনগান থাকে। থানা থেকে লাইট মেশিনগানের কোনো গুলি এলো না। হয় তাদের এলএমজি'তে কোনো সমস্যা হয়েছে। কিংবা তাদের গানার নেই।

থেমে যাওয়া বৃষ্টি আবারো শুরু হলো। ঘনঘন বাজ ডাকতে লাগল। থানা কম্পাউন্ডের ভেতরের একটা তালগাছে বাজ পড়ল। সেই শব্দ হলো ভয়াবহ। মিলিটারিরা এই বজ্রপাতকে অবশ্যই কামানের আক্রমণ ধরে নিল। তারা গুলিবর্ষণ বন্ধ করল। বাঁশের মাথায় সাদা কাপড় ঝুলিয়ে তারা আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত করল।

নাইমুলের দল গুলিবর্ষণ বন্ধ করল। নাইমুল শান্ত কিন্তু উঁচু গলায় বলল, Hello come out. We have stopped firing. মাত্র পাঁচজন মিলিটারির ছোট্ট

একটা দল হাত উঁচু করে বের হয়ে এলো। তাদের সঙ্গে আছে তিনজন পাকিস্তানি পুলিশ। তাদের পেছনে থানার ওসি। নাইমুল উঠে এলো থানা কম্পাউন্ডের পাকা বারান্দায়। থানার ওসির দিকে তাকিয়ে বলল, ওসি সাহেব ভালো আছেন?

হতভম্ব ওসি বলল, জি স্যার।

আপনাদের বিশাল পুলিশ বাহিনী স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করছে আর আপনি এদের হয়ে কাজ করছেন— এটা কেমন কথা? আপনি একটা কাজ করুন মিলিটারিদের বেঁধে ফেলুন।

জি স্যার।

এরা সংখ্যায় এত কম কেন? বেশি থাকার কথা না?

বেশিই ছিল। পরশু সকালবেলা জরুরি ম্যাসেজ পাঠিয়ে নিয়ে গেছে।

এখানে ওয়্যারলেস আছে?

জি স্যার আছে।

থানা যে অ্যাটাক হয়েছে সেই ম্যাসেজ কি গেছে?

জি না।

যায় নাই কেন?

অপারেটর নাই স্যার।

মিলিটারিদের বেঁধে সঙ্গে করে নিয়ে ব্রিজের কাছে যান। ব্রিজ উড়ানোর ব্যাপারে সাহায্য করুন।

জি স্যার।

নাইমুল মিলিটারি ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় ইংরেজিতে বলল, তোমরা আত্মসমর্পণ করেছ। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তোমাদের দেখা আমার দায়িত্ব। সমস্যা হচ্ছে আমরা একটা গেরিলা ইউনিট। দেশের ভেতর ঘুরে ঘুরে কাজ করি। তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে ঘোরা আমার পক্ষে সম্ভব না। ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব না। তাছাড়া আমাদের মুক্তিবাহিনীর অনেক সদস্য তোমাদের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের প্রত্যেককে তোমরা ফায়ারিং স্কোয়াডের কাছে পাঠিয়েছ। তোমাদের বেলাতেই বা অন্যরকম হবে কেন?

হাশেম চেয়ারম্যান অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে দেখলেন মুক্তিযোদ্ধার দলটা ফজরের আগে আগে তাঁর বাড়িতে খেতে এলো। দলের কমান্ডার খাবার সময় বিনীত গলায় বাড়ির মহিলাদের কাছে কাঁচামরিচ চাইল। এই ভদ্র-বিনয়ী ছেলে নাকি

কিছুক্ষণ আগে পাঁচজন মিলিটারি, তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশকে ব্রিজের উপর থেকে গুলি করে পানিতে ফেলে দিয়েছে।

রফিক গোলাগুলি শুরু হওয়া মাত্র পালিয়ে গিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার সময় সে আবারও উপস্থিত হলো এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে খাওয়ার তদারকি করতে লাগল। একবার শুধু ফাঁক পেয়ে নাইমুলকে বলল, স্যার, যতদিন জীবন আছে আমি আপনার সাথে আছি। আর আপনেরে ছাইড়া যাব না। ভয় পাইয়া দৌড় দিছিলাম। আমি গু খাই।

রফিক তার কথা রেখেছিল। কাঁচপুর অপারেশনে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে নাইমুলের সঙ্গেই ছিল। সে খুব ভালো এসএমজি চালাতে শিখেছিল। কাঁচপুর অপারেশনে গুলিবিদ্ধ হবার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এসএমজিতে গুলিবর্ষণ করেছিল বলেই নাইমুল তার দল নিয়ে পালাতে পেরেছিল। একই ধরনের বীরত্ব দেখিয়েছিলেন আরেকজন। তিনি সিপাহি হামিদুর রহমান। ধলই বর্ডার আউট পোস্ট আক্রমণের সময় আমৃত্যু মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে তিনি তাঁর প্লাটুনকে পশ্চাদ অপসারণের সুযোগ করে দেন। তাঁর প্রাণের বিনিময়ে পুরো প্লাটুন রক্ষা পায়। সিপাহি হামিদুর রহমানকে বীরশ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। রফিকের নাম মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাতেও নেই।

তাঁর চোখ কালো চশমায় ঢাকা। গায়ে ধবধবে সাদা হাফ হাতা গেঞ্জি। বসেছেন ঋজু ভঙ্গিতে। বাঁ হাতের কব্জিতে পরা ঘড়ির বেল্ট সামান্য বড় হয়ে যাওয়ায় হাত নাড়ানোর সময় ঘড়ি উঠানামা করছে। এতে তিনি সামান্য বিরক্ত, তবে বিরক্তি বোঝার উপায় নেই। যে চোখ মানবিক আবেগ প্রকাশ করে, সেই চোখ তিনি বেশিরভাগ সময় কালো চশমায় ঢেকে রাখতে ভালোবাসেন। মানুষটার চারপাশে এক ধরনের রহস্য আছে।

তাঁর নাম জিয়াউর রহমান। তিনি তাঁবুর বাইরে কাঠের ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছেন। চারপাশের দৃশ্য অতি মনোরম। যে দিকে চোখ যায় জঙ্গলময় উঁচু পাহাড়। কোনো জনবসতি নেই। জায়গাটা মেঘালয় রাজ্যের ছোট্ট শহর তুরা থেকেও মাইল দশেক দূরে। নাম তেলঢালা। মেজর জিয়া ঘন জঙ্গলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ ফেরালেন আকাশের দিকে। আকাশে মেঘের আনাগোনা। এই মেঘে বৃষ্টি হয় না, তবে এই অঞ্চলের বৃষ্টির ঠিক নেই। যে-কোনো মুহূর্তে ঝুমঝুমিয়ে বৃষ্টি নামতে পারে।

প্রায় স্বর্গের কাছাকাছি এই অপূর্ব বনভূমিতে জড়ো হয়েছে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম ব্যাটালিয়ান। তাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে দুর্ধর্ষ এক পদাতিক ব্রিগেড, নাম 'জেড ফোর্স'। জিয়াউর রহমানের নামের আদ্যক্ষর জেড দিয়ে এই ফোর্সের নামকরণ।

জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়ার মন খানিকটা খারাপ। কারণ তিনি খবর পেয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি তাঁর বিষয়ে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। মেজর জিয়ার নির্দেশে প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের কামালপুর বর্ডার আউটপোস্ট আক্রমণ জেনারেল ওসমানীর মতে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। কামালপুর আক্রমণ করতে গিয়ে প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের তিনজন নিহত হন, ছেষট্টিজন আহত। ডেল্টা কোম্পানির কমান্ডার সালাহউদ্দিন শহিদ হন। ব্রাভো কোম্পানির কমান্ডার হাফিজউদ্দিন গুরুতর আহত হন। দুটো কোম্পানিই কমান্ডারবিহীন হয়ে পড়ে।

জেনারেল ওসমানীর মতে, যেহেতু আমাদের লোকবল অস্ত্রবল কম সেহেতু রক্তক্ষয়ী দুর্ধর্ষ পরিকল্পনায় যাওয়া ঠিক না।

মেজর জিয়ার মত হচ্ছে, আমি দেশের ভেতর যুদ্ধ করছি। কখন কী করব সেই সিদ্ধান্ত আমি নেব। সেনাবাহিনী প্রধান— যিনি থাকেন বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরে— তিনি পরিস্থিতি জানেন না।

মেজর জিয়া এফ ফোর্সের অধিনায়ক মেজর কে এম শফিউল্লাহ এবং কে ফোর্সের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে এক বৈঠকেও খোলাখুলি নিজের এই মত প্রকাশ করেন। তাঁর কথা হলো, গেরিলা ধরনের এই যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের প্রয়োজন নেই। আমাদের দরকার কমান্ড কাউন্সিল। সবচে' বড় কথা সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কেউ সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পারেন না। মেজর জিয়ার এই মনোভাব জেনারেল ওসমানীর কানে পৌঁছেছিল। সঙ্গত কারণেই এই মন্তব্য তাঁর ভালো লাগে নি।

তাঁবুর ভেতর কিছু সময় কাটিয়ে মেজর জিয়া আবার বের হয়ে আগের জায়গায় বসলেন। এবার তাঁর হাতে দু'লাইনের একটা ইংরেজিতে লেখা চিঠি। চিঠিটি তিনি লিখেছেন পাকিস্তানের মেজর জেনারেল জামশেদকে। এখন তিনি ঢাকায় ৩৬তম ডিভিশনের প্রধান। মেজর জিয়া যখন পাঞ্জাব রেজিমেন্টে ছিলেন, তখন মেজর জেনারেল জামশেদ ছিলেন তাঁর কমান্ডিং অফিসার।

চিঠিতে মেজর জিয়া লিখেছেন—

> Dear General Jamshed,
>
> My wife Khaleda is under your custody. If you do not treat her with respect, I would kill you someday.
>
> Major Zia

এই চিঠি দেয়া হলো মেজর শাফায়েতকে। মেজর শাফায়েত চিঠিটি ঢাকায় পোস্টবক্সের ডাকবাক্সে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। মজার ব্যাপার হলো, এই চিঠি মেজর জেনারেল জামশেদের হাতে পৌঁছেছিল।*

---

*সূত্র : *রক্তে ভেজা একাত্তর*
মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ

সূত্র : দৈনিক বাংলা
তারিখ : ২রা জানুয়ারি, ১৯৭২
শিরোনাম : মেজর জিয়ার পরিবারের উপর পাক বাহিনীর নির্যাতনের বিবরণ

মেজর জিয়া যখন দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন হানাদার খান সেনারা তখন তাঁর পরিবার পরিজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

॥ মনজুর আহমদ প্রদত্ত ॥

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বীর নায়ক মেজর (বর্তমানে কর্নেল) জিয়া যখন হানাদার পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাদেরকে নাজেহাল করে তুলছিলেন, তখন তাঁর প্রতি আক্রোশ মেটাবার ঘৃণ্য পন্থা হিসেবে খান সেনারা নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর আত্মীয়স্বজন পরিবার-পরিজনদের ওপর।

তাদের এই প্রতিহিংসার লালসা থেকে রেহাই পান নি কর্নেল জিয়ার ভায়রা শিল্পোন্নয়ন সংস্থার সিনিয়র কো-অর্ডিনেশন অফিসার জনাব মোজাম্মেল হক।

চট্টগ্রাম শহর শত্রু কবলিত হবার পর বেগম খালেদা জিয়া যখন বোরখার আবরণে আত্মগোপন করে চট্টগ্রাম থেকে স্টিমারে পালিয়ে নারায়ণগঞ্জে এসে পৌঁছেন, তখন জনাব মোজাম্মেল হকই তাঁকে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। সেদিন ছিল ১৬ই মে। ঢাকা শহরে কারফিউ। নারায়ণগঞ্জেও সন্ধ্যা থেকে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। এরই মধ্যে তিনি তাঁর গাড়িতে রেডক্রস ছাপ এঁকে ছুটে গিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জ টার্মিনালে।

বেগম জিয়াকে নিয়ে আসার দিন দশেক পর ২৬শে মে শিল্পোন্নয়ন সংস্থায় হক নাম সংবলিত যত অফিসার আছেন সবাইকে ডেকে পাক সেনারা কর্নেল জিয়ার সঙ্গে কারোর কোনো

আত্মীয়তা আছে কিনা জানতে চায়। জনাব মোজাম্মেল হক বুঝতে পারলেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তিনি সেখানে কর্নেল জিয়ার সাথে তাঁর আত্মীয়তার কথা গোপন করে অসুস্থতার অজুহাতে বাসায় ফিরে আসেন এবং অবিলম্বে বেগম জিয়াকে তাঁর বাসা থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

কিন্তু উপযুক্ত কোনো স্থান না পেয়ে শেষপর্যন্ত ২৮শে মে তিনি তাঁকে ধানমণ্ডিতে তাঁর এক মামার বাসায় কয়েক দিনের জন্য রেখে আসেন এবং সেখান থেকে ৩রা জুন তাঁকে আবার জিওলজিক্যাল সার্ভের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জনাব মুজিবুর রহমানের বাসা এবং এরও কদিন পরে জিওলজিক্যাল সার্ভের ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব এস কে আব্দুল্লাহর বাসায় স্থানান্তরিত করা হয়।

এরই মধ্যে ১৩ই জুন তারিখে পাক বাহিনীর লোকেরা এসে হানা দেয় জনাব মোজাম্মেল হকের বাড়িতে। জনৈক কর্নেল খান এই হানাদার দলের নেতৃত্ব করছিল। কর্নেল খান বেগম জিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং জানায় যে, এই বাড়িতে তারা বেগম জিয়াকে দেখেছে। জনাব হকের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর না পেয়ে তাঁর দশ বছরের ছেলে ডনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ডন কর্নেল খানকে পরিষ্কারভাবে জানায় যে, গত তিন বছরে সে তার খালাকে দেখে নি।

সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে খান সেনারা তাঁর বাড়ি তল্লাশী করে। কিন্তু বেগম জিয়াকে সেখানে না পেয়ে হতোদ্যম হয়ে ফিরে যায়। যাবার আগে জানিয়ে যায়, সত্যি কথা না বললে আপনাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

এরপরই জনাব হক বুঝতে পারেন সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করা হচ্ছে। যেখানেই যান সেখানেই তাঁর পেছনে লেগে থাকে ফেউ। এই অবস্থায় তিনি মায়ের অসুখের নাম করে ছুটি নেন অফিস থেকে এবং সপরিবারে ঢাকা ছেড়ে যাবার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

ব্যবস্থা অনুযায়ী ১লা জুলাই গাড়ি গ্যারেজে রেখে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাঁরা দুটি অটোরিকশায় গিয়ে ওঠেন। উদ্দেশ্য ছিল ধানমণ্ডিতে বেগম জিয়ার মামার বাসায় গিয়ে আপাতত ওঠা। কিন্তু সায়েন্স ল্যাবরেটরি পর্যন্ত আসতেই একটি অটোরিকশা তাঁদের বিকল হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাঁরা কাছেই গ্রীনরোডে এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে ওঠেন। কিন্তু এখানে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল এক বিরাট বিস্ময়। জনাব হক এখানে

গিয়ে উঠতেই তাঁর এই বিশিষ্ট বন্ধুর স্ত্রী তাঁকে জানান যে, কর্নেল জিয়ার লেখা চিঠি তাঁদের হাতে এসেছে। চিঠিটা জনাব হককেই লেখা এবং এটি তাঁর কাছে পাঠাবার জন্যে কয়েকদিন ধরেই তাঁকে খোঁজ করা হচ্ছে।

তাঁর কাছে লেখা কর্নেল জিয়ার চিঠি এ বাড়িতে কেমন করে এলো তা বুঝতে না পেরে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হন এবং চিঠিটা দেখতে চান। তাঁর বন্ধুর ছেলে চিঠিটা বের করে দেখায়। এটি সত্যই কর্নেল জিয়ার লেখা কিনা বেগম জিয়াকে দিয়ে তা পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্যে তিনি তাঁর বন্ধুর ছেলের হাতে দিয়েই এটি জিওলজিক্যাল সার্ভের জনাব মুজিবর রহমানের কাছে পাঠান।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় জনাব হক তাঁর এই বন্ধুর বাসায় রাতের মতো আশ্রয় চান। তাঁদেরকে আরো নিরাপদ স্থানে রাখার আশ্বাস দিয়ে রাতে তাঁদেরকে পাঠানো হয় সূত্রাপুরের একটি ছোট্ট বাড়িতে। তাঁর বন্ধুর ছেলেই তাঁদেরকে গাড়িতে করে এই বাড়িতে নিয়ে আসে। এখানে ছোট্ট একটি ঘরে তাঁরা আশ্রয় করে নেন।

কিন্তু পরদিনই তাঁরা দেখতে পেলেন পাক-বাহিনীর লোকেরা বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। জনাদশেক সশস্ত্র জওয়ান বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে। এই দলের প্রধান ছিল ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ আর ক্যাপ্টেন আরিফ। তারা ভেতরে ঢুকে কর্নেল জিয়া ও বেগম জিয়া সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জনাব হক ও তাঁর স্ত্রী জিয়ার সাথে তাদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে যান। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ জনাব ও বেগম হকের সাথে তোলা বেগম জিয়ার একটি গ্রুপ ছবি বের করে দেখালে তাঁরা জিয়ার সাথে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। তবে তাঁরা জানান কর্নেল ও বেগম জিয়া কোথায় আছেন তা তাঁরা জানেন না।

এই পর্যায়ে বিকেল পাঁচটার দিকে জনাব হক ও তাঁর স্ত্রীকে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িতে তুলে মালিবাগের মোড়ে আনা হয় এবং এখানে মৌচাক মার্কেটের সামনে তাঁদেরকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়। এখানেই তাঁদেরকে জানান হয় যে বেগম জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর তাদেরকে দ্বিতীয় রাজধানী এলাকা ঘুরিয়ে আবার সূত্রাপুরের বাসায় এনে ছেড়ে দেয়া হয়। এখান থেকে রাতে তাঁরা গ্রীনরোডে জনাব হকের বন্ধুর বাসায় আসেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসেন খিলগাঁয়ে তার নিজের বাসায়।

উল্লেখযোগ্য যে এই দিনই জনাব এস কে আব্দুল্লাহ্‌র সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে বেগম জিয়া ও জনাব আব্দুল্লাহ্‌কে এবং একই সাথে জনাব মুজিবর রহমানকেও পাক-বাহিনী গ্রেফতার করে। এবং ৫ই জুলাই তারিখে জনাব মোজাম্মেল হক অফিসে কাজে যোগ দিলে সেই অফিস থেকেই ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।

ক্যান্টনমেন্টে তাঁকে এফ আই ইউ (ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন ইউনিট) অফিসে রাত দশটা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হয় এবং দশটায় তাঁকে স্কুল রোডের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেলে প্রবেশের আগে তাঁর ঘড়ি, আংটি খুলে নেয়া হয় এবং মানিব্যাগটিও নিয়ে নেয়া হয়। সারাদিন অভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কিছুই খেতে দেয়া হয় নি।

পরদিন সকালে তাঁকে এক কাপ মাত্র ঠাণ্ডা চা খাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের অফিসে। সাজ্জাদ তাঁর কাছে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানতে চায়। তিনি তাঁর কোনো পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন। ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ এতে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করে এবং শাস্তি হিসেবে তাঁকে বৈদ্যুতিক শক দেবার হুমকি দেখায়। কিন্তু এরপরও কোনো কথা আদায় করতে না পেরে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলোর নিচে শুইয়ে রাখার হুকুম দেয়।

হুকুম মতো রাতে তাঁকে তাঁর সেলে চিৎ করে শুইয়ে মাত্র হাত দেড়েক ওপরে ঝুলিয়ে দেয় পাঁচশ পাওয়ারের দুটি অত্যুজ্জ্বল বাল্ব। প্রায় চারঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়।

পরদিন আবার তাঁকে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সাজ্জাদ আবার তাঁর পরিকল্পনার কথা জানতে চায়। জানতে চায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কী কী কথা হয়েছে, তিনি ভারতে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা। জনাব হক এসব কিছুই অস্বীকার করলে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁর ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত হানে। এরপর তাঁর সেলে চব্বিশ ঘণ্টা হাজার ওয়াটের বাতি জ্বালিয়ে রাখার হুকুম দেয়।

বেলা একটায় তাঁকে সেলে এনেই বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ঘণ্টা কয়েক পরেই তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন। চিৎকার করে তিনি একটি কথাই বলতে থাকেন— আমাকে একবারেই মেরে ফেল। এভাবে তিলে তিলে মেরো না।

তিনি যখন অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করছিলেন, তখন তাঁর

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন পাঠান হাবিলদার। তাঁর এই করুণ আর্তি বোধ হয় হাবিলদারটি সইতে পারে নি। তারও হৃদয় বোধহয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল মানুষের ওপর মানুষের এই নিষ্ঠুর জুলুম দেখে। আর তাই বোধহয় সে সেন্ট্রিকে ডেকে হুকুম দিয়েছিল বাতি নিভিয়ে দিতে। বলেছিল, কোনো জীপ আসার শব্দ পেলেই যেন বাতি জ্বালিয়ে দেয়, আবার জীপটি চলে যাবার সাথে সাথেই যেন বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়।

এরপর ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে আরো কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নতুন ধরনের নির্যাতন চালায়। তাঁর কাছ থেকে সারাদিন ধরে একটির পর একটি বিবৃতি লিখিয়ে নেয়া হয় এবং তাঁর সামনেই সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে আবার তাঁকে সেগুলি লিখতে বলা হয়। এবং যথারীতি আবার তা ছিঁড়ে ফেলে আবার সেই একই বিবৃতি তাঁকে লিখতে বলা হয়। এবং আবার তা ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই অবস্থায় ক্লান্তি ও অবসন্নতায় তিনি লেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। এদিকে হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলোর নিচে থাকার ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেন। দিন ও রাতের মধ্যে কোনো পার্থক্যই বুঝতে পারতেন না।

২৬শে জুলাই বিকেলে তাঁকে ইন্টার স্টেটসক্রিনীং কমিটির (আই এস এস সি) ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে একটি ছোট্ট কামরায় তাঁরা মোট ১১০জন আটক ছিলেন। বিকেল পাঁচটার দিকে তাঁকে বের করে রান্নাঘরের বড় বড় পানির ড্রাম ভরার কাজ দেয়া হয়। এই কাজে আরো একজনকে তাঁর সাথে লাগানো হয়। তিনি হচ্ছেন, জিওলজিক্যাল সার্ভের জনাব এস কে আব্দুল্লাহ্। তাঁরা দুজনে প্রায় পোয়া মাইল দূরের ট্যাপ থেকে বড় বড় বালতিতে করে পানি টেনে তিনটি বড় ড্রাম ভরে দেন। রাতে লাইন করে দাঁড় করিয়ে তাঁদেরকে একজন একজন করে খাবার দেয়া হয়। এতদিন পরে এই প্রথম তিনি খেতে পান গরম ভাত ও গরম ডাল।

পরদিন সকালে তাঁর এবং আরো অনেকের মাথার চুল সম্পূর্ণ কামিয়ে দেয়া হয়।

এখানে বিভিন্ন কামরায় তাঁকে কয়েকদিন আটকে রাখার পর ৬ই আগস্ট নিয়ে যাওয়া হয় ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন সেন্টারে (এফ আই সি)। মেজর ফারুকী ছিল এই কেন্দ্রের প্রধান এবং এখানে সকলের ওপর নির্যাতন করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল সুবেদার মেজর

নিয়াজী। ফারুকী এখানে তাঁকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাকে বিবৃতি দিতে বলে। কিন্তু বিবৃতি লেখানোর নাম করে সেই পুরনো নির্যাতন আবার শুরু হয়। একটানা তিনদিন ধরে তিনি একই বিবৃতি একের পর এক লিখে গেছেন এবং তাঁর সামনে তা ছিঁড়ে ফেলে আবার এই একই বিবৃতি তাঁকে লিখতে বলা হয়েছে।

৯ই আগস্ট তাঁকে দ্বিতীয় রাজধানীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এখানে বিভিন্ন কক্ষে তাঁকে প্রায় দেড়মাস আটক রাখার পর ২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ৩০শে অক্টোবর তিনি মুক্তি পান।

ইতিমধ্যে রাজাকাররা তিনদফা তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়ে সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যায়। সর্বশেষ গত ১৩ই ডিসেম্বর তারা তাঁর গাড়িটিও নিয়ে যায়।

---

*সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ৮ম খণ্ড* (পৃষ্ঠা : ৪৭৬)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়

কলিমউল্লাহ্ তার স্ত্রী, শাশুড়িকে নিয়ে বর্তমানে নিউ পল্টনে যে বাড়িতে বাস করছে সেই বাড়ির নাম হেনা কুটির। বাড়িটা দোতলা। সব মিলিয়ে আটটা কামরা। দু'টা দক্ষিণমুখি। একটা দক্ষিণমুখি ঘরে সে তার স্ত্রী মাসুমাকে নিয়ে থাকে। অন্যটায় তার শাশুড়ি, বড় মেয়ে মরিয়ম, ছোট মেয়ে মাফরুহা এবং ছোট ছেলেটাকে নিয়ে থাকেন। মরিয়মের জন্যে আলাদা ঘর দেয়া হয়েছে। সে সেখানে থাকে না। একা তার ভয় লাগে। বাড়ির সামনে ছোট্ট লনের মতো আছে। লনে দেশী ফুলের গাছ। বাড়ির এক পাশে হাসনাহেনার ঝাড়। বাড়ির পেছনে বেশ অনেকখানি জায়গা। সেখানে দু'টা বড় কামরাঙ্গা গাছ আছে। একটা গাছের গুড়ি শ্বেতপাথরে বাঁধানো। কলিমউল্লাহ্ রোজ কিছু সময় এখানে কাটায়। তার হাতে তখন কাগজ-কলম থাকে। কামরাঙ্গা গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে গাছের চিড়ল চিড়ল পাতা দেখতে তার ভালো লাগে। নতুন কবিতা নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে। জীবন এত আনন্দময় কেন— এই নিয়ে ভাবতেও ভালো লাগে। ভালো লাগার ষোল কলা পূর্ণ হতো, যদি নতুন কোনো কবিতা লেখা হতো। বিয়ের পর থেকে তার মাথায় কবিতা আসছে না। একটাও না। একদিন শুধু একটা লাইন এসেছিল—

কামনায় রাঙ্গা ছিল কামরাঙ্গা ফুল

এইখানেই সমাপ্তি। দ্বিতীয় লাইনটা আসে নি। প্রথম লাইনটাও মাথা থেকে যায় নি। কলিমউল্লাহ্ এখন নিশ্চিত— প্রথম লাইনটা মাথা থেকে না তাড়ালে নতুন কিছু আসবে না। তার এখন প্রধান চেষ্টা মাথা থেকে প্রথম লাইন সরানো। ব্যাপারটা খুব সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। গ্রামোফোনের প্যাঁচকাটা রেকর্ডের মতো একটা লাইনই শুধু মাথায় ঘুরপাক খায়। কবি হওয়ার যন্ত্রণা আছে। সাধারণ মানুষ এই যন্ত্রণা থেকে অবশ্যই মুক্ত।

নতুন বাড়ি কলিমউল্লাহর স্ত্রীর খুবই পছন্দ। মাসুমা জিজ্ঞেস করেছে, এই বাড়ি আসলে কার? কলিমউল্লাহ্ বলেছে, তোমার।

মাসুমা বলেছে, আমার হবে কীভাবে ? বাড়ি যদি আমার হতো তাহলে বাড়ির নাম হতো মাসুমা কুটির। বাড়ির নাম তো হেনা কুটির।

কলিমউল্লাহ হাই তুলতে তুলতে বলেছে, বাড়ির নতুন নামের শ্বেতপাথর যখন বসবে তখন টের পাবে। অর্ডার দেয়া হয়েছে। সাদা পাথরে কালো অক্ষরে বাড়ির নাম লেখা হবে। এতদিনে হয়ে যেত, কারিগর নেই বলে হচ্ছে না।

কী নাম ? 'মাসুমা কুটির' ?

না। বাড়ির নাম রেখেছি 'মেঘবালিকা'।

'মেঘবালিকা'টা কে ?

তুমি। 'মেঘবালিকা' কবিতা তোমাকে নিয়ে লিখেছি, ভুলে গেছ ? এত ভুলোমনা হলে সংসার চলবে ?

সত্যি করে বলো তো বাড়িটা কার ?

এক হিন্দু উকিলের বাড়ি ছিল। ইন্ডিয়ায় পালায়ে গেছে। আমি বন্দোবস্ত নিয়েছি।

কীভাবে বন্দোবস্ত নিয়েছ ?

আছে, আমার কানেকশন আছে।

দেশ স্বাধীন হলে তো এই বাড়ি তোমার থাকবে না।

কলিমউল্লাহ বিরক্ত হয়ে বলল, দেশ স্বাধীন হবে তোমাকে কে বলেছে ?

মাসুমা অবাক হয়ে বলল, দেশ স্বাধীন হবে না ?

কোনোদিন না। পটকা ফুটিয়ে দেশ স্বাধীন করতে লাগবে খুব কম করে হলেও একশ' পঞ্চাশ বছর। বাঙালি জাতি কী রকম জানো ? বাঙালি জাতি হলো স্ফুলিঙ্গ জাতি। যে-কোনো বিষয়ে উৎসাহে স্ফুলিঙ্গের মতো ঝলমল করে। সেই উৎসাহ ধপ করে নিভে যায়। স্ফুলিঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা জানো ?

না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণ কালের ছন্দ
> উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল তাতেই তার আনন্দ।

মাসুমা মুগ্ধ গলায় বলল, এত কবিতা তুমি জানো, আশ্চর্য! মাসুমা যতই তার স্বামীকে দেখছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে। প্রায়ই তার মনে হয়, একটা মানুষ একই সঙ্গে এত জ্ঞানী এবং এত ভালো হয় কীভাবে ? ভাগ্যিস দেশে একটা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে বলেই তো এমন একজন অসাধারণ মানুষের সঙ্গে হুট

করে তার বিয়ে হয়ে গেল। যুদ্ধ যদি না হতো আর বাবা যদি তাদের সঙ্গে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই তার বিয়ের জন্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার খোঁজা হতো। কবি খোঁজা হতো না।

মাসুমা এখন তার স্বামীর প্রতিটি কথা মনে-প্রাণে শুধু যে বিশ্বাস করে তাই না— কথাগুলি অন্যদের শোনানোর দায়িত্বও অনুভব করে। মরিয়ম এখন তার মেঝ বোনকে ডাকে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'। মাসুমা এতে রাগ করে না। সে আনন্দই পায়।

রাতের খাবার পর কলিমউল্লাহ সবাইকে নিয়ে টিভিতে খবর দেখে। খবর দেখার পর দেশের অবস্থা নিয়ে গল্পগুজব করে। এই সময়টা মাসুমার খুব ভালো কাটে। গল্প বলার সময়ই তার মনে হয়— একটা মানুষ এত সুন্দর করে কথা বলে কীভাবে! আর কত তার আদব-কায়দা! স্ত্রী সামনে থাকার পরেও সে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। কথা বলে তার শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে। কী মিষ্টি করেই না সে মা ডাকে! সব মানুষ তাদের শাশুড়িকে আম্মা ডাকে। শুধু এই মানুষটা ডাকে মা। মাসুমার মনে হয়, শুধুমাত্র একজন কবির পক্ষেই তার শাশুড়িকে এত মিষ্টি করে মা ডাকা সম্ভব।

মা মন দিয়ে শোনেন। আমাদের জাতিগত সমস্যা হচ্ছে, আমরা কোনো কথা মন দিয়ে শুনি না। কান দিয়ে শুনি। আমরা অতীত নিয়ে হৈচৈ করি— ভবিষ্যতে কী আসছে সেটা নিয়ে ভাবি না। ঘটনার এ্যানালাইসিস করতে পারি না। আমি আজ একটা এ্যানালাইসিস দেব। দেখেন আপনার কেমন লাগে।

মুক্তিযুদ্ধের নামে যে পটকা ফাটাফাটি হচ্ছে তার পেছনের প্রধান মানুষ কে? শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি কোথায়? জেলে। তার কপালে কী আছে? ফাঁসির দড়ি। কাজেই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ। ফুল স্টপ। কমা সেমিকোলন না, একেবারে ফুলস্টপ।

বাকি থাকল কারা? আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। তারা কী করছেন? একে একে দল ছেড়ে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। আজো একজন করেছেন। চট্টগ্রামের এমপি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। কিছুক্ষণ আগেই নিউজে দেখলেন। দেখলেন না? গত সপ্তাহে বগুড়ার দুই আওয়ামী এমপি পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিল। এরা কেউ বেকুব না। এরা বাতাস বোঝে। কখন কোন দলে যেতে হবে জানে।

যারা প্রথম ধাক্কায় ইন্ডিয়ায় চলে গেছে তারা পড়েছে বেকায়দায়। ইচ্ছা থাকলেও ইয়াহিয়ার সঙ্গে যোগ দিতে পারছে না। তারা আছে সুযোগের অপেক্ষায়। ফিরে এলো বলে।

তারা যে আশা করছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের জন্যে যুদ্ধ করবে, সেই আশার গুড়ে বালি শুধু না, আশার গুড়ে গু। মা, একটা খারাপ কথা বলে ফেলেছি, বেয়াদবি মাপ করবেন। ইন্দিরা গান্ধী সাগু খাওয়া মেয়ে না। সে নামতা জানা মেয়ে। ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেই লাদাখ দিয়ে শত শত চাইনিজ সৈন্য ইন্ডিয়ার ভেতরে ঢুকে পড়বে। এক টানে তারা চলে আসবে মেঘালয় পর্যন্ত। ইন্দিরার অবস্থা তখন কী হবে ? ইন্দিরাকে বলতে হবে— ভিক্ষা চাই না, তোমার কুত্তাটারে একটু সামলাও। এইখানেই শেষ না, থাবা মেরে বসে আছে আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ঝিম ধরে আছেন। তবে ঝিম ধরা অবস্থাতেও সিগন্যাল পাঠিয়ে দিয়েছেন ইন্ডিয়ার কাছে। সিগন্যালটা হলো— ইন্দিরা, তুমি অনেকদিন আমাদের চির শত্রু রাশিয়ার সঙ্গে ঘষাঘষি করেছ। আমি চুপ করে দেখেছি। আর দেখব না।

আমেরিকা কী বুঝেন তো মা ? আমেরিকা হলো বাঘের বাবা টাগ। বাঘ লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়ে। টাগ লাফ দেয় না। লেজ দিয়ে একটা বাড়ি দেয়। এক বাড়িতেই কাজ শেষ।

মরিয়ম ভয়ে ভয়ে বলল, যারা মুক্তিযুদ্ধ করছে তাদের কী হবে ?

কলিমউল্লাহ মরিয়মের দিকে তাকিয়ে বলল, আপা, সত্য জবাবটা আপনাকে দিতে খারাপ লাগছে। কারণ ভাইসাহেব মুক্তিযুদ্ধে গেছেন। ঝড়-বৃষ্টি, প্যাক-কাদায় কী করতেছেন তিনিই জানেন। তারপরেও সত্যটা বলি। এদের মোহভঙ্গ হবে। অনেকের ইতিমধ্যে হয়েও গেছে। এরা অস্ত্রপাতি ফেলে নিজের নিজের ঘরে ফেরার চেষ্টা করবে। যারা আগে রেগুলার আর্মিতে ছিল, তাদের কোর্টমার্শাল হবে। যারা রেগুলার আর্মির না, তাদের কী হবে বলতে পারছি না। শাস্তি হতে পারে, আবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাও হতে পারে।

আজকের মতো আলোচনা শেষ। মা যান ঘুমাতে যান। আপনার ঘুম কম হচ্ছে। আপনার ঘুম দরকার। চিন্তা করবেন না। চিন্তায় ভাত নাই। কর্মে ভাত।

'কর্মে ভাত' কথাটা এখন কলিমউল্লাহর জন্যে প্রযোজ্য। সে প্রচুর কাজ করছে। সেনাবাহিনীকে ছোটখাটো জিনিস সাপ্লাই দিচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস। একবার সাপ্লাই দিল এক টন নারিকেল তেল। এক টন নারিকেল তেলের তাদের প্রয়োজনটা কী কে জানে! ট্যাংকের চাক্কায় কী দেবে ! জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যায়। কলিমউল্লাহ জিজ্ঞেস করে না। বাড়তি কৌতূহল দেখানোর দরকার কি ? তার সাপ্লাই দেয়া নিয়ে কথা। মিলিটারি সাপ্লাই মানে পয়সা। নগদ পয়সা।

মিলিটারি সাপ্লাই ছাড়াও সম্পূর্ণ নতুন এক জায়গা থেকে ভালো টাকা আসছে। টাকাটা অন্যায়ভাবে আসছে তা ঠিক, তবে যুদ্ধের বাজারে ন্যায় অন্যায় দুই যমজ ভাই। বোঝার উপায় নাই কোন ভাই ন্যায়, কোন ভাই অন্যায়। দু'জনই দেখতে একরকম।

টাকা বানানোর নতুন কায়দাটা হলো বন্দিশিবির থেকে খবর বের করা। আত্মীয়স্বজনরা খবরের জন্যে আধাপাগল হয়ে থাকে। টাকা খরচ করতে তাদের কোনো অসুবিধা নেই। গয়না, বাড়ি-ঘর বিক্রি করে হলেও টাকার জোগাড় করবে, শুধু একটা খবর দরকার। বেঁচে আছে না মারা গেছে।

খবর সাপ্লাইয়ের ব্যবসা অনেকেই করছে। ঘরে বসে উপার্জন। কোনো রিস্ক নেই। অনেক বিহারি যেখানে করছে, সেখানে তার এই ব্যবসা করতে ক্ষতি কী? বরং লাভ আছে। টাকাটা বিহারিদের হাতে না গিয়ে বাঙালির হাতে থাকল।

এই ব্যবসায় তার এক বিহারি পার্টনার অবশ্যি আছে। মজনু শেখ। টাকার অর্ধেক ভাগ তাকে দিতে হয়। পুরো টাকাটা সে রাখতে পারে না। ব্যবসাটা একা করতে পারলে হতো। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। বিহারি লোক ছাড়া বিষয়টা বিশ্বাসযোগ্য করা যায় না। বাঙালিরা এখন বিহারি বিশ্বাস করে না। শুধু এই একটি ক্ষেত্রে বিহারির কথা তারা বিশ্বাস করে।

ব্যবসাটা এইভাবে হয়— একজন এলো তার ভাইকে মিলিটারি ধরে নিয়ে গেছে। সে বেঁচে আছে না বন্দিশিবিরে আছে জেনে দিবে। তার কাছে খবর পাঠাতে হবে। মুক্তির ব্যবস্থা করা যায় কি-না দেখতে হবে।

কলিমউল্লাহ প্রথমে খুব সূক্ষ্মভাবে পার্টির টাকা-পয়সা কেমন আছে বোঝার চেষ্টা করে। পার্টি দুর্বল হলে এক ব্যবস্থা, সবল হলে অন্য ব্যবস্থা। মাঝামাঝি অর্থনৈতিক অবস্থার পার্টির সঙ্গে প্রথমদিন কলিমউল্লাহর নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়—

আপনার ভাইকে কবে ধরে নিয়ে গেছে?

সোমবার।

তারিখটা বলেন, শুধু বার বললে তো হবে না।

আঠারো তারিখ।

ভাইয়ের নাম, বয়স বিস্তারিত একটা কাগজে লেখে আমাকে দেন। ছবি এনেছেন?

জি-না।

কী আশ্চর্য কথা, একটা ছবি সঙ্গে করে আনবেন না!

এখন নিয়া আসি। সিঙ্গেল ছবি বোধহয় নাই, গ্রুপ ছবি আছে।

গ্রুপ ছবি থেকে কী বোঝা যাবে বলেন। সিঙ্গেল ছবি জোগাড় করার ব্যবস্থা করেন। তবে আজকে না। আজ আমার কাজ আছে। আগামীকাল এই সময়ে আসেন।

জি আচ্ছা। খবর কি পাওয়া যাবে?

সেটা তো ভাই বলতে পারব না। অবস্থা বুঝেন না? আমি চেষ্টা করব সেটা বলতে পারি।

টাকা-পয়সা কত দেব?

আরে রাখেন টাকা-পয়সা, আগে খোঁজটা পাই কি-না দেখি। আগামীকাল ছবি নিয়ে আসেন, আর ভাইকে যদি কোনো খবর পাঠাতে চান, সেটা চিঠির মতো করে দেন। সেই চিঠিতে খবরদার আপনার ভাইয়ের নাম উল্লেখ করবেন না। নিজেদের নামও লিখবেন না। চিঠি ধরা পড়লে বিরাট সমস্যা হয়।

ভাই সাহেব, কিছু টাকা দিয়ে যাই?

আপনার মনে হয় টাকা বেশি হয়ে গেছে। এখন বাড়িতে যান। আল্লাহ্-খোদার নাম নেন। টাকা খরচের সুযোগ পাবেন।

পার্টি খুবই খুশি হয়ে বাড়ি যায়। এক ধরনের ভরসাও পায় যে, এরা ধান্ধাবাজ না।

পরের দুই সপ্তাহ পার্টিকে শুধু খেলানো। প্রথমবার বলা যে বেঁচে আছে। তবে পুরো নিশ্চিত না।

তারপরের বার বেঁচে আছে এই ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত। তবে মিলিটারি খুবই অত্যাচার করছে। মা'র বন্ধ করার জন্যে টাকা।

তারপরের বার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ, একবেলা শুধু একটা শুকনা রুটি দিচ্ছে। টাকা খরচ করলে হয়তো রেশনের খাওয়া পাবে, তবে নিশ্চিত।

শেষবার বড় অংকের টাকা নেয়া হয় মিলিটারিকে ঘুস দিয়ে রিলিজ করে নিয়ে আসার জন্যে। তবে আগেই বলা হয় সম্ভাবনা মাত্র ত্রিশ পারসেন্ট। ভাগ্য ভালো থাকলে রিলিজ হয়ে যাবে। ভাগ্য খারাপ হলে পুরো টাকা নষ্ট হবে। এখন আপনি দেখেন চান্স নিবেন কি না। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আমি বলব, চান্স না নিতে। এরা আজকাল রিলিজ করে দেবে এই বলে টাকা খায় কিন্তু কাজ করে না। বিরাট হারামি জাতি।

এই কথা বলার পরেও সব পার্টি টাকা দেয়। সম্ভাবনা যত কমই হোক, একটা চেষ্টা তো করা হলো।

কলিমউল্লাহকে গুছিয়ে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করতে হয় না। ঘরে বসে রোজগার। কলিমউল্লাহর মাঝে মাঝে মনে হয়, যুদ্ধের সময় হলো বুদ্ধি পরীক্ষার সময়। বুদ্ধি থাকলে যুদ্ধের সময় করে খেতে পারবে, বুদ্ধি না থাকলে শেষ। নিজের বুদ্ধিতে কলিমউল্লাহ নিজেই মাঝে-মাঝে চমৎকৃত হয়।

জোহর সাহেবের সঙ্গে কলিমউল্লাহর যোগাযোগ আছে। তবে জোহর সাহেব এখন আগের চেয়ে অনেক ব্যস্ত। সব সময়ই তাঁর ঘরে লোকজন থাকে। বেশির ভাগ দিন কথাবার্তাই হয় না। কলিমউল্লাহর ধারণা যে প্রয়োজনে প্রথম তাকে ডাকা হয়েছিল, সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলেই তার আলাদা ডাক পড়ে না। প্রয়োজনটা কী ছিল তা এখনো কলিমউল্লাহর কাছে পরিষ্কার না। প্রয়োজন শেষ হলে তাকে পুরোপুরি বিদেয় করে দেয়ার কথা। তাও এরা করছে না। শত ব্যস্ততার মধ্যেও জোহর সাহেব তার দিকে তাকিয়ে পরিচিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। এইটাই কম কী! জোহর সাহেব অতি ক্ষমতাধর ব্যক্তি। ক্ষমতাধর মানুষের চোখের ইশারারও দাম আছে।

জোহর সাহেবের শরীর-স্বাস্থ্য মনে হয় খুবই খারাপ হয়েছে। চাদর আগেই গায়ে দিয়ে রাখতেন, এখন চাদরের নিচে ফুল হাতা সুয়েটার পরেন। দুর্দান্ত গরমে একজন মানুষ ফুলহাতা সুয়েটার এবং চাদর গায়ে দিয়ে থাকে কীভাবে— সেও এক রহস্য। তিনি সারাক্ষণই কাশেন। যক্ষ্মারোগীর কাশির মতো খুসখুসে কাশি। ব্যাটাকে যক্ষ্মায় ধরেছে কি-না কে জানে!

কলিমউল্লাহ যখন ধরেই নিয়েছিল জোহর সাহেব তাকে আর ডাকবেন না, আলাদা করে কথাবার্তা বলবেন না, তখন ডাক পড়ল। সেদিন ঘরে লোকজন নেই। জোহর সাহেব একা। তাঁর পুরনো ভঙ্গিতে চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন। খুসখুসে কাশি কাশছেন।

কেমন আছ কবি ?

বিনয়ে গলে যাবার মতো ভঙ্গি করে কলিমউল্লাহ বলল, স্যার আপনার দোয়া।

টাকা-পয়সা ভালো কামাচ্ছেন তো ?

কলিমউল্লাহ খানিকটা হকচকিয়ে গেল। সে টাকা-পয়সা কামাচ্ছে— এই তথ্য জোহর সাহেবের জানার কথা না। ব্যাটা মনে হয় আন্দাজে ঢিল ছুড়েছে। এরা আন্দাজে ঢিল ছোড়ার বিষয়ে ওস্তাদ।

জোহর সাহেব কাশতে কাশতে বললেন, টাকা-পয়সা যা কামানোর দ্রুত কামিয়ে নিন। সুযোগ বেশি দিন নাও থাকতে পারে।

কলিমউল্লাহ্ প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, স্যারের শরীর কি খারাপ?

হ্যাঁ, খারাপ। আমার নিজের ধারণা লাংস ক্যান্সার। ডাক্তার এই কারণেই দেখাচ্ছি না। আপনার শরীর ভালো তো?

জি জনাব, আমি ভালো।

মোবারক হোসেন সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করেছেন?

এইবার কলিমউল্লাহ্ সত্যি সত্যি চমকাল। এই খবর কোনোক্রমেই জোহর সাহেবের জানার কথা না। ব্যাটা জানে কীভাবে? কলিমউল্লাহ্ নিজের বিস্ময় গোপন করতে করতে বলল, জি স্যার। অসহায় পরিবার। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল। মাথার উপরে দেখাশোনার কেউ নাই— এই ভেবে এত বড় দায়িত্ব নিলাম। আপনার কথাও তখন মনে পড়ল।

আমার কথা মনে পড়ল কেন?

আপনি বলেছিলেন পরিবারটির জন্যে আপনি কিছু করতে চান?

কলিমউল্লাহ্।

জি স্যার।

তুমি অনেক বুদ্ধিমান, কিন্তু তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি অনেক বেশি। কেউ যখন আমাকে খুশি করার জন্যে কিছু বলে, আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলি। আমার তখন ভালো লাগে না।

আমি ভুল করে থাকলে মাফ করে দেবেন স্যার।

আলবদর বাহিনী তৈরি হচ্ছে শুনেছ?

জি-না স্যার।

আমি চাই তুমি আলবদরে ঢুকে যাও। সেখানে কিছু বুদ্ধিমান মানুষ দরকার।

আপনি যা বলবেন, তাই হবে স্যার।

কোরআন শরীফ পড়েছ?

কলিমউল্লাহ্ বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বলল, মুসলমানের ছেলে কোরআন শরীফ পড়ব না, কী বলেন স্যার!

জোহর সাহেব কাশি থামিয়ে শান্ত গলায় বললেন, আল্লাহ্‌পাক কোরআন শরীফে বলেছেন— 'মানুষকে আমি সর্বোত্তম রূপে তৈরি করি। সে যখন পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে যাই।'

কলিমউল্লাহ বলল, বাহ্ সুন্দর আয়াত!

জোহর সাহেব কলিমউল্লাহর দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তুমি ছিলে কবি। একজন কবি হলো মানুষের সর্বোত্তম রূপ। তুমি যখন পরিবর্তিত হবে, তখন কতটা পরিবর্তিত হও— সেটা আমার দেখার ইচ্ছা।

স্যার কি আমার উপর কোনো কারণে রাগ করেছেন?

না, রাগ করি নি। একজন কবি কি কখনো আরেকজন কবির উপর রাগ করতে পারে? ভালো কথা, কোরআন শরীফে কবিদের প্রসঙ্গে একটা আয়াত আছে, সেটা কি তুমি জানো?

জি-না স্যার।

পরেরবার আয়াতটা জেনে আসবে। তখন এই আয়াত নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

জি আচ্ছা স্যার।

জোহর সাহেবের ঘর থেকে বের হয়ে কলিমউল্লাহ মনে মনে বলল, তোর দিন ঘনায়ে এসেছে। দিন ঘনায়ে আসলে মানুষ ধর্ম কপচায়, তুইও ধর্ম কপচাচ্ছিস।

মনে মনে এ ধরনের কঠিন কথা বললেও সে পরদিন আলবদরে ঢুকে গেল।

কলিমউল্লাহর বাবুর্চি বাচ্চু মিয়া ভোল পাল্টে 'বিহারি' হয়ে গেছে। বিহারি হবার জন্যে তাকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় নি— মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটতে হয়েছে, একটা সানগ্লাস কিনতে হয়েছে, গলায় বাঁধার জন্যে বাহারি রুমাল। প্যান্টের পকেটে রাখার জন্যে মুখ বন্ধ চাকু।

প্রতিদিনই ঢাকা শহরে সে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরতে বের হয়। তখন মুখ ভর্তি থাকে পান, হাতে সিগারেট। তার গা থেকে ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বের হয়।

লোকজন তার দিকে ভীত চোখে তাকায়। বাচ্চু মিয়ার বড় ভালো লাগে। যে-কোনো পান-সিগারেটের দোকানের সামনে সে যখন দাঁড়ায়, দোকানি তটস্থ হয়ে পড়ে। কীভাবে খাতির করবে বুঝতে পারে না। বাচ্চু মিয়া পানের পিক ফেলে ঢেকুরের মতো শব্দ করে (ঢেকুরের শব্দ করাটা সে সম্প্রতি আয়ত্ত করেছে। এই শব্দেও লোকজন চমকায়। চমকানি দেখেও তার বড় ভালো লাগে।) এবং পিক করে পানের পিক ফেলে। বিহারিদের পানের পিক ফেলা বাঙালিদের মতো নয়। তারা আয়োজন করে পিক ফেলে। এই কায়দাও এখন সে জানে। দোকানি যখন আতঙ্কে অস্থির হয়ে যায়, তখন সে বলে, তুম সাচ্চা পাকিস্তান? (গলা গম্ভীর।)

দোকানি ক্রমাগত হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তে থাকে। তখন বাচ্চু মিয়া দ্বিতীয় দফায় পানের পিক ফেলে বলে, সিগ্রেট নিকালো। (গলা আগের চেয়েও গম্ভীর।)

দোকানি তৎক্ষণাৎ এক প্যাকেট সিগারেট (বেশিরভাগ সময় ক্যাপস্টান, এক একটা শলার দাম দশ পয়সা, সহজ ব্যাপার না) বের করে এগিয়ে দেয়।

পান খিলাও। জর্দা ডবল। চুনা কম।

দোকানি অতি দ্রুত পান বানাতে বসে। পান বানাতে শুরু করে। ভয়ে যখন তার হাত কাঁপতে শুরু করে, তখন বাচ্চুর মায়া হয়। সে নিচু গলায় বলে, ভাইজান, এত ডরাইতেছেন কী জন্যে? আমি বিহারি না, বাঙালি। বিহারির ভাব ধরছি।

দোকানির ভয় তাতেও কাটে না। তার চোখে তখন সন্দেহ। নতুন কোনো ফাঁদ নিশ্চয়ই।

ডর খাইয়েন না ভাইজান। আল্লাহর কসম আমি বাঙালি। বাচ্চু মিয়া নাম। খালি যে বাঙালি এইটাও ঠিক না, আমি মুক্তি। (এখন গলার স্বর চাপা।)

দোকানির চোখ বড় বড় হয়ে যায়।

বাচ্চু মিয়া ফিসফিস করে বলে, দিনে বিহারি সাইজা ঘুরি। মিলিটারির খোঁজ-খবর নেই। রাইতে বুম বুম বোমা। রাইতে আমরার বোমার আওয়াজ পান না?

পাই।

কাইল রাইতে পাইছিলেন? ইয়াদ কইরা দেখেন।

জি।

কয়বার পাইছেন বলেন দেখি? তিনবার। সইন্ধ্যা রাইতে দুইবার। এগারোটার সময় একবার। রাইত এগারোটার অপারেশনে আমি ছিলাম। সইন্ধ্যা রাইতে ছিলাম না। এগারোটার অপারেশনে মিলিটারি মারা পড়েছে তিনটা।

এই পর্যায়ে দোকানির বিশ্বাস ফিরে আসে। তার চোখ-মুখ থেকে ভয় কেটে যায়। মুখ হাসি হাসি হয়ে যায়। সে আনন্দিত গলায় বলে, ভাই, চা খাইবেন?

আপনার দোকানে চায়ের ব্যবস্থা কই?

ব্যবস্থা নাই, আনায়ে দেই।

আচ্ছা আনান। তার আগে সিগ্রেটের দামটা নেন। আমরা মুক্তি। জোর-জবরদস্তি কইরা জিনিস নেওয়া আমরার নিষেধ আছে।

দোকানি প্রায় চেঁচিয়ে বলে, কী সর্বনাশ। আপনের কাছ থাইক্যা সিগারেটের দাম নিমু? আমি কি বেজন্মা?

মুক্তি সেজে গল্প করতে বাচ্চু মিয়ার ভালো লাগে। তখন নিজেকে মুক্তিই মনে হয়।

ভাইসাব, আপনাদের অপারেশন চলতেছে কেমন?

রাইতে বোম শুনেন না?

অবশ্যই শুনি। মাঝে মধ্যে দিনেও শুনি।

রাইত-দিন বইল্যা এখন আমরার কিছু নাই। সব সময় শুনবেন। আমরার দলের লোকজন আরো আসতেছে। প্রতিদিনই আসে।

আলহামদুলিল্লাহ।

মিলিটারির পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে গেছে। বুঝতেছেন না?

অবশ্যই বুঝতেছি।

চরমপত্র শুনেন?

আরে কী বলেন? এইটা না শুনলে চলে? চরমপত্র আর ঢাকা শহরে বোমার শব্দ— এই দুইটা না শুনলে আমার আর আমার পরিবারের ঘুম হয় না।

যতই দিন যাচ্ছে বাচ্চু মিয়ার সাহস ততই বাড়ছে। এখন সে মাঝে-মধ্যে মিলিটারির কোনো দল দেখলে এগিয়ে যায়। মিলিটারিরাও বিহারি দেখলে মনে ভরসা পায়। বাচ্চু মিয়া, তাদের দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে— ভাই হালত কিয়া? মিলিটারিদের সঙ্গে তার ভালোই কথাবার্তা হয়।

পানের পিক ফেলতে ফেলতে সে গম্ভীর গলায় বলে, সব মুক্তি ফিনিস করডো। বাঙালি খতম করো। সব খতম।

তার উর্দু ঠিক হয় না। তাতে সমস্যা নেই। বিহারিরাও ভালো উর্দু বলতে পারে না। বিহারিদের চেনার উপায় হলো— বাংলা উর্দুর মিকচার ভাষা। এই ভাষা বাচ্চু মিয়া জানে।

সন্ধ্যার আগে আগে বাচ্চু ঘরে ফিরে আসে। চাল-ডালের খিচুড়ি বসিয়ে দেয়। রান্না ভালো হবে না খারাপ হবে— এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই। সে একা মানুষ। কাঁচা চাল-ডাল চিবায়ে খেলেও কারো কিছু বলার নেই। একা থাকার এই মজা। সে কলিমউল্লাহর বাসাতেই আছে। মাঝে-মাঝে লোকটাকে নিয়ে তার চিন্তা হয়। দশ টাকা হাত খরচ দিয়ে মানুষটা যে গেল, আর তার খোঁজ নেই। মারা যায় নি তো? আজকাল মরে যাওয়া কোনো ব্যাপারই না। ঘর থেকে বের হলে মৃত্যু, ঘরে বসে থাকলেও মৃত্যু। ঢাকা শহরে আজরাইলের কোনো বিশ্রাম নাই।

বাচ্চু মিয়া খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রেডিও কানের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলা বেতারের কোনো কিছুই যেন বাদ না পড়ে। বিশেষ করে *চরমপত্র*। *চরমপত্র* যখন হয় তখন বাচ্চু *চরমপত্রের* লোকটার মতো গলা করে বলে, দে দে গাব্বুইরা মাইর দে।

চরমপত্র শোনার সময় তার মনে হয়, ইস যদি সত্যি মুক্তি হতে পারতাম তাহলে গাবুইরা মাইর দিতাম। মিলিটারি বুঝত মাইর কী জিনিস! বাঙালি কী জিনিস!

এক শুক্রবারে দরজার কড়া নড়ছে। কড়া নড়ার ভঙ্গি ভালো না। খারাপ কিছু না তো ? কোনো বাঙালি এখন এত জোরে কড়া নাড়ে না। বাঙালি কড়া নাড়ে ভয়ে ভয়ে। লালমুখা মিলিটারি ?

শুয়োরের বাচ্চারা এখন বাড়ি বাড়ি তালাশ শুরু করেছে। জোয়ান ছেলে সব ধরে নিয়ে যায়। এরা ফিরত আসে না। জোয়ান হওয়ার এই এক বিপদ হয়েছে। বড় পীর গাউসুল আযমের নাম নিয়ে বাচ্চু মিয়া দরজা খুলল। দরজা খুলে হতভম্ব! কলিউমউল্লাহ দাঁড়িয়ে আছেন। দাড়ি, মাথায় টুপি, ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি।

কলিমউল্লাহ বলল, কিরে তুই এখনো আছিস ? পালায়ে যাস নাই ?

বাচ্চু মিয়া কদমবুসি করতে করতে বলল, আমি যামু কই ? আপনে খরচ বরচ কিছুই দিয়া যান নাই। খায়া না খায়া আছি। আপনি ছিলেন কই ?

কলিমউল্লাহ তীক্ষ্ণ চোখে ঘর-দুয়ার দেখতে দেখতে বলল, জিনিসপত্র বিক্রি করেছিস না-কি ? খালি খালি লাগছে।

হিসাব মিলাইয়া দেখেন।

চা বানা। চা খাই। ভালো কথা, তুই কি আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমাস নাকি ? বিছানা দেখে তো সে রকমই লাগে।

বাচ্চু মিয়া জবাব না দিয়ে চা বানাতে গেল। ঘটনা সত্যি।

সে আগে মেঝেতে ঘুমাতো। এখন স্যারের বিছানাতেই ঘুমায়। যুদ্ধের বাজারে সব সমান। আম কাঠ সেগুন কাঠের একই দর। সে কেন বিছানায় ঘুমাবে না ?

কলিমউল্লাহ চায়ে চুমুক দিয়ে কিছুটা শান্ত হলো। বাচ্চু মিয়া যে ঘর বাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় নি— এটা বড় ব্যাপার। চুরি অবশ্যই করেছে। টুকটাক চুরি তো করবেই।

স্যার, আপনে ছিলেন কই ?

কলিমউল্লাহ বলল, বিয়ে করলাম। এই নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

বাচ্চু মিয়া অবাক হয়ে বলল, বিবাহ করেছেন ?

হুঁ।

ভাবিসাব কই ?

আছে। অন্য একটা বাড়িতে তুলেছি।

উনার নাম কী ?

নাম দিয়ে তুই কী করবি ? ফাজিলের মতো কথা।

উনার সাথে পরিচয় হবে না ?

তুই এত বড় তালেবর যে পরিচয় করায়ে দিতে হবে ? তুই এই বাড়িতে যে রকম আছিস, সে রকম থাকবি। বাড়ি পাহারা দিবি। বুঝেছিস ?

বুঝলাম।

আমি মাঝে-মধ্যে এসে দেখে যাব। খরচ দিয়া যাব। জিনিস বিক্রি বন্ধ।

বাচ্চু মিয়া নিজের জন্যেও চা বানিয়ে এনেছে। বেয়াদবি যেন না হয় সে জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। স্যার বিবাহ করেছেন শুনে ভালো লাগছে। যে বাড়িতে মেয়েছেলে নাই, সে বাড়িতে কাজ করে মজা নাই।

স্যার, দেশ স্বাধীন হইব কবে ?

স্বাধীন তো হয়েই আছে। নতুন করে কী হবে ? উল্টা পাল্টা কথা বন্ধ।

জি, আচ্ছা বন্ধ।

তুই চাকর, চাকরের মতো থাকবি। তোর কাজ ভাত রাঁন্দা, বুঝেছিস ?

জি, বুঝলাম। তয় এখন অবশ্য ভাত রাঁন্দনের সময় পাই না। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়।

কলিমউল্লাহ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কী কাজকর্ম ?

বাচ্চু মিয়া উদাস গলায় বলল, মুক্তি হয়েছি স্যার।

কী হয়েছিস ?

মুক্তি।

কলিমউল্লাহ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। স্যারের অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার দৃশ্যটা বাচ্চু মিয়ার বড় ভালো লাগছে। এখন সে আর ভাত রাঁন্দা চাকর না। সে মুক্তি। মুক্তি কোনো সহজ জিনিস না।

তুই মুক্তি হয়েছিস ?

জি। দিনে ঘুমাই, রাইতে অপারেশন। আইজ রাইতেও অপারেশন আছে। দোয়া রাইখেন। চা কি আরেক কাপ খাইবেন ? বানাই ?

কলিমউল্লাহ হ্যাঁ না কিছু বলল না। বাচ্চু মিয়া চা বানাতে গেল। তার বড় ভালো লাগছে যে স্যার তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে। 'যুদ্ধের বাজার' বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে মিথ্যা কথাকে সব সময় সত্যি মনে হয়। এইটাই হলো যুদ্ধের বাজারের মজা।

চায়ের কাপ কলিমউল্লাহর হাতে দিতে দিতে বাচ্চু মিয়া বলল, স্যার, একটু দোয়া রাইখেন আইজ আমরার বিরাট অপারেশন আছে। জীবন নিয়া ফিরতে পারব কি-না আল্লাহ মাবুদ জানে। মনে হয় না।

অপারেশন কোথায় ?

এইটা বলা নিষেধ আছে।

বাচ্চু মিয়া!

জি স্যার।

আমার সঙ্গে ফাজলামি না করলে ভালো হয়। কয়েকদিনের জন্যে বাইরে ছিলাম, এর মধ্যে তুই মুক্তি হয়ে গেছিস?

বাচ্চু মিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ধরছেন ঠিক। তয় স্যার মুক্তিতে ঢুকতেছি। কথাবার্তা চলতেছে।

চুপ!

জি আচ্ছা চুপ করলাম। স্যার গোসল করবেন? পানি গরম করি?

না।

গায়ে তেল ডলে দেই? আরাম পাবেন। তেল ডলার পরে গোসলে মজা আছে। দিব?

কলিমউল্লাহ্ উদার গলায় বলল, দে।

আরামে কলিমউল্লাহর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, বাচ্চু মিয়ার শরীর ম্যাসাজের এই গুণটি তুচ্ছ করার মতো না। মাঝে-মাঝে এই বাড়িতে এসে গা ম্যাসাজ করালে খারাপ হবে না। ম্যাসাজে রক্ত চলাচল ভালো হয়। শরীর ঠিক থাকে। শরীর ঠিক থাকা মানেই মেজাজ ঠিক থাকা।

বাচ্চু মিয়া!

জি স্যার।

এত ভালো ম্যাসাজ তুই শিখেছিস কার কাছে?

আমার ওস্তাদ মনু মিয়া বাবুর্চির শইল ডলতে ডলতে শিখছি।

তোর কাজ যুদ্ধও না, রাঁন্দাও না। তোর কাজ শইল ডলা। বুঝেছিস?

জি স্যার।

যুদ্ধ বিষয়ে একটা পাঞ্জাবি শের শুনবি? জোহর সাহেবের কাছ থেকে শুনে নোট করে রেখেছিলাম। শেরটা হলো—

সুলেহ্ কীতিয়ান ফাতেহ্ খি বাতাবে
কমর জং তি মূল না কাসেয়ে নি

এর অর্থ হলো, যদি শান্তি বিজয় আনে, তাহলে যুদ্ধ করো না। কবিতাটা সুন্দর না?

কলিমউল্লাহ্ স্যারের ঘাড় ম্যাসাজ করতে করতে বাচ্চু বলল, যুদ্ধ ছাড়া আমরার গতি নাই। বিনা যুদ্ধে পাঞ্জাবি যাবে না। খবিস জাত।

চুপ থাক।

জি আচ্ছা।

বাঙালি যুদ্ধ করার জাত না। বুঝেছিস ?

জি বুঝেছি। তয় মনে একটা বিরাট শখ ছিল যুদ্ধ করব। একটা পাঞ্জাবি মারতে পারলেও জীবন সার্থক হইত।

আর কথা না চুপ।

জি আইচ্ছা।

ম্যাসাজ অতি আরামের হচ্ছে। কলিমউল্লাহ ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সুযোগে বাচ্চু মিয়া তার মনের কথা বলে যাচ্ছে—

স্যার, ধরেন যুদ্ধ করা যদি কপালে নাও থাকে, একটা অপারেশন যদি খালি দেখতে পারতাম! একদিকে গুলি করতাছে মুক্তি আরেক দিকে পাকিস্তান। পাকিস্তান মইরা সাফ, এরা আমরার মুক্তির বালটাও ছিঁড়তে পারল না। এমন একটা দৃশ্য যদি দেখতে পারতাম— দেখি আল্লা কী করে। কপালে থাকলে দেখব। আপনে কী বলেন স্যার ? আপনে কি ঘুমে ?

কলিমউল্লাহ পুরোপুরি ঘুমে— এই বিষয়ে নিশ্চিত হবার পরেই বাচ্চু মিয়া তার পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট সরিয়ে ফেলল। যুদ্ধের বাজারে চুরি দোষের মধ্যে পড়ে না।

পরম করুণাময় মানুষের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেন বলেই হয়তো বাচ্চু মিয়ার ইচ্ছাও পূর্ণ করলেন। সে চোখের সামনে মুক্তিদের একটা বড় অপারেশন দেখার সুযোগ পেল। সে বাংলা মোটরের কাছে বিহারি সেজে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ, কালো পোশাকের মিলিটারি এবং সেনাবাহিনীর একজন সেকেন্ড লেফটেনেন্টের সঙ্গে গল্প করছিল। এমন সময় দেখল একটা কালো রঙের টয়োটা গাড়ি তাদের কাছে এসে হঠাৎ যেন ব্রেক করে থামল। মুহূর্তেই গাড়ির জানালা থেকে প্রবল গুলি বর্ষণ হতে লাগল। একটি গ্রেনেড উড়ে এলো গাড়ির ভেতর থেকে।

গাড়ি যেমন উড়ে এসেছিল ঠিক তেমনিভাবে উড়ে চলে গেল। বাচ্চু মিয়া মারা গেল চোখের সামনে ঢাকা শহরের গেরিলাদের ভয়াবহ একটি আক্রমণ দেখে। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে খুব কম মানুষের মনই আনন্দে অভিভূত থাকে। তারটা ছিল।

কোলকাতায় পার্ক সার্কাসের একটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের নাম কোহীনূর ম্যানশন। কোহীনূর ম্যানশনের মাঝারি ধরনের ফ্ল্যাটে বাংলাদেশের প্রবাদ পুরুষ মাওলানা ভাসানী বাস করেন। তাঁর সঙ্গী 'মুজাফফর-ন্যাপে'র এক সময়ের কর্মী জনাব সাইফুল ইসলাম। সাইফুল ইসলামের দায়িত্ব বিভিন্ন জায়গায় মাওলানা ভাসানীর বিবৃতি পাঠানো, রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে লেখা চিঠি কপি করা। চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

মাওলানা সেখানে খানিকটা নির্বাসিত জীবন-যাপন করছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলধারা থেকে আলাদা। সংগ্রামময় দীর্ঘ জীবন পার করে এখন একটু যেন ক্লান্ত।

তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে নিজের হাতে একটি চিঠি লিখেছেন। তার বক্তব্য—

> 'আমার প্রথম পুত্রের মৃত্যু হয় ধুবড়ির গ্রামে। তাই আমার বৃদ্ধা স্ত্রীর আশা শেষ দাফন ধুবড়ির কোনো গ্রামে হয়।...'*

চিঠিতেও বিষাদের সুর। যেন তিনি দূরাগত ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন।

মাওলানা ভাসানী তাঁর ফ্ল্যাটের বসার ঘরে বসে আছেন। তাঁর পরনে সেলাইবিহীন লুঙ্গি, গায়ে ধবধবে সাদা ফতুয়া। ডান হাতে তসবির ছড়া। তিনি তসবি টানছেন। তাঁর দৃষ্টি স্থির। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। প্রধানমন্ত্রী মাওলানার পা স্পর্শ করে সালাম করলেন। বিনীত গলায় বললেন, হুজুর কেমন আছেন?

মাওলানা বললেন, ভালো আছি। মনের সুখে মাছি মারতেছি। এদিকে অনেক মাছি।

আপনার খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধা কি হচ্ছে?

মাওলানা তসবি টানা বন্ধ করে বললেন, খাওয়া দাওয়ার সুবিধা অসুবিধার কথা বাদ দেও। কোনো কাজের কথা থাকলে বলো।

---

*সূত্র : *স্বাধীনতা ভাসানী ভারত*, সাইফুল ইসলাম

হুজুর, আমি নানান অসুবিধায় আছি।

কেউ সুবিধায় নাই। তবে তোমার অসুবিধা বুঝতে পারি। বাতাস বড় গাছে লাগে। ছোট গাছে লাগে না। তুমি এখন বড় গাছ।

বড় গাছ হওয়ার বাসনা কোনো দিন আমার ছিল না।

হ্যাঁ, এই কথাটা সত্য বলেছ।

আপনার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছি।

শোনো তাজউদ্দিন, আমি পরামর্শের মুদির দোকান খুলি নাই। দোয়া যদি চাও বলো দোয়া দিতে পারি।

আমি আপনার কাছে পরামর্শ চাই।

কোন বিষয়ে?

তাজউদ্দিন চুপ করে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ মওলানার হাতের তসবি দ্রুত ঘুরল। একসময় তসবির ঘূর্ণন বন্ধ হলো। তিনি শান্ত গলায় বললেন, নিজের বুদ্ধিতে চলবা— এইটাই আমার পরামর্শ। যুদ্ধের বাজারে ভেজাল বুদ্ধির বিকিকিনি হয়। বুদ্ধি কিনতে গেলে ভেজাল বুদ্ধি পাইবা। এই আমারে দেখ, সারাজীবন নিজের বুদ্ধিতে চলেছি। ভালো কথা, তোমার কি ক্ষুধা হয়েছে? কিছু খাইবা?

তাজউদ্দিন না-সূচক মাথা নাড়লেন। মাওলানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বয়স হয়ে গেছে। শরীরে শক্তি নাই। মনে শক্তি আছে শরীরে নাই। শরীরে শক্তি থাকলে তোমারে বলতাম, আমারে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার বানায়া আমার নিজ গ্রামে পাঠায়ে দেও।

অনেক বড় যুদ্ধ অস্ত্র ছাড়া করা যায়।

শেষে কিন্তু অস্ত্র লাগে। খবরের কাগজে দেখলাম, ফ্রান্সের আঁদ্রে মালরো এই বয়সেও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে থেকে সরাসরি যুদ্ধ করতে চান। খবরটা পড়ে এত ভালো লেগেছে সঙ্গে সঙ্গে চোখে পানি এসেছে। আমি খাস দিলে উনার জন্যে দোয়া করেছি। আমি উনাকে ধন্যবাদ জানায়ে একটা পত্র দিব। তুমি পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

জি করব। আমার প্রতি আপনার আর কোনো আদেশ কি আছে?

একটা আদেশ আছে। আদেশ বলো, অনুরোধ বলো, নির্দেশ বলো একটা আছে।

বলুন কী আদেশ?

আমাকে স্বাধীন বাংলাদেশের ধুবড়ি গ্রামে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। আমি আমার নিজ গ্রামে মরতে চাই।

মাওলানা চোখ বন্ধ করলেন। আবারো তসবি ঘুরতে লাগল। প্রধানমন্ত্রী উঠার ভঙ্গি করতেই মাওলানা ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন। মাওলানা চোখ মেলে শান্ত গলায় বললেন, মাথা কাছে আনো, তোমার জন্যে একটু দোয়া করে দেই। ভালো কথা, আমার এখান থেকে কিছু মুখে না দিয়া যাবে না। চালভাজা খাবে? চাল ভাজতে বলি। তেল-মরিচ দিয়ে চালভাজা খাও। বাংলাদেশী খাদ্য।

প্রধানমন্ত্রী মাথা এগিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মাওলানা তাঁর মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে দোয়া পড়ছেন।

মেঘালয়ের বাংলাদেশ হাসপাতাল থেকে পাঠানো মায়ের কাছে লেখা জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি

৭৮৬

পাক জনাবেষু

আম্মাজান,

পত্রে আমার শতকোটি ছালাম জানিবেন। দাদিজান এবং দাদাজানের কদম মোবারকেও আমার শতকোটি ছালাম। বাড়ির অন্য সকলের জন্যে শ্রেণীমতো ছালাম ও দোয়া।

পর সমাচার এই যে, আমি ভালো আছি। আপনারা আমার যে মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছেন ইহা সত্য নহে। আমার দুই পায়ে মর্টারের শেল লাগিয়াছিল। যথাযথ চিকিৎসা হইয়াছে। এখন আমি হাসপাতালে আছি, সুস্থ হইয়া উঠিতেছি ইনশাআল্লাহ। অনেক বিশিষ্ট মানুষ আমাকে দেখিতে আসিয়াছে। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় আমার নাম উঠিয়াছে। ইহা বিরাট সুসংবাদ। দেশ স্বাধীন হইলে আমি সারাজীবন সরকার হইতে ভাতা পাইব।

এখন একটি দুঃসংবাদ দিতেছি, শুভপুরের গফুর ভাই এবং মিশাকান্দির এনায়েত (এনায়েতকে আপনি চিনিবেন না। অতি সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। পরহেজগার আদমি। যুদ্ধের সময়ও উনি কোনো নামাজ কাযা করেন নাই।) মিলিটারির হাতে ধরা পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ভাগ্যে কী ঘটিয়াছে আমরা জানি না। এখনো কোনো খবর নাই। আমি যখন আহত হইয়া বিরামপুরের মাঠে পড়িয়া ছিলাম, তখন গফুর ভাই

আমাকে পিঠে নিয়া তিন মাইলের বেশি দৌড়াইয়াছিলেন। আমাকে ক্যাম্পে রাখিয়া তিনি আবার যুদ্ধে যান এবং মিলিটারির হাতে ধরা পড়েন। ইহাকেই বলে নিয়তির পরিহাস। গফুর ভাইয়ের কথা মনে উঠিলেই আমি অশ্রু সামলাইতে পারি না।

আম্মাজান, এখন আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিব। আপনাকে আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে, আপনি অধিক কান্নাকাটি করিবেন না। আল্লাহ্ যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন। এই কথাটি মনে রাখিবেন। ডাক্তাররা আমার দুইটা পা হাঁটুর নিচ হইতে কাটিয়া বাদ দিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। ডাক্তাররা বলিতেছেন, ইহা ব্যতীত আমার জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। দাদিজানের কাছে এই সংবাদ লুক্কায়িত রাখিবেন। তিনি বৃদ্ধ মানুষ, এই সংবাদে তিনি অত্যধিক কষ্ট পাইবেন। শেষে তাহার ভালো-মন্দ কিছু হইয়া যাইবে।

আম্মাজান, আমি গত পরশু দিবাগত রাতে আব্বাজানকে খোয়াবে দেখিয়াছি। তিনি সাদা রঙের একটা বড় পাঞ্জাবি পরিধান করিয়া আমার বিছানার পাশে বসিয়া আছেন। এবং আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া আমাকে আদর করিতেছেন। তাঁহার সহিত আমার কিছু টুকটাক সাংসারিক আলাপ হয়। আফসোস্, কী আলাপ হয় তাহার কিছুই মনে নাই। অনেকদিন পরে আব্বাজানকে খোয়াবে দেখিয়া মনে অতীব আনন্দ পাইয়াছি।

আম্মাজান, আমি ভালো আছি। আমাকে নিয়া কোনো দুশ্চিন্তা করিবেন না।

ইতি
আপনার অতি আদরের সন্তান
আব্দুল গণি

পুনশ্চ : অপারেশনের তারিখ এখনো নির্ধারণ হয় নাই।

মেঘালয়ের বাংলাদেশ হাসপাতালের ডাক্তার ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, বীর প্রতীক-এর নিজের কথা।

১৯৬১ সালের কথা। তখন আমি হলিক্রস কলেজের ছাত্রী; প্রচুর খেলাধুলা করতাম। ডাক্তার হওয়ার পর ৬ মাস 'ইন্টার্নিশিপ' করে আর্মিতে ১৯৭০ সালের জুন-জুলাই মাসে যোগদান করি। কারণ, আমার বড় ভাইও ছিলেন আর্মিতে। ১৯৭০ সালে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত একজন লেফটেনেন্ট-এর পদে ছিলাম। ১৯৭১-এ শেষের দিকে জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে আমার পদোন্নতি ঘটে— আমি ক্যাপ্টেন হই। বড় ভাই হায়দার সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে জড়িত ছিলেন। ছোট ভাই এ টি এম সাফদার (জিতু) মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বিভিন্ন খবর এবং গোপনবার্তা পৌঁছে দেবার কাজে নিয়োজিত ছিল।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে আমি ছিলাম কুমিল্লায়। বড় ভাই মেজর হায়দার পিন্ডির চেরাট থেকে এই সময় বদলি হয়ে তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নে চলে আসেন। যদ্দুর মনে পড়ে তারিখটা ছিল ৫ ফেব্রুয়ারি, রোজার দিন। দু'ভাইবোন কিশোরগঞ্জে বেড়াতে এসেছি। আমার ছুটি ছিল ১ মাস আর বড় ভাই হায়দারের ছুটি ছিল ২ সপ্তাহের। তিনি কুমিল্লায় ফিরে গেলেন একমাস পর ছুটি শেষ হবার আগেই। আর তখুনি শুরু হয়ে গেল দেশে রাজনৈতিক সঙ্ঘাতজনিত আলোড়ন।

মার্চের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি ঢাকায় ফিরে আসি। বড় ভাই তখন ক্যান্টনমেন্টে। আমার এক ফুপার বাসায় এসে তিনি লুকিয়ে-ছুপিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁর কথা মতো, ছুটির পর সেনাবাহিনীতে আবার যোগ দিয়ে কিশোরগঞ্জে বাসায় ফিরে আসি। কিন্তু যেদিন কিশোরগঞ্জ স্টেশনে air-raid হলো, সেদিনই আমরা পালালাম। মামার শ্বশুরবাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে ৩ মাইল দূরে ছিল। চলে গেলাম সেখানেই। এক

সপ্তাহ থাকার পর আবার কিশোরগঞ্জে ফিরে এলাম। ক্যাপ্টেন নাসের এবং বড় ভাই হায়দার ময়মনসিংহের দুটো ব্রিজ উড়িয়ে দিতে এখানে এলেন। এই সময় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট হেড কোয়ার্টার্স থেকে ২/৩টা টেলিগ্রাম এলো 'জয়েন' করার জন্য চাপ দিয়ে। আব্বাই এগুলোর উত্তর দিতেন এই লিখে— She is sick. অর্থাৎ আমি অসুস্থ।

এক সপ্তাহ কিশোরগঞ্জে থাকার পর মিলিটারি আসার মাত্র দু'দিন আগে দশ-বারো মাইল উত্তরে হোসেনপুরে আমার নানার বাড়ি পালিয়ে গেলাম। ওখানে থাকার সময় বড় ভাইয়ের খবর পেতাম। লোক মুখে শুনতাম, তিনি আগরতলায় আছেন, ট্রেনিং দিচ্ছেন। বিশ্বাস করতাম না। কিশোরগঞ্জে সেই তখন আমার বড় ভাই ও আব্বার নামে কাগজে বেরুত যে, তাদেরকে ধরে দিলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। জুলাইয়ের শেষের দিকে বড় ভাই একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্যকে আমাদের কাছে পাঠালেন বাবা-মাকে পাকবাহিনী মেরে ফেলেছে— এই খবর পেয়ে। তিনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন খবরটার সঠিকতা সম্পর্কে।

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে একটানা আট-দশদিন নৌকায় চেপে কিশোরগঞ্জের গোজদিয়া ঘাঁটি হয়ে মেঘালয় পৌঁছলাম। তারপর সিলেটের টেকেরহাটে ছিলাম এক সপ্তাহ। এরই মধ্যে বড় ভাই কী করে যেন আমার খবর পেলেন, জানি না। সেখান থেকে ট্রাকে করে পৌঁছলাম শিলং-এ। পথে আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়ায় শিলং-এ থাকলাম ৪/৫ দিন। পরে গৌহাটি হয়ে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে পৌঁছলাম মেঘালয়ে। দু'তিন সপ্তাহ পরে যোগ দিলাম বাংলাদেশ হাসপাতালে।

আমি ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিলাম। মেঘালয়ের বাংলাদেশ হাসপাতালটি বাঁশের তৈরি ছিল এবং তাতে বেড ছিল চারশো'র মতো। মেডিকেল কলেজের তিন-চারজন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সেখানে নিয়োজিত ছিলেন। লন্ডন থেকে মবিন এসেছিলেন, এসেছিলেন ডা. জাফরউল্লাহ, ডা. কিরণ সরকার দেবনাথ, ডা. ফারুক মাহমুদ, ডা. নাজিমুদ্দিন এবং ডা. মোর্শেদ। এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দশ-বারো জন ভলান্টিয়ারও আর্মি থেকে এসেছিলেন। তবে সুবেদারের ওপরে কেউ ছিলেন না। কোনো ভারতীয় ডাক্তার আমাদের সাথে নিয়মিতভাবে থাকতেন না। তবে ওষুধের জন্য আগরতলা ও উদয়পুরে যেতে হতো। উদয়পুরের ডিসি মি. ব্যানার্জি,

আগরতলা এডুকেশন বোর্ডের পরিচালক ডা. চ্যাটার্জি, ডা. মজুমদার এবং ডা. চক্রবর্তী এঁরা আমাদের প্রচুর সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

আমাদের OT অর্থাৎ Operation Theatre ছিল প্লাস্টিক ক্লথ দিয়ে চারদিকে ঘের দেয়া একটা ঘর। এর মেঝেও আবৃত ছিল প্লাস্টিক ক্লথে। আমি ওখানে থাকার সময় কেবল দু'জন রোগী ডায়রিয়া-ডিসেন্ট্রিতে মারা গিয়েছিল।

ভারতীয় আর্মিরও অনেক সৈন্য আসতো এখানে চিকিৎসার জন্য। আমি আগরতলা IA HOSPITAL-এ মাঝে-মধ্যে যেতাম।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছ থেকেও আমরা প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। আমাদের রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগই থাকত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত।

একবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা ট্রাক রাস্তার খাদে উল্টে পড়ে গিয়েছিল। ট্রাকটি সেনা সদস্যে ছিল ঠাঁসা। আহতদেরকে আমাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে এনে এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জেনারেল রব-এর হেলিকপ্টারে গুলি লেগেছিল। তিনিও এখানে চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন।

যখন হাসপাতালে ছিলাম, তখনো বড় ভাই হায়দারের সঙ্গে দেখা করতে পারতাম না। অধিকাংশ সময় অসম্ভব ব্যস্ত থাকতেন তিনি। মাঝেসাঝে দেখা হতো। আব্বা-আম্মা মেলাঘর ক্যাম্পের কাছেই একটা মাটির ঘর ভাড়া নিয়ে মেঝেতে প্লাস্টিক ব্যাগ বিছিয়ে দিনরাত যাপন করতেন। তাদের সাথেও ভাইয়া দেখা করার সময় পেতেন না।*

---

*সূত্র : *মুক্তিযুদ্ধ : ডেটলাইন আগরতলা*, হারুন হাবীব

শ্রাবণ মাসের এক দুপুরে (১৬ আগস্ট) নাইমুল ঢাকা শহরে ঢুকে পড়ল। তার তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। সে ঢুকেছে নরসিংদী এলাকার গ্রামের ভেতর দিয়ে। বাস, ট্রেন কিংবা লঞ্চে ঢুকলে চেকপোস্টের সমস্যায় পড়তে হতো। ডান্ডি কার্ড (আইডেনটিটি কার্ড) দেখানো, নানান প্রশ্নের জবাব দেয়া হাজারো ফ্যাকড়া। সন্দেহ হলেই আটক। তার মতো রোদে পোড়া শহুরে ধরনের চেহারা হলে কথাবার্তা ছাড়াই আটক। ইসকুরুপের চাবি আঁটা।

গ্রামের ভেতর দিয়ে যাতায়াতও যে খুব নিরাপদ তা না। রাজাকারবাহিনী ভালোমতো গজিয়ে গেছে। লুটপাট করার সুযোগ থাকায় তারা বেশ উৎসাহী। শান্তি কমিটিও উৎসাহী। অচেনা কেউ গ্রামে ঢুকলেই— 'আপনের নাম ? আপনের পরিচয় ?'

নাম-পরিচয় সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র নাইমুলের সঙ্গে আছে। শান্তি কমিটির এক চেয়ারম্যান সাহেব হাজী আসমতউল্লাহর চিঠি আছে। টাইপ করা এবং পিস কমিটির সীল দেয়া চিঠিতে লেখা—

বিসমিল্লা হে রাহমানের রহিম

পত্রবাহক সিরাজগঞ্জ নিবাসী ফরহাদ খান পাকিস্তানের একনিষ্ঠ সেবক। তাহাকে সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

নাইমুলকে সেই চিঠি একবার শুধু দেখাতে হয়েছে। ঢাকায় ঢোকার মুখে এক রাজাকার কমান্ডার গম্ভীর ভঙ্গিতে চিঠি উল্টেপাল্টে দেখেছে। তার চিঠির দিকে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে কমান্ডার সাহেব চিঠি পড়তে পারছেন না।

আপনার পরিচয় বলেন।

নাইমুল বলেছে, পরিচয় এখানে লেখা আছে।

কমান্ডার সাহেব ধমক দিলেন— লেখা তো জানি, মুখে বলেন। মুখে তো তালা নাই। তালা থাকলে বলেন, চাবি দিয়া খুলব। আমার কাছে মুখের চাবি আছে।

আমার নাম ফরহাদ খান।

কই মেলা দিছেন?

ঢাকা।

কী জন্যে?

আমার স্ত্রী ঢাকায়, তাকে দেখতে যাচ্ছি।

স্ত্রীর নাম বলেন।

নাইমুল সত্যি কথাই বলল, মরিয়ম।

হাত তুইল্যা খাড়ান। চেকিং হবে।

নাইমুল হাত তুলে দাঁড়াল। অন্য একজন এসে গায়ে থাবা দিয়ে চেকিং পর্ব শেষ করল। নাইমুলের মনে হলো কাজটা করতে গিয়ে দু'জনই মজা পাচ্ছে। এই মজার উৎস নাইমুল জানে। বন্দুকের সামনে মানুষ ভয়ে ছোট হয়ে থাকে। এই ভয়টা দেখতে ভালো লাগে।

নাইমুল বলল, ঢাকা শহরের অবস্থা কিছু জানেন?

কমান্ডার বলল, অবস্থা ভালো।

শহরে কি মুক্তি আছে?

টুকটাক দুই-একটা থাকতে পারে। আমাদের অঞ্চলে নাই।

তারপরেও সাবধানে থাকবেন। এখন নাই, হঠাৎ চলে আসবে।

কমান্ডার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, এত প্যাঁচালের দরকার নাই। যেখানে যাইতেছেন যান। আমাদের পান খাওয়ার খরচ দিয়া যান।

নাইমুল দশ টাকার একটা নোট দিল। কমান্ডার সাহেব সেই নোট অনাগ্রহের সঙ্গে হাতে নিলেন।

শ্রাবণ মাসে আকাশ মেঘলা থাকবে। রোদ থাকবে না। আর থাকলেও রোদের তেজ থাকবে না। এটাই নিয়ম। আজ নিয়মের ব্যতিক্রম। ঝকঝক করছে রোদ। শহর তেতে আছে। শহর থেকে ভাপ বের হচ্ছে।

দীর্ঘদিন গ্রামগঞ্জের কাঁচা সড়ক, চষা মাঠের উপর হাঁটাহাঁটি করার পর শহরের পাকা রাস্তায় হাঁটতে নাইমুলের চমৎকার লাগছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার। দেয়ালে লেখা নেই। পথে ভিড় নেই। প্রতিটি বাড়িতে পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। রিকশার সঙ্গেও কাগজের পতাকা।

নাইমুল যাচ্ছে শান্তিবাগের দিকে। সেখানে তার পরিচিত একটা হোটেল আছে। হোটেল জিন্দাবাহার। বেশ কিছুদিন এই হোটেলের একটা ঘর (রুম নং

১৮) ভাড়া করে সে ছিল। হোটেলের লোকজন তার চেনা। সেই হোটেলে ওঠাই তার জন্যে সম্ভবত নিরাপদ। সে প্রথমে হোটেলের একটা ঘর (চেষ্টা করবে রুম নং ১৮) নেবে। বয়কে একটা টাকা দিয়ে বলবে দুই বালতি গরম পানি দিতে। দুই বালতি গরম পানি গায়ে ঢেলে আরামের একটা গোসল তাকে দিতে হবে। সে আস্ত একটা সাবান গায়ে ডলবে। অনেকদিন আরাম করে গোসল করা হয় না। আরামের গোসলের জন্যে শরীর খাপ ধরে অপেক্ষা করছে।

গোসলের পর খাওয়া-দাওয়া। এই হোটেলের ইলিশ মাছের ডিমের তরকারি এবং কাতল মাছের মাথার মুড়িঘণ্ট তুলনাবিহীন। সে রুমে অর্ডার দিয়ে আরাম করে খাওয়া-দাওয়া করবে। খাওয়ার পর একটা মিষ্টি পান। একটা সিগারেট। কিছুক্ষণ আরামের ভাতঘুম।

মরিয়মের খোঁজে সে যাবে ঘুম ভাঙার পর। তাদের কোনো খোঁজ যে পাওয়া যাবে না এই বিষয়ে সে প্রায় নিশ্চিত। তাদের ঢাকায় থাকার কথা না। নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে যাবার কথা। ঢাকা কি এখন নিরাপদ? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নগরী কি নিরাপত্তার কথা বলে?

ঢাকা এখন কুকুর এবং কাকমুক্ত নগর। কুকুরমুক্ত হবার পেছনে যুক্তি আছে। মিলিটারিরা না-কি কুকুর সহ্য করছে না। দেখলেই গুলি করে মারছে। কিন্তু কাক গেল কোথায়? তারা নিশ্চয়ই কাকও গুলি করে মারে নি।

নাইমুল হাঁটছে আর মনে মনে কাক খুঁজছে।

কাক বলে কা কা
ঢাকা শহর খা খা।

বাহ্ সুন্দর মিলেছে তো!

কুকুরের দেখা নাইমুল কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে গেল। মোটামুটি স্বাস্থ্যবান একটা ঘিয়া রঙের কুকুর ফুটপাতে শুয়ে আছে। তার শুয়ে থাকার ভঙ্গি বিষণ্ণ। নাইমুল বলল, এই তোর খবর কিরে?

কুকুর সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো। ঢাকা শহরে এই প্রথম নাইমুলের কারো সঙ্গে কথা বলা। ডায়েরি লেখার অভ্যাস থাকলে এই ঘটনাটা সুন্দর করে লেখা যেত—

> আমি ঢাকায় প্রবেশ করি ১৬ আগস্ট দুপুরে। প্রথম কথা যা বলি তা হলো— এই তোর খবর কিরে? প্রশ্নটি করা হয় একটা কুকুরকে। কুকুরের গায়ের রঙ ঘিয়া। সে পা খুঁড়িয়ে হাঁটে। এই কুকুরটা আমার সঙ্গে অনেকদূর হেঁটে হেঁটে আসে। আমি যখন শান্তিনগরের মোড় পার হই তখনই শুধু

সে থেমে যায়। তবে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। তার তাকানোর ভঙ্গি এরকম যে আমি একটু ইশারা দিলেই সে আবারো আমার পেছনে পেছনে আসবে। আমি তাকে ইশারা দিতাম কিন্তু দেই নি, তার কারণ আমার চোখে পড়ল একটা নাপিতের দোকান। সঙ্গে সঙ্গে চুল কাটার কথা মনে পড়ল। আমি ঢুকে গেলাম নাপিতের দোকানে।

চুল কাটার সময় কথা বলা সব নাপিতের অভ্যাস। যে নাইমুলের চুল কাটছে তার মুখে কোনো কথা নেই। কচকচ করে চুল কেটে যাচ্ছে। নাইমুলের খুবই আরাম লাগছে। চুলকাটার ব্যাপারটা যে আরামদায়ক নাইমুল তা আগে কখনো টের পায় নি। তার ঘুম ঘুমও পাচ্ছে। চুল কাটাতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া কোনো কাজের কথা না। নাইমুলকে বেশ কষ্ট করে জেগে থাকতে হচ্ছে। নাইমুল হাই তুলতে তুলতে বলল, আপনার নাম কী?

নাপিত চাপা গলায় বলল, তৈয়ব।

দোকান আপনার?

মহাজনের দোকান।

কারিগর কি আপনি একা?

হুঁ।

কাস্টমার কেমন হয়?

হয় কিছু।

মিলিটারিরা চুল কাটতে আসে?

তৈয়ব এই প্রশ্নের জবাব দিল না। মিলিটারি প্রসঙ্গে কোনো কথা বলা বোধহয় নিষেধ।

শহরে কি 'মুক্তি' আছে?

নাপিত কিছুক্ষণের জন্যে কাচির ক্যাচ ক্যাচ বন্ধ করে আবার শুরু করল। এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। নাইমুল বলল, আপনারা শহরে আছেন, মুক্তির নাড়াচাড়া বুঝেন না? বোঝার তো কথা।

আছে, নাড়াচাড়া আছে। আপনে কি মুক্তি?

নাইমুল সহজ ভঙ্গিতে বলল, হুঁ।

আপনেরে দেইখ্যাই বুঝেছি।

কীভাবে বুঝলেন?

এইসব বোঝা যায়। মাথা মালিশ কইরা দিব ?

দেন। আগে শেভ করেন।

মাথা মালিশ এতই আরামদায়ক হলো যে, নাইমুল সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। ছোটখাটো ঘুম না, লম্বা ঘুম। তৈয়ব তার ঘুম ভাঙাল না। খবরের কাগজ ভাঁজ করে পাশে বসে রইল। মাছি খুব উপদ্রব করছে। ঘুমন্ত লোকটার মুখে বারবার এসে বসছে। তৈয়ব খবরের কাগজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে।

নাইমুলের ঘুম ভাঙল বিকেলে। তখন শহরে রোদ নেই। আকাশ মেঘলা। শ্রাবণ মাসের আকাশে মেঘ মানেই বৃষ্টি। বৃষ্টি নামলে খুবই সমস্যা হবে। নাইমুল এক কাপড়ে ঢাকা এসেছে।

তৈয়ব তাকিয়ে আছে। তার মুখ ভাবলেশহীন।

নাইমুল বিরক্ত গলায় বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ডাকলেন না কেন ?

তৈয়ব জবাব দিল না।

কত হয়েছে আমার ? চুল কাটা, শেভ, মাথা মালিশ। কত হয়েছে বলেন।

তৈয়ব বলল, আপনের কিছু দিতে হবে না।

নাইমুল বলল, দিতে হবে না কেন ?

তৈয়ব এই প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

নাইমুল বলল, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। ভাই, তাড়াতাড়ি বলেন— কত ?

তৈয়ব আগের মতোই আবেগশূন্য গলায় বলল, আপনে মুক্তি। আমি মুক্তির কাছে টেকা নেই না। আমারে টেকা দেওনের চেষ্টা কইরা ফয়দা নাই। দিতে পারবেন না।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। নাইমুল রাস্তায় নেমে পড়ল। সে হোটেলে জায়গা পেল না। হোটেলের মালিক বদল হয়েছে। মালিকের সঙ্গে নামও পাল্টেছে। এখন নতুন নাম 'পাকিস্তান হোটেল'। নতুন মালিক নাইমুলকে কঠিন গলায় বলল, হোটেলে লোক নেওয়া নিষেধ আছে। রেস্টুরেন্ট আছে, খানা খাইতে পারেন। থাকার জায়গা নাই।

মিলিটারির নিষেধ ?

হুঁ। মাঝে মধ্যে চেকিং হয়। বিরাট দিগদারি।

আশেপাশে কোনো হোটেল আছে ?

খুঁজেন। খুঁইজ্যা দেখেন।

নাইমুল আরো দু'টা হোটেলে চেষ্টা করল। একটাতে বলল, ফ্যামিলির সাথে বাচ্চাকাচ্চা থাকলে ঘর দিতে পারে। একা মানুষকে ঘর দেবে না।

নাইমুল বলল, একটা রাতের জন্যে আমার কোথাও থাকা দরকার। একটু ব্যবস্থা করে দেন।

হোটেল মালিক ক্লান্ত গলায় বলল, আত্মীয়স্বজনের বাসায় যান। এইটা ছাড়া পথ নাই। হোটেলে আপনেরে কেউ রাখব না। ঢাকা শহরে আপনের স্বজন আছে না?

নাইমুল দেরি না করে স্বজনের খোঁজে বের হলো। অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার তো ঘটেও যেতে পারে। দেখা যাবে মরিয়মরা ঢাকাতেই আছে, ঐ বাড়িতেই আছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর মরিয়মের মা'র ভীত গলা শোনা যাবে— কে? কে?

এই মহিলা মেয়েদের কখনো দরজা খুলতে দেন না। নিজে আসেন দরজা খুলতে। পরিচয় দেয়ার পরেও আরো কয়েকবার বলেন, কে কে?

নাইমুল কড়া নাড়ার পর তিনিই দরজার ওপাশ থেকে ভয়ে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া গলায় বলবেন, কে?

নাইমুল গলা নামিয়ে বলবে, মা আমি। আমি নাইমুল। দরজাটা খুলুন। তবে কাউকে বলবেন না যে আমি এসেছি। আমি একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই।

তিনি দরজা খুলবেন, তবে নিজেকে নিশ্চয়ই সামলাতে পারবেন না। চিৎকার করে বলবেন, মরিয়ম, দেখে যা কে এসেছে! মরিয়ম কী করবে— দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা মচকে ফেলবে। এই মেয়ের সিঁড়িতে পা পিছলানো রোগ আছে। সে সিঁড়ি দিয়ে নামবে অথচ পা পিছলাবে না— এটা হতেই পারে না।

তাকে দেখে মরিয়ম কী করবে? ঝাঁপ দিয়ে তার গায়ের উপর পড়বে এবং তাকে সুদ্ধ মেঝেতে ফেলে দেবে। এরকম ঘটার সম্ভাবনা আছে। মরিয়ম এমনই মেয়ে যে উত্তেজনার মুহূর্তে চিন্তাই করবে না আশেপাশে কে আছে। মা দাঁড়িয়ে আছে। বোন দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক দাঁড়িয়ে। আমি আমার মানুষটার গায়ে ঝাঁপ দেব। যার যা ইচ্ছা মনে করুক, আমার কিছু যায় আসে না। মানুষটা যখন দোতলায় উঠবে, আমি শক্ত করে তার হাত ধরে রাখব। মানুষটা যদি লজ্জা পেয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতে চায় তাতেও লাভ হবে না। আমি আরো শক্ত করে হাত চেপে ধরব।

মরিয়মদের বাড়ির সদর দরজা তালাবন্ধ। একটা না, দু'টা বড় বড় তালা। নাইমুল কিছুক্ষণ তালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। কেন দাঁড়িয়ে থাকল সে নিজেও জানে না।

রাত ন'টা থেকে কারফিউ। আগে ছিল রাত এগারোটা থেকে। গত এক সপ্তাহ হলো এই সময় এগিয়ে এনে ন'টা করা হয়েছে। এর মধ্যেই থাকার জন্যে নাইমুলকে একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ঢাকা শহরে তার পরিচিত মানুষ নেই বললেই চলে। সে রওনা হলো আগামসি লেনের দিকে। অনেকদিন সেই অঞ্চলে থেকেছে। যে বাড়িতে ছিল তার বাড়িওয়ালা নিশ্চয়ই তাকে ফেলে দেবে না।

আগামসি লেনে ঢোকা গেল না। কোনো সমস্যা হয়েছে নিশ্চয়ই। এলাকা কর্ডন করে মিলিটারি বাড়িতে বাড়িতে ঢুকছে।

কমলাপুর রেল স্টেশনে চলে যাওয়া যায়। একরাত স্টেশনের বেঞ্চিতে গড়াগড়ি করে কাটিয়ে দেয়া। কমলাপুর স্টেশনে থাকাও বিপদজনক। সেখানে কঠিন মিলিটারি পাহারা। সঙ্গে ব্যাগ স্যুটকেস নেই, একটা লোক ঘোরাঘুরি করছে— অতি সন্দেহজনক ব্যাপার।

রাত আটটা বেজে গেছে। আর এক ঘণ্টা পরেই কারফিউ শুরু হবে। শেষ চেষ্টা হিসেবে নাইমুল রওনা হয়েছে শাহেদের বাসার খোঁজে। কয়েকবারই সে এই বাসায় গিয়েছে, তারপরেও রাতে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। পঁচিশে মার্চের পর শহর মনে হয় নিজে নিজেই নিজেকে বদলে ফেলেছে। কিছুই চেনা যায় না। নাইমুল ঠিক করল শাহেদকে পাওয়া না গেলে দরজার ফাঁক দিয়ে আসমানীর চিঠিটা ঢুকিয়ে দেবে। এতে একটা বড় দায়িত্ব শেষ হবে। তারপর যে-কোনো একটা বাড়ির কড়া নেড়ে বলবে, আমার রাতে থাকার জায়গা নেই। আজকের রাতটা আপনাদের বাসায় থাকতে দিন। কারফিউ ভাঙলেই আমি চলে যাব।

নাইমুলের এখন মনে হচ্ছে, তার ঢাকা আসাটা ভুল হয়েছে। ঝোঁকের মাথায় সে চলে এসেছে। মাথায় একটা জিনিস কাজ করেছে— ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। ছুটি। ভালো খাবার খাব। ভালো বিছানায় ঘুমাব। গরম পানি দিয়ে সাবান ডলে গোসল দিব। ভাগ্য ভালো হলে মরিয়মের সঙ্গে দেখা হবে।

এখন দেখা যাচ্ছে সবই এলোমেলো হয়ে গেছে। শুধু চুলটা কাটা হয়েছে। এখন পর্যন্ত গোসল হয় নি। খাওয়া হয় নি। আরামের কোনো বিছানায় শোয়ার প্রশ্নই আসছে না। রাতে কেউ যদি থাকতে দেয়, তাকে ঘুমাতে হবে বসার ঘরের সোফায়। তার জন্যে নিশ্চয়ই বিছানা ছেড়ে দেবে না।

কারফিউ শুরু হবার পাঁচ-সাত মিনিট আগে শাহেদের বাসা পাওয়া গেল। ভেতরে বাতি জ্বলছে। দরজা-জানালা বন্ধ। জানালার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। শাহেদ না থাকলেও কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আছে। ঝুমিয়ে বৃষ্টি

নেমেছে। নাইমুল এক দৌড়ে বারান্দায় উঠে পড়ল। উঁচু গলায় ডাকল, শাহেদ, বাসায় আছিস?

দ্বিতীয়বার ডাকার আগেই দরজা খুলে গেল। শাহেদ দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখেমুখে গভীর বিস্ময়। নাইমুল প্রথম যে বাক্যটা বলল তা হচ্ছে— ঘরে গায়ে মাখা সাবান আছে তো? সাবান দিয়ে হেভি গোসল দিতে হবে। তুই এইভাবে তাকিয়ে আছিস কেন? আমাকে চিনতে পারছিস তো?

শাহেদ বন্ধুর প্রশ্নের জবাব দেয় নি। যেভাবে তাকিয়েছিল সেভাবেই তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে বিস্ময় আনন্দ কিছুই নেই।

নাইমুল ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, দাড়ি গোঁফ টোফ গজিয়ে তুই তো হানড্রেড পারসেন্ট মাওলানা হয়ে গেছিস। তোকে দেখে মনে হচ্ছে দেওবন্ধ থেকে পাস করা মাওলানা। মাথায় টুপিও আছে। সবসময় টুপি পরে থাকিস?

শোবার ঘর থেকে আগরবাতির গন্ধ আসছে। মেঝেতে জায়নামাজ পাতা। জায়নামাজের পাশে আগরবাতি জ্বলছে। নাইমুল বলল, ঘটনা কী? আগরবাতি কেন?

শাহেদ বলল, একটা খতম পড়ছি। খতমে জালালী। এক লক্ষ পঁচিশ হাজারবার দোয়া ইউনুস।

খতম শেষ হয়েছে?

হুঁ। মাগরেবের ওয়াক্তে শেষ হয়েছে। আসমানীদের কোনো খবর পাচ্ছি না, এই জন্যেই খতম।

নাইমুল বলল, খতম যখন শেষ করেছিস তখন খবর হয়তো পাবি। কিছুই বলা যায় না। It is a strange world. গরম পানির ব্যবস্থা কর, গোসল করব। তুই খাওয়াদাওয়া কোথায় করিস?

নিজেই রাঁধি।

খাবারের ব্যবস্থা কর। প্রচণ্ড ক্ষিধা লেগেছে। কী খাওয়াবি? খিচুড়ি খেতে ইচ্ছা করছে। খিচুড়ি খাওয়াতে পারবি?

হুঁ।

ঘরে ডিম আছে?

আছে।

খিচুড়ি আর ডিম কর। আমার খাওয়া কিন্তু বেড়েছে। আগে যা খেতাম তার তিনগুণ খাই। বেশি করে রাঁধবি। লেবু, কাঁচামরিচ এইসব আছে?

না।

আচার নিশ্চয়ই আছে। ভাবি তো আচার পছন্দ করত।

আচার আছে।

গুড। আমার মাথায় খাওয়া ছাড়া কোনো চিন্তা নেই। অতীতে যেসব সুখাদ্য খেয়েছি তার সবগুলির কথা মনে পড়ছে।

শাহেদ রান্না বসিয়েছে। কেরোসিনের চুলায় রান্না হচ্ছে। নাইমুল ঢুকেছে বাথরুমে। বাথরুমের দরজা পুরোপুরি খোলা। শাহেদ যেখান থেকে রান্না করছে সেখান থেকে বাথরুমের ভেতরটা পুরোপুরি দেখা যায়। শাহেদ সেদিকে তাকাচ্ছে না। কারণ নাইমুল সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গোসল করছে। নাইমুল খুব আনন্দে আছে, এটা শাহেদ বুঝতে পারছে। এই প্রবল দুঃসময়ে একটা মানুষ এত আনন্দে কীভাবে থাকে সে বুঝতে পারছে না।

শাহেদ বলল, তুই মুক্তিযুদ্ধে গেছিস— তাই না ?

হুঁ।

যুদ্ধ কেমন হচ্ছে ?

ভালো।

ঢাকা শহরেও অনেক মুক্তিবাহিনী ঢুকেছে।

নাইমুল বলল, তুই যুদ্ধে গেলি না কেন ? দাড়ি গজিয়ে দেওবন্ধের মাওলানা হয়ে বসে আছিস।

শাহেদ বলল, আসমানীদের কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না বলে যেতে পারছিলাম না।

খোঁজ পেলে যুদ্ধে যাবি ?

হুঁ।

খিচুড়ি থেকে তো ভালো গন্ধ বের হয়েছে। কী দিয়েছিস ?

গরমমসলা।

ডিম কয়টা রান্না করছিস ?

তিনটা। আমি একটা খাব, তোর দু'টা।

চারটা ডিম দে। আমি তিনটা খাব।

আচ্ছা। তুই ঢাকায় যুদ্ধ করার জন্যে ঢুকেছিস ?

না। বিশ্রাম নিতে এসেছিলাম। মরির সঙ্গে দেখা করার শখ ছিল। দেখা হলো না।

মরিটা কে ?

আমার বউ, আদর করে মরি ডাকি। মরিয়মকে শর্ট করে মরি।

শাহেদ বিরক্ত গলায় বলল, তোর সবকিছুই উদ্ভট। আদর করে কেউ কাউকে মরি ডাকে।

একেকজনের আদরের ভঙ্গি একেকরকম। তুই ভাবিকে আদর করে কী ডাকিস ?

জেপ ডাকি।

জেপ ডাকিস মানে ? জেপের মানে কী ?

কোনো মানে নাই।

মানে অবশ্যই আছে, তুই বলতে চাস না। না বললে নাই। ভাবির কাছ থেকে জেনে নেব। দেখা হলে আমি তাকে ডাকব জেপ ভাবি।

শাহেদের চোখে সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে গেল। নাইমুলের মুখ থেকে 'জেপ ভাবি' শোনার পরপরই শাহেদের চোখের সামনে সুন্দর একটা ছবি ভেসে উঠেছে। সে, নাইমুল, আসমানী আর রুনি তারা চারজন যেন কোথায় বেড়াতে গেছে। অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তাদের সবারই একটু শীত শীত করছে। এর মধ্যে নাইমুল আসমানীকে খুব বিরক্ত করছে। একটু পর পর বলছে— 'জেপ ভাবি', 'জেপ ভাবি'।

নাইমুল বাথরুম থেকে বলল, তোর রান্না কি হয়েছে ?

একটু বাকি আছে।

শেষ হলে আমাকে বলবি, তখন বাথরুম থেকে বের হবে। স্ট্রেইট খেতে বসব। রান্না শেষ না হওয়া পর্যন্ত গায়ে পানি ঢালতেই থাকব।

ঠাণ্ডা লাগাবি তো।

আমরা যারা মুক্তিতে আছি তারা ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ির মতো ঠাণ্ডাপ্রুফ হয়ে গেছি। রোদবৃষ্টিতে এখন কিছুই হয় না। ভাবির হাতে হাঁসের মাংস খেতে ইচ্ছা করছে। একবার ভাবি রান্না করেছিল, আমি একাই একটা আস্ত হাঁস খেয়ে ফেলেছিলাম। ভাবি আমার নাম দিয়েছিল 'হাঁস রাক্ষস'। তোর মনে আছে ?

মনে আছে।

খেতে বসে নাইমুল খিচুড়ি ছানাছানি করতে লাগল। শাহেদের দিকে তাকিয়ে করুণ গলা করে বলল, ক্ষিধা কেন জানি চলে গেছে। এখন শুধু ঘুম পাচ্ছে। আমার ভাগের খিচুড়ি রেখে দে। ঘুম ভাঙলে খাব।

শাহেদ বলল, কিছুই তো মুখে দিলি না।

ক্ষিধেটা ঘুমের দিকে টার্ন নিয়ে নিয়েছে। এখন না ঘুমালে মরে যাব।

নাইমুল খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তোর জন্যে একটা উপহার আমি নিয়ে এসেছি। উপহারটা শুরুতেই দিতে পারতাম। ইচ্ছা করে দেরি করলাম।

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, কী উপহার?

একটা চিঠি।

কার চিঠি?

কোথায় ঘুমাব সেই জায়গাটা আগে দেখিয়ে দে। ঘুমিয়ে পড়লে খবরদার আমাকে জাগাবি না। তোর বাসায় মিলিটারি ঢুকে পড়লেও না। আমার প্যান্টের পকেটে চিঠিটা আছে। নিয়ে পড়।

শাহেদ চিঠি পড়ছে। তার কাছে মনে হচ্ছে ভূমিকম্প হচ্ছে। বাড়িঘর দুলছে। শাঁ শাঁ শব্দ হচ্ছে। কানের পাশ দিয়ে গরম বাতাস যাচ্ছে। প্রবল আনন্দের সময় এরকম অনুভূতি হয় তার জানা ছিল না। রুলটানা কাগজে ছোট্ট চিঠি—

জেপ গো,

আমি রুনিকে নিয়ে ভালো আছি। শরণার্থী শিবিরে ছিলাম, তোমার বন্ধু নাইমুল সাহেব সেখান থেকে এনে তাঁর এক আত্মীয় বাড়িতে রেখেছেন। সেই বাড়িতে আমরা অতি যত্নে আছি। নিরাপদে আছি।

ইতি—

তোমার জেপ, আসমানী

শাহেদ চিঠি হাতে নাইমুলের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নাইমুল শিশুদের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। আরামের গাঢ় ঘুম।

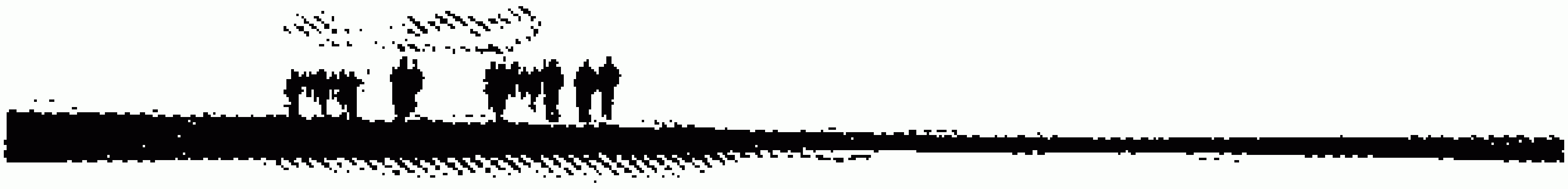

দরজা খুলেই ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী আনন্দিত গলায় বললেন, আরে তুমি! কেমন আছ শাহেদ ?

নাইমুল স্যারের পা ছুঁয়ে সালাম করতে করতে বলল, স্যার, আমি শাহেদ না, আমি নাইমুল।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, নাইমুল নামটাই মাথায় এসেছে। বলার সময় শাহেদ বলে ফেলেছি। তোমার ঐ বন্ধুটা কোথায় ?

সে ইন্ডিয়ার দিকে রওনা হয়েছে। তার স্ত্রী-কন্যার অনুসন্ধানে। আজ সকালেই রওনা দিয়েছে।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিস্ময়ে অভিভূত হবার মতো ভঙ্গি করলেন। মুখে বললেন, বলো কী! আশ্চর্য তো! নাইমুল মনে মনে হাসল। কী অদ্ভুত মানুষ। জগতের কোনো কিছুর সঙ্গে মানুষটার যোগাযোগ নেই, অথচ তা তিনি প্রকাশ করতেও অনিচ্ছুক।

স্যার, দুপুরে আপনার সঙ্গে খাব।

অবশ্যই খাবে। স্পেশাল ডিশ হবে। তুমি বাজার করে নিয়ে আসো। ঘরে চাল-ডাল ছাড়া কিছুই নেই। ইলিশ মাছ খাওয়া যাক, কী বলো ? মাছ কাটিয়ে নিয়ে আসবে। তেলে ভেজে গরম গরম খাব।

নাইমুল বলল, মাছ খাওয়া যাবে না স্যার। বাংলাদেশের মানুষ এখন মাছ খায় না।

কেন ? মাছ খায় না কেন ?

মিলিটারিরা মানুষ মেরে মেরে নদীতে ফেলে। নদীর মাছ মরা-গলা ডেড বডির মাংস খায়। এই জন্যেই মাছ খাওয়া নিষেধ।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বললেন, ইলিশ মাছ তো নদীর মাছ না। সাগরের মাছ।

সাগরের মাছ হলেও এরা ধরা পড়ে নদীতে।

সেটাও কথা। তবে মাছ ডেডবডি খাবে কেন ? মাছ কি আমিষাশী ? লাইব্রেরি ঘরে যাও তো। মাছের উপর কিছু বইপত্র থাকার কথা। পড়ে দেখি মাছ আমিষাশী কি-না। দেখা যাবে মাছ আমিষই খায় না। মাটি শৈবাল এইসব খায়। মাঝখান থেকে আমরা মাছ খাওয়া বন্ধ করে বসে আছি।

নাইমুল লাইব্রেরি ঘরে গেল না। সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তার চায়ের পিপাসা হয়েছে। নাইমুল রান্নাঘর থেকে বলল, স্যার, আপনি চা খাবেন ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি রান্নাঘরে কী করছ ? তোমাকে বললাম না, মাছের উপর বই খুঁজে বের করতে ?

নাইমুল চায়ের পানি বসিয়ে দিয়ে মাছের উপর বই খুঁজতে গেল। স্যারের উপর তার সামান্য রাগ হচ্ছে। ডেডবডি পানিতে ফেলছে বলে মাছ খাওয়া বন্ধ, এই বিষয়টি তাঁর কাছে গুরুত্বহীন। গুরুত্ব পেয়ে গেছে মাছের খাদ্য কী!

নাইমুল!

জি স্যার।

বই পাওয়া গেছে ?

খুঁজছি স্যার। সব বই এলোমেলো করে রাখা।

বই তো এলোমেলোই থাকবে। গোছানো থাকবে শাড়ি, জামা-কাপড়। ভালো কথা, তুমি কি বিয়ে করেছ ?

জি স্যার।

ঐ রাতে তো আমি ভালো বিপদে পড়েছিলাম। তুমি ভুল ঠিকানা দিয়ে চলে গেলে। আমি রাত দশটা পর্যন্ত বাড়ি খুঁজলাম। তোমার স্ত্রীর নাম কী ?

মরিয়ম।

সুন্দর নাম। যিশুর মাতা মরিয়ম। তুমি বৌমাকে নিয়ে অবশ্যই একদিন আসবে। আগে থেকে খবর দিয়ে আসবে যেন সার্ট-পাঞ্জাবি কিছু একটা গায়ে থাকে। খালি গায়ে থাকা হয়েছে অভ্যাস। মেয়েদের সামনে খালি গায়ে থাকা বিরাট অসভ্যতা।

আমি খবর দিয়েই তাকে আনব। বই পাওয়া গেছে স্যার।

ভেরি গুড। আমার কাছে বই দাও, আর একটা কাগজ-কলম দাও।

কাগজ-কলম কী জন্যে ?

নোট করি। ছাপার অক্ষরের উপর দিয়ে শুধু চোখ বুলিয়ে গেলে তো হবে না। নোট নিতে হবে। কী পড়েছ সেটা ভাবতে হবে।

স্যার, আমি কয়েকদিন আপনার সঙ্গে থাকব।

থাক।

আপনার অসুবিধা হবে না তো ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী জবাব দিলেন না। তিনি খাতায় নোট নেয়া শুরু করেছেন।

নাইমুল বলল, গতকাল আপনার বাড়ির কথা একেবারেই মনে আসে নি। গতকাল রাতে থাকার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এই কথার উত্তরেও কিছু বললেন না।

চায়ের পানি ফুটছে। নাইমুল চা বানাতে গেল। মৎস্য বিষয়ক জটিলতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঋষিতুল্য এই মানুষটি কোনো কথা বলবেন না— এটা বোঝা যাচ্ছে।

পুণ্যবান মানুষের আশেপাশে থাকলেই পুণ্য হয়। আলাদা করে পুণ্য করতে হয় না। নাইমুল ঠিক করল, কয়েকদিন এই মানুষটার আশেপাশে থেকে সে পুণ্য সঞ্চয় করে নেবে। এই আলাভোলা মানুষ তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয়, পৈতৃক বাড়িঘর— সবই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন। তিনি এখন চলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া পেনসনের টাকায়। মাঝে-মাঝে তাঁর মেয়ে কানাডা থেকে ডলার পাঠায়।

স্যার!

বলো।

একটা প্রশ্ন ছিল, আপনি কি এই বাড়িটাও ইউনির্ভাসিটিকে দিয়ে দিয়েছেন ?

হুঁ। তবে আমার মৃত্যুর পর।

ইউনির্ভাসিটি যদি এখনই বাড়ি চায়, আপনি কী করবেন ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী রেগে গেলেন। ধমকের স্বরে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এটা তো খুবই অন্যায় সিদ্ধান্ত। আমি তো বলে দিয়েছি, মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে এই বাড়িতে থাকতে দিতে হবে। লিখিত কোনো ডিড অবশ্যি হয় নাই, মৌখিক কথা। দেখি টেলিফোনটা দাও তো। ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের সঙ্গে কথা বলি। হুট করে আমাকে এত বড় ঝামেলায় ফেলা তো ঠিক না।

নাইমুল বলল, স্যার, আপনি আপনার কাজ করুন। ইউনির্ভাসিটি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নি। চা খান স্যার। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী চায়ে চুমুক দিয়ে খাতায় নোট নিতে লাগলেন—

রুই মাছ।

বৈজ্ঞানিক নাম : *Labeo rohita*
খাদ্য : উদ্ভিদ ভূক। মাটিও খায়।

কাতল
বৈজ্ঞানিক নাম : *Catla catla*
খাদ্য : ফ্লাইটো প্লাঙ্কটন, জুপ্লাঙ্কটন। শ্যাওলা, জলজ উদ্ভিদ, ছোট চিংড়ি ও পোকামাকড়।

মৃগেল মাছ
বৈজ্ঞানিক নাম : *Cirrhinus mrigala*
খাদ্য : পচা জলজ উদ্ভিদ, পোকামাকড়, মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ, মাটি।

চিতল
বৈজ্ঞানিক নাম : *Notopterus chitala*
খাদ্য : আমিষাশী

এপর্যন্ত লিখে ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ঘোষণা দিলেন— মাছ খাওয়া যাবে না। মাছের ডেডবডি খাবার সম্ভাবনা আছে। দুপুরে হবে ডিমের ঝোল।

মিলিটারিরা গৌরাঙ্গকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তার পরনে একটা অতি ময়লা কালো রঙের প্যান্ট। খালি গা। অনেকদিন দাঁত ব্রাশ করা হয় নি বলে দাঁত কালচে হয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে দগদগে ঘায়ের মতো হয়েছে। গৌরাঙ্গের কোমরে দড়ি বাঁধা। তবে তাকে মোটেই চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না। সে মনের আনন্দে সিগারেট টানছে। এই সিগারেট কিছুক্ষণ আগে এক লেফটেনেন্ট সাহেব দিয়েছেন। তিনি যে শুধু সিগারেট দিয়েছেন তা না। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়েও দিয়েছেন।

মিলিটারিরা বদ্ধ উন্মাদ এই মানুষটাকে নিয়ে খুবই মজা পাচ্ছে। লেফটেনেন্ট সাহেব এক একবার পাগলটার সঙ্গে কথা বলেন এবং আনন্দে প্রায় ভেঙে পড়েন।

এই তুমি হিন্দু ?

ইয়েস স্যার।

তুমি যে হিন্দু এটা প্রমাণ করো। প্যান্ট খুলে দেখাও।

গৌরাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ট খুলে দেখাল। তার মুখভর্তি হাসি।

তোমহারা বিবি কাহা ?

মিলিটারি লে গিয়া।

তোমহারা বাচ্চা ?

গুল্লি। খতম।

খতম বলার সময় গৌরাঙ্গ চোখ বন্ধ করে জিভ বের করে মরে যাওয়ার ভঙ্গি করল। মিলিটারি দলটার বড় আনন্দময় সময় যাচ্ছে। গৌরাঙ্গ যাই করছে তাই তাদের পছন্দ হচ্ছে।

শেখ মুজিব কে ?

Leader our great leader. জয় বাংলা।

তুমি জয় বাংলার লোক ?

Yes sir.

জয় বাংলার লোকদের আমরা কী করি জানো ?

জানি স্যার। গুল্লি করেন।

তোমাকেও তো গুল্লি করব।

জি আচ্ছা, স্যার।

আরেকটা সিগারেট খাবে ?

জি স্যার।

লেফটেনেন্ট সাহেব আবারো সিগারেট দিলেন, আবারো নিজেই ধরিয়ে দিলেন। তিনি পাগলটাকে আর্মি মেসে নিয়ে যেতে বলেন। গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকবে। সবাই মজা পাবে। পাগলটা ইংরেজি জানে। এটাও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

What is your name ?

My name is গৌরাঙ্গ।

What is the meaning of the name ?

Fair skin.

লেফটেনেন্ট সাহেব বললেন, বলো, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

গৌরাঙ্গ লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, জয় বাংলা।

এতেও লেফটেনেন্ট সাহেব খুব মজা পেলেন। গৌরাঙ্গকে আর্মি মেসে নিয়ে যাওয়া হলো।

ছত্রিশতম ব্রিগেডের প্রধান মেজর জেনারেল জামশেদের খাস কামরায় জরুরি স্টাফ মিটিং বসেছে। উপস্থিত আছেন ৯৩ ব্রিগেডের প্রধান ব্রিগেডিয়ার কাদির। ট্যাংকবাহিনী প্রধান কর্নেল ফজলে হামিদ। বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার কমোডর এনাম আহমেদ। ব্রিগেডিয়ার কাসিম এবং ব্রিগেডিয়ার বশীর। নারায়ণগঞ্জ এলাকার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্রিগেডিয়ার মনজুর শুধু আসেন নি। তিনি জেনারেল নিয়াজীকে নিয়ে আসবেন বলে জানিয়েছেন।

জরুরি স্টাফ মিটিং সকাল ন'টায় শুরু হবার কথা। এখন বাজছে দশটা এগারো, মিটিং শুরু হয় নি। কারণ জেনারেল নিয়াজী এসে পৌছান নি। তিনি জানিয়েছেন— পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে তার অতি জরুরি কিছু কথা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে কথা হচ্ছে না। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার বশীর বললেন, আমরা নিজেরা কি আলোচনা শুরু করতে পারি না?

জেনারেল জামশেদ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তিনি তার সামনে রাখা টিপট থেকে চায়ের কাপে চা ঢাললেন। ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটল। চায়ের কাপ উল্টে গেল। চা পড়ল ধবধবে সাদা টেবিলে। গত স্টাফ মিটিংয়ে একই ব্যাপার ঘটেছে। এর পেছনে কি কোনো ইঙ্গিত আছে? যুদ্ধকালীন সময়ে ছোটখাটো বিষয়েরও অর্থ খোঁজা হয়। লক্ষণ বিচার করা হয়। ডেজার্ট ফক্স ট্যাংক সেনাপতি জেনারেল রোমেলও অভিযান শুরুর আগে নানান লক্ষণ বিচার করতেন।

টেবিলক্লথে পড়া চা মুছে দেবার জন্যে জেনারেল জামশেদের এডিসি রুমাল নিয়ে এগিয়ে এলেন। জামশেদ তাকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বললেন। টেবিলক্লথের চা ম্যাপের মতো তৈরি করছে। কে জানে এই ম্যাপেও হয়তো ইশারা আছে। ম্যাপটা দেখতে হয়েছে ইংল্যান্ডের ম্যাপের মতো।

ব্রিগেডিয়ার কাদির হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করব ?

জেনারেল জামশেদ টেবিলক্লথে তৈরি হওয়া ম্যাপ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ব্রিগেডিয়ার কাদিরের দিকে তাকালেন।

কাদির বললেন, স্যার, আপনি কি জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে আরেকবার কথা বলে দেখবেন ? আমরা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব ? আমাকে টঙ্গী যেতে হবে। সেখানে আমার ফিল্ড মিটিং আছে।

জেনারেল জামশেদ টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। আর তখনি টেলিফোন বাজল। নিয়াজীর ফুর্তিমাখা গলা শোনা গেল— হ্যালো জামশেদ!

ইয়েস স্যার।

তোমরা মিটিং শুরু করে দাও। আমি আজ আর আসব না।

ঠিক আছে স্যার।

উপস্থিত সবাইকে তাদের অতি বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্যে আমার অভিনন্দন জানাবে।

অবশ্যই জানাব।

তারা সবাই পাকিস্তানের নিবেদিত যোদ্ধা এবং পাকিস্তানের অহঙ্কার।

জি স্যার।

তোমার গলার স্বর বিষণ্ন কেন ? গতরাতে কি তুমি তোমার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখেছ ? স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখলে সৈনিক পুরুষদের মন বিষণ্ন হয়। হা হা হা। হ্যালো জামশেদ।

ইয়েস স্যার।

মজার একটা জোক শোনো। এই জোকটা তুমি তোমার অফিসারদের সঙ্গে শেয়ার করতে পার। সবাই মজা পাবে। এক পাঞ্জাবি সুবাদার মেজর, নাম মিঠা খান। তার আসল যন্ত্রটার দৈর্ঘ্য ছিল এক ফুট। মন দিয়ে শোন, এক ফুট। সে তার এই বিশেষ যন্ত্র সুরক্ষিত রাখার জন্যে তার স্ত্রীকে একটা উলের মোজার মতো জিনিস বানাতে বলল। জামশেদ, শুনতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি।

যন্ত্রটার দৈর্ঘ্য কত মনে আছে তো ?

এক ফুট।

রাইট। তোমার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। যাই হোক, মূল গল্প শোনো। মিঠা খানের স্ত্রী উলের মোজার মতো জিনিস তৈরি করল। তারপর... হা হা হা।

জেনারেল জামশেদ ধৈর্য ধরে কুৎসিত রসিকতাটা শুনলেন।

ভদ্রতার হাসি হাসা উচিত। তার প্রয়োজন নেই। কারণ নিয়াজী নিজেই হেসে টেলিফোন ফাটিয়ে ফেলছেন। অন্য কারো হাসি শোনার প্রয়োজন তার নেই।

জামশেদ, রসিকতাটা কেমন?

ভালো রসিকতা।

এই লাইনের আরেকটা গল্প আছে। মডিফায়েড ভার্সন। তোমাকে আরেকদিন শোনাব। মনে করিয়ে দেবে।

জি। মনে করিয়ে দেব।

আমি যে আনন্দে আছি বুঝতে পারছ?

আপনি সবসময়ই আনন্দে থাকেন।

দ্যাটস রাইট। তবে আজ আনন্দিত হবার মতো ব্যাপার আছে। চাইনিজ আর কামিং।

সে তো অনেকদিন থেকেই শুনছি।

অনেকদিনের শোনা আর আজকের শোনা আলাদা। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে নামবে।

নামলে তো ভালোই।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটনা ঘটবে। ভালো কথা, চাইনিজদের নিয়ে একটা মজার রসিকতা আছে। শুনবে?

বলুন, শুনছি।

নিয়াজী চাইনিজদের নিয়ে রসিকতাটা শুরু করেও শেষ করতে পারলেন না। হেড কোয়ার্টার থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাকে লাইনে থাকতে হলো।

জেনারেল জামশেদ জরুরি মিটিং শুরু করলেন। আজকের এজেন্ডা সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা। তিনি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমাদের সৈনিকদের মরাল কী? তার এই প্রশ্নের কেউ উত্তর দিল না। জেনারেল জামশেদ বললেন, সৈনিকদের মরাল সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছে বলে আমার ধারণা। এর কারণটা কী? যুদ্ধ শুরুই হয় নি। কিছু মুক্তি এদিক ওদিক ফুটফাট করছে। এতেই এই অবস্থা? কিছু বর্ডার আউটপোস্ট চাপের মধ্যে আছে। কিন্তু এখনো তো কোনো আউটপোস্ট কেউ দখল করে নি। ইন্ডিয়া সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করলে তবেই আমরা খানিকটা চাপে পড়ব।

এয়ার কমোডর এনাম আহমেদ বললেন, খানিকটা চাপে পড়ব ? আমরা কি নিজেদের সম্পর্কে অতিরিক্ত আস্থা দেখাচ্ছি না ?

একজন প্রকৃত সৈনিক কি নিজেকে শত্রুর কাছে তুচ্ছ ভাববে ?

জেনারেল, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন ? আমি প্রকৃত সৈনিক না ?

আপনি অকারণে উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? বিমানবাহিনীর প্রধান কাজ উত্তেজিত হওয়া। মূল যুদ্ধ করে স্থল বাহিনী। বাকিরা উত্তেজিত হয়।

আপনি কি এই জরুরি মিটিং ব্যক্তিগত কোন্দলের জন্যে ডেকেছেন ?

জেনারেল জামশেদ বললেন, আপনি এই মিটিং অপ্রয়োজনীয় মনে করলে চলে যেতে পারেন।

কিছুক্ষণের জন্যে সবাই চুপ করে গেল। পরিস্থিতি সামাল দিলেন কর্নেল ফজলে হামিদ। তিনি বললেন, আমাদের সামনের সময়টা ভালো না। সামনের দুঃসময়ের কথা ভেবে আমরা কি আমাদের কথাবার্তায় কিছুটা সংযত হতে পারি না ?

জেনারেল জামশেদ বললেন, আমি যে সাময়িক উত্তেজনা দেখিয়েছি, তার জন্যে দুঃখিত। সত্যি কথা আপনাদের বলি, আমি হতাশাগ্রস্ত। বড় বড় কথা হতাশাগ্রস্তরা বলে। মুক্তিদের আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছি। এদের তুচ্ছ করা কি আর এখন উচিত ? এরা শক্তি সঞ্চয় করছে।

এয়ার কমোডর বললেন, এরা এমন কোনো শক্তি সঞ্চয় করে নি যে আপনার মতো একজন শক্ত জেনারেল হতাশাগ্রস্ত হবেন।

জেনারেল জামশেদ তার রিভলভিং চেয়ার পুরোপুরি এয়ার কমোডরের দিকে ফিরিয়ে বললেন, কাদের সিদ্দিকী নামের সিভিলিয়নকে আপনি চেনেন ? চেনেন না ?

নামটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না।

নামটা পরিচিত হবার কথা। ছয়ত্রিশতম ব্রিগেডের একটা বড় অংশ আমরা তার পেছনে লাগিয়েছি। আপনাকে আপনার বিমানবাহিনী নিয়ে বেশ কয়বার তাদের আক্রমণ করতে হয়েছে। তার টিকির দেখাও আমরা পাচ্ছি না। তারপরেও আপনি যদি বলেন, তার নাম আপনার পরিচিত মনে হচ্ছে না, তাহলে আমার কিছু বলার নেই।

তার ভয়ে এতটা ভীত হবার কোনো কারণ দেখি না।

আপনি দেখছেন না। আমি দেখছি। আমাদের অস্ত্র বোঝাই জাহাজ সে দখল করে নিয়েছে। তাও একটা না। তার হাতে এখন অস্ত্রের অভাব নেই।

আমাদের আজকের এই জরুরি মিটিং কি তাকে নিয়ে ?

তার মতো আরো তৈরি হবে।

হোক, তখন দেখা যাবে। ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে এখনই দুঃস্বপ্ন দেখা কাজের কথা না।

বেশ তাহলে কাজের কথা কী আপনি বলুন।

সভা আবারো নীরব হয়ে গেল। একসময় ব্রিগেডিয়ার কাসিম বললেন, চাইনিজ সাহায্যের কথা শুনছি। সেই সাহায্য কবে এসে পৌঁছবে ?

জেনারেল জামশেদ ক্লান্ত গলায় বললেন, চাইনিজ সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন কী ? এয়ার কমোডর এনাম আহমেদের মতো দুর্ধর্ষ মানুষজন থাকতে আমরা কেন বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি ? যাই হোক, আজকের মিটিং অসম্পূর্ণ। জেনারেল নিয়াজীর উপস্থিতিতে আমরা অতিসত্বর আবার বসব। গুড ডে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল গুল হাসান খানের সঙ্গে জেনারেল নিয়াজীর টেলিফোনের মাধ্যমে কিছু কথাবার্তা হলো। অস্ত্র এবং বিশটি মাঝারি ধরনের ট্যাংক নিয়ে একটা চীনা জাহাজ চিটাগাং পোর্টে ভিড়েছে। কথাবার্তা হলো মাল খালাস প্রসঙ্গে। গুল হাসান খান বললেন, আপনি অস্ত্র খালাস করবেন কিন্তু ট্যাংকগুলো পাঠিয়ে দেবেন পশ্চিম পাকিস্তানে।

নিয়াজী বললেন, ট্যাংকগুলোই আমার প্রয়োজন।

ট্যাংকগুলো আপনি চিটাগাং থেকে ঢাকা কীভাবে নিয়ে যাবেন ? ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ। সড়কপথের সমস্ত ব্রিজ নষ্ট।

ট্যাংকগুলো কীভাবে ঢাকায় নেব তা আমার ব্যাপার।

আপনি কি দয়া করে বলবেন, ট্যাংকগুলি কীভাবে নেবেন ?

কীভাবে নেব সেটা আমার ব্যাপার।

আমারও জানার ব্যাপার থাকতে পারে।

অস্ত্র এবং ট্যাংক এসেছে ইস্টার্ন কমান্ডের জন্যে।

মূল প্রসঙ্গে আসুন, ট্যাংকগুলো আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কীভাবে নেবেন ?

আমি তো আগেও বলেছি, সেটা আমার ব্যাপার।

শুনুন জেনারেল, সব ট্যাংক আপনি করাচি পোর্টে পাঠাবেন। এটা হচ্ছে একটি সামরিক আদেশ।

গুল হাসান খান টেলিফোন রেখে দিলেন। নিয়াজী সামরিক আদেশ অগ্রাহ্য করলেন। জাহাজের সব কিছুই চিটাগাং পোর্টে খালাস করা হলো।*

টেলিফোনের কথাবার্তায় জেনারেল নিয়াজীর মেজাজ বেশ খারাপ হলো। তবে এই খারাপ মেজাজ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। তিনি সামান্য ভদকা পান করলেন। ভদকা শীতের দেশের পানীয় হলেও বাংলাদেশের গরমেও এটা ভালো লাগে। প্রচুর বরফ এবং প্রচুর লেবু দিয়ে বানানো ভদকার গ্লাসে চুমুক দেয়া মাত্রই তার মনে একধরনের ফুরফুরে ভাব হয়। মনে হয় সৈনিক জীবনটা তো খারাপ না। বিশাল এক দায়িত্ব নিয়ে তিনি এসেছেন। দায়িত্ব তিনি ভালোমতোই পালন করছেন। এই যুদ্ধ কিছুদিনের মধ্যেই থেমে যাবে। তখন তিনি ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী হয়ে যাবেন। পাঠ্যবই-এ লেখা হবে পাকিস্তানের অতি দুঃসময়ে টাইগার নিয়াজী হাল ধরেছিলেন।

তিনি অতি দ্রুত ভদকার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। এত দ্রুত খাওয়া ঠিক না। কিন্তু তার অসুবিধা হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে তার চিন্তা পরিষ্কার হচ্ছে। মাথা থেকে কুয়াশা সরে যাচ্ছে। তিনি ঠিক করলেন একটি আত্মজীবনীও লিখবেন। যেখানে পূর্বপাকিস্তানকে পোষ মানানোর গল্প সুন্দরভাবে লেখা থাকবে। বইটি লেখার সময় তিনি বিনয়ী থাকবেন। বীরপুরুষরা বিনয়ী হয়। বিনয়ও বীরত্বের লক্ষণ।

আত্মজীবনীটা ইংরেজিতে লেখা হবে, যাতে সব ভাষাভাষীরা পড়তে পারে। বইটার প্রথম লাইনটা হবে— It was a monson of discontent.

জেনারেল নিয়াজীর মন অতিদ্রুত আনন্দে পূর্ণ হলো। এত আনন্দ একা একা ধারণ করা যায় না। আনন্দ বিলিয়ে দিতে হয়। তিনি জেনারেল জামশেদকে টেলিফোন করলেন। তাকে একটা জরুরি নির্দেশও দিতে হবে। কী নির্দেশ তা মনে পড়ছে না, তবে মনে পড়বে। কথা বলতে বলতেই মনে পড়বে। নেশা করার এই এক আনন্দ। মানুষ একইসঙ্গে সবকিছু ভুলে যায়, আবার তার সবকিছুই মনে পড়ে।

হ্যালো জামশেদ।

ইয়েস স্যার।

আমি একটি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ লেখার পরিকল্পনা করেছি।

ভালো করেছেন স্যার।

এটি হবে পাকিস্তান রক্ষা বিষয়ক একটি প্রামাণ্য দলিল।

---

*সূত্র : *Memoir গুল হাসান খান*

অবশ্যই।

বইটিকে আমি সুখপাঠ্য করার ব্যবস্থা করব।

আপনার পক্ষে কাজটা কঠিন হবে না। অসংখ্য গল্প আপনি জানেন। সেইসব গল্প নিশ্চয় বইতে পাওয়া যাবে।

তা পাবে। ইস্টার্ন কমান্ডে তুমি এবং তোমার বীর সৈনিকরা যে সাহসী ভূমিকা রেখেছ— তার উল্লেখ থাকবে।

স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ দিতে হবে না। আমি সবাইকে সবার প্রাপ্য সম্মান দেব। ভালো কথা, তোমার প্রতি একটি জরুরি নির্দেশ আছে। এতক্ষণ মনে পড়ছিল না। এখন মনে পড়েছে।

স্যার বলুন।

চিটাগাং পোর্টে কিছু ট্যাংক খালাস করা হচ্ছে। তুমি ট্যাংকগুলো ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করো।

সেটা কীভাবে সম্ভব ?

আমি তোমাকে নির্দেশ দিলাম, কীভাবে সম্ভব তা তোমার ব্যাপার। আমি দেখতে চাই নির্দেশ পালিত হয়েছে।

জেনারেল জামশেদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ছোট্ট একটা দুঃসংবাদ আছে।

নিয়াজী বিরক্ত গলায় বললেন, দুঃসংবাদ শোনার মতো মানসিক অবস্থা এখন আমার নেই। তারপরেও বলো।

আমাদের একটা পুরো কোম্পানি কাদের সিদ্দিকী ধ্বংস করে ফেলেছে। কয়েকজন তার হাতে ধরাও পড়েছে।

কাদের সিদ্দিকী কে ? ইন্ডিয়ান আর্মির ?

জি-না স্যার, একজন সিভিলিয়ান মুক্তি।

তাকে মৃত অথবা জীবিত অবস্থায় আমার সামনে হাজির করবে। তোমার প্রতি এটি আমার আদেশ, একটি সামরিক আদেশ।

জেনারেল নিয়াজী টেলিফোন রেখে দিলেন। তার মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরনো ফুরফুরে ভাব আবার ফিরে এলো। তিনি তার আত্মজীবনী নিয়ে ভাবতে লাগলেন।

নদীর নাম ধলেশ্বরী। তারিখ বারই আগস্ট।

সাতটা জাহাজের বিশাল বহর এগুচ্ছে। তাদের গন্তব্য ফুলছরিঘাট। জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ এবং রসদ। ফুলছরিঘাটে মাল খালাস হবে। সেখান থেকে যাবে রংপুর এবং সৈয়দপুর। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্টে।

জাহাজ বহরের দায়িত্বে আছেন ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ, সহকারী কমান্ডার লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ। জাহাজগুলি মালামাল বহন করছে, কাজেই নৌবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত না। স্থলবাহিনীর বেশ বড় দল জাহাজে আছে। তারাই নির্বিঘ্নে জাহাজগুলি গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। জাহাজের সারেংরা সবাই বাঙালি, নদী ভালো চেনে। তারা নদীর গভীরতা দেখে দেখে এগুচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ আছেন এস. ইউ. ইঞ্জিনিয়ারস এলসি থ্রি জাহাজে। তাঁর সঙ্গে আছেন লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ। বিশাল আকৃতির এই জাহাজের পাশাপাশি যাচ্ছে ত্রিপল ঢাকা ট্যাংকার এস. টি. রাজন। এখানে আছেন সুবেদার রহিম খান।

ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ জাহাজের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তার কাছে এই প্রথম মনে হচ্ছে তিনি ছুটি কাটাতে এসেছেন। আনন্দময় নৌভ্রমণ হচ্ছে। জাহাজ বহর দেখে দুই তীরের আতঙ্কিত মানুষদের ছোটাছুটিতেও তিনি খুব মজা পাচ্ছেন। বাঙালি অতিরিক্ত মাছ খাওয়ার কারণে ভীরু স্বভাবের হয় বলে তিনি জানেন। আজ তার প্রমাণ দেখছেন। বাড়িঘর ছেড়ে লোকজন পালাচ্ছে। মাছ মারতে আসা জেলেরা নৌকা এবং জাল ফেলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে পানিতে। ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ তাদের দোষ দিতে পারছেন না। সাতটা জাহাজের বহর দেখে যে-কেউ ভয় পাবে। ভীতু বাঙালির ছোটাছুটি দেখতে ভালো লাগে।

জাহাজ এগুচ্ছে ধীর গতিতে। নদী সব জায়গায় সমান গভীর না। জায়গায় জায়গায় চর জেগেছে। নদীর গভীরতা দেখে দেখে এগুতে হচ্ছে সাবধানে। জাহাজের গতি আরেকটু বেশি হলে ভালো হতো।

লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ ডেকে উঠে এলেন। তার হাতে ক্যামেরা। তার উদ্দেশ্য নিজের কিছু ছবি তুলবেন। দেশে পাঠাবেন। ছবি এমনভাবে তোলা হবে যেন জাহাজ বহরের অনেকটাই ছবিতে আছে। তার বৃদ্ধা মা ছেলের ছবি খুব আগ্রহ করে দেখেন।

ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ হাসিমুখে বললেন, হ্যালো মি. ফটোগ্রাফার, তুমি যে হারে ছবি তোল, তোমার ক্যামেরায় ফিল্ম অবশিষ্ট থাকার কথা না। যদি থাকে আমার একটা ছবি তুলে দাও।

লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ বললেন, অবশ্যই স্যার।

ছবিটা এমনভাবে তুলবে যেন আমাকে দেখে মনে হয় আমি ক্রিস্টোফার কলম্বাস।

অবশ্যই স্যার। এখানে ছবি না তুলে চলুন ছাদে যাই। ছাদে ছবি ভালো আসবে। জাহাজ বহরের অনেকখানি পাওয়া যাবে।

চল যাই।

ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ ছাদে উঠার সিঁড়িতে পা রেখেছেন, তখনই মর্টারের গোলা এসে জাহাজে পড়ল। ব্যাপার কী বুঝে উঠার আগেই বৃষ্টির মতো মেশিনগানের গুলি এসে পড়তে লাগল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, What is happening ? বিশাল এই জাহাজ বহর আক্রমণ করার স্পর্ধা কে দেখাচ্ছে ? লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ বলল, স্যার আমরা কাদের সিদ্দিকীর এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের আক্রমণ করেছে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী। সে ছাড়া এই কাজ আর কেউ করবে না।

ততক্ষণে নারকীয় কাণ্ড শুরু হয়েছে। পেছনের জাহাজগুলি উল্টোদিকে চলতে শুরু করেছে। তার জাহাজটি এবং এস. টি. রাজন ছাড়া সামনের জাহাজগুলিও দেখা যাচ্ছে না। এস. টি. রাজনে যেভাবে মর্টারের গোলা এসে পড়ছে যে-কোনো মুহূর্তে এতে আগুন ধরে যেতে পারে। এই ট্যাংকারটিতে ডিজেলই আছে এক লক্ষ আশি হাজার গ্যালন।

জাহাজের কন্ট্রোলরুম থেকে ওয়্যারলেসে হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো।

আমরা আক্রান্ত হয়েছি। আমরা আক্রান্ত হয়েছি। বৃষ্টির মতো মর্টারের গোলা এসে পড়ছে। লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ নিহত। সুবেদার রহিম খান নিহত।

কী বলছ এসব ?

মে ডে। মে ডে।

জাহাজ নিয়ে পিছিয়ে আস। কোনোক্রমেই যেন জাহাজ কাদের সিদ্দিকীর হাতে না পড়ে। জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র।

আমরা চড়ায় আটকা পড়েছি। সেনাবাহিনীর প্রায় সবাই নিহত। বিমানবাহিনীর সাহায্য লাগবে। অবিলম্বে বিমানবাহিনীর সাহায্য লাগবে।

বিমানবাহিনীর সাহায্য যাচ্ছে। জাহাজের অস্ত্র যেন তাদের হাতে না পড়ে।

কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী এগিয়ে আসছে। তাদের দেখতে পাচ্ছি।

হেভি মেশিনগান দিয়ে ওদের আটকে রাখ। বিমানবাহিনীর সাহায্য আসছে।

মেশিন গানাররা কেউ জীবিত নেই।

কথা শেষ হবার আগেই বিকট শব্দে রকেট লাঞ্চারের গোলা ফাটল। ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন পানিতে।*

---

* মাটিকাটা অঞ্চলে অসীম সাহসিকতায় যে মানুষটি জাহাজ আক্রমণের নেতৃত্ব দেন তিনি কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর এক বীর যোদ্ধা। তাঁর নাম মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। জাহাজ দখলের পর তাঁর নাম হয়ে গেল জাহাজ মারা হাবীব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর বিক্রম সম্মানে সম্মানিত করেন। কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীতে যোগদানের আগে তিনি ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার।

বরিশালের বানিয়াপাড়ার একটি বড় দোতলা লঞ্চের দোতলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন জানে রসুল শুকনা মুখে বসে আছেন। লঞ্চে ত্রিশজন সৈনিক, পাঁচজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং কিছু রাজাকারকে উঠানো হয়েছে। জানে রসুলকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে। হেমায়েত বাহিনীকে শেষ করে দেয়া। হেমায়েত বাহিনী বর্তমানে কোথায় আছে কীভাবে আছে— সেই তথ্য নিয়ে একজন ইনফরমার এসেছে। ইনফরমারের নাম কয়েস আলি। তার বয়স চল্লিশের নিচে। থুতনিতে ছাগলাদাড়ি। মাথায় বেতের গোলটুপি। তিনি চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। এক চোখের সুরমা কী কারণে জানি লেপ্টে গিয়েছে। এখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে মারামারি করে তিনি চোখে কালশিটা ফেলেছেন।

ক্যাপ্টেন জানে রসুল এই ইনফরমারের উপর খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে তেমন কিছুই উদ্ধার করা যাচ্ছে না। বরং উল্টা সন্দেহ হচ্ছে, এই লোক আসলে হেমায়েত বাহিনীরই একজন স্পাই। এর কথায় লঞ্চ নিয়ে কোথাও উপস্থিত হওয়া মানে বিপদে পড়া। অথচ উপর থেকে নির্দেশ এসেছে অভিযানে বের হতে হবে। নদীপথের অভিযানের দায়িত্ব নৌবাহিনীর। তারা গানবোট নিয়ে বের হবে। কাজ শেষ করে গানবোট নিয়ে ফিরে আসবে। এইসব জায়গায় স্থলবাহিনীকে লক্কর লঞ্চে করে পাঠানোর মানে কী ? ক্যাপ্টেন জানে রসুলের ধারণা— সেনাবাহিনী এখন চলছে হুজুগের উপর। উপরের লোকজনের যার মাথায় যা আসছে তাই করছে। ওয়ারলেস অর্ডার পাঠিয়ে দিয়ে খালাস।

কয়েস আলি পাঞ্জাবির পকেট থেকে পানের ডিব্বা বের করে দু'টা পান একসঙ্গে মুখে দিয়ে বলল, মেজর সাব এখন কী করবেন ঠিক করলেন ? কথাগুলি সে বলল, কাজ চালাবার মতো উর্দুতে। এটা ভালো। অনেক ইনফরমার আছে যারা উর্দু বলতে পারে না। বুঝতেও পারে না। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় দোভাষির মাধ্যমে। দোভাষিরা সব সময় নিজেদের কিছু কথাবার্তাও ঢুকিয়ে দেয়।

তোমার নাম কয়েস আলি ?

জি জনাব।

উর্দু কোথায় শিখেছ ?

আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাঁচ বছর চাকরি করেছি।

কী চাকরি ?

কিচেনে হেলপার।

চাকরি চলে গেল কেন ?

রিজিকের মালিক আল্লাহ্। তিনি মিলিটারি থেকে রিজিক উঠায়ে নিয়েছেন বলে চাকরি চলে গেছে।

তুমি হেমায়েত বাহিনীকে চেন ?

কেন চিনব না ? দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা আছে।

কার সঙ্গে আত্মীয়তা ?

হেমায়েতউদ্দিনের সঙ্গে। উনার স্ত্রীর নাম হাজেরা খাতুন। যুদ্ধের সময় গুলি খেয়ে মারা গেছে। সে এক হিন্দু মেয়েরে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। তার নাম সোনেকা রাণী রায়। তার বড়ছেলের নাম হাছিবউদ্দিন, ডাকনাম পাপ্পু।

তুমি হেমায়েতউদ্দিনকে ধরিয়ে দিতে চাও ?

অবশ্যই।

কারণ কী ?

পাকিস্তান টিকায়ে রাখতে হবে না ?

শুধু পাকিস্তান টিকায়ে রাখার জন্যে তাকে ধরিয়ে দেবে ?

অন্য কারণও আছে। পারিবারিক।

হেমায়েতউদ্দিন কোথায় আছে তুমি জানো ?

অবশ্যই।

সেখানে গেলে আমরা তাকে পাব ?

সে হইল শুশুক। এইটা বিবেচনায় রাখতে হবে।

শুশুক কী ?

শুশুক থাকে পানিতে। ভুস কইরা ভাইসা উঠে আবার ডুব দেয়।

সে এখন যেখানে আছে— সেখানে পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে ?

আমারে সারেঙ্গের সাথে বসায়ে দেন, আমি নিয়া যাব। তবে খালে ঢুকতে হবে। জোয়ার-ভাটা বিবেচনা করে চলতে হবে।

নদীতে জোয়ার-ভাটা আছে না-কি?

কী যে বলেন, আমরার এইটা জোয়ার-ভাটার দেশ। নদীপথে চলতে হলে নদীর হিসাবে চলতে হবে।

নদীর হিসাবে চলতে হলে কখন রওনা দিতে হবে?

আরো এক ঘণ্টা পরে।

ঠিক আছে তুমি এখন যাও, এক ঘণ্টা পরে রওনা দেব।

ক্যাপ্টেন জানে রসুল বরিশাল এলাকার একটা ম্যাপ বের করে সামনের টেবিলে রাখলেন। ম্যাপ দেখে কোনো কিছুই বোঝার উপায় নেই। মাকড়শার জালের মতো চারদিকে নদী-নালা। অতি দুর্গম অঞ্চল। এই অঞ্চল যে চেনে না— তার জন্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া পুরোপুরি অসম্ভব একটা ব্যাপার। এই রকম অবস্থায় তাকে অভিযানে যেতে হচ্ছে এমন একজনকে শায়েস্তা করতে— যার সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য তাঁর কাছে নেই। এই লোক সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার ছিল। দীর্ঘদিন এবোটাবাদ সেনাবাহিনী স্কুলে প্রশিক্ষক ছিল। এখন সে 'মুক্তি' হয়েছে। বদের হাড্ডি হয়েছে। ভারতের কোনো রকম সাহায্য ছাড়াই নাকি বিশালবাহিনী তৈরি করেছে। এই বাহিনী কোনো রকম ভয়ভীতি ছাড়াই সরাসরি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ঢুশঢাশ কয়েকটা গুলি করে পালিয়ে যাওয়া টাইপ যুদ্ধ না। সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধ। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদের গুণতির মধ্যে ধরছে— এটাও এক বিস্ময়কর ঘটনা।

ব্যাটা এখন আবার হিন্দু বিয়ে করেছে। স্ত্রীর নাম সোনেকা রাণী রায়। হিন্দু বিয়ে তো করবেই, এরা এমনিতেই হাফ হিন্দু। ক্যাপ্টেন জানে রসুলের কাছে খবর আছে, পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানরা বেশির ভাগ সময় মুসলমানি করায় না।

এক ঘণ্টার জায়গায় লঞ্চ ছাড়ল দেড় ঘণ্টা পরে। লঞ্চের নাম এমডি যমুনা। কয়েস আলি সারেঙের পাশে বসে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা যাচ্ছে বানারিপাড়া থেকে স্বরূপকাঠির দিকে। হেমায়েত বাহিনীর মূল লক্ষ্য শর্ষিনার পীরসাহেবের আস্তানায় যে মিলিটারি ক্যাম্প আছে সেখানে আক্রমণ করা। তারা সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় আছে। ক্যাপ্টেন জানে রসুল কয়েস আলিকে ডেকে পাঠালেন। তথ্যগুলি ভালোমতো আবারো যাচাই করে নেয়া দরকার।

হেমায়েত বাহিনী যেখানে লুকিয়ে আছে, সেই জায়গাটা তুমি চেন?

অবশ্যই। বিরাট পেয়ারা বাগান। জংলার মতো সেইখানে আছে।

হেমায়েতউদ্দিন নিজেও কি দলের সঙ্গে আছে ?

উনি নিজে সব অপারেশনে থাকেন। তার স্ত্রীও থাকেন। স্ত্রী হিন্দু। নাম সোনেকা রাণী। রায় বংশ।

তার স্ত্রী যে হিন্দু এটা একবার বলেছ। নতুন কিছু থাকলে বলো।

তার স্ত্রীও যুদ্ধ করে। রাইফেল চালাইতে পারে। এলএমজি চালাইতে পারে। এইটা অবশ্য শোনা কথা। আমি নিজে দেখি নাই। স্যার কি একটা পান খাবেন ?

আমি পান খাই না।

কয়েস আলি দু'টা বড় পান মুখে দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে চাবাতে চাবাতে বলল, আমি সারেঙের সাথে বসি। এর বাড়ি চিটাগাং, এই অঞ্চল সম্পর্কে কিছুই জানে না।

যাও।

কয়েস আলি চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লঞ্চের ইঞ্জিন থেমে গেল। একটু পর পর ঘটাং ঘটাং শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। লঞ্চ থেমে আছে মাঝনদীতে। তবে এখানে নদী তেমন চওড়া না। মাছধরার নৌকা চোখে পড়ছে। ইলিশের মরসুম। জেলেরা প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে মাছ মারতে বের হয়। শুধু গানবোটের বিশেষ শব্দ কানে এলে নৌকা নিয়ে দ্রুত কোনো খালে ঢুকে পড়ে।

এমভি যমুনাকে দেখে তারা সাধারণ লঞ্চই মনে করছে। লঞ্চ সাজানো হয়েছে সেইভাবেই। সৈন্যরা লুকিয়ে আছে এক তলায়। তাদেরকে বলা হয়েছে কেউ যেন জানালা দিয়ে মুখ বের না করে। কেউ যেন তাদের দেখতে না পারে। একতলা দোতলা দুটাই মালে বোঝাই। নারিকেল, পেয়ারা, কাউফল। আলাদা করে মাল বোঝাই করতে হয় নি। মিলিটারিরা মাল বোঝাই এই লঞ্চ রিক্রুট করেছে।

ক্যাপ্টেন জানে রসুল খবর নিয়ে জানলেন, লঞ্চের ইঞ্জিনে কী না-কী সমস্যা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঞ্জিন ঠিক হবে। একঘণ্টা পরে জানানো হলো, ইঞ্জিন ঠিক করা যাচ্ছে না, তবে খুব কাছেই এক লঞ্চ মেকানিকের বাড়ি। ক্যাপ্টেন সাহেব অনুমতি দিলে সারেং সেই লঞ্চ মেকানিককে নিয়ে আসতে পারবে। মেকানিককে বাড়িতে না পাওয়া গেলেও অসুবিধা নেই, তার বাড়ি থেকে কয়েকটা রেঞ্জ নিয়ে এলে সে নিজেই ঠিক করতে পারবে।

জানে রসুল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, কতক্ষণ লাগবে ?

সারেং জানাল, যেতে আসতে যতক্ষণ লাগে। উর্ধ্বে একঘণ্টা।

ক্যাপ্টেন অনুমতি দিলেন। অনুমতি না দিয়ে তার উপায়ও ছিল না। দ্বিতীয় কোনো বিকল্প তার হাতে নেই। অন্য কোনো লঞ্চ নিয়ে তিনি যে ফিরে যাবেন—সেই উপায়ও নেই। নদীপথে এখন লঞ্চ চলাচল করে না বললেই হয়। তার সঙ্গে ওয়্যারলেস সেট নেই। কারো সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য চাওয়ার উপায় নেই।

একঘন্টার মধ্যে সারেঙের ফেরার কথা। দু'ঘন্টার কাছাকাছি হয়ে গেল সারেঙের খোঁজ নেই। বেলা হয়েছে। পাঁচটার উপর বাজে। দিনের আলো কমে এসেছে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেজর জানে রসুল কয়েস আলিকে ডেকে পাঠালেন। কয়েস আলি বিনীত মুখে সামনে এসে দাঁড়াল। জানে রসুল বিরক্ত মুখে বললেন, ঘটনা কী ?

কয়েস আলি উদাস গলায় বলল, ঘটনা ভালো না।

ঘটনা ভালো না মানে কী ?

সারেঙ লঞ্চ ফালায়ে তার হেলপার নিয়ে পালায়ে গেছে বলে মনে হয়।

এরকম মনে হবার কারণ কী ?

হাবেভাবে বুঝলাম। দুই আর দুই-এ মিল করে চার বের করলাম। সহজ হিসাব, জটিল হিসাব তো না।

জটিল হিসাব না ?

জি-না। আপনাকে আগেই বলেছি সারেঙের বাড়ি চিটাগাং, এই অঞ্চলের কিছুই সে চিনে না। সে কীভাবে মেকানিক ধরে আনবে ?

এটা আমাকে আগে বলো নি কেন ?

একবার ভাবলাম বলি। পরে ভাবলাম মানুষরে এত সন্দেহ করা ঠিক না। সে লঞ্চ নিয়া এই অঞ্চলেই চলাফেরা করে। মেকানিকের বাড়ি চিনতেও পারে।

সারেঙ যদি সত্যি সত্যি পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের করণীয় কী ?

জনাব, এই বিষয়ে আমি গভীর চিন্তায় আছি। একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনুমতি দিলে বলি।

বলো।

আমার মন বলতেছে লঞ্চের ইঞ্জিন ঠিক আছে। ব্যাটা ইচ্ছা কইরা লঞ্চ চড়ায় উঠায়ে দিয়েছে।

লঞ্চ কি চড়ায় বেধে আছে ?

জি। শিকারপুরে ছোট লঞ্চ আছে। আপনি যদি আমার সঙ্গে কোনো লোক দেন আমি নৌকাযোগে শিকারপুর যাব। সেখান থেকে লঞ্চ নিয়ে ফিরব। জায়গাটা ভালো না। রাতে এখানে লঞ্চে আটকা পড়লে বিপদ আছে। হেমায়েত বাহিনী শক্ত জিনিস।

তুমি শিকারপুর থেকে লঞ্চ নিয়ে আসতে চাও?

শিকারপুরের দুই-একজন লঞ্চ মালিকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তবে আপনি যদি অন্য কাউকে পাঠাইতে চান, পাঠাইতে পারেন। আমার একটাই কথা, সন্ধ্যার পর এই অঞ্চলে থাকা অতি বিপদজনক। আমি সারেঙের ঘরে আছি। কোন সিদ্ধান্ত হয় আমাকে জানাবেন। আছরের নামাজ পড়ব। আমি সব নামাজ কাজা পড়তে রাজি আছি, আছরের নামাজ কাজা পড়তে রাজি না। ক্যাপ্টেন সাহেব কি জানেন রোজকেয়ামত হবে আছরের ওয়াক্তে?

ক্যাপ্টেন জানে রসুল জবাব দিলেন না। সরু চোখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর এখন সন্দেহ হচ্ছে, লঞ্চ মাঝনদীতে এনে চড়ে আটকে ফেলার পেছনে এই লোকটার ভূমিকা আছে। বেশ বড় ভূমিকা। এই লোক কাজ করছে তার পরিকল্পনা মতো। সারেঙের সঙ্গে পরামর্শ করে লঞ্চ আটকানোর ব্যবস্থা করেছে। নদীর দু'পাশে ঘন নারিকেল বন। নারিকেল বনের কভার নিয়ে হেমায়েত বাহিনী সহজ যুদ্ধ করবে। তিনি লঞ্চ নিয়ে খোলা জায়গায় আছেন, তাঁর কোনো কভার নেই।

তোমার নাম কয়েস আলি?

জি স্যার।

বিয়ে করেছ?

জি স্যার।

ছেলেমেয়ে আছে?

দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলে দুইজনকেই মাদ্রাসায় ভর্তি করায়ে দিয়েছি। হাফেজিয়া মাদ্রাসা। তারা কোরান মজিদ মুখস্থ করতেছে। ছোট ছেলের পাঁচ পারা মুখস্থ হয়েছে। বড়টার এক পাড়া। বড়টার মাথার তেজ কম।

আমার ধারণা তুমি হেমায়েত বাহিনীরই একজন। ইচ্ছা করে আমাদের এখানে এনে ফেলেছ।

আপনি যা চিন্তা করতেছেন তা ঠিক না।

আমি তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে যাব না। আমি তোমাকে এখন লঞ্চের ছাদে নিয়ে তুলব। সেখানে গুলি করে ডেডবডি নদীতে ফেলে দেব।

আপনি আপনার বিবেচনা মতো কাজ করবেন, তবে হায়াত মউতের মালিক আল্লাহপাক। আমার মৃত্যু যেমন হতে পারে, আপনাদের সবার মৃত্যুও এখানে হতে পারে। একটা লঞ্চ এখানে আটকা পড়ে আছে আর হেমায়েত বাহিনী এই খবর জানবে না তা কি হয়? যে সারেং পালেয়ে গেছে— খবর তার মাধ্যমেই চলে গেছে।

তুমি ছাদে চল।

কয়েস আলি বলল, জি আচ্ছা। মৃত্যুর আগে একটা পান খাওয়ার সুযোগ দিয়েন জনাব। জর্দা দিয়া ভালোমতো একটা পান খাইয়া নেই।

ক্যাপ্টেন জানে রসুন নিজে রিভলবার দিয়ে খুব কাছ থেকে কয়েস আলির মাথায় গুলি করলেন। গুলি করার আগমুহূর্তে কয়েস আলি পানের পিক ফেলতে ফেলতে বলল, আপনাদের আজরাইল আসতাছে। বেশি দেরি কিন্তু নাই।

সন্ধ্যার পর পরই হেমায়েত বাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে লঞ্চ আক্রমণ করল। তখনো কয়েস আলির মৃতদেহ লঞ্চের আশেপাশেই আছে। জোয়ারের টান শুরু হয় নি বলে মৃতদেহ ভেসে যায় নি।*

---

* অসীম সাহসিকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্যে মোঃ হেমায়েতউদ্দিনকে বাংলাদেশ সরকার বীরবিক্রম সম্মানে সম্মানিত করেন। কয়েস আলি সম্মান স্বীকৃতি কোনোটাই পান নি। সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে আমি এই লেখার মাধ্যমে তাঁর প্রতি সম্মান জানালাম। (কয়েস আলি নামটি ঠিক না। আসল নাম আমি ভুলে গেছি। কোনো পাঠক মূল নামটি জানালে পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে দেব।) আরেকটি তথ্য যোগ করার লোভ সামলাতে পারছি না। *স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা* গ্রন্থে মোঃ আব্দুল হান্নান লিখছেন— "যুদ্ধকালিন সময়ে মুজিবনগর সরকার মোঃ হেমায়েতউদ্দিনকে সুবেদার পদ প্রদান করেন। এবং তার ডাকনাম দেয়— 'হিমু'।"

তোমার নাম কী ?

আমার নাম মোহম্মদ আবু তাহের।

নাম বলো।

আমার নাম মোহম্মদ আবু তাহের।

কেয়া নাম ?

আবু তাহের।

Tell me your name.
Sir, my name is Abu Taher.

তোমার নাম কী ?

আমার নাম মোহম্মদ আবু তাহের।

কেয়া নাম ?

আবু তাহের।

Tell me your name.
Sir, my name is Abu Taher.

মোহম্মদ আবু তাহের সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছে। তার মুখের উপর দুশ' পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। চোখ বন্ধ করেও তীব্র আলোর হাত থেকে সে বাঁচতে পারছে না। কঠিন এই আলো চোখের পাতা ভেদ করে মাথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের গভীরে কোনো এক জায়গায় পিন ফুটানোর মতো যন্ত্রণা হচ্ছে। এই যন্ত্রণার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। আবু তাহের মাঝে মধ্যেই ভাবছে, শুধুমাত্র বাতি জ্বালিয়ে একজন মানুষকে এত কষ্ট দেয়া যায়!

তার হাত চেয়ারের হাতলের সঙ্গে বাঁধা, চেয়ারের পায়ের সঙ্গে দু'টা পা বাঁধা। পায়ের বাঁধন এত শক্ত যে দড়ি চামড়া কেটে মাংসে ঢুকে পড়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, পায়ে কোনো ব্যথা বোধ নেই। আবু তাহেরের মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। লালা পড়া শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। তার সামনে মিলিটারি

গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন বসে আছে। দু'জনের চেহারাটা তার কাছে একরকম মনে হচ্ছে। গোলাকার ফর্সা মুখ। নাকের নিচে হালকা গোঁফ। আবু তাহেরের পেছনে একজন দাঁড়িয়ে আছে। সেই একজন মাঝে-মধ্যে তার সামনে আসছে। সেই একজনের চেহারাও অন্য দুজনের মতো। তবে সে রোগা। তার মুখে বসন্তের দাগ। এরা কি যমজ ভাই? এক সঙ্গে তিনজনের জন্ম কি হতে পারে?

তোমার নাম কী?

আমার নাম মোহম্মদ আবু তাহের।

নাম বলো।

আবু তাহের।

কেয়া নাম?

মোহম্মদ আবু তাহের।

Tell me your name.

Sir, my name is Abu Taher.

তোমার নাম কী?

আমার নাম মোহম্মদ আবু তাহের।

তারা একই প্রশ্ন করে যাচ্ছে। কতদিন ধরে করছে? একদিন দু'দিন নাকি কয়েক বছর হয়ে গেল? তারা কি এই প্রশ্ন করেই যাবে? একই প্রশ্ন বারবার করার পেছনের অর্থ কী? আবু তাহের কিছুক্ষণ আগে চেয়ারে প্রস্রাব করেছে। সেই প্রস্রাব গড়িয়ে গেছে সামনে বসে থাকা দু'জনের দিকে। তারা তাকিয়ে দেখেছে কিন্তু এই বিষয়ে কিছুই বলে নি। তারা কিছুক্ষণ পর পর সিগারেট ধরাচ্ছে। সেই সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভয়াবহ। নাড়ি পাক দিয়ে বমি আসছে।

মোহম্মদ আবু তাহের?

জি স্যার।

ঢাকা শহরে যেসব মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা কাজ করছে— তাদের কাউকে তুমি চেন?

জি-না স্যার।

কিন্তু তুমি তো মতিঝিলে হাটখোলা শাখার হাবীব ব্যাংক লুটের সময় জড়িত ছিলে। তোমার সঙ্গে আর কে কে ছিল?

স্যার, আমি হাবীব ব্যাংক লুটের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না।

তুমি কী করো?

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। ফিজিক্সে M.Sc. থিসিস গ্রুপ।

টিকাটুলি ওয়েল ট্যাংকার হাইজ্যাকে তুমি ছিলে না ?

জি-না স্যার।

এখন আমরা তোমার ডান হাতের পাঁচটা আঙুলে পিন ঢুকিয়ে দিব। তুমি যদি অপরাধ স্বীকার করো, তবেই তা বন্ধ করা হবে।

স্যার, মুক্তিবাহিনীর কোনোকিছুর সঙ্গেই আমি জড়িত না।

তোমরা তিনভাই। বাকি দু'জন কোথায় ?

স্যার, বাকি দু'জন কোথায় আমি জানি না।

আমরা যতদূর জানি বাকি দু'জন মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

ওদের খবর আমি জানি না স্যার।

তুমি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দাও নাই কেন ?

আমি পাকিস্তানে বিশ্বাস করি। ইন্ডিয়া আমাদের শত্রু। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কায়দে আজম জিন্দাবাদ। লিয়াকত আলি খান জিন্দাবাদ। মহাকবি ইকবাল জিন্দাবাদ।

গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন শব্দ করে হেসে উঠল। তাদের একজন হাসতে হাসতে বলল, দাও ওর আঙুলে পিন ফুটিয়ে দাও।

আবু তাহের বিড়বিড় করে বলল, আল্লাহ্ আমাকে অজ্ঞান করে দাও। আল্লাহ্পাক আমাকে অজ্ঞান করে দাও। আমাকে অজ্ঞান করে দাও।

কী তীব্র ব্যথা! কী ভয়াবহ যন্ত্রণা! চোখের সামনে হঠাৎ করে আগুনের মতো কী যেন ঝলসে ওঠে। পিন ফুটানোর ব্যথাটা হাতের আঙুলে হয় না। অন্য কোথাও যেন হয়।

স্যার পানি খাব। স্যার পানি খাব।

তোমার নাম কী ?

আমার নাম আবু তাহের, স্যার পানি খাব।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের চৌরাস্তার ট্রাফিক স্টপে মন্ত্রী মাওলানা মোহম্মদ ইসহাকের গাড়িতে গ্রেনেড ছোড়া হয়। যারা এই কাজটা করে, তুমি কি তাদের সঙ্গে ছিলে ?

স্যার, পানি খাব।

প্রশ্নের জবাব দাও, তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে ?

ছিলাম স্যার।

হাবীব ব্যাংক লুটের সময় ছিলে ?

ছিলাম স্যার। পানি খাব।

টিকাটুলি অপারেশনে ছিলে ?

জি স্যার। এক গ্লাস পানি দেন। পানি খাব।

গেরিলারা কে কোথায় লুকিয়ে থাকে, তুমি জানো ?

জানি স্যার।

ওদের দুইজনকে, শুধুমাত্র দুইজনকে ধরিয়ে দিতে পারলে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব। ধরিয়ে দেবে ?

জি স্যার। একটু পানি খাব।

আবু তাহেরকে পানি খেতে দেয়া হলো। চোখের উপরের বাতি নিভিয়ে দেয়া হলো। ঘরে এখনো বাতি জ্বলছে। কিন্তু আবু তাহের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে ঘর অন্ধকার। কবর কি এরকম অন্ধকার হয় ?

মোহম্মদ আবু তাহের।

জি স্যার।

নাও সিগারেট নাও।

আমি সিগারেট খাই না।

না খেলেও সিগারেটে টান দাও। এই অবস্থায় শরীর নিকোটিন পছন্দ করে।

আবু তাহের সিগারেট টানছে। সিগারেট তার বাঁ হাতে ধরা। সে ডান হাত তুলতে পারছে না। তার ডান হাতের প্রতিটি আঙুলে পিন ফুটানো হয়েছে। মধ্যমা আঙুলের পিন ঠিকমতো ফুটে নি। অর্ধেক বের হয়ে আছে। একবার তার কাছে মনে হলো, এরকম কিছুই ঘটে নি। সে ভয়ঙ্কর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছে। তার বোবায় ধরা রোগ হয়েছে। বোবায় ধরার আগে আগে সে এরকম দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙলেই দেখা যাবে সব ঠিক আছে।

মোহম্মদ আবু তাহের ?

জি।

অনেকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্যে সব অপরাধ স্বীকার করে। তাদেরকে যখন বলা হয়— মুক্তি যেখানে থাকে সেখানে নিয়ে চল— তখন তারা কোথাও নিয়ে যেতে পারে না। কাউকে ধরিয়েও দিতে পারে না। তারা আমাদের সময় নষ্ট করে। তুমি বলো আমাদের সময় নষ্ট করা কি উচিত ?

জি-না।

তুমি আমাদের সময় নষ্ট করছ না তো ?

জি-না।

কাউকে যদি ধরিয়ে দিতে না পার, তাহলে আমরা তোমাকে মজার একটা শাস্তি দেব। শাস্তির ইংরেজি নাম Castration. তোমার দুটা অণ্ডকোষ কেটে ফেলে দেব। খোজা বানিয়ে দেব। খোজা কী চেন ?

চিনি।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটা পুরুষকে খোজা বানিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। একটা নতুন জাতি তৈরি হতো। নপুংসক জাতি। ভালো হতো না ?

জি স্যার। ভালো হতো।

এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা তোমাকে নিয়ে বের হব। তুমি বাড়িগুলি চিনিয়ে দেবে। তোমার হাত থেকে আমরা পিন সরাব না। যে রকম আছে, সে রকমই থাকবে। ঠিক আছে ?

জি স্যার।

তোমার একটা আঙুলের পিন দেখছি ঠিকমতো ঢোকানো হয় নি। ঢুকিয়ে দেই ?

দিন স্যার।

আচ্ছা এখন থাক। আমরা ভ্রমণ শেষ করে কাজটা করব।

জি আচ্ছা স্যার।

ভ্রমণে যাবার আগে কিছু কি খাবে ? এক পিস কেক। এক কাপ চা।

খাব স্যার।

কাজটা সেরে এসে খাই ? প্রথমে কাজ তারপর খাদ্য। সেটা ভালো না ?

জি স্যার ভালো। খুব ভালো।

গাঢ় নীল রঙের একটা টয়োটা গাড়ি নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছে। গাড়ির কাচ এমন যে, ভেতরের আরোহীদের বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গাড়ির ভেতরের মানুষরা বাইরে কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে। পেছনের সিটে আবু তাহের বসে আছে। তার গায়ে কম্বল জড়ানো। আবু তাহেরের মুখ দিয়ে এখনো লালা পড়ছে। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। কিছুক্ষণ পরপর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আবু তাহেরের দু'পাশে দু'জন। আবু তাহের বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছে, এই দু'জন নোট নিচ্ছে। বাড়ি দেখানোর কাজটা আবু তাহের করছে কিছুই না জেনে। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে তার কোনোই যোগ নেই। তারা কে কোথায় থাকে সে কিছুই জানে না।

স্যার, এই বাড়ি।

এটা তো দোতলা বাড়ি। দোতলা বাড়ির কোন তলা ?

সেটা বলতে পারছি না স্যার।

ভালো করে দেখে বলো, এই বাড়ি?

জি স্যার।

এখন কোন দিকে যাব?

পুরানা পল্টন।

পুরানা পল্টন?

জি স্যার।

পুরানা পল্টনে যে থাকে তার নাম কী?

নাম জানি না স্যার। রাতে এই বাড়িতে এসে ঘুমায়।

একা ঘুমায় নাকি আরো লোকজন থাকে?

সেটা বলতে পারছি না স্যার।

আবু তাহের ঢাকা নগরের বিভিন্ন এলাকায় পাঁচটি বাড়ি দেখিয়ে দিল। সেই রাতেই পাঁচটি বাড়ি থেকে নয়জনকে মিলিটারি ধরে নিয়ে গেল। তাদের কেউই জীবিত ফিরে এলো না। এই নয়জনের কেউই মুক্তিবাহিনীর বিষয়ে কিছুই জানত না।

এই নয়জন আরো কিছু মানুষের নাম বলল। অদ্ভুত এক চেইন রিঅ্যাকশন। তরুণ যুবকরা ধরা পড়ছে। কেন ধরা পড়ছে তারা জানে না। কোনো একজনের নাম বলে দিলে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার সম্ভাবনা। তারা নাম বলছে। বাড়িঘর দেখিয়ে দিচ্ছে।

সেই সময় দুষ্কৃতিকারী ধরার জন্যে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল। পুরস্কারের লোভে যদি কেউ এগিয়ে আসে। জেলা প্রশাসকরা যে-কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে ধরিয়ে দিতে পারলে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতে পারতেন।*

ক. সাধারণ দুষ্কৃতিকারী বিষয়ে খবর দেয়ার জন্যে ৫০০ টাকা।

খ. ভারতের ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুষ্কৃতিকারীর বিষয়ে খবর দেয়ার জন্যে ৭৫০ টাকা।

গ. আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতারের জন্যে ১,০০০ টাকা।

ঘ. দুষ্কৃতিকারী দলের নেতা গ্রেফতারের জন্যে ২,০০০ টাকা।

ঙ. অস্ত্রশস্ত্রসহ দুষ্কৃতি দলের নেতা গ্রেফতারের জন্যে ১০,০০০ টাকা।

---

* সূত্র : *দৈনিক পাকিস্তান*

জওহরলাল নেহেরুর একমাত্র কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর দেশের মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে ডাকে 'ইন্দিরাজী'।

ইন্দিরাজী কোলকাতা বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বক্তৃতা দেবেন। তারিখ ডিসেম্বর তিন। তাঁর আসার কথা ছিল চার তারিখে, তিনি একদিন আগেই চলে এসেছেন। এর কোনো বিশেষ তাৎপর্য কি আছে? আজই কি সেই দিন? সেই মাহেন্দ্রক্ষণ? আজই কি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হবে? হিন্দুস্থান সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে সরাসরি নেমে পড়বে। স্বাধীন হবে বাংলাদেশ। এক কোটি শরণার্থী যারা অন্য এক দেশে, অচেনা পরিবেশে অবর্ণনীয় দুঃখে জীবনযাপন করছে তারা ফিরে যাবে নিজ বাসভূমে।

বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ড লোকে লোকারণ্য। উদ্‌গ্রীব মানুষের সমুদ্র। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিশেষ ভাষণ সবাই শুনতে চায়।

ইন্দিরাজী ভাষণ শুরু করলেন। শান্ত গলায় প্রায় উত্তেজনাহীন বক্তৃতা। তিনি নতুন কিছু বললেন না। শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বললেন। বিদেশী শক্তিদের আবারো আহ্বান করলেন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখার জন্যে। বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল। তবে বক্তৃতা চলাকালিন সময়ে তিনি একটা ছোট্ট চিরকুট পেলেন। চিরকুট দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখের দৃষ্টি হলো তীব্র। তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে বক্তৃতা শেষ করলেন।

চিরকুটে লেখা ছিল— পাকিস্তান বিমানবাহিনী হঠাৎ করে অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তিপুর, যোধপুর, আম্বালা এবং আগ্রায় বোমা বর্ষণ করেছে। পাঞ্জাব সীমান্তে পাকিস্তান স্থলবাহিনী যুদ্ধ শুরু করেছে। তারা ভারতের ভেতরেও কিছুদূর ঢুকে পড়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী দিল্লি ফিরে গেলেন। ডিসেম্বরের চার তারিখ মধ্যরাতে আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র থেকে তিনি বাংলাদেশের মানুষদের বহু প্রতীক্ষিত বিশেষ ঘোষণাটা দিলেন। এই ঘোষণায় বাংলাদেশের স্বীকৃতি ছিল না, কিন্তু

বোঝা যাচ্ছিল সেই স্বীকৃতি আসার পথ তৈরি হচ্ছে—

> Today the war in Bangladesh has become a war on india...
>
> Aggression must be met and the people of India will meet it with fortitude and determination and with discipline and atmost unity.

ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণার জবাবে ইয়াহিয়া খান আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ডিসেম্বরের চার তারিখ সকালে। তিনি রেডিও ভাষণে বললেন,

> Our enemy has once again challenged us.... March forward. Give the hardest blow of Allah ho Akbar to the enemy.

ইয়াহিয়া খানের যুদ্ধ ঘোষণার জবাবে ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বললেন, আমি ভোরবেলায় খবর পেয়েছি পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমরা তৈরি আছি।

কিসিং কনটেম্পরারি আর্কাইভসের সেই সময়ের বিবরণ এইভাবে দেয়া আছে—

> The Indian Army, linking up with the Mukti Bahini entered East Pakistan on Dec. 4 from five main direction, (1) in the Comilla Sector, east of Dacca; (2) In the Sylhet Sector, in the north-east of the province (3) in the Mymensingh Sector, in the North (4) in the Rangpur Dinajpur Sector, in the north west; (5) in the Jessore Sector, south west of Dacca....

শুরু হয়ে গেল অদ্ভুত এক আন্তর্জাতিক দাবা খেলা।

শক্তিমান দেশগুলি মেতে গেল নিজেদের অবস্থান এবং শক্তি পরীক্ষায়।

ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে মার্কিন সরকারের উদ্যোগে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসল। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলেন মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ বুশ।* মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে এগারোটা ভোট পড়ে। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে অংশগ্রহণ করে নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন প্রস্তাবের বিপক্ষে সরাসরি ভেটো প্রয়োগ করে প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। সোভিয়েত প্রতিনিধি কমরেড মালিকভ বলেন, 'আপনারা কেউ কি পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন না? জাতিসংঘের ৮৮টি দেশের কোনোটির জনসংখ্যা এক কোটির বেশ না অথচ পূর্ব পাকিস্তান থেকে এক কোটির বেশি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।'

---

*জর্জ বুশ পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের পিতা।

রেডিও পিকিং থেকে বলা হলো, চীন পাকিস্তানকে সবরকম সাহায্য দেবে। ভারতীয় বাহিনীকে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

চীন যাতে লাদান সীমান্ত দিয়ে সরাসরি ভারতে ঢুকে না পড়তে পারে, সেই ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে এলো রাশিয়া। রাশিয়া, চীন-রাশিয়া সীমান্তে দশ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন সাংবাদিকদের কাছে বললেন, ভারত যা করছে তার নাম সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশের অংশ দখল করার অশুভ পাঁয়তারা।

মার্কিন সরকারের সপ্তম নৌবহর তখনো ছিল উত্তর ভিয়েতনামের কাছে। সপ্তম নৌবহরকে বাংলাদেশের দিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। সপ্তম নৌবহর রওনা হলো বঙ্গোপসাগরের দিকে। সপ্তম নৌবহরে ছিল পরমাণু শক্তি চালিত বোমারু বিমান বহনকারী বিশাল জাহাজ এন্টারপ্রাইজ, একটি এমফিবিয়াস এসল্ট শিপ, একটি গাইডেড মিজাইল ফ্রিগেট, চারটি গাইডেড মিজাইল ডেস্ট্রয়ার এবং একটি ল্যান্ডিং ক্রাফট।

এর জবাবে রাশিয়া বিশটি সোভিয়েত রণতরীকে ভারত সাগরে নিয়ে এলো। একটি ক্ষেপণাস্ত্রবাহী রাশিয়ান ফ্রিগ্রেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে সক্ষম পরমাণু চালিত একটি সোভিয়েট ডুবোজাহাজও বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হবার জন্যে রওনা হলো।

হতভম্ব নিয়াজীকে গুল হাসান খান টেলিফোন করে পশতু ভাষায় জানালেন, নার্ভাস হবার কিছু নেই। মনে সাহস রাখ, হলুদ এবং সাদা জাতি উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক দিয়ে আসছে।

ইয়াহিয়া খানও টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন, যে-কোনো মুহূর্তে বিদেশী সাহায্য আসবে। যে-কোনো মূহূর্তে।

সাহায্য কীভাবে আসবে?

কীভাবে সাহায্য আসবে সে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, তবে বিদেশী সাহায্য আসবে। এই খবরে কোনো ভুল নেই। অতি গোপন খবর এবং আসল খবর। যে-কোনো ভাবেই হোক ঢাকার পতন যেন না হয়। ঢাকা ধরে রাখ। শুধু ঢাকা। সাহায্য আসবে, কঠিন সাহায্য।

গভর্নর হাউসে মিটিং বসেছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ড. মালিকের মাথায় (ড. আব্দুল মোত্তালেব মালিক) সাদা টুপি। তিনি এইমাত্র নামাজ শেষ করেছেন। তাঁর চোখে-মুখে দিশাহারা ভাব। জেনারেল নিয়াজীকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

মিটিং-এ আরো উপস্থিত আছেন, রাও ফরমান আলি (গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা), জেনারেল জামশেদ। জেনারেল জামশেদকে অসম্ভব চিন্তিত দেখাচ্ছে। তবে রাও ফরমান আলির মুখমণ্ডল ভাবলেশশূন্য। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, আশেপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার সঙ্গে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করছেন না।

ড. মালিক খাকাড়ি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে মিনমিনে স্বরে বললেন, আমাদের অবস্থাটা কী ?

নিয়াজী বললেন, অবস্থা ভালো। কাপুরুষ হিন্দুবাহিনী ঢাকায় আসার চেষ্টা করছে। তাদের আগমন শিক্ষাসফরের মতো। পদে পদে শিক্ষা পেয়ে তারা এগুচ্ছে।

ড. মালিক বললেন, মূল অবস্থাটা কী জানতে পারি ?

জেনারেল জামশেদ বললেন, মূল অবস্থা আপনার জানার প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ কী হচ্ছে কেমন হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব গভর্নরের না। তিনি বেসামরিক বিষয় দেখবেন। জাতীয় পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এসেছে, আপনি সেই বিষয় নিয়ে ভাবুন।

ড. মালিক আগের চেয়েও ক্ষীণ গলায় বললেন, আমার মাথায় অন্য পরিকল্পনা ছিল।

রাও ফরমান আলি তীব্র গলায় বললেন, কী পরিকল্পনা ?

ড. মালিক থতমত খেয়ে গেলেন। কিছু বলতে পারলেন না। ফরমান আলি বললেন, দাবা খেলা এখন শেষপর্যায়ে চলে এসেছে। এখন আমরা মিডল গেম পার হয়ে এন্ড গেমে এসেছি। এন্ড গেম চট করে শেষ হয় না। চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। এই খেলাও চলতে থাকবে। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান কেউ জয়ী হবে না। স্টিলমেট অবস্থা হবে। তখন বিদেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যস্থতায় একধরনের সমঝোতা হবে।

ড. মালিক বললেন, এই বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত ?

ফরমান আলি বললেন, অবশ্যই। একজন পূর্ব পাকিস্তানি নুরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোকে উপপ্রধানমন্ত্রী করে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হয়েছে। আপনি কি এর মধ্যে কোনো ইঙ্গিতে দেখতে পারছেন না ? এই কোয়ালিশন সরকার আলাদা আলোচনার মাধ্যমেই গঠন করা হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শেই এই সরকার গঠন করা হয়েছে।[১]

ড. মালিক বললেন, ইন্ডিয়ান সৈন্যরা যেভাবে এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয়, অতি দ্রুত তারা ঢাকায় ঢুকে পড়বে।

জেনারেল নিয়াজী বললেন, ঢাকায় ঢুকতে তাদের খুব কম করে ধরলেও

পাঁচ বছর লাগবে। ইন্ডিয়ানরা কাপুরুষ। আমাদের গোলাগুলির ভেতর দিয়ে এরা ঢাকায় কিছুতেই ঢুকবে না। ইন্ডিয়ানরা কেন কাপুরুষ সেই গল্প শুনতে চান?

কেউ জবাব দিল না। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তারা এই মুহূর্তে গল্প শোনায় আগ্রহী না। নিয়াজীর উৎসাহে তাতে ভাটা পড়ল না। তিনি গল্প শুরু করলেন— পুরুষদের কাপুরুষতার অংশটা থাকে তাদের নুনুর আগায়। আমরা তা কেটে ফেলে দেই বলে আমরা সাহসী। ওরা তা ফেলে না বলে ওরা কাপুরুষ। হা... হা... হা...।

জেনারেল গলা ফাটিয়ে হাসছেন। সেই হাসি অন্য কারো মুখে সংক্রামিত হচ্ছে না। সাইরেনের শব্দ হচ্ছে। আবারো বিমান আক্রমণ হবে। অতি দ্রুত সবাই স্থান ত্যাগ করলেন। ইন্ডিয়ান বিমানবাহিনী বড় যন্ত্রণা করছে।

গভীর রাত। টাঙ্গাইলে পাকবাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার কাদির খান অবস্থান করছেন এলেঙ্গায়। কয়েকটি দুঃসহ রাত তিনি নির্ঘুম পার করেছেন। এখন আর শরীর টানছে না। মন অবসন্ন। একের পর এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ আসছে। নিয়তির কী অপূর্ব রসিকতা! টাঙ্গাইল এলাকার মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের নামও কাদের। কাদের সিদ্দিকী। কাদির খান এখন প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখেন— তিনি বন্দি হয়েছেন কাদের সিদ্দিকীর হাতে।

কাদের সিদ্দিকী কি তার সঙ্গে সম্মানসূচক আচরণ করবে? তার মনে হয় না। মুক্তিবাহিনীর কাছে তারা অতি ঘৃণ্য প্রাণী। একজন মর্যাদাসম্পন্ন সামরিক বাহিনীর অফিসারের সম্মান এবং মর্যাদার ব্যাপারটা বুঝবেন আরেকজন মর্যাদাসম্পন্ন সামরিক অফিসার। আত্মসমর্পণ যদি করতেই হয়, তাহলে করতে হবে ইন্ডিয়ানদের কাছেই। তিনি কী করবেন? তার কী করা উচিত?

উপর থেকে অস্পষ্ট সব নির্দেশ আসছে। একবার বলা হলো, নিজের অবস্থানে শক্ত হয়ে বসে থাকো। তারপর বলা হলো, পশ্চাদ অপসারণ করে ঢাকায় চলে এসো। ঢাকা রক্ষা করতে হবে। এখন ঢাকা রক্ষা মানেই পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা।

তিনি ঢাকায় কীভাবে যাবেন? ঢাকা যাবার কোনো উপায় নেই। প্রতিটি ব্রিজ মুক্তিবাহিনী ভেঙে ফেলেছে। এতে অবশ্যি একটা সুবিধা হয়েছে, ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীও ঢাকায় যেতে পারছে না। তাদেরকেও পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার কাদির খান ডিনার করতে বসলেন রাত দু'টায়। কয়েকটা শুকনা রুটি, এক বাটি ঠাণ্ডা গরুর মাংস। সেই মাংস সিদ্ধ হয় নি। পাথরের মতো শক্ত। সময় যখন খারাপ হয়, তখন সবদিক থেকেই খারাপ হয়।

রসুইখানায় রান্না হয় নি। রসদের সমস্যা কিংবা অন্যকিছু হবে। তিনি এই নিয়ে ভাবতে চান না। এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা— কীভাবে কোন পথে ঢাকায় পৌঁছানো যায় ? এবং কত দ্রুত পৌঁছানো যায়।

কাদির খান মাংস ছাড়াই রুটি মুখে দিলেন, আর তখন তার কাছে একটা সুসংবাদ এলো। এত বড় সুসংবাদ তিনি তার দীর্ঘজীবনে পান নি। বিদেশী সাহায্য চলে এসেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে চাইনিজ প্যারাট্রুপার নামছে। টাঙ্গাইলে নামছে।

ব্রিগেডিয়ার কাদির খান বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্। শেষপর্যন্ত তাহলে তাদের দেখা পাওয়া গেল ?

সংখ্যায় কত ?

অসংখ্য। শুধু নামছেই।

আমার তরফ থেকে তাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করো। তাদের পরিকল্পনা কী আমার জানা দরকার। আমার ধারণা তারা ইচ্ছা করে টাঙ্গাইল নেমেছে, যাতে শুরুতেই কাদের সিদ্দিকীকে শায়েস্তা করতে পারে।

হতে পারে স্যার।

হতে পারে না, এটাই সত্য। হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাইনিজ প্যারাট্রুপার নামার সুসংবাদ দাও। এবং যে-কোনো ভাবেই হোক তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যবস্থা কর।

কাদির খান অতি তৃপ্তির সঙ্গে ডিনার শেষ করলেন। মদ্যপানের মতো মানসিক অবস্থা তার এই ক'দিন ছিল না। আজ এক বোতল রাম নিজে একা শেষ করলেন।

চাইনিজ প্যারাট্রুপারদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে যাওয়া কাদির খানের বাহিনীর সবাই মারা পড়ল, কারণ এরা চাইনিজ প্যারাট্রুপার ছিল না। এরা ছিল ইন্ডিয়ান প্যারাট্রুপার।

ভাগ্যের পরিহাস টাঙ্গাইল পাকবাহিনীর সেক্টর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার কাদির খান ধরা পড়েন কাদের সিদ্দিকীর হাতেই। তখন তার সঙ্গে ছিলেন দু'জন কর্নেল, তিনজন মেজর এবং একজন লেফটেনেন্ট। তার সব সৈন্য কালিহাতি এলেঙ্গায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ক'জনই শুধু জীবন নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।

কাদের সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার কাদির খানের প্রতি কোনো অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন নি। তিনি বন্দিকে ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেন।

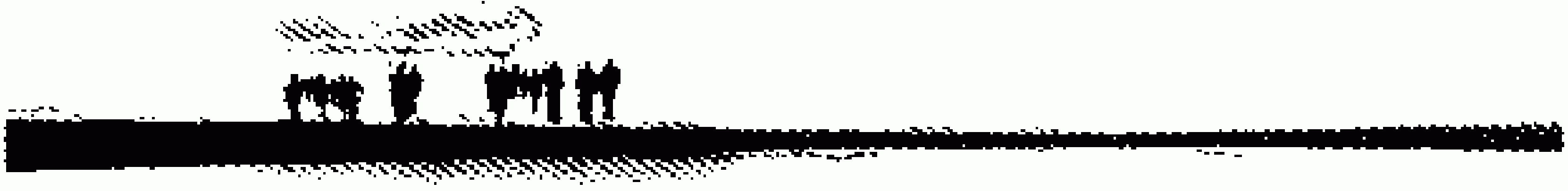

ডিসেম্বরের ছয় তারিখ। ভারত স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মুক্তিবাহিনী-ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। ঢাকার বাইরের পাকিস্তানি ঘাঁটিগুলি একে একে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। বাংলাদেশের আকাশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য।

শরণার্থী শিবিরের মানুষরা অস্থির হয়ে পড়েছেন দেশে ফেরার জন্যে। দুই পক্ষের ভয়াবহ গোলাগুলির মধ্যেই তারা দেশে ঢুকতে শুরু করেছেন। স্বাধীন হবার আনন্দ তাঁরা নিজ দেশে বসে পেতে চান।

এমনই এক অস্থির সময়ে (সন্ধ্যার ঠিক পর পর) শাহেদকে বারাসতের গ্রামের একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তার হাতে নাইমুলের দেয়া ঠিকানা। সে অনেক কষ্টে এই পর্যন্ত এসেছে। কাগজে লেখা ঠিকানা শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছে। এখন আর তার সাহসে কুলাচ্ছে না। বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে সে যে জানতে চাইবে— এখানে আসমানী নামের কেউ আছে, এই সহজ কাজটা করতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে তাকে বলা হবে, না এই নামে তো কেউ থাকে না। কিংবা বলা হবে— হ্যাঁ এই নামে একটি মেয়ে ছিল, তারা এখন নেই। কোথায় আছে তাও বলতে পারছি না।

হঠাৎ শাহেদের মনে হলো, তার তৃষ্ণা পেয়েছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। আসমানীর খোঁজ না করে তার এখন উচিত ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেতে চাওয়া।

দরজার কড়া নাড়তে হলো না, দরজা খুলে গেল। এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ বিস্মিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন। শাহেদকে বললেন, কাকে চান?

শাহেদ আমতা আমতা করে বলল, পানি খাব, এক গ্লাস পানি খাব।

আসুন ভেতরে এসে বসুন। জল এনে দিচ্ছি।

শাহেদ বিড়বিড় করে বলল, এই বাড়িতে কি আসমানী নামের কেউ থাকে? আর একটা ছোট্ট মেয়ে। রুনি।

আপনি তাদের কে হন?

রুনি আমার মেয়ে।

শাহেদের শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। বৃদ্ধ এগিয়ে এসে শাহেদের হাত ধরলেন। কোমল গলায় বললেন, আপনার স্ত্রী এবং কন্যা আমার এখানেই আছে। তারা ভালো আছে। আসমানী বাড়ির পেছনে পুকুর ঘাটে আছে। মেয়েটা বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকে। আপনি কি আগে তার কাছে যাবেন, না জল খাবেন ?

শাহেদ বিড়বিড় করে বলল, পুকুরঘাট কোন দিকে ?

বৃদ্ধ ঘাট দেখিয়ে দিলেন। শাহেদ এলোমেলো পা ফেলে এগুচ্ছে। সে নিশ্চিত ঘাট পর্যন্ত যেতে পারবে না। তার আগেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। এখন সে নিঃশ্বাসও নিতে পারছে না। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

তারো কিছুক্ষণ পরে রুনি মায়ের খোঁজে পুকুরঘাটে এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। মা অচেনা অজানা দাড়ি গোঁফওয়ালা এক লোককে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর লজ্জার ব্যাপার!

রুনি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এসব কী হচ্ছে মা ? কী হচ্ছে এসব ?

ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল স্যাম মানেক শ'র আহ্বান ভারতীয় বেতারে ক্রমাগত প্রচারিত হচ্ছে—

> আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। আত্মসমর্পণ করুন। নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।
>
> আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। আত্মসমর্পণ করুন। নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।
>
> আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। আত্মসমর্পণ করুন। নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।
>
> আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। আত্মসমর্পণ করুন। নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।
>
> আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। আত্মসমর্পণ করুন। নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।

চৌদ্দই ডিসেম্বর ভোরবেলা মরিয়মের ঘুম ভাঙল একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। কে যেন দরজার কড়া নাড়ছে। কড়া নাড়ার শব্দে এক ধরনের অস্থিরতা। মরিয়ম বলল, কে ? দরজার ওপাশ থেকে ভারি গম্ভীর গলা শোনা গেল, মরি, দরজা খোল। ঘুমের মধ্যেই মরিয়মের শরীর কাঁপতে লাগল। চলে এসেছে, মানুষটা চলে এসেছে! সে তার কথা রেখেছে। সে বলেছিল দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন আসবে। দেশ তো স্বাধীন হবেই। মনে হয় আজই হবে। মরিয়ম সাবধানে বিছানা থেকে নামল। সবাই গভীর ঘুমে। সে শুধু জেগেছে। ভালো হয়েছে। খুব ভালো হয়েছে। মানুষটার সঙ্গে যখন তার দেখা হবে, তখন আশেপাশে কারোর না থাকাই ভালো। স্বপ্ন হঠাৎ সামান্য পরিবর্তিত হলো। সে ফিরে গেল পুরনো বাড়িতে। শোবার ঘরের দরজা খুলেই সে দেখল তার বাবাকে। দীর্ঘদিন তাঁর কোনো খোঁজ নেই, অথচ স্বপ্নে সে ব্যাপারটা মনে থাকল না।

মোবারক হোসেন মেয়েকে দেখে হাসিমুখে বললেন, নাইমুল এসে কখন থেকে দরজা ধাক্কাচ্ছে, তুই দরজা খুলছিস না কেন ? কী রকম ঘুম ঘুমাস! মেয়েছেলের নিদ্রা হবে পাখির পালকের মতো। যা দরজা খোল। মরিয়ম সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল, তখন মোবারক হোসেন আরেকবার ধমক দিলেন, সেজেগুজে যা। শাড়িটা বদলা। এতদিন পরে জামাই এসে যদি দেখে একটা ফকিরনি বসে আছে, তার ভালো লাগবে ? তোর গয়নাগুলি কই ? গয়না পর। ভালো শাড়ি যদি না থাকে বিয়ের শাড়িটা পর।

মরিয়ম শাড়ি বদলাল। স্বপ্নে শাড়ি বদলানোটা অতি দ্রুত হলো। হালকা নীল রঙের শাড়ি চোখের নিমিষে হয়ে গেল বিয়ের শাড়ি। গা ভর্তি হয়ে গেল গয়নায়। দেরি হচ্ছে শুধু কাজল দিতে। ঘরে আলো কম বলে চোখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। দেরি দেখে মোবারক হোসেন মেয়ের বন্ধ দরজায় ধুম ধুম করে কিল দিচ্ছেন। মরিয়মের ঘুম ভাঙল ধুম ধুম শব্দে।

সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পানি এসে গেল। এতক্ষণ যা ঘটেছে সবই স্বপ্ন ? কেউ আসে নি ? কেউ দরজায় কড়া নেড়ে মরি মরি বলে ডাকে নি ? স্বপ্নের

বাস্তব অংশ শুধু একটাই— ধুম ধুম শব্দ। তবে এই শব্দ তার শোবার ঘরের দরজায় হচ্ছে না। অনেক দূরে হচ্ছে। এই শব্দ কামানের শব্দ। ঢাকা শহর মুক্তিবাহিনী ঘিরে ফেলেছে। তাদের সঙ্গে আছে ইন্ডিয়ান সৈন্য। তারা কামান দাগছে। নাইমুল কি তাদের সঙ্গে আছে ? তারা যখন শহরে ঢুকবে, নাইমুল কি থাকবে তাদের সঙ্গে ? অবশ্যই থাকবে। মরিয়ম সাবধানে বিছানা থেকে নামল। তার পাশে সবচেয়ে ছোটবোন মাফরুহা শুয়ে আছে। কী যে সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে! একেকটা দিন যায় আর মাফরুহা আরো সুন্দর হয়। যে ছেলের সঙ্গে মাফরুহার বিয়ে হবে, সেই ছেলে আদর করে তার স্ত্রীকে কি ডাকবে 'মাফ' ? মাফরুহা থেকে 'মাফ'। নাইমুল যেমন তাকে ডাকে মরি।

বাবা তাদের নাম ঠিকমতো রাখতে পারেন নি। নামগুলি এমন রেখেছেন যে ছোট করে ডাকা যায় না। মাসুমাকে ছোট করলে হয় মা। কোনো স্বামী স্ত্রীকে আদর করে মা ডাকবে ?

মরিয়ম ঘর থেকে বের হয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। তার নতুন এক অভ্যাস হয়েছে, ঘুম ভাঙলেই সে রান্নাঘরে যায়। দু'কাপ চা বানিয়ে চট করে আড়ালে কোথাও চলে যায়। এক কাপ চা সে খায়, আরেক কাপ সামনে রেখে দেয়। এই কাপটা সে রাখে নাইমুলের জন্যে। এক ধরনের খেলা। সে ঠিক করল, চায়ের কাপ নিয়ে আজ ছাদে যাবে। আজও নিশ্চয় ইন্ডিয়ান বিমান আসবে। ছোটাছুটি করবে আকাশে। চা খেতে খেতে বিমানের খেলা দেখতে খুব ভালো লাগবে।

চা নিয়ে ছাদে উঠার মুখে কলিমউল্লাহর সঙ্গে দেখা। মরিয়ম অবাক হয়ে কলিমউল্লাহর দিকে তাকিয়ে রইল। গতকাল রাতেও লোকটার গালভর্তি দাড়ি ছিল। আজ মুখ পরিষ্কার। কী যে অদ্ভুত লাগছে দেখতে!

কলিমউল্লাহ গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, দাড়িতে উকুন হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে ফেলে দিয়েছি। চা নিয়ে কোথায় যান, ছাদে ? ছাদে যাওয়া ঠিক না, ইন্ডিয়ান বিমান যেখানে সেখানে গুলি করে। সমানে সিভিলিয়ান মেরে শেষ করে দিচ্ছে। পাকিস্তান মিলিটারি যে দিকে আছে, সেদিকে তারা যায় না। সিভিলিয়ান এলাকায় ঘুরাফিরা করে। চা দুই কাপ কেন ?

মরিয়ম লজ্জিত গলায় বলল, আমি পরপর দু'কাপ চা খাই।

দেখি আমাকে এক কাপ দেন। খালি পেটে চা খাওয়ার অভ্যাস আমার নাই। খাই এক কাপ।

মরিয়ম খুবই অনিচ্ছায় চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিল। কলিমউল্লাহ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, আমাদের সামনে যে কী ভয়ঙ্কর দিন— সেটা কেউ বুঝতে পারছে না।

ভয়ঙ্কর দিন কেন ?

মূল যুদ্ধ এখন শুরু হবে। ঢাকা দখলের যুদ্ধ। পাকিস্তানি মিলিটারি ঢাকা ধরে রাখবে। কিছুতেই ঢাকা ছাড়বে না। তারা তাদের পুরো ফোর্স ঢাকায় নিয়ে এসেছে। এক বছর ঢাকা ধরে রাখার শক্তি তাদের আছে। এই এক বছরে নিগোসিয়েশন হবে। একটা লুজ কনফেডারেশনের মতো হবে। বিদেশী শক্তি সেটাই চায়।

দেশ স্বাধীন হবে না ?

আরে না, স্বাধীন হওয়া এত সোজা ? অতি জটিল জিনিস। কয়েকটা লক্কর পুরনো বিমান নিয়ে ইন্ডিয়ানরা আকাশে উড়ছে। মানেক শ' বলে আরেক লোক দিল্লিতে বসে চিৎকার করছে— সারেন্ডার করো। সারেন্ডার করো। ভাবটা এ রকম যে তার মুখের কথায় পাকিস্তান আর্মি অস্ত্র ফেলে দিয়ে কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। পাকিস্তান আর্মি কানে ধরা আর্মি না। আপা শুনুন, পৃথিবীর সেরা দু'টা আর্মির একটা হলো গুর্খা রেজিমেন্ট, আরেকটা হলো পাকিস্তান আর্মি। এই জিনিস ইন্ডিয়ানরা খুব ভালো করে জানে। জানে না শুধু আমাদের দেশের গামছা মাথার মুক্তিবাহিনী।

মরিয়ম শুকনা গলায় বলল, ও।

কলিমউল্লাহ বলল, আপা চা-টা শেষ করে সবাইকে ডেকে তুলেন। আমাদের কাজ আছে।

কী কাজ ?

এই বাড়ি ছেড়ে আপনাদের পুরনো বাড়িতে চলে যাব। আমার কাছে মনে হচ্ছে, আপনাদের পুরনো বাড়িটাই সেফ। দুই-তিন মাস চলার মতো চাল-ডাল কিনতে হবে। ঐ বাড়িতে গিয়েই বাংকার খুঁড়তে হবে। সবচেয়ে ভালো হতো ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে পারলে। সেটা সম্ভব না।

মরিয়ম বলল, এই বাড়ি ছেড়ে যাবেন কীভাবে ? কারফিউ চলছে।

কার্ফুর মধ্যেই যাব, কোনো সমস্যা নাই। ব্যবস্থা করব। আপনারা জিনিসপত্র গুছায়ে নেন।

যে বিশেষ গাড়িটি ঢাকা শহর থেকে বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল— সেই গাড়ি দিয়েই কলিমউল্লাহ তার স্ত্রী এবং শাশুড়ির পরিবারকে তাদের পুরনো বাড়িতে পার করল।

বিকাল তিনটায় এই গাড়ি এসে থামল প্রফেসর ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর একতলা বাড়িতে। তিনি তখন খেতে বসেছেন। নিজেই রান্না করেছেন। ভাত-

ডিমের ভর্তা। অতি সহজ রান্না। ভাতের সঙ্গেই একটা ডিম ছেড়ে দিয়েছিলেন। ডিমের সঙ্গে তিনটা কাঁচা মরিচ। ভাতে-ভাতে ডিম সিদ্ধ হয়েছে। কাঁচামরিচ নরম হয়েছে। তিনি ডিমের খোসা ছড়িয়ে কাঁচামরিচ ডাল-ভর্তা বানিয়ে ফেলেছেন। ভর্তায় লবণ দেয়া হয়েছে। ঝাঁঝালো সরিষার তেল দেয়া হয়েছে আধা চামচ। যে জিনিস তৈরি হয়েছে, সেটা এক কথায় অমৃত। এখনো মুখে দেন নি কিন্তু গন্ধ থেকে বোঝা যাচ্ছে। তিনি যখন খেতে বসবেন, তখন দরজার কড়া নড়ল। তিনি দরজা খুলতেই কলিমউল্লাহ্ এসে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করল।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী হাসিমুখে বললেন, কেমন আছ বাবা? তিনি ধরেই নিলেন সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি তার ছাত্র। তাঁর বেশির ভাগ ছাত্রই অসময়ে আসে।

কলিমউল্লাহ্ বলল, স্যার, ভালো আছি। আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন স্যার?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় তাকে চিনতে পারেন নি (চিনতে পারার কথা না। কলিমউল্লাহ্কে তিনি আগে কখনো দেখেন নি।) তারপরও হাসিমুখে বললেন, চিনতে পারব না কেন? চিনেছি।

মিথ্যা বলার কারণ হলো তিনি অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, যতবার কোনো ছাত্রকে দেখে তিনি না চেনার কথা বলেছেন, ততবারই তারা ভয়ঙ্কর মনে কষ্ট পেয়েছে। এক ছাত্র তো কেঁদেই ফেলেছিল।

বাবা, তোমার নামটা যেন কী?

কলিমউল্লাহ্।

হ্যাঁ, তাই তো। কলিমউল্লাহ্, কলিমউল্লাহ্। এখন পরিষ্কার মনে পড়েছে। তুমি কি খাওয়া-দাওয়া করেছ?

জি না স্যার।

এসো আমার সঙ্গে চারটা ভাত খাও। আয়োজন খুব সামান্য। ভাত ডিম ভর্তা। ঘরে আরো ডিম আছে। তোমাকে ডিম ভেজে দেব। ঘরে এক কৌটা খুব ভালো গাওয়া ঘি ছিল। কৌটাটা খুঁজে পাচ্ছি না।

কলিমউল্লাহ্ বলল, স্যার, এখন খেতে পারব না। আপনার কাছে আমি একটা অতি জরুরি কাজে এসেছি।

জরুরি কাজটা কী?

মিলিটারির এক কর্নেল সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার সঙ্গে মিলিটারির কী কথা?

আমি জানি না। তবে স্যার, আপনার ভয়ের কিছু নাই। আমি সঙ্গে আছি।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় বললেন, তুমি আমার কোন ব্যাচের ছাত্র বলো তো?

কথা বলে সময় নষ্ট করতে পারব না স্যার। মিটিংটা শেষ করে আসি, তারপর আপনার সঙ্গে গল্প করব।

দুইটা মিনিট অপেক্ষা করো, ভাত খেয়ে নেই। খুবই ক্ষুধার্ত। সকালে নাশতা করি নাই।

ভাত খাবার জন্যে অপেক্ষা করার সময় নাই স্যার।

তাহলে দাঁড়াও পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে আসি। আমার সঙ্গে কী কথা বুঝলাম না। সে আমার ছাত্র না তো? করাচি ইউনিভার্সিটিতে আমি দুই বছর মাস্টারি করেছি। প্রফেসর সালাম সাহেব সেখানে আমার কলিগ ছিলেন।

কলিমউল্লাহ বলল, আপনার ছাত্র হবার সম্ভাবনা আছে। কর্নেল সাহেব যেভাবে বললেন, স্যারকে একটু নিয়ে আসো— তাতে মনে হচ্ছে উনি আপনার ছাত্র।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় গাড়িতে উঠে দেখলেন, গাড়ি ভর্তি মানুষ। তারা সবাই চিন্তায় অস্থির। ধীরেন্দ্রনাথ রায় তাদের দিকে তাকিয়ে আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসলেন। ভুলে তিনি চশমা ফেলে এসেছেন বলে কাউকে চিনতে পারলেন না। চোখে চশমা থাকলে এদের অনেককেই চিনতেন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা গাড়িতে বসেছিলেন। তাদের নিয়ে যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে।

কলিমউল্লাহ জোহর সাহেবের ঘরে হাতলবিহীন একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছে। সময় সন্ধ্যা। ঘরে বাতি জ্বলছে। প্রথমবারের মতো জোহর সাহেবের ঘরের দু'টা জানালা খোলা। জোহর সাহেব আগের মতোই গায়ে চাদর জড়িয়ে টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা খোলা বই। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি গভীর মনোযোগে বই পড়ছেন। ঘরে একশ' পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে। তারপরেও জোহর সাহেব টেবিলে তাঁর বইয়ের সামনে দু'টা মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন। খোলা জানালা দিয়ে মাঝে-মাঝে হাওয়া আসছে, তাতে মোমবাতির শিখা কাঁপছে এবং পতপত শব্দ হচ্ছে। তখনই শুধু জোহর সাহেব বই থেকে মুখ তুলে মোমবাতির দিকে তাকাচ্ছেন।

কলিমউল্লাহ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে গলা খাকাড়ি দিল। জোহর সাহেব বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, কেমন আছ কলিমউল্লাহ?

কলিমউল্লাহ বলল, ভালো আছি স্যার। আপনার শরীর কেমন?

এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জোহর সাহেব বললেন, কলিমউল্লাহ্, তুমি তো কবি মানুষ। বলো দেখি আত্মা কী ?

কলিমউল্লাহ বলল, জানি না স্যার।

জোহর সাহেব বললেন, কোরআন শরীফে আত্মাকে বলা হয়েছে order of god. ভালো কথা, তুমি আল্লাহ্ বিশ্বাস করো ?

কলিমউল্লাহ বিস্মিত হয়ে বলল, এটা কী বলেন স্যার ? আল্লাহ্ বিশ্বাস করব না কেন ? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সবসময় ঠিকমতো পড়া হয় না, কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাস করি। রোজা ত্রিশটা রাখি।

জোহর সাহেব বই থেকে মুখ তুলে কলিমউল্লাহর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, তুমি গত কয়েকদিনে যে ভয়ঙ্কর অন্যায়গুলি করেছ, একজন আল্লাহবিশ্বাসী মানুষ কি তা করতে পারে ?

প্রশ্ন শুনে কলিমউল্লাহ্ হতভম্ব হয়ে গেল। মনে মনে বলল, তুই এখন এইগুলা কী বলিস ? আমি যা করেছি তোদের কথামতো করেছি। হাতে যাদের লিস্টি ধরিয়ে দিয়েছিস, খুঁজে খুঁজে তাদের এনে দিয়েছি। পরে তাদেরকে নিয়ে তোরা কী করেছিস সেটা তোদের ব্যাপার। পাপ যদি কারো হয় তোদের হবে।

জোহর সাহেব বললেন, আত্মা সম্পর্কে এই বইটিতে কী বলা হয়েছে শোন—

> 'The experience of every soul becomes the experience of the divine mind; therefore, the devine mind has the knowledge of all beings.'

কলিমউল্লাহ বলল, বইটা কার লেখা স্যার ?

একজন সুফির লেখা। সুফির নাম হযরত এনায়েত খান।

কলিমউল্লাহ তার মুখ হাসিহাসি করে রাখল, তবে মনে মনে বলল, শালা বিহারি! এখন সুফি সাধনা করছ। মোমবাতি জ্বালায়ে সাধনা।

জোহর সাহেব বই বন্ধ করতে করতে বললেন, আল্লাহ্ খোদা, বেহেশত-দোযখ এইসব বিষয়ে আমার বিশ্বাস কিছু কম। তারপরেও মাঝে-মাঝে মনে হয়— থাকতেও পারে। যদি থাকে আমি সরাসরি দোযখে যাব।

কলিমউল্লাহ বলল, এটা স্যার আপনি বলতে পারেন না। কে দোযখে যাবে কে বেহেশতে যাবে— এটা আল্লাহপাক নির্ধারণ করবেন।

জোহর সাহেব দৃঢ় গলায় বললেন, দোযখে যে আমি যাব এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। আমার কোনো আপত্তিও নাই। আপত্তি এক জায়গায়— দোযখে তোমার মতো লোকজন আমার সঙ্গে থাকবে, এটাতেই আমার আপত্তি।

কলিমউল্লাহ্ কী বলবে ভেবে পেল না। সে এসেছিল জোহর সাহেবের কাছ থেকে ভেতরের কিছু খবরাখবর বের করতে। তার এখানে আসা ঠিক হয় নি।

কলিমউল্লাহ!

জি স্যার।

তোমার জন্যে বড় একটা দুঃসংবাদ আছে।

কলিমউল্লাহর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী বলে এই লোক! বড় দুঃসংবাদ মানে কী?

জোহর সাহেব চাদরের নিচ থেকে সিগারেট বের করে মোমবাতির আলোয় সিগারেট ধরালেন। তখন বোঝা গেল তিনি মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন সিগারেট ধরানোর সুবিধার জন্যে।

কলিমউল্লাহ!

জি স্যার।

দুঃসংবাদটা হচ্ছে— তোমাদের দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী এখনো শহরে ঢুকে নাই। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ঢুকে পড়েছে।

বলেন কী স্যার!

জোহর সাহেব সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, আমি যতদূর জানি জেনারেল ইয়াহিয়া খান জেনারেল নিয়াজীকে সম্মানজনক শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তোমাকে অগ্রিম অভিবাদন। আমার অবস্থা দেখ— আমি একজন বিহারি, দেশ নেই এমন এক জাতি।

স্যার, আমি যাই।

যাও। দাড়ি কখন কামিয়েছ? আজ?

জি স্যার। উকুন হয়েছিল।

দাড়ি কেটে ভালো করেছ। বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।

কথা শেষ করে তিনি বই পড়ায় মন দিলেন।

মরিয়ম বিকাল থেকেই ছাদে। আগে ছাদে যেতে ভয় ভয় লাগতো। আজ ভোর থেকে ভয় লাগছে না। সব বাড়ির ছাদেই মানুষ। তারা তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ইন্ডিয়ান প্লেন বারবার আসছে। নিচু হয়ে উড়ছে। শাঁ করে চলে গেল, আবার ফিরে এলো। কী সুন্দর দৃশ্য! কোনো কোনো বাড়ির ছাদ থেকে চিৎকারও শোনা যাচ্ছে। 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার। ঢাকার মানুষদের এখন এত সাহস

হয়েছে ? 'জয় বাংলা' বলছে! বিশ্বাস হতে চায় না। মনে হয় কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে।

সাফিয়া পুত্রকে কোলে নিয়ে ছাদে এলেন। মরিয়মকে দেখে বললেন, বাবুকে একটু কোলে নে। মনে হয় জ্বর আসছে।

মরিয়ম ভাইকে কোলে নিতে নিতে বলল, মা কিছুক্ষণ ছাদে থাকো।

সাফিয়া বললেন, ইফতারের সময় হয়ে গেছে, ইফতার করব।

তুমি রোজা ?

হুঁ।

কিসের রোজা মা ?

দেশ স্বাধীন হবার রোজা।

আমাকে বললে না কেন ? আমিও রোজা রাখতাম। মা, দেশ কি সত্যি সত্যি স্বাধীন হচ্ছে ?

এইসব তো আমি বুঝি না।

তোমার মন কী বলছে মা ?

সাফিয়া জবাব না দিয়ে নিচে নেমে যেতে গিয়েও ফিরে এসে বললেন, দে বাবুকে দে, নিয়ে যাই।

মরিয়ম বলল, নিয়ে যাবে কেন ? থাকুক আমার কোলে। তুই সুন্দর শাড়ি পরে আছিস, শাড়িটা নষ্ট হবে।

নষ্ট হবে না, থাকুক। মা, আমাকে কি দেখতে সুন্দর লাগছে ?

খুব সুন্দর লাগছেরে মা। খুব সুন্দর।

আচ্ছা মা, বিয়ের শাড়ি না-কি বিবাহ বার্ষিকী ছাড়া অন্য কোনো সময় পরা অলক্ষণ ?

কে বলেছে ?

কে বলেছে আমার মনে নেই। অলক্ষণ হলে এই শাড়ি বদলে অন্য শাড়ি পরব।

সাফিয়া কিছু বললেন না। বিয়ের শাড়ি অন্য সময় পরা অলক্ষণ কি না তিনি জানেন না। যদি অলক্ষণ হয়, তাহলে না পরাই ভালো। কিন্তু মেয়েটা এত আগ্রহ করে শাড়িটা পরেছে। সেই শাড়ি বদলাতে তিনি কী করে বলেন!

ভাইকে কোলে নিয়ে মরিয়ম ছাদের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাচ্ছে। গুজগুজ করে গল্প করছে। তার ভাই যে চোখে দেখে না, এই বিষয়ে এখন সবাই নিশ্চিত। এখন সন্দেহ হচ্ছে সে কানেও শোনে না। তার সঙ্গে যত গল্পই করা

হোক সে শোনে না। নিজের মনে তা তা করে এক ধরনের শব্দ করে। শুধু পেটে খোঁচা দিলে শব্দ করে হাসে। সেই হাসির শব্দ সুন্দর।

মরিয়ম একটু পর পর ভাইয়ের পেটে খোঁচা দিয়ে ভাইকে হাসাচ্ছে। আর বলছে— এই গুটকু এই। তার ভাইকে ইয়াহিয়া নামে এখন কেউ ডাকে না। একেকজন একেক নামে ডাকে। সে ডাকে গুটকু।

এই গুটকু, দেশ স্বাধীন হচ্ছে বুঝতে পারছিস। হুঁ হুঁ স্বাধীন হচ্ছে। স্বাধীন কী বুঝিস ? স্বাধীন হলো জয় বাংলা। সব মিলিটারি চলে যাবে। উঁহুঁ চলেও যাবে না। এদেরকে আমরা কচুকাটা করব। ঘ্যাচ ঘ্যাচ ঘ্যাচ ঘ্যাচ।

গুটকু হাসছে। মনের আনন্দে হাসছে। কারণ ঘ্যাচ ঘ্যাচ করার সময় মরিয়ম ভাইয়ের পেটে করাত চালানোর মতো ভঙ্গি করছে।

আমি যে বিয়ের শাড়ি পরেছি বুঝতে পারছিস ? বল দেখি কেন পরেছি ? বলতে পারলে বুঝতে পারব তোর বুদ্ধি আছে। দেশ স্বাধীন হলে আমাদের বাসায় একজন লোক আসবে। তার জন্যে শাড়ি পরেছি। বল দেখি লোকটা কে ? সে আমার কে হয় ? হাসি বন্ধ হাসি বন্ধ। প্রশ্নের জবাব দে।

মরিয়ম ছাদের কার্নিশে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। এখন কারফিউ চলছে; অথচ রাস্তায় লোকজন। মিলিটারির কোনো গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। দেশ কি স্বাধীন হয়ে গেছে ?

কলিমউল্লাহ্ তার ঘরে। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে বলে সে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। মাসুমা কয়েকবার এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখে গেছে জ্বর কি-না। মানুষটার কিছু হলে তার এমন অস্থির লাগে। সবচেয়ে অস্থির লাগে মানুষটা যদি কথা না বলে চুপ করে থাকে। গতকাল থেকে লোকটা কেমন চুপ মেরে গেছে।

মাসুমা বলল, তোমার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে ? এই! এই!

কলিমউল্লাহ্ বলল, গা ম্যাজম্যাজ করছে। তেমন কিছু না।

গা টিপে দেব ?

দরকার নেই।

মাথায় হাত বুলিয়ে দেই ?

উঁহুঁ। তুমি এক কাজ করো, অন্য ঘরে যাও। আমি কিছুক্ষণ একা একা চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকি।

মাসুমা করুণ গলায় বলল, আমি থাকি তোমার সঙ্গে। কথা বলব না। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেব, তোমার ভালো লাগবে।

কোনো দরকার নেই। তুমি বরং একটা পেন্সিল দাও আর কবিতার খাতাটা দাও।

মাসুমা এতক্ষণে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মানুষটা যখন বলল, কিছুক্ষণ একা একা চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকি— তখন তার খুবই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল মানুষটা তার সঙ্গ পছন্দ করছে না। এখন দেখা যাচ্ছে ঘটনা সে রকম না। মানুষটা মনে মনে কবিতা নিয়ে ভাবছিল বলেই এরকম বলেছে। এইসব ছোটখাটো কারণে কবি টাইপ মানুষদের স্ত্রীরা ভুল বুঝে।

মাসুমা কবিতার খাতা এবং দু'টা পেন্সিল নিয়ে বিছানায় উঠে এলো। লোকটা রাগ করুক বা যাই করুক, সে চাদরের নিচে লোকটাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকবে। লোকটার পিঠে নাক ঘষবে। লোকটার পিঠে নাক ঘষতে মাসুমার অসম্ভব ভালো লাগে। কেন লাগে কে জানে!

কলিমউল্লাহ্ কবিতার খাতা এবং পেন্সিল নিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছে। মাসুমা স্বামীর সঙ্গে লেপ্টে শুয়ে আছে। কলিমউল্লাহ্ কিছু বলছে না। মাসুমা আদুরে গলায় বলল, কবিতাটার নাম কী?

কলিমউল্লাহ্ বলল, চুপচাপ শুয়ে থাকো। কথা বলবে না।

মাসুমা বলল, সরি! আর কথা বলব না।

কলিমউল্লাহ্ স্বাধীনতা নিয়ে একটা দীর্ঘ কবিতা লেখার চেষ্টা করছে। প্রথম লাইনটা মাথায় চলে এসেছে। দ্বিতীয় লাইন এখনো আসে নি। এইসব ক্ষেত্রে প্রথম লাইন অনেকক্ষণ মাথায় খেলাতে হয়। তখন দ্বিতীয় লাইন আপনাআপনি আসে।

'এসেছে রঙিন, জল পড়ে পাতা নড়ে দিন।'

এই হচ্ছে প্রথম লাইন। এখানে রঙিন মানে স্বাধীনতা। জল পড়ে পাতা নড়ে হলো শাশ্বত বাংলা।

'এসেছে রঙিন, জল পড়ে পাতা নড়ে দিন।'

অনেকক্ষণ কথা বলতে না পেরে মাসুমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দমবন্ধ ভাবটা কাটাবার জন্যে সে বলল, কবিতাটা কী নিয়ে লিখছ?

কলিমউল্লাহ্ রাগ করল না, সহজ গলায় বলল, স্বাধীনতা নিয়ে। কলিমউল্লাহ্র গলার শান্ত স্বরে সাহস পেয়ে মাসুমা বলল, তুমি আমাকে নিয়ে অনেকদিন কবিতা লিখছ না। স্বাধীনতার কবিতা পরে লেখ, আগে আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখ।

কলিমউল্লাহ জবাব দিল না। দ্বিতীয় লাইন তার মাথায় এসে গেছে। পুরোটা না, অর্ধেকটা।

'বাতাসে বারুদগন্ধ ...'

এই, আমাকে নিয়ে কবিতাটা কবে লিখবে?

আহা একটু চুপ করো না!

আগে বলো আমাকে নিয়ে কবিতাটা কবে লিখবে, তারপর চুপ করব। স্বাধীনতা এখনো আসে নি, তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে বসেছ। আমি তো এসেছি। আমি এতক্ষণ তোমার পাশে শুয়ে আছি, তুমি একবার আমার দিকে তাকাও নি। স্বাধীনতা চোখে দেখা যায় না। আমাকে চোখে দেখা যায়।

কলিমউল্লাহ স্ত্রীর দিকে তাকাল। মাসুমার গায়ে গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি। মাসুমাকে সুন্দর লাগছে। গাঢ় রঙ ফর্সা মেয়েদের খুব মানায়।

মাসুমা বলল, তুমি আগে বলেছিলে দেশ স্বাধীন হবে না। এখন তো হচ্ছে। হচ্ছে না?

কলিমউল্লাহ জবাব দিল না। মাসুমা প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুমি রাগ না করলে আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

জিজ্ঞেস করো।

না আগে বলো, রাগ করবে না। আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো রাগ করবে না।

কলিমউল্লাহ স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে বলল, রাগ করব না।

তুমি তো পাকিস্তানিদের পক্ষে অনেক কাজটাজ করেছ। এখন তুমি বিপদে পড়বে না?

না। আমি হচ্ছি গিরগিটি।

তার মানে কী?

গিরগিটি গায়ের রঙ বদলাতে পারে। আমিও পারি। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, গিরগিটি হতে হয়। তাহলে একটা গল্প শোন। ডারউইন সাহেবের গল্প। সারভাইবেল নিয়ে story.

মাসুমা মুগ্ধ চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। গল্প তার মাথায় ঢুকছে না। মানুষটার বক্তৃতার ভঙ্গিটা দেখতে ভালো লাগছে। মাসুমা মনে মনে জপ করতে লাগল 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' সে ঠিক করেছে মানুষটা যতক্ষণ বক্তৃতা দেবে ততক্ষণ সে মনে মনে বলবে 'আমি

তোমাকে ভালোবাসি'। শুধু যে মনে মনে বলবে তা না। কতবার বলা হলো তার হিসাবও রাখবে।

কলিমউল্লাহ্ বক্তৃতা শেষ করে বলেন, আঙুলে কী গুনছিলে?

মাসুমা লজ্জিত গলায় বলল, কিছু না।

আমার যুক্তি তোমার পছন্দ হয়েছে? যে সমাজের জন্যে যে ফিট সে টিকে থাকবে। যে আনফিট সে ঝরে যাবে। বলো পছন্দ হয়েছে না?

তুমি যা বলো তাই আমার পছন্দ হয়।

তাহলে এখন একটা কাজ করো তো— কাঁচি নিয়ে এসো।

কাঁচি দিয়ে কী করবে?

তোমার সবুজ শাড়িটা কেটে বাংলাদেশের পতাকা বানাব। দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিনই পতাকা উড়াব। লাল রঙের কাপড় আছে? তোমার লাল শাড়ি আছে না?

আছে।

স্বামী-স্ত্রী দরজা বন্ধ করে বাংলাদেশের পতাকা বানাচ্ছে। মাসুমা খুবই মজা পাচ্ছে।

১৬ ডিসেম্বর সকাল ন'টায় জেনারেল নিয়াজী একটা চিরকুট পেলেন। চিরকুটটি নিয়ে এসেছে ভারতীয় মেজর জেনারেল নাগরার এডিসি। দুই লাইনের চিরকুট পড়তে তার তিন মিনিটের মতো লাগল। তিনি কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন। বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছলেন। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি বললেন, কী লেখা? নিয়াজী তার হাতে চিরকুট দিলেন। রাও ফরমান আলি চিরকুটটি পড়লেন এবং বাড়িয়ে দিলেন মেজর জেনারেল জামশেদের দিকে।

চিরকুটে লেখা— "প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখন মিরপুর সেতুর কাছে। পরামর্শ হচ্ছে, আপনি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করুন। আপনার প্রতিনিধি পাঠান।"

মেজর জেনারেল নাগরার সঙ্গে নিয়াজী পরিচিত। নাগরা ইসলামাবাদে অনেকদিন ছিলেন। ভারতীয় দূতাবাসে তিনি ছিলেন মিলিটারি এটাচি। সেখানেই পরিচয়, সেখানেই সখ্য।

মেজর জেনারেল ফরমান আলি নিয়াজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আত্মসমর্পণের আলোচনা কি আমরা নাগরার সঙ্গে করব?

নিয়াজী হ্যাঁ না কিছুই বললেন না।

ফরমান আলি বললেন, আপনার কি কোনো রিজার্ভ বাহিনী আছে?

নিয়াজী এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। মনে হচ্ছে তিনি সাময়িক বধিরতায় আক্রান্ত। চিরকুটটি সব হাত ঘুরে এখন তার হাতে এসেছে। তার দৃষ্টি চিরকুটের লেখা 'আবদুল্লাহ' নামটার দিকে।

রিয়ার এডমিরাল শরীফ নিয়াজীর দিকে তাকিয়ে পাঞ্জাবিতে উঁচু গলায় বললেন, কুছ পাল্লে হ্যায়? এর অর্থ— 'থলেতে কিছু আছে?' নিয়াজী তাকালেন জেনারেল জামশেদের দিকে। ঢাকা রক্ষার দায়িত্ব জেনারেল জামশেদের। তিনি না-সূচক মাথা নাড়লেন। থলে শূন্য। থলেতে বিড়াল নেই।

রিয়ার এডমিরাল শরীফ বললেন, এই যদি হয় অবস্থা তাহলে নাগরা যা বললেন তাই করাই বাঞ্ছনীয়।

রাও ফরমান আলী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। কিছু সময়ের জন্যে দলটির ভেতর কবরের নৈঃশব্দ নেমে এলো। নীরবতা ভঙ্গ করলেন রাও ফরমান আলী। তিনি নিয়াজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন কিছু নোংরা পাঞ্জাবি রসিকতা শোনা যেতে পারে।

নিয়াজী চুপ করে রইলেন। এই প্রথম তিনি কোনো রসিকতা করলেন না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বীরত্বের জন্যে মিলিটারি ক্রস পাওয়া সৈনিক পাংশু মুখে উঠে দাঁড়ালেন। রাও ফরমান আলী তাকালেন তাঁর দিকে। জেনারেল জামশেদ বললেন, আমি মিরপুর ব্রিজের দিকে যাচ্ছি।

এডমিরাল শরীফ বললেন, কেন ?

জেনারেল জামশেদ তিক্ত গলায় বললেন, আত্মসমর্পণ করব। এবং জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসব।

ও আচ্ছা।

আমার কাছে কোনো দ্বিতীয় বিকল্প নেই। আপনাদের কাছে কি আছে ?

কেউ জবাব দিল না।

ষোলই ডিসেম্বর ভোরবেলা (সাড়ে দশটা) কারফিউ দেয়া শহরে দুটি গাড়ি যাচ্ছে। সেদিন নগরী ঘন কুয়াশায় ঢাকা। রাস্তা জনশূন্য। গাড়ি দুটি যাচ্ছে প্যাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের হেড কোয়ার্টারের দিকে। প্রথমটা জিপ। সেখানে বসে আছেন মেজর জেনারেল জামশেদ। দ্বিতীয়টা পতাকা উড়ানো স্টাফ কার। এখানে আছেন ভারতীয় মেজর জেনারেল নাগরা, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। লম্বা চুল দাড়িতে কাদের সিদ্দিকীকে দেখাচ্ছে চে গুয়েভারার মতো।

নিয়াজী প্রতীক্ষা করছিলেন। জেনারেল নাগরা ঘরে ঢোকার মাধ্যমে সেই প্রতীক্ষার অবসান হলো। নিয়াজী নাগরাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বিড়বিড় করে কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আমার আজকের এই অপমানের জন্যে দায়ী রাওয়ালপিন্ডির বাস্টার্ডরা।

নিয়াজীর ফোঁপানো একটু থামতেই জেনারেল নাগরা তাঁর পাশে দাঁড়ানো মানুষটির সঙ্গে নিয়াজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শান্ত গলায় হাসি হাসি মুখে বললেন, এই হচ্ছে সেই টাইগার সিদ্দিকী।

জেনারেল নিয়াজী, জেনারেল জামশেদ অবাক হয়ে দীর্ঘসময় তাকিয়ে থাকলেন কাদের সিদ্দিকীর দিকে। তাঁদের স্তম্ভিতভাব কাটতে সময় লাগল। এক সময় নিয়াজী করমর্দনের জন্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন কাদের সিদ্দিকীর দিকে।

কাদের সিদ্দিকী হাত বাড়ালেন না। তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইংরেজিতে বললেন, নারী এবং শিশু হত্যাকারীদের সঙ্গে আমি করমর্দন করি না।

টাইগার নিয়াজী অপেক্ষা করছেন ভারতীয় প্রতিনিধির জন্যে। কার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন? আত্মসমর্পণের শর্ত কী? ঘটনাটা ঘটবে কোথায়? তিনি খবর পেয়েছেন আত্মসমর্পণের ব্যাপারটির দেখার জন্যে লেফটেনেন্ট জেনারেল জেকব হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আসছেন। নিয়াজী বুঝতে পারছেন না তার কি উচিত ঢাকা এয়ারপোর্ট নিজে উপস্থিত হয়ে জেকবকে অভ্যর্থনা জানানো? না-কি অন্য কাউকে পাঠাবেন? কাকে পাঠানো যায়?

লেফটেনেন্ট জেনারেল অরোরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখত করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। জেনারেল অরোরা সস্ত্রীক আসছেন। এমন অদ্ভুত ঘটনা দেখার লোভ তাঁর স্ত্রী সামলাতে পারছেন না। অরোরা কখন আসবেন? তাদের জন্যে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা কি তার করা উচিত না? মেনু কী হবে? অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে টাইগার নিয়াজী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ঢাকা রেসকোর্সে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখত করলেন। তিনি তার কোমরের বেল্টে ঝুলানো পিস্তল তুলে দিলেন লেফটেনেন্ট জেনারেল অরোরার হাতে। ঘড়িতে তখন সময় বিকাল চারটা উনিশ মিনিট।

আমি (এই গ্রন্থের লেখক) তখন ঢাকায়। ঝিকাতলার একটি বাড়িতে লুকিয়ে আছি। আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবালও ঢাকায়। সে কোথায় আছে, বেঁচে আছে না মারা গিয়েছে, কিছুই জানি না। আমার সঙ্গে ঝিকাতলার সেই একতলা টিনের ছাদের বাড়িতে আছে আমার অতি প্রিয় বন্ধু আনিস সাবেত। তিনি বয়সে আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। আমার দেখা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন। ষোলই ডিসেম্বরে আমরা দুজন কী করলাম একটু বলি। হঠাৎ মনে হলো আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পৃথিবী উলট-পালট হয়ে গেছে। সারাক্ষণ কানে ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ হচ্ছে। আনিস সাবেত বাড়ির সামনের মাঠে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি শব্দ করে কাঁদছেন। গড়াগড়ি করছেন।

আমি তাঁকে টেনে তুললাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চল রাস্তায় চল। একটু আগেই তিনি কাঁদছিলেন। এখন আবার হাসছেন। আমরা রাস্তায় নেমে পড়লাম এবং ফাঁকা রাস্তায় কোনোরকম কারণ ছাড়া দৌড়াতে শুরু করলাম। আনিস ভাই এক হাতে শক্ত করে আমাকে ধরে আছেন, আমরা দৌড়াচ্ছি।

ঢাকা শহরের সব মানুষ ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছে। যার যা ইচ্ছা করছে। চিৎকার, হৈচৈ, লাফালাফি। মাঝে-মধ্যেই আকাশ কাঁপিয়ে সমবেত গর্জন— 'জয় বাংলা'। প্রতিটি বাড়িতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ছে। এই পতাকা সবাই এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল কে জানে?

ঝিকাতলার মোড়ে আমাদের দু'জনকে লোকজন আটকাল। তারা শঙ্কিত গলায় বলল, রাস্তা পার হবেন না। খবরদার! কিছু আটকা পড়া বিহারি দোতলার জানালা থেকে এইদিকে গুলি করছে। আমরা গুলির শব্দ শুনলাম। আনিস ভাই বললেন, দুত্তেরী গুলি। হুমায়ূন চল তো। আমরা গুলির ভেতর দিয়ে চলে এলাম। আমাদের দেখাদেখি অন্যরাও আসতে শুরু করল।

সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে এসে আনিস ভাই দুপ্যাকেট বিসকিট কিনলেন। (আমার হাত সে সময় শূন্য। কেনাকাটা যা করার আনিস ভাই করতেন।) আমরা সারাদিন খাই নি। প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। আমি আনিস ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, আনিস ভাই, পোলাও খেতে ইচ্ছা করছে।

তিনি বললেন, অবশ্যই পোলাও খাব। পোলাও। আমরা দু'জন অর্ধউন্মাদের মতো 'পোলাও পোলাও' বলে চেঁচালাম। রাস্তার লোকজন আমাদের দেখছে। কেউ কিছু মনে করছে না। একটা রিকশাকে আসতে দেখলাম। রিকশার সিটের উপর বিপদজনক ভঙ্গিতে মধ্যবয়স্ক এক লোক দাঁড়িয়ে। তিনি জিগিরের ভঙ্গিতে বলেই যাচ্ছেন— জয় বাংলা। জয় বাংলা। জয় বাংলা। আনিস ভাই তাঁর হাতের বিসকিটের প্যাকেট গুঁড়া করে ফেললেন। আমিও করলাম। আমরা বিস্কিটের গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে দিতে এগুচ্ছি। কোন দিকে যাচ্ছি তাও জানি না। আজ আমাদের কোনো গন্তব্য নেই।

স্মৃতিকথন বন্ধ থাকুক। মূল গল্পে ফিরে যাই।

মরিয়মদের বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। মরিয়ম বিয়ের শাড়ি পরেছে। তার মন সামান্য খারাপ। কারণ শাড়িতে ঝোলের দাগ পড়েছে। রান্না করতে গিয়ে এই দাগ মরিয়ম নিজেই ফেলেছে। অনেক ধোয়াধুয়ি করেও এই দাগ উঠানো যাচ্ছে না। দাগটা এমন জায়গায় লেগেছে যে আড়াল করা যাচ্ছে না।

মরিয়ম বসে আছে তাদের বাসার সিঁড়ির সামনে। আজ সারাদিন সে কিছু খায় নি। যদিও ঘরে অনেককিছু রান্না হয়েছে। এর মধ্যে অনেক তুচ্ছ রান্নাও আছে। একটা হলো খুবই চিকন করে কাটা আলুর ভাজি। আরেকটা কাঁচা টমেটো আগুনে পুড়িয়ে ভর্তা। এই দু'টা আইটেম নাইমুলের পছন্দ। মরিয়ম নিজে রেধেঁছে নতুন আলু দিয়ে মুরগির মাংসের ঝোল।

একটু পরপর মরিয়মকে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করা হচ্ছে। তার খুবই বিরক্তি লাগছে। সে তো অনশন করছে না যে সেধে তার অনশন ভাঙতে হবে। সে যথাসময়ে খেতে যাবে।

নাইমুল কথা দিয়েছিল দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন সে উপস্থিত হবে। মরিয়ম জানে নাইমুল কথা রাখবে। যত রাতই হোক সে বাসার সামনে এসে গম্ভীর গলায় বলবে— মরি, আমি এসেছি। কেউ কথা না রাখলেও আমি নাইমুল। আমি কথা রাখি। এই বলে সে নিশ্চয় ইংরেজি কবিতাটাও বলবে— Anable Lee না কী সব হাবিজাবি।

সন্ধ্যার পর সাফিয়া এসে মেয়ের হাত ধরলেন। কোমল গলায় বললেন, মা তুই কতক্ষণ এখানে বসে থাকবি?

মরিয়ম বলল, মা, তুমি বিশ্বাস করো আমি ও না আসা পর্যন্ত বসেই থাকব।

রাত একটা বেজে গেল। মরিয়মের দুই বোন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। মরিয়মের মুখ ভাবলেশহীন। এক সময় মরিয়ম বলল, তোমরা এখান থেকে যাও। আমি একা বসে থাকব।

সবচে' ছোটবোন করুণ গলায় বলল, তুমি একা বসে থাকবে কেন? আমরাও বসি।

মরিয়ম কঠিন গলায় বলল, না। বোনরা উঠে গেল।

তারো অনেক পরে ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে বাড়ির সামনে দাড়ি-গোঁফ ভর্তি এক যুবক এসে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলল, সিঁড়িতে যে মেয়েটি বসে আছে, তাকে কি আমি চিনি? দীর্ঘকায় এই যুবক দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মরিয়ম চিৎকার করে বলল, মা দেখ, কে এসেছে! মাগো দেখ কে এসেছে!

মরিয়ম যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে আছে। যুবকের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলছে— আহা, এইভাবে সবার সামনে আমাকে ধরে আছ কেন? আমাকে ছাড় তো। আমার লজ্জা লাগে।

নাইমুল কিন্তু তার স্ত্রীকে ধরে ছিল না। তার হাত এখনো প্রসারিত। কঠিন হাতে নাইমুলকে জড়িয়ে ধরেছিল মরিয়ম নিজেই।

পাঠক, মহান বিজয় দিবসে যে গল্প শেষ হবে সেই গল্প আনন্দময় হওয়া উচিত বলেই আমি এরকম একটা সমাপ্তি তৈরি করেছি।

বাস্তবের সমাপ্তি এরকম ছিল না। নাইমুল কথা রাখে নি। সে ফিরে আসতে পারে নি তার স্ত্রীর কাছে। বাংলার বিশাল প্রান্তরের কোথাও তার কবর হয়েছে। কেউ জানে না কোথায়। এই দেশের ঠিকানাবিহীন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার কবরের মধ্যে তারটাও আছে। তাতে কিছু যায় আসে না। বাংলার মাটি পরম আদরে তার বীর সন্তানকে ধারণ করেছে। জোছনার রাতে সে তার বীর সন্তানদের কবরে অপূর্ব নকশা তৈরি করে। গভীর বেদনায় বলে, আহারে! আহারে!

পরিশিষ্ট

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব ও সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে পাওয়া খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণ তালিকা নিচে দেওয়া হলো। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর ৮/২৫/ডি-১/৭২-১৩৭৮ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ এই তালিকা প্রকাশিত হয়।

খেতাবপ্রাপ্ত শহীদ বীরদের নামের পাশে তারকা (*) চিহ্ন উল্লেখ করা হলো।

বীরশ্রেষ্ঠ

নাম	মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধকালীন পদবী
মহিউদ্দিন জাহাংগীর*		ক্যাপ্টেন
হামিদুর রহমান*		সিপাই
মোঃ মোস্তাফা*		সিপাই
রুহুল আমিন*	নৌ বাহিনী	ই. আর. এ
মতিউর রহমান*	বিমান বাহিনী	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মুন্সি আবদুর রব*		ল্যান্স নায়েক
নূর মোহাম্মদ*		ল্যান্স নায়েক

বীর উত্তম

নাম	মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধকালীন পদবী
আবদুর রব	সেনা প্রধান, সেনা সদর	লে. কর্নেল
কে. এম. সফিউল্লাহ	অধিনায়ক, এস. ফোর্স	মেজর
জিয়াউর রহমান	অধিনায়ক, জেড. ফোর্স	মেজর
চিত্তরঞ্জন দত্ত	সেক্টর অধিনায়ক-৪	মেজর
কাজী নূরুজ্জামান	সেক্টর অধিনায়ক-৭	মেজর
মীর শওকত আলী	সেক্টর অধিনায়ক-৫	মেজর
খালেদ মোশারফ	অধিনায়ক, কে. ফোর্স	মেজর

নাম	সেক্টর	পদবী
আবদুল মঞ্জুর	সেক্টর অধিনায়ক-৮	মেজর
আবু তাহের	সেক্টর অধিনায়ক-১১	মেজর
এ. এন. এম.নূরুজ্জামান	সেক্টর অধিনায়ক-৩	ক্যাপ্টেন
রফিকুল ইসলাম	সেক্টর অধিনায়ক-১	ক্যাপ্টেন
আবদুস ছালেক চৌধুরী	সেক্টর অধিনায়ক-২	ক্যাপ্টেন
আমিনুল হক	অধিনায়ক, ৮ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
খাজা নিজাম উদ্দিন*	সেক্টর-৪	লিডার গণবাহিনী
হারুন আহমেদ চৌধুরী	সেক্টর-১	ক্যাপ্টেন
এ. টি. এম. হায়দার	সেক্টর অধিনায়ক-২	মেজর
এম. এ. গাফ্ফার হালদার	অধিনায়ক, ৯ ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
শরীফুল হক (ডালিম)	সেক্টর-৪	মেজর
মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান ওমর	সেক্টর-৯	ক্যাপ্টেন
মাহবুবুর রহমান	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন
মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন	অধিনায়ক, ১ম ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
আফতাব কাদের*	সেক্টর-১	ক্যাপ্টেন
মাহবুবুর রহমান*	জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
সালাহউদ্দিন মমতাজ*	১ম ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
আজিজুর রহমান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
এস. এম ইমদাদুল হক*	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট
আনোয়ার হোসেন*	১ম ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট
এ. এম. আশফাকুস সামাদ*	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
আফতাব আলী	—	সুবেদার
ফয়েজ আহমেদ	—	সুবেদার
বেলায়েত হোসেন	—	নায়েব সুবেদার
ময়নুল হোসেন	—	নায়েব সুবেদার
হাবিবুর রহমান	—	নায়েব সুবেদার
শাহ্ আলম	—	হাবিলদার
নূরুল আমিন	—	হাবিলদার
নাসির উদ্দিন	—	হাবিলদার
আবদুল মান্নান	—	নায়েক
আবদুল লতিফ	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুস ছাত্তার	—	ল্যান্স নায়েক
নূরুল হক	—	সিপাই
মোহাম্মদ শামসুজ্জামান	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
শাকিল মিন	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
ফজলুর রহমান	—	সুবেদার
মজিবুর রহমান	—	নায়েব সুবেদার
শফিকউদ্দিন চৌধুরী	—	নায়েক
আবু তালেব	—	সিপাই

নাম	সেক্টর	পদবী
সালাহ উদ্দিন আহমেদ	—	সিপাই
আনোয়ার হোসেন	—	সিপাই
এরশাদ আলী	—	সিপাই
মোজাহার উল্লা	এম. এফ, সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো
জালাল উদ্দিন	নৌ বাহিনী	এল এস
আফজাল মিঞা	নৌ বাহিনী	ই আর এ
বদিউল আলম	নৌ বাহিনী	এম ই আর
শফিউল মাওলা	নৌ বাহিনী	এ বি
আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী	নৌ বাহিনী	সাব/লে.
মতিউর রহমান	এম এফ	নৌ-কমান্ডো
শাহ আলম	এম এফ, সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো
এ. কে. খন্দকার	বিমানবাহিনী প্রধান	গ্রু. ক্যাপ্টেন
এম.কে.বাসার	সেক্টর অধিনায়ক-৬	উইং কমান্ডার
সুলতান মাহমুদ	অধিনায়ক, কিলো ফ্লাইট	স্কোয়ার্ড্রন লিডার
শামছুল আলম	সদর দফতর, মুজিবনগর	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
বদরুল আলম	কিলো ফ্লাইট	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
লিয়াকত আলী খান	সদর দপ্তর, জেড. ফোর্স	ফ্লাইট অফিসার
শাহাবুদ্দিন আহমেদ	কিলো ফ্লাইট	ক্যাপ্টেন
আকরাম আহমেদ	কিলো ফ্লাইট	ক্যাপ্টেন
শরফুদ্দিন	কিলো ফ্লাইট	ক্যাপ্টেন
এম. এইচ. সিদ্দিকী	সেক্টর-৮	ক্যাপ্টেন
আবদুল কাদের সিদ্দিকী	সেক্টর-১১	মুক্তিবাহিনী
খন্দকার নাজমুল হুদা	সেক্টর-৮	মেজর
আবু সালেহ মোঃ নাছিম	অধিনায়ক, ১১ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
সাফায়াত জামিল	অধিনায়ক, ৩য় ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
ময়নুল হোসেন চৌধুরী	অধিনায়ক, ২য় ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	সেক্টর-৭	মেজর
মহসীন উদ্দিন আহমেদ	জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
আমিন আহমেদ চৌধুরী	জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
এম.এ. আর. আজম চৌধুরী	সেক্টর-৮	মেজর
মোস্তাফিজুর রহমান	সেক্টর-৮	মেজর
হাফিজ উদ্দিন আহমেদ	১ম ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
অলি আহমেদ	বি.এম. জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
জাফর ইমাম	অধিনায়ক, ১০ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
এ.ওয়াই. মাহফুজুর রহমান	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
মেহ্দী আলী ইমাম	সেক্টর-৯	ক্যাপ্টেন
এস.এইচ.এম.বি নূর চৌধুরী	এ.ডি.সি, প্রধান সেনাপতি	ক্যাপ্টেন
ইমামুজ্জামান	কে. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
এস.আই.বি নুরুন্নবী খান	৩য় ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট

নাম	সেক্টর	পদবী
মতিউর রহমান	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
আবদুল মান্নান	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
গোলাম হেলাল মোরশেদ খান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট
শমসের মবিন চৌধুরী	সেক্টর-১	লেফটেন্যান্ট
আবদুর রউফ	সেক্টর-৫	লেফটেন্যান্ট
খন্দকার আজিজুল ইসলাম	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
আবদুল জব্বার পাটোয়ারী	—	সুবেদার মেজর
আবদুল ওহাব	—	সুবেদার
আবদুস শুকুর	—	সুবেদার
আবদুল করিম	২য় ইস্ট বেঙ্গল	সুবেদার
ওয়ালিউল্লাহ	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ আমানুল্লাহ	—	সুবেদার
মোহাম্মদ ইব্রাহীম	—	নায়েব সুবেদার
ভুলু মিঞা	—	নায়েব সুবেদার
আবদুস ছালাম	—	নায়েব সুবেদার
এম. এ. মান্নান	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল হক ভুঁইয়া	—	নায়েব সুবেদার
ইয়ার আহমেদ	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল মালেক	ই পি আর সেক্টর-৩	নায়েব সুবেদার
শহীদুল্লাহ ভুঁইয়া	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল হাসেম	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল হক	—	নায়েব সুবেদার
নূর আহমেদ গাজী	—	নায়েব সুবেদার
আশরাফ আলী খান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
শামসুল হক	সেক্টর-৪	নায়েব সুবেদার
জোনাব আলী	২য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
নূরুল হক	—	হাবিলদার
আবদুল হালিম	—	হাবিলদার
নূরুল ইসলাম	—	হাবিলদার
রফিকুল ইসলাম	—	হাবিলদার
রুহুল আমিন	—	হাবিলদার
আফজাল হোসেন (সৈয়দ)	—	হাবিলদার
রাঙ্গা মিয়া	—	হাবিলদার
সাকিমুদ্দিন	—	হাবিলদার
গোলাম রসুল	সেক্টর-৪	হাবিলদার
তাহের	—	হাবিলদার
আফসার আলী	—	নায়েক
আবদুল হক	—	নায়েক

নাম	সেক্টর	পদবী
আবদুল মোতালেব	—	নায়েক
নূরুজ্জামান	—	নায়েক
তৌহিদুল্লাহ	—	নায়েক
আবদুর রহমান	—	নায়েক
মোহর আলী	—	নায়েক
আবদুল খালেক	—	নায়েক
আবদুর রব চৌধুরী	সেক্টর-২	নায়েক
মোহাম্মদ মোস্তাফা	—	ল্যান্স নায়েক
সিরাজুল ইসলাম	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুল বারেক	—	ল্যান্স নায়েক
আবুল কালাম আজাদ	—	ল্যান্স নায়েক
দেলোয়ার হোসেন	—	ল্যান্স নায়েক
তারা উদ্দিন	—	সিপাই
আবদুল আজিজ	৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
মোহাম্মদ সানাউল্লাহ	—	সিপাই
গোলাম মোস্তফা কামাল	—	সিপাই
খন্দকার রেজানুর হোসেন	—	সিপাই
হায়দার আলী	২য় ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আবুল কালাম আজাদ	—	সিপাই
জামাল উদ্দিন	—	সিপাই
আবদুর রহিম	—	সিপাই
নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া	—	সিপাই
আবদুল মান্নান	—	সিপাই
আলী আশ্রাফ	—	সিপাই
মজিবুর রহমান	—	সিপাই
আবদুল হক	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
রমজান আলী	১০ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
হেমায়েত উদ্দিন	সেক্টর-৮	হাবিলদার
নূরুল ইসলাম		মোজাহিদ
আবদুল খালেক	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	মোজাহিদ
সিরাজুল হক	৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, সেক্টর-৮	মোজাহিদ
রমিজ উদ্দিন	২য় ইস্ট বেঙ্গল	মোজাহিদ
তমিজ উদ্দিন	সেক্টর-৬	মোজাহিদ ক্যাপ্টেন
এলাহী বক্স পাটোয়ারী	সেক্টর-২	আনসার
ফকরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	—	সুবেদার মেজর
খন্দকার মতিয়ার রহমান	—	সুবেদার
মনিরুজ্জামান	—	সুবেদার
সুলতান আহমেদ	—	নায়েব সুবেদার

নাম	সেক্টর	পদবী
সৈয়দ আমিরুজ্জামান	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল হাকিম	—	হাবিলদার
জামান মিয়া	—	হাবিলদার
আবদুস সালাম	—	হাবিলদার
নাজিমুদ্দিন	—	হাবিলদার
ইউ কে সিং	—	হাবিলদার
আনিস মোল্লা	—	হাবিলদার
কামরুজ্জামান খলিফা	—	হাবিলদার
আরব আলী	—	হাবিলদার
নূরুল ইসলাম	—	হাবিলদার
তারিক উল্লাহ	—	হাবিলদার
দেলোয়ার হোসেন	—	নায়েক
আজিজুল হক	—	নায়েক
মোজাফ্‌ফর আহমেদ	—	নায়েক
আবুল কাশেম	—	নায়েক
আবদুল মালেক	—	নায়েক
শাহ্ আলী	—	নায়েক
মফিজ উদ্দিন আহমেদ	—	ল্যান্স নায়েক
জিল্লুর রহমান	—	ল্যান্স নায়েক
লিলু মিঞা	—	ল্যান্স নায়েক
নিজাম উদ্দিন	—	ল্যান্স নায়েক
আবুল খায়ের	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুস্ ছাত্তার	—	ল্যান্স নায়েক
আবুল বাসার	—	সিপাই
আবদুল মজিদ	—	সিপাই
আনসার আলী	—	সিপাই
মোহাম্মদ উল্লা	—	সিপাই
আতাহার আলী মল্লিক	—	সিপাই
আবদুল মোতালিব	—	সিপাই
সেরাজ মিঞা	—	সিপাই
আবদুল আজিম	—	সিপাই
মোহাম্মদ মহসীন	—	সিপাই
আমিনউল্লাহ্ শেখ	নৌ-বাহিনী	এ বি
এম. এইচ. মোল্লা	নৌ-বাহিনী	এ বি
মহিবুল্লাহ	নৌ-বাহিনী	এ বি
ফরিদ উদ্দিন আহ্‌মেদ	নৌ-বাহিনী	আর ই এন
মোহাম্মদ আবদুল মালেক	নৌ-বাহিনী	সিম্যান
মোহাম্মদ আব্দুর রহমান	নৌ-বাহিনী	এস টি ডব্লিউ ডি

নাম	সেক্টর	পদবী
এ. ডব্লিউ. চৌধুরী	নৌ-বাহিনী	সাবমেরিনার
আবদুর রকিব মিঞা	নৌ-বাহিনী	এম. ই
সৈয়দ মনসুর আলী	বিমান বাহিনী	ফ্লাইট সার্জেন্ট
আবদুল মান্নান	—	কনস্টেবল পুলিশ
তৌহিদ	—	কনস্টেবল পুলিশ
মাহবুব উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর-৮	মহকুমা পুলিশ অফিসার
মোঃ শাহজাহান সিদ্দিকী	সেক্টর-২	নৌ-কমান্ডো
কবিরুজ্জামান	সেক্টর-২	নৌ-কমান্ডো
মোফাজ্জেল হোসেন (মায়া)	সেক্টর-২	গণবাহিনী
আবুল কাশের ভূঁইয়া	সেক্টর-২	গণবাহিনী
আব্দুস সালাম	সেক্টর-২	গণবাহিনী
আবদুস সবুর খান	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
কামরুল হক (স্বপন)	সেক্টর-২	সেনা-ক্যাডেট
কাজী কামাল উদ্দিন	সেক্টর-২	সেনা-ক্যাডেট
শাফী ইমাম (রুমী)	সেক্টর-২	গণবাহিনী
আবদুল হালিম চৌধুরী (জুয়েল)	সেক্টর-২	গণবাহিনী
বদিউল আলম (বদি)	সেক্টর-২	গণবাহিনী
মোহাম্মদ আবু বকর	সেক্টর-২	গণবাহিনী
মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন	সেক্টর-৪	গণবাহিনী
মাহমুদ হোসেন	সেক্টর-৪	গণবাহিনী
নিলমণি সরকার	সেক্টর-৪	গণবাহিনী
জগত জ্যোতি দাস	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
সিরাজুল ইসলাম	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
ইয়ামিন চৌধুরী	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
মতিউর রহমান	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
আবদুস সামাদ	সেক্টর-৬	গণবাহিনী
এ.টি.এম হামিদুল হোসাইন	সেক্টর-৭	গণবাহিনী
আবুবকর সিদ্দিকী	সেক্টর-৭	গণবাহিনী
মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান	সেক্টর-৭	গণবাহিনী
মোহাম্মদ খালিদ সাইফুদ্দিন	সেক্টর-৮	গণবাহিনী
এম.এ. মান্নান	সেক্টর-৮	গণবাহিনী
তৌফিক এলাহী চৌধুরী	সেক্টর-৮	মহকুমা অফিসার
খিজির আলী	সেক্টর-৯	গণবাহিনী
আলতাফ হোসাইন	সেক্টর-৯	গণবাহিনী
মোহাম্মদ ইউসুফ	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
মোহাম্মদ খুররাম	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
আমানুল্লাহ কবির	সেক্টর-১১	গণবাহিনী

নাম	সেক্টর	পদবী
নূর ইসলাম	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
শওকত আলী সরকার	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
আবুল কালাম আজাদ	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
মোহাম্মদ শাহজাহান	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	সেক্টর-১১	গণবাহিনী

বীর প্রতীক

নাম	মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধকালীন পদবী
মোহাম্মদ আবদুল মতিন	সদর দপ্তর এস. ফোর্স	মেজর
আবু তাহের সালাউদ্দিন	সেনা সদর	মেজর
মোহাম্মদ আবদুল মতিন	অধিনায়ক, ১১ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
মোহাম্মদ মতিউর রহমান	সেক্টর-৩	মেজর
এম. আইনউদ্দিন	অধিনায়ক, ৯ম ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
আকবর হোসেন	সেক্টর-২	মেজর
নজরুল হক	সেক্টর-৬	মেজর
বজলুল গণি পাটোয়ারী	জেড. ফোর্স	মেজর
আবদুর রশিদ	সেক্টর-৭	ক্যাপ্টেন
শহীদুল ইসলাম	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন
সৈয়দ মইনুদ্দিন আহ্‌মেদ	এস. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
আকতার আহমেদ	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন
আনোয়ার হোসেন	জেড ফোর্স	ক্যাপ্টেন
দেলোয়ার হোসেন	সেক্টর-৬	ক্যাপ্টেন
সিতারা বেগম	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন
দিদারুল আলম	জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
এ. এম. রাশেদ চৌধুরী	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
এম. হারুনুর রশিদ	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
ইবনে ফজল বদিউজ্জামান	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
নজরুল ইসলাম ভুঁইয়া	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
হুমায়ুন কবির চৌধুরী	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
মোহাম্মদ শফিউল্লাহ্	সেক্টর-৮	লেফটেন্যান্ট
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
মাহবুব আলম	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
সাঈদ আহ্‌মেদ	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
অলিক কুমার গুপ্ত	সেক্টর-৮	লেফটেন্যান্ট
মমতাজ হাসান	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
কে. এম. আবুবকর	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট

নাম	সেক্টর	পদবী
মিজানুর রহমান মিএগ্র	সেক্টর-১১	লেফটেন্যান্ট
তাহের আহ্‌মেদ	সেক্টর-১	লেফটেন্যান্ট
মনজুর আহ্‌মেদ	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
সামসুল আলম	—	লেফটেন্যান্ট
জামিল উদ্দিন আহ্‌সান	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
ওয়াকার হাসান	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
মাসুদুর রহমান	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
জহিরুল হক খান	সেক্টর-৪	লেফটেন্যান্ট
ওয়ালীউল ইসলাম	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
শওকত আলী	সেক্টর-১	লেফটেন্যান্ট
মোদ্দাসির হোসাইন খান	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
রওশন ইয়াজদানী ভুঁইয়া	সেক্টর-৮	লেফটেন্যান্ট
জাহাঙ্গীর ওসমান	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
মোহাম্মদ নূরুল হক	—	সুবেদার মেজর
হারিস মিএগ্র	—	সুবেদার মেজর
আবদুল মজিদ	—	সুবেদার মেজর
মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া	—	সুবেদার মেজর
নূরুল আজিম চৌধুরী	—	সুবেদার মেজর
মোহাম্মদ আলী	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	সুবেদার মেজর
মোহাম্মদ আবুল বাসার	—	সুবেদার
আবদুল জব্বার	—	সুবেদার
আলী নেওয়াজ	—	সুবেদার
মোহাম্মদ হাফিজ	—	সুবেদার
জালাল আহ্‌মেদ	—	সুবেদার
মোহাম্মদ শামসুল হক	—	সুবেদার
আবদুল হাকিম	—	সুবেদার
করম আলী হাওলাদার	—	সুবেদার
বদিউর রহমান	—	সুবেদার
আবদুল জব্বার	—	সুবেদার
আবুল হাশেম	সেক্টর-২	সুবেদার
চাঁন মিয়া	২য় ইস্ট বেঙ্গল	সুবেদার
এম. এ. মতিন চৌধুরী	সেক্টর-৪	সুবেদার
রছিব আলী	সেক্টর-৪	সুবেদার
আফতাব হোসাইন	সেক্টর-১১	সুবেদার
আবদুল লতিফ	—	নায়েব সুবেদার
আবুল হাসেম	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ আবদুল মমিন	২য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
আলতাফ হোসাইন খান	—	নায়েব সুবেদার

নাম	সেক্টর	পদবী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ হোসাইন	—	নায়েব সুবেদার
মংগল মিয়া	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল জব্বার খান	—	নায়েব সুবেদার
কবির আহমেদ	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	—	নায়েব সুবেদার
গিয়াস উদ্দিন	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ রেজাউল হক	—	নায়েব সুবেদার
মনসুর আলী	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল জব্বার	—	নায়েব সুবেদার
হোসাইন আলী তালুকদার	—	নায়েব সুবেদার
মুসলিম উদ্দিন এসি	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
মনির আহমেদ খান	১৪ ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
কাজী আকমল আলী	সেক্টর-৩	নায়েব সুবেদার
আলী আকবর	৩য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
আবুল কালাম	৩য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
আবদুল হাই	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
তোফায়েল আহমেদ	২য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার
সাইফুদ্দিন	—	হাবিলদার
রুহুল আমিন	—	হাবিলদার
আবদুল গফুর	—	হাবিলদার
আবদুস সোবহান	—	হাবিলদার
ওয়াজেদ আলী মিঞা	—	হাবিলদার
সফিকুল ইসলাম	—	হাবিলদার
আবদুল লতিফ	—	হাবিলদার
মোজাম্মেল হক	—	হাবিলদার
আবু তাহের	—	হাবিলদার
সিরাজ মিঞা	—	হাবিলদার
আবদুল আওয়াল	—	হাবিলদার
মনিরুল ইসলাম	—	হাবিলদার
মুসলেহ উদ্দিন	—	হাবিলদার
আবদুল মালেক	—	হাবিলদার
সাহেব মিঞা	—	হাবিলদার
নূর মোহাম্মদ	—	হাবিলদার
মোহাম্মদ মকবুল হোসাইন	১ম ইস্ট বেঙ্গল	হাবিলদার
মনির আহমেদ	২য় ইস্ট বেঙ্গল	হাবিলদার
মিজানুর রহমান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	হাবিলদার
সোনা মিঞা	২য় ইস্ট বেঙ্গল	হাবিলদার

নাম	সেক্টর	পদবী
মোহাম্মদ বিল্লাল উদ্দিন	—	নায়েক ক্লার্ক
সাইদুল আলম	—	নায়েক
আবদুল ওহাব	—	নায়েক
শহীদুল্লাহ	—	নায়েক
আবদুল বাতেন	—	নায়েক
সিরাজুল হক	—	নায়েক
আবদুন নূর	—	নায়েক
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	—	নায়েক
সিকান্দর আহমেদ	—	নায়েক
গোলাম মোস্তফা	—	নায়েক
আবুল কালাম	—	নায়েক
আবুল বাশার	—	ল্যান্স নায়েক
তাজুল ইসলাম	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুর রাজ্জাক	—	ল্যান্স নায়েক
অলিমুল ইসলাম	—	ল্যান্স নায়েক
আলিমুল ইসলাম	—	ল্যান্স নায়েক
মতিউর রহমান	—	ল্যান্স নায়েক
শাহাবুদ্দিন	—	ল্যান্স নায়েক
শাহজালাল আহমেদ	—	ল্যান্স নায়েক
আলী আহমেদ	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুল মান্নান	—	ল্যান্স নায়েক
মোহাম্মদ ইদ্রিস	—	ল্যান্স নায়েক
আবদুল মান্নান	—	সিপাই
বসির আহমেদ	—	সিপাই
আবুল হাসেম	—	সিপাই
আবদুল বাতেন	—	সিপাই
আবদুল খালেক	—	সিপাই
আবদুল মজিদ	—	সিপাই
মোহাম্মদ আমিনউল্লাহ	—	সিপাই
গোলাম মোস্তাফা	—	সিপাই
মোহাম্মদ সিদ্দিক	—	সিপাই
এ.বি.এম. রুশিউল আলম	—	সিপাই
মোহাম্মদ ইসমাইল	—	সিপাই
খলিলুর রহমান	—	সিপাই
মোহাম্মদ মোস্তাফা	—	সিপাই
আবদুল ওয়াহিদ	—	সিপাই
ফারুক আহমেদ পাটোয়ারী	—	সিপাই
এনামুল হক	—	সিপাই

নাম	সেক্টর	পদবী
মোহাম্মদ এজাজুল হক খান	—	সিপাই
আসাদ মিঞা	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
দেলোয়ার হোসাইন	১ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আবদুল কাদের	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আবদুল বাসেত	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
কাজী মোরশেদুল আলম	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আবদুল কুদ্দুস	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আবু মুসলিম	সেক্টর–২	সিপাই
রফিকুল ইসলাম	সেক্টর–২	সিপাই
বজলু মিঞা	সেক্টর–৪	সিপাই
কামাল উদ্দিন	সেক্টর–৪	—
আমির হোসেন	—	—
মোহাম্মদ ইসহাক	১০ ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
বাদশা মিঞা	১০ ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
হারুন-অর-রশিদ	সেক্টর– ৩	সিপাই
আজিজুল হক	—	মুজাহিদ
মোশাররফ হোসেন বাঙাল	সেক্টর–২	মুজাহিদ
জুলফু মিঞা	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	মুজাহিদ
আবদুল কুদ্দুস গাজী	সেক্টর – ২	মুজাহিদ
ওয়ালিল হোসেন	—	মুজাহিদ
সেরাজুল ইসলাম	সেক্টর–২	মুজাহিদ
আলী আকবর	সেক্টর–২	মুজাহিদ
বাচ্চু মিঞা	৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল	মুজাহিদ
আবদুস সালাম	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	মুজাহিদ
মোহাম্মদ ওসমান গনি	—	ই পি আর
মুজাফফর আহমেদ	—	সুবেদার মেজর
তোবারক উল্লাহ্	—	সুবেদার মেজর
আবদুল জলিল শিকদার	—	সুবেদার মেজর
খায়রুল বাসার	—	সুবেদার
হাসান উদ্দিন আহমেদ	—	সুবেদার
গোলাম মোস্তফা	—	সুবেদার
আহমেদ হোসেন	—	সুবেদার
আবদুল মালেক	—	সুবেদার
গোলাম হোসেন	—	সুবেদার
মাজহারুল হক	—	সুবেদার
খুরশেদ আলম	—	সুবেদার
মোহাম্মদ আবদুল গাজী	—	সুবেদার
এস.এ.সিদ্দিক	—	নায়েব সুবেদার

নাম	সেক্টর	পদবী
আহসান উল্লাহ	—	নায়েব সুবেদার
শেখ সুলেমান	—	নায়েব সুবেদার
আইনুদ্দিন আহমেদ	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ রৌফ মজুমদার	—	নায়েব সুবেদার
মোহাম্মদ লনি মিয়া দেওয়ান	—	নায়েব সুবেদার
আবদুল মালেক চৌধুরী	—	নায়েব সুবেদার
নূরুল হুদা	—	নায়েব সুবেদার
মকবুল আলী	—	নায়েব সুবেদার
মমতাজ মিয়া	—	হাবিলদার
লালু মিয়া	—	হাবিলদার
আবু তাহের	—	হাবিলদার
মোহাম্মদ ইব্রাহিম	—	হাবিলদার
মোবারক হোসেন	—	হাবিলদার
আবদুল হালিম	—	হাবিলদার
সায়েদ আলী	—	হাবিলদার
আবদুর রউফ শরিফ	—	হাবিলদার
আবদুল হাসেম	—	হাবিলদার
আবদুল হালিম	—	হাবিলদার
আবদুল আওয়াল	—	হাবিলদার
আজিজুর রহমান	—	হাবিলদার
ফজলুল হক	—	হাবিলদার
ওয়াজিউল্লাহ	—	হাবিলদার
লুৎফর রহমান	—	হাবিলদার
আবদুর রহমান	—	হাবিলদার
ওয়াহিদুর রহমান	—	হাবিলদার
আসাদ আলী	—	হাবিলদার
আবদুর রশিদ	—	হাবিলদার
আবদুল হোসেন	—	হাবিলদার
আবদুল গাফফার	—	হাবিলদার
কাছেম আলী হাওলাদার	—	হাবিলদার
মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী	—	নায়েক
সায়েদুল হক	—	নায়েক
মোহাম্মদ লোকমান	—	নায়েক
আবদুল মান্নান খান	—	নায়েক
আবদুল ওয়াহিদ	—	নায়েক
সফিক উদ্দিন আহমেদ	—	নায়েক
নজরুল ইসলাম	—	নায়েক
আতাহার আলী	—	নায়েক

নাম	সেক্টর	পদবী
আহ্মাদুর রহমান	—	নায়েক
আবদুল মালেক	—	নায়েক
জাকির হোসেন	—	নায়েক
মুকতার আলী	—	নায়েক
রশিদ আলী	—	নায়েক
আবদুল ওয়াজেদ	—	নায়েক
হাবিবুর রহমান	—	নায়েক
তোফায়েল আহমেদ	—	নায়েক
দুদু মিঞা	—	নায়েক
আলী আকবর	সেক্টর-৫	নায়েক
আতাউর রহমান	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েক
আবদুল হক	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েক
সফিকুর রহমান	—	নায়েক
দেলোয়ার হোসেন	—	নায়েক
দেলোয়ার হোসেন	—	নায়েক
মফিজুর রহমান	—	নায়েক
নান্নু মিয়া	—	নায়েক
মোস্তফা কামাল	—	নায়েক
গাজী আবদুল ওয়াহিদ	—	নায়েক
ফোরকান উদ্দিন	—	নায়েক
আবদুল জব্বার	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েক
সিরাজুল ইসলাম	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েক
রবি উল্লাহ্	১ম ইস্ট বেঙ্গল	নায়েক
তাজুল ইসলাম	১ম ইস্ট বেঙ্গল	ল্যান্স নায়েক
ইউসুফ আলী	১ম ইস্ট বেঙ্গল	ল্যান্স নায়েক
আবদুর রহমান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	ল্যান্স নায়েক
আবদুল হাই	২য় ইস্ট বেঙ্গল	ল্যান্স নায়েক
মোহাম্মদ মাখন খান	—	সিপাই
মোহাম্মদ শাহজাহান	—	সিপাই
সামসুল হক	—	সিপাই
রবিউল হক	—	সিপাই
মোহাম্মদ শরিফ	—	সিপাই
নূরুল হক	—	সিপাই
গুল মোহাম্মদ ভুঁইয়া	—	সিপাই
আবদুল মান্নান	—	সিপাই
ইলিয়াসুর রহমান	—	সিপাই
আবদুল জলিল	—	সিপাই
সাজিদুর রহমান	—	সিপাই

নাম	সেক্টর	পদবী
ফারুক লস্কর	—	সিপাই
আবদুল মালেক	—	সিপাই
জাহাঙ্গীর হোসেন	—	সিপাই
বাচ্চু মিঞা	—	সিপাই
আবদুল ওয়াহাব	—	সিপাই
আবদুল হাসেম	—	সিগনালম্যান
আলী আকবর	—	সিপাই-কুক
আবু সালেক	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
হযরত আলী	১ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাই
আশরাফ আলী খান	—	সিপাই
তরিকুল ইসলাম	—	সিপাই
সফিউদ্দিন	—	সিপাই
সাইদুর রহমান	—	সিপাই
মোঃ ইদ্রিস	সেক্টর-৭	মুক্তিবাহিনী
নজরুল ইসলাম	নৌ-বাহিনী	এম ই আর
মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ	নৌ-বাহিনী	চীফ আর ই এ
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	নৌ-বাহিনী	এ বি
আবদুল আওয়াল	নৌ-বাহিনী	বি.ও.আর.এস.
মোফাজ্জল হোসেন	নৌ-বাহিনী	এল টি ও
এ.এস. ভুইয়া	নৌ-বাহিনী	এল টি ও
আহসানউল্লাহ	নৌ-বাহিনী	এম ই আর
এম. সদর উদ্দিন	সেক্টর-৬	স্কোয়াড্রন লিডার
এম. হামিদউল্লাহ খান	সেক্টর-১১	স্কোয়াড্রন লিডার
সহিদ উল্লাহ	বিমান বাহিনী	সার্জেন্ট
মি. হক	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
রুস্তম আলী	বিমান বাহিনী	এল এ সি
সৈয়দ রফিকুল ইসলাম	বিমান বাহিনী	সার্জেন্ট
জয়নাল আবেদীন	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
নজরুল ইসলাম	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
আলী আশরাফ	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
শেখ আজিজুর রহমান	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
রেজওয়ান আলী	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
হেলালউজ্জামান	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
রতন শরীফ	বিমান বাহিনী	কর্পোরাল
মোহাম্মদ সুলাইমান	—	কনস্টেবল
নিজামুদ্দিন	—	কনস্টেবল
ফারুক-ই-আজম	সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম	সেক্টর-১০	নৌ-কমান্ডো

নাম	সেক্টর	পদবী
মোঃ নূরুল হক	সেক্টর–১	নৌ-কমান্ডো
মোঃ আমির হোসেন	সেক্টর–১	নৌ-কমান্ডো
এস.এম. মাওলা	সেক্টর–১	নৌ-কমান্ডো
এ.কে.এম. ইসহাক	সেক্টর–১	ইঞ্জিনিয়ার
মোহাম্মদ হোসেন	সেক্টর–১	নৌ-কমান্ডো
মোহাম্মদ মতিউর রহমান	সেক্টর–৯	নৌ-কমান্ডো
মোহাম্মদ শাহজাহান কবির	সেক্টর–২	নৌ-কমান্ডো
মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী	সেক্টর–২	নৌ-কমান্ডো
এ. এস.এম. এ. খালেক	বিমান বাহিনী	প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ
আলমগীর আবদুস ছাত্তার	বিমান বাহিনী	প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ
আবদুল মুকিত	বিমান বাহিনী	প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ
গিয়াস উদ্দিন	সেক্টর–২	এফ এফ
গোলাম দস্তগীর গাজী	সেক্টর–২	এফ এফ
মুসুরুল আলম দুলাল	সেক্টর–২	এফ এফ
জয়নুল আবেদিন খান	সেক্টর–২	এফ এফ
মুহাম্মদ জিয়া	সেক্টর–২	এফ এফ
মুহাম্মদ জাকির	সেক্টর–২	এফ এফ
মাহমুদ	সেক্টর–২	এফ এফ
শেখ আবদুল মান্নান	সেক্টর–২	এফ এফ
হাবিবুল আলম	সেক্টর–২	এফ এফ
এ.এম.মোহাম্মদ ইসহাক	সেক্টর–২	এফ এফ
ডব্লিউ.এ.এস.ওয়াডারল্যান্ড	সেক্টর–২	এফ এফ
মোহাম্মদ এ. আজিজ	সেক্টর–২	এফ এফ
খায়রুল জাহান	সেক্টর–২	এফ এফ
সেলিম আকবর	সেক্টর–২	এফ এফ
আব্দুল্লাহেল বাকী	সেক্টর–২	এফ এফ
মোজাম্মেল হক	সেক্টর–২	এফ এফ
নওয়াব মিএগ	সেক্টর–২	এফ এফ
মানিক	সেক্টর–২	এফ এফ
সামসুল হক ফিটার	সেক্টর–২	এফ এফ
আনোয়ার হোসেন	সেক্টর–২	এফ এফ
আলমগীর করিম	সেক্টর–২	এফ এফ
মমিন	সেক্টর–২	এফ এফ
আবুল হোসেন	সেক্টর–২	এফ এফ
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	সেক্টর–২	এফ এফ

নাম	সেক্টর	পদবী
নূরুল হক	সেক্টর–২	এফ এফ
রফিকুল ইসলাম	সেক্টর–২	এফ এফ
মমিনুল হক ভুইয়া	সেক্টর–২	এফ এফ
মোহাম্মদ ইব্রাহীম খান	সেক্টর–২	এফ এফ
সেরাজ উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর–২	এফ এফ
মোঃ তৈয়ব আলী	সেক্টর–২	এফ এফ
আবদুস সামাদ	সেক্টর–২	এফ এফ
বাহারউদ্দিন রেজা	সেক্টর–২	এফ এফ
জামাল	সেক্টর–২	এফ এফ
মোহাম্মদ আশরাফ	সেক্টর–৩	এফ এফ
আবদুস সালাম	সেক্টর–৩	এফ এফ
রফিকুল হক	সেক্টর–৩	এফ এফ
নুরুল ইসলাম খান পাঠান	সেক্টর–৩	এফ এফ
শাহজাহান মজুমদার	সেক্টর–৩	এফ এফ
এ. কে. এম. মিরাজউদ্দিন	সেক্টর–৩	এফ এফ
মাহফুজুর রহমান	সেক্টর–৩	এফ এফ
আমির হোসেন	সেক্টর–৩	এফ এফ
মফিজুল ইসলাম	সেক্টর–৪	এফ এফ
এ.কে.এম. আতিকুল ইসলাম	সেক্টর–৪	এফ এফ
আশরাফুল হক	সেক্টর–৪	এফ এফ
মাহবুবুর রব সাদী	সেক্টর–৪	এফ এফ
রফিক উদ্দিন	সেক্টর–৪	এফ এফ
নুরুদ্দিন আহমেদ	সেক্টর–৪	এফ এফ
সিরাজুল ইসলাম	সেক্টর–৫	এফ এফ
মোহাম্মদ আবদুল মজিদ	সেক্টর–৫	এফ এফ
ফখরুদ্দিন চৌধুরী	সেক্টর–৫	এফ এফ
এম.এ. হালিম	সেক্টর–৫	এফ এফ
ইনামুল হক চৌধুরী	সেক্টর–৫	এফ এফ
মোহাম্মদ ইদ্রিস	সেক্টর–৫	এফ এফ
মোহাম্মদ বদরুজ্জামান	সেক্টর–৬	এফ এফ
হাছির উদ্দিন সরকার	সেক্টর–৩	এফ এফ
আবদুল হাই সরকার	সেক্টর–৬	এফ এফ
এম.এ. সরকার	সেক্টর–৬	এফ এফ
এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান	সেক্টর–৭	এফ এফ
মোহাম্মদ মহসীন আলী সরদার	সেক্টর–৭	এফ এফ
মোহাম্মদ আজাদ আলী	সেক্টর–৭	এফ এফ
মোঃ নূর হামিম	সেক্টর–৭	এফ এফ
মোঃ বদিউজ্জামান	সেক্টর–৭	এফ এফ

নাম	সেক্টর	পদবী
গোলাম আজাদ	সেক্টর-৮	এফ এফ
সদর উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর-৮	এফ এফ
আব্দুর রহিম	সেক্টর- ৮	এফ এফ
নাছির উদ্দিন	সেক্টর-৮	এফ এফ
হাবিবুর রহমান	সেক্টর-৮	এফ এফ
নজরুল ইসলাম	সেক্টর-৮	এফ এফ
হারুনুর রশিদ	সেক্টর-৮	এফ এফ
আবদুল মালেক	সেক্টর-৯	এফ এফ
হাজারী লাল তরফদার	সেক্টর-৯	এফ এফ
শামসুদ্দিন আহমেদ	সেক্টর-৯	এফ এফ
ইশতিয়াক হোসেন	সেক্টর-৯	এফ এফ
কে. এম. রফিকুল ইসলাম	সেক্টর-৯	এফ এফ
দিদার আলী	সেক্টর-৯	এফ এফ
মোহাম্মদ গোলাম ইয়াকুব	সেক্টর-৯	এফ এফ
আবদুল আলীম	সেক্টর-৯	এফ এফ
কুদ্দুস মোল্লা	সেক্টর-৯	এফ এফ
আনোয়ার হোসেন	সেক্টর-৯	এফ এফ
রফিকুল আহসান	সেক্টর-১০	এফ এফ
কে.এস.এ.মহিউদ্দিন(মানিক)	সেক্টর-১	এফ এফ
রফিকুল ইসলাম	সেক্টর-১০	এফ এফ
দেবদাস বিশ্বাস (খোকন)	সেক্টর-১০	এফ এফ
এ.টি.এম. খালেদ	সেক্টর-১১	এফ এফ
জহিরুল হক মুন্সি	সেক্টর-১১	এফ এফ
মোহাম্মদ আনিছুর রহমান	সেক্টর-১১	এফ এফ
আবদুল মজিদ	সেক্টর-১১	এফ এফ
মোছাম্মত তাহ্রামুন বেগম	সেক্টর-১১	এফ এফ
ভুঁইয়া	সেক্টর-১১	এফ এফ
নূর ইসলাম	সেক্টর-১১	এফ এফ
বশির আহমেদ	সেক্টর-১১	এফ এফ
আনিছুল হক আখন্দ	সেক্টর-১১	এফ এফ
মতিউর রহমান	সেক্টর-১১	এফ এফ
মোহাম্মদ জহুরুল হক মুন্সি	সেক্টর-১১	এফ এফ
আবুল কালাম	—	এফ এফ
মোহাম্মদ মাহবুব ইলাহী রঞ্জু	—	এফ এফ
এ.টি.এম.খালেদ	—	এফ এফ
মোহাম্মদ নূরুল হক	সেক্টর-১১	এফ এফ
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	সেক্টর-১১	এফ এফ
বাহার	সেক্টর-১১	এফ এফ

নাম	সেক্টর	পদবী
সৈয়দ সদরুজ্জামান	সেক্টর–১১	এফ এফ
বেলাল হোসেন	সেক্টর–১১	এফ এফ
মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন	সেক্টর–১১	এফ এফ
ওয়ারেছাত হোসেন	সেক্টর–১১	এফ এফ
সাখাওয়াৎ হোসেন	সেক্টর–১১	এফ এফ
মিজানুর রহমান খান	সেক্টর–১১	এফ এফ
হাবিবুর রহমান তালুকদার	সেক্টর–১১	এফ এফ
খোরশেদ আলম তালুকদার	সেক্টর–১১	এফ এফ
ফজলুল হক	সেক্টর–১১	এফ এফ
আবদুল গফুর মিয়া	সেক্টর–১১	এফ এফ
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্	সেক্টর–১১	এফ এফ
আবদুল হাকিম	সেক্টর–১১	এফ এফ
সৈয়দ গোলাম মোস্তফা	সেক্টর–১১	এফ এফ
আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী	সেক্টর–১১	এফ এফ
ছায়েদুর রহমান	সেক্টর–১১	এফ এফ
হামিদুল হক	সেক্টর–১১	এফ এফ
ফয়েজুর রহমান	সেক্টর–১১	এফ এফ
মোহাম্মদ খসরু মিয়া	সেক্টর–১১	এফ এফ
শহীদুল ইসলাম	সেক্টর–১১	এফ এফ
আনিছুর রহমান	সেক্টর–১১	এফ এফ

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান, তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২. Surrender at Dacca Birth of a Nation, Lt. Gen. JFR Jacob, The University Press Limited

৩. ৭১-এর দশ মাস, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, কাকলী প্রকাশনী

৪. একাত্তরের ঢাকা, সেলিনা হোসেন, আহমেদ পাবলিশিং হাউজ

৫. বাংলাদেশের তারিখ, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মাওলা ব্রাদার্স

৬. আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল, সাগর পাবলিশার্স

৭. মুক্তিযুদ্ধ ডেটলাইন আগরতলা, হারুন হাবিব, সাহিত্য প্রকাশ

৮. স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, মোঃ আবদুল হান্নান, পুর্বা প্রকাশনী

৯. মুক্তিযুদ্ধ মুক্তির জয়, সুফিয়া কামাল, সময় প্রকাশন

১০. একাত্তরের স্মৃতিচারণ, আহমেদ রেজা, প্যাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স

১১. রক্তভেজা একাত্তর, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, সাহিত্য প্রকাশ

১২. বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মাহবুব কামাল অনূদিত, তাজমহল বুক ডিপো

১৩. গেরিলা থেকে সম্মুখযুদ্ধে, মাহবুব আলম, সাহিত্য প্রকাশ

১৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, এম এ ওয়াজেদ মিয়া, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

১৫. স্মৃতি : ১৯৭১, সম্পাদনা : রশীদ হায়দার, বাংলা একাডেমী

১৬. একাত্তরের দিনগুলি, জাহানারা ইমাম, সন্ধানী প্রকাশনী

১৭. স্মৃতি অম্লান ১৯৭১, আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাহিত্য প্রকাশ

১৮. মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ, তাজুল মোহাম্মদ, সাহিত্য প্রকাশ

১৯. একাত্তরের স্মৃতি, বাসন্তী গুহঠাকুরতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

২০. একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী, আহমদ পাবলিশিং হাউস

২১. মুক্তিযুদ্ধের দু'শো রণাঙ্গন, মেজর রফিকুল ইসলাম পি এসসি সম্পাদিত, অনন্যা

২২. মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, আতিউর রহমান, সাহিত্য প্রকাশ

২৩. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, মোঃ বদরুজ্জামান মিয়া, বীর প্রতীক, কাশবন প্রকাশনী

২৪. মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ, সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ইউনুছ

২৫. বাংলাদেশ ও বাঙালি রেনেসাঁস স্বাধীনতা-চিন্তা ও আত্মানুসন্ধান, অনুপম সেন, অবসর

২৬. শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী
২৭. ডেটলাইন বাংলাদেশ : নাইন্টিন সেভেনটি ওয়ান সিডনি শনবার্গ, মফিদুল হক অনূদিত, সাহিত্য প্রকাশ
২৮. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ, মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ বীরউত্তম, আগামী প্রকাশনী
২৯. বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা ও বিবৃতি, রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, অন্যপ্রকাশ
৩০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র
৩১. পরাজিত পাকিস্তানী জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ, মুনতাসীর মামুন, সময় প্রকাশনী
৩২. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, সম্পাদনা সেলিম রেজা, বাংলা একাডেমী
৩৩. সত্তায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, আলমগীর সাত্তার, সাহিত্য প্রকাশ
৩৪. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, এম আর আখতার মুকুল, আগামী প্রকাশনী
৩৫. স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি, সংকলন ও সম্পাদনা ফরিদ কবির, মাওলা ব্রাদার্স
৩৬. বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, রেহমান সোবহান, ভোরের কাগজ প্রকাশনী
৩৭. মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ, হারুন হাবিব, অন্যপ্রকাশ
৩৮. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ, অনুপম প্রকাশনী
৩৯. ১৯৭১ উত্তর রণাঙ্গনে বিজয়, আখতারুজ্জামান মণ্ডল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৪০. অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু তার পরিবার ও আমি, মুমিনুল হক খোকা, সাহিত্য প্রকাশ
৪১. মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা পাবনা জেলা, আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৪২. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক, দীপঙ্কর মোহান্ত, সাহিত্য প্রকাশ
৪৩. একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ, তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত, সাহিত্য প্রকাশ
৪৪. স্মৃতিময় '৭১, হেনা দাস, সাহিত্য প্রকাশ
৪৫. বাংলাদেশ রক্তের ঋণ, এ্যান্থনি ম্যাসকার্নহাস, হাক্কানী পাবলিশার্স
৪৬. যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, মেজর নাসির উদ্দিন, অনুপম প্রকাশনী
৪৭. দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ, এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, রনত্রি অনূদিত, পপুলার পাবলিশার্স
৪৮. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : ঐতিহাসিক ভাষণ ইশতেহার ও চিঠি, মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস
৪৯. একাত্তরে পাকবর্বরতার সংবাদ ভাষ্য, আহমদ রফিক, সময় প্রকাশন
৫০. ১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, সম্পাদনা : রশীদ হায়দার, সাহিত্য প্রকাশ
৫১. Memoirs of Le. Gen. Gul Hassan Khan, OXFORD
৫২. বন্দিশালা পাকিস্তান, সৈয়দ নাজিমুদ্দীন হাশেম, সাহিত্য প্রকাশ
৫৩. মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস, মেজর জেনারেল এম এস এ ভূঁইয়া, আহমদ পাবলিশিং হাউস
৫৪. আমার একাত্তর, মোহাম্মদ নুরুল কাদের, সাহিত্য প্রকাশ
৫৫. একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, শাহরিয়ার কবির, সময় প্রকাশন
৫৬. একাত্তর করতলে ছিন্নমাথা, হাসান আজিজুল হক, সাহিত্য প্রকাশ
৫৭. যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস, সাহিদা বেগম, সাহিত্য প্রকাশ
৫৮. মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন, আতিউর রহমান, সাহিত্য প্রকাশ
৫৯. মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, সাহিত্য প্রকাশ
৬০. মুক্তিযুদ্ধ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, ছদরুদ্দীন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

৬১. মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর, শামসুল হুদা চৌধুরী, বিজয় প্রকাশনী
৬২. একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের বিচার, মোস্তাক হোসেন, অবয়ব প্রকাশন
৬৩. একাত্তরের শহীদ ডাক্তার আলীম চৌধুরী, শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৬৪. গৌরবাঙ্গনে, মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমদ, কাকলী প্রকাশনী
৬৫. বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব, আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাহিত্য প্রকাশ
৬৬. মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন ছবি চট্টগ্রামের কাকলী, এনায়েত মাওলা, সাহিত্য প্রকাশ
৬৭. দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অব শেখ মুজিব, রায়হান ইন্টারন্যাশনাল
৬৮. বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, সাহিত্য প্রকাশ
৬৯. স্বাধীনতা '৭১, কাদের সিদ্দিকী, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী
৭০. মুক্তিযুদ্ধের গল্প, সম্পাদনা আবুল হাসনাত, অবসর
৭১. স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন, বেগম মুশতারী শফী, অনুপম প্রকাশনী
৭২. মুক্তিযুদ্ধ ও রাইফেলস, সম্পাদনা : সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ রাইফেলস
৭৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহত্তর কুষ্টিয়া, মোঃ আব্দুল হান্নান, পূর্বা প্রকাশনী
৭৪. দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন ১৯৭১, মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, সূচয়নী পাবলিশার্স
৭৫. যখন বঙ্গভবনে ছিলাম, ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দীন আহমেদ, আগামী প্রকাশনী
৭৬. বাংলাদেশ : জাতির অবস্থা, আবদুর রাজ্জাক, সাহিত্য প্রকাশ
৭৭. স্বাধীনতার বাইশ বছর, মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, কাকলী প্রকাশনী
৭৮. অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি, জি. ডব্লিউ. চৌধুরী, হককথা প্রকাশনী
৭৯. অসহযোগের দিনগুলি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব, আতিউর রহমান, সাহিত্য প্রকাশ
৮০. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ, অনুপম প্রকাশনী
৮১. Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh, Salam Azad, Ankur Prakashani
৮২. মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ, হারুন হাবিব, অন্যপ্রকাশ
৮৩. একাত্তরের নয় মাস, রাবেয়া খাতুন, আগামী প্রকাশনী
৮৪. আমার একাত্তর, আনিসুজ্জামান, সাহিত্য প্রকাশ
৮৫. The Cruel Birth of Bangladesh, Archer K Blood, University Press Limited.
৮৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভারত, রাশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা, মেজর রফিকুল ইসলাম পি এসসি, আহমদ পাবলিশিং হাউস
৮৭. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, এ. এস. এম. শামছুল আরেফিন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
৮৮. দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, মুহাম্মদ নুরুল কাদির, মুক্ত প্রকাশনী
৮৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : এ লিডার উইথ ডিফারেন্স, ওবায়দুল হক
৯০. পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন, আহমেদ সালিম, অনুবাদ মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ
৯১. মুক্তিযুদ্ধ, সিদ্দিকুর রহমান, আগামী প্রকাশনী
৯২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা : ১৯৭১ জগন্নাথ হল, আগামী প্রকাশনী
৯৩. উত্তাল মার্চ : ১৯৭১, আহমেদ ফারুক হাসান, আগামী প্রকাশনী

বাংলাদেশের লেখালেখির ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা....* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁকে নিয়ে একটি পনেরো মিনিটের ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in Asia শিরোনামে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। একা থাকতে পছন্দ করেন। এখন তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দন কানন 'নুহাশ পল্লীতে'।